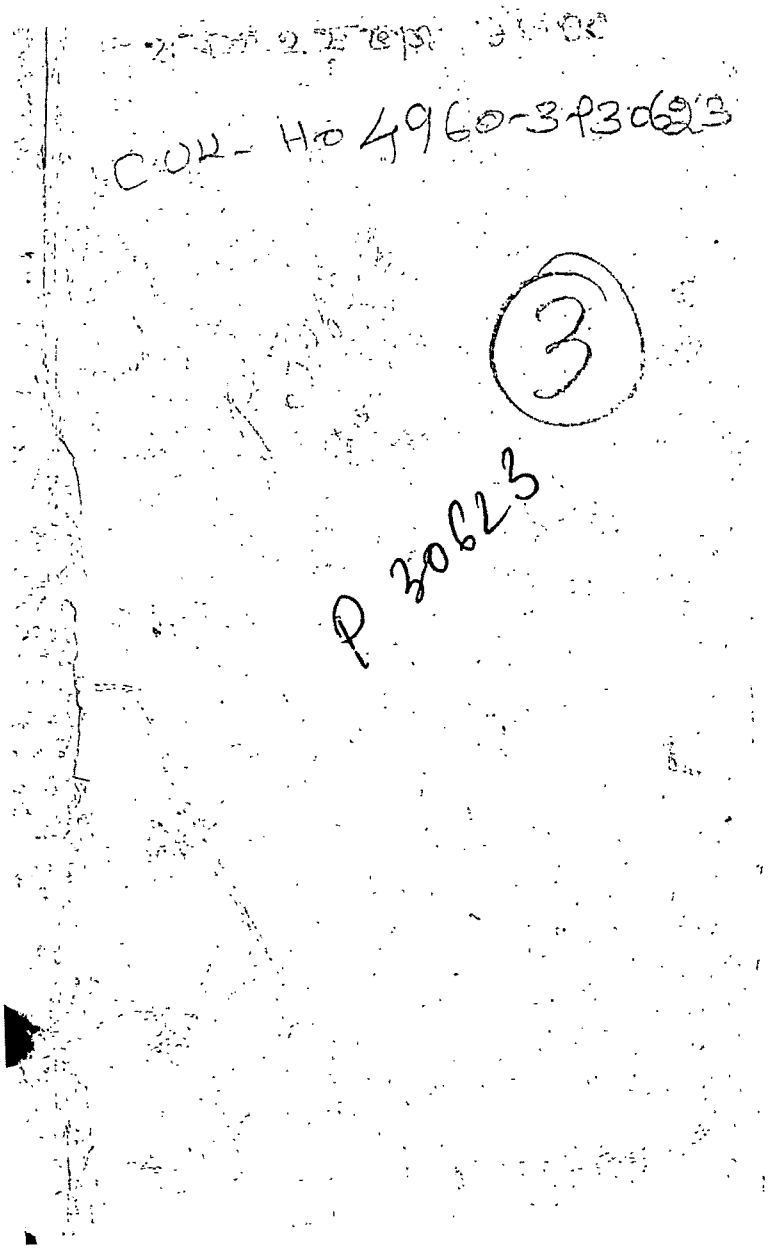
COR- HO 4960-3-930623
3
P 30623

। দুষ্কৃতখণ্ডনের উপায় অনুসন্ধান করিতে আসে
ত বলে দুষ্কৃতের ফল দুঃখ অনিবার্য্য, দুর্ব্বল মান
। মানে না—দুর্ব্বলতাকে দমন করিতে না পারিলে
বহুতে সে অব্যাহতি চায়। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা দেখিলেন
জ্ঞান সর্ব্বসাধারণকে সান্ত্বনা দিতে অক্ষম, মানবের প্রতি প
শমনে অবিচলিত দণ্ডহস্তে সে কেবল কর্ম্ম এবং ফলের মধ্যে
অমোঘ সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করে; লোকে নিরাশ হইয়া পড়ে। তাঁহারা
সহজ বিধি দিলেন, যাজকমণ্ডলী সমীপে দুষ্কৃত স্বীকার করিলে
পাপ হইতে মুক্তি। ইহাতে কর্ম্মফলও টলিবে না, মুক্তিও সুলভ
হইয়া আসিল। কর্ম্মফল যেন সহসা এই নূতন প্রায়শ্চিত্তবিধান
আবিষ্কার করিল। মুক্তিলাভের সহজ উপায় দেখিয়া আবালবৃদ্ধবনিতা দলে দলে এই পথ অবলম্বন করিতে লাগিল। সন্ন্যাসীরা মালাজপের ব্যবস্থা দিলেন, আশীর্ব্বচনের অধিকার
প্রতিপন্ন করিলেন এবং দুর্নিবিশেষে বিশেষ বিশেষ মন্ত্রও দিতে
আরম্ভ করিলেন; ক্রমে দাঁড়াইল এই যে, একদিকে বুদ্ধগণ, অন্যদিকে
অজ্ঞান মানব, এবং মধ্যে যাজকমণ্ডলী সেতুস্বরূপ। এইরূপে
সৃষ্টিছাড়া হইলেও নিঃশব্দে বৌদ্ধধর্ম্ম জ্ঞানমার্গচ্যুত হইয়া ব্রাহ্মণ্যের তন্ত্রজালে জড়িত হইয়া পড়িল। যেখানে কর্ম্মফলের এক
মাত্র অধিকার ছিল, সেখানে দেবপ্রসাদবৎ একটা অনুগ্রহনিগ্রহের
ভাব অল্পে অল্পে ব্যক্ত হইয়া উঠিল। ক্রমে অনুষ্ঠান বহু বাড়িতে
লাগিল, ব্রাহ্মণের সহিত ঘনিষ্ঠতাবৃদ্ধি সহকারে প্রাচীন বৌদ্ধ
সরলতা বিলুপ্ত হইয়া আসিল। এবং ব্রাহ্মণ্য যখন যথাসময়ে
বৌদ্ধাচারকে স্বীয় অঙ্গীভূত করিয়া লইতে আপত্তি করিল না,
তখন এদেশে বৌদ্ধ মতের বিশেষ সার্থকতা রহিল না—বৌদ্ধধর্ম্ম
দেশান্তরিত হইয়া গেল।

সকল জীবিতাও পূজা করি; যেখানে বিভিন্ন মতের মধ্যে বিরোধ দেখা যায় সেখানেও আমরা উভয়কেই অকাতরে আত্মসাৎ করিয়া লই। নানা মতের সংঘর্ষে আমাদের মনের যে কৃত্রিম নানা বিভিন্ন দিক হইতে দেখিবার শক্তি একটু বিশেষ বৃদ্ধি পায় এবং ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে দেখি বলিয়াই আমাদের মনে বিরোধ সহজেই ভঞ্জন হইয়া আসে।

যে সমস্ত বড় বড় ধর্ম্মতত্ত্ব ইংরাজ সংস্কারকেরা আজি আমাদের মধ্যে প্রবেশ করাইতে চাহিতেছেন—যেমন, জাতি-উচ্ছেদ মানবে মানবে সাম্য, ঈশ্বরের একমাত্রতা এবং প্রতিমার অকিঞ্চিৎকরতা—সে সকলই আমাদের দেশের অশিক্ষিত জন সাধারণের মধ্যেও নূতন কথা নহে। সামান্য কুটীরবাসী কৃষককে জিজ্ঞাসা করিলে সেও বলিবে, ধর্ম্মের নিকটে জাতি নাই, সকলেই সেই একমাত্র অদ্বিতীয় প্রত্যক্ষের অগোচর পরমেশ্বরের সৃষ্টি এবং সেই মহান্ পরমেশ্বর সর্ব্বভূতে ও সর্ব্বঘটে নিরন্তর অবস্থিতি করিতেছেন। যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, তবে শিলাখণ্ডকে পূজা করিয়া ফল কি, পিতৃপিতামহাগত লোকাচারের উল্লেখ করিয়া সেও বলিবে, ইহার মধ্যেও ত পরমেশ্বর আছেন, এবং সেই সঙ্গে নিরাকারকে ধারণা করিবার সামর্থ্য অস্বীকার করিয়া বিনীতভাবে সর্ব্বসমক্ষে আপন অজ্ঞতা নিবেদন করিবে। কিন্তু নিজে শিলাখণ্ড পূজা করে বলিয়া অন্যে ভিন্ন ব্রহ্মোপাসনার মহত্ত্ব অস্বীকার করিবে না।

ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে দেখিবার অভ্যাসে মনের এইরূপ প্রসরবৃদ্ধি হয় সন্দেহ নাই এবং সৃষ্টির সর্ব্বত্র নানা বিরোধের মধ্যে এক চিরন্তন নিগূঢ় অবিরোধ আবিষ্কার করিয়া সর্ব্বত্র বাহিরকে চিত্ত অন্তরে আয়ত্ত করিতে শিখে। কিন্তু আমাদের

ব্রাহ্মণ্য দর্শনাদি বৌদ্ধ আশ্রমে পঠিত হইত এবং ব্রাহ্ম গুরুর নিকটে শাস্ত্রাধ্যয়নও অগৌরবের বিবেচিত হইত না। বৌদ্ধ শ্রমণেরাও যে কিরূপ প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছিলেন এখনকার হিন্দু সন্ন্যাসীদিগকে দেখিলেই তাহা অনেকটা বুঝা যায়। কারণ, এই সন্ন্যাসবাহুল্য অনেক পরিমাণে বৌদ্ধ সন্ন্যাসেরই ফল।

খণ্ডগিরির গুহাবলীতে এই প্রাচীন ধর্ম্মযুগের সমাধি। এখন কিছুই নাই, শুধু শূন্য গুম্ফাবলী, কোনটি ব্যাঘ্রের মুখব্যাদানের অনুরূপ, কোনটি বা হস্তীর স্থূলদেহের আকারসদৃশ, কোথাও দেবসভা—পাহাড়ের পাষাণ-দেয়ালে খোদিত কতকগুলি স্ত্রীমূর্ত্তি, এবং তাহারই সন্নিহিত সর্ব্বোচ্চ শিখরে নব্য জৈন মন্দির। জৈন দেবতা সেই বিজন গিরিশিখরে বসিয়া আপন মহিমায় বিলীন হইয়া আছেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে একবার উৎসব হয়। ভুবনেশ্বর হইতে একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া ঘণ্টা নাড়িয়া যায়। দূর নিকট হইতে কতকগুলি জৈন যাত্রী আসিয়া উপস্থিত হয়। গিরিপাদমূলে যে বাবাজী বাসা বাঁধিয়া থাকে যাত্রীদিগকে সাদর অভ্যর্থনাসহকারে নানাপ্রকারে খণ্ডগিরির অতীত গৌরব শ্রবণ করাইয়া দেয়। এবং সেই পুরাতন গল্পটি বার-বার করিয়া বলে যে, হনুমান পৃষ্ঠে বহন করিয়া লইয়া যাইবার সময় ঋষি-সেবিত হিমালয়ের একখণ্ড কেমন করিয়া এখানে ফেলিয়া যায় এবং বহুদিন ঋষিদিগের বাসস্থান থাকিয়া কলির প্রারম্ভে পাপের প্রাদুর্ভাবের সহিত সেই নিক্ষিপ্ত হিমাচলখণ্ড কালক্রমে কিরূপে ঋষিগণের বাসের অযোগ্য হইয়া উঠে।

দখিণ সমীর বুলায় ললাটে
দক্ষিণ করতল।
প্রভাতের আলো আশীষ-পরশ
করিছে তাহার দেহে,
রজনী তাহারে বুকের আঁচলে
ঢাকিছে নীরব স্নেহে।
কাছে আসি শিশু মাগিছে আদর
কণ্ঠ জড়ায়ে ধরি,'
পাশে আসি যুবা চাহিছে তাহারে
লইতে বন্ধু করি'।
এই পথে গৃহে কত আনাগোনা,
কত ভালবাসাবাসি,
সংসারসুখ কাছে কাছে তার
কত আসে যায় ভাসি',
মুখ ফিরাইয়া সে রহে বসিয়া,
কহে সে নয়নজলে,—
তোমাদের আমি চাহি না কারেও,
শশি চাই করতলে।

শশি যেথা ছিল সেথাই রহিল,
সেও বলে' এক ঠাঁই।
অবশেষে যবে জীবনের দিন
আর বেশি বাকি নাই,
এমন সময়ে সহসা কি ভাবি'
চাহিল সে মুখ ফিরে',

রজনী সবারে কোলেতে লইছে
নয়ন করিয়া নত।
ছোট ছোট ফুল, ছোট ছোট হাসি,
ছোট কথা, ছোট সুখ,
প্রতি নিমেষের ভালবাসাগুলি,
ছোট ছোট হাসিমুখ
আপনা-আপনি উঠিছে ফুটিয়া
মানবজীবন ঘিরি',
বিজন শিখরে বসিয়া সে তাই
দেখিতেছে ফিরি ফিরি'।

দেখে বহুদূরে ছায়াপুরীসম
অতীত জীবন-রেখা,
অস্তরবি-সোণার কিরণে
নূতন বরণে লেখা।
যাহাদের পানে নয়ন তুলিয়া
চাহে নি কখনো ফিরে,
নবীন আভায় দেখা দেয় তারা
স্মৃতিসাগরের তীরে।
হতাশ হৃদয়ে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
পূরবী রাগিণী বাজে,
দু'বাহু বাড়ায়ে ফিরে যেতে চায়
ওই জীবনে মাঝে।
দিনের আলোক মিলায়ে আসিল
তবু পিছে চেয়ে রহে;—

[illegible] নাই। কেবল অগত্যা বসিয়া ছিলাম, কিন্তু যেদিন আমাদের
[illegible] পরে একটা কর্ম্ম খালি হইল, এবং মাহির হইতে একটা কাঁচা
[illegible] রাঘের ছেলেকে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া আমাদের বোমো-
[illegible] ন্ বন্ধ করা হইল, সেদিন আমাদের ক্রোধের আর সীমা রহিল
[illegible]। ইচ্ছা হইল তখনি কাম ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যাই, একটা
[illegible] ইউটিনী করি, ইংরাজকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিই, পার্লে-
[illegible] মণ্টে একটা দরখাস্ত করি, ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্ কাগজে একটা মেমো
[illegible] ম লিখি। কিন্তু তাহার কোনটা না করিয়া বাড়িতে
[illegible] সে দিন আর জলখাবার খাইলাম না, খো
[illegible] মোছে বলিয়া স্ত্রীকে যৎপরোনাস্তি ল[illegible]না ক[illegible]
[illegible] দিতে লাগিল, আমি সকাল সকাল শুইয়া পড়িলাম। শুইয়া
[illegible] ইয়া ভাবিতে লাগিলাম, হায়রে পয়সা তোর জন্য এত অপমান।

স্ত্রী অভিমান করিয়া আমার কাছে আসিলেন না, কিন্তু
[illegible] শেষ হইতে নিদ্রাদেবী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হঠাৎ কখন্
[illegible] দিতে পাইলাম—আমি একটি পয়সা। কিছু আশ্চর্য্য বোধ
[illegible] ইল না। কবে কোন্ সনাতন টাঁকশাল হইতে বাহির হইয়াছি
[illegible] সে মনেও নাই। এই পর্য্যন্ত অবগত আছি যে, ব্রহ্মার [illegible] হইতে
[illegible] মন শূদ্রের উৎপত্তি, সেইরূপ টাঁকশালের অত্যন্ত নিম্নদিকেই
[illegible] আমাদের জন্ম।

সেদিন শিকি হু-আনীর একটা মহতী সভা বসিয়াছে, সংগতে
[illegible] রূপ একটা বিজ্ঞাপন পড়া গিয়াছিল। হাতে কাজ [illegible] না,
[illegible] তূহলবশতঃ গড়াইয়া গড়াইয়া সেই সভায় গিয়া উপস্থিত
[illegible] লাম, এবং দেয়ালের কাছে একটা কোণে আশ্রয় লইলাম।

[illegible] সুকুমারী সহধর্ম্মিণী হু-আনীকে ম[illegible] বামপার্শ্বে লইয়া ভদ্র-
[illegible] চাঁ-আনীগুলি দলে দলে আসিয়া [illegible] করিল।

নহে!" ভূ-আনীর তীব্র তর্জ্জন সর্ব্বোচ্চে শুনা গেল। যে ধনিতে আমার আদিম উৎপত্তি সেই ধনির মধ্যে প্রবেশ করিবার ইচ্ছায় আমি বসুমতীকে দ্বিধা হইতে অনুরোধ করিলাম, বসুমতী সে অনুরোধ পালন করিল না—দেয়াল ঘেঁষিয়া রক্তবর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

এমন সময় এক ঝকঝকে নূতন পিকি গড়াইয়া এই পিকি-ভূ-আনীর সভার মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। সে দেখিলাম সকলকে ছাড়াইয়া উঠিল। সতেজে বক্তৃতা দিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে করতালি পড়িল।

কিন্তু আমি ঠাহর করিয়া শুনিলাম, বক্তৃতাটা যেন হোঁৎ আওয়াজটা ঠিক রূপালি ছাঁদের নহে। মনে বড় সন্দেহ হইল সভা যখন ভঙ্গ হইল, ধীরে ধীরে গড়াইয়া গড়াইয়া বহুসাহস পূর্ব্বক তাহার গায়ের উপর গিয়া পড়িলাম—ঠন্ করিয়া আওয়াজ হইল, সে আওয়াজটা অত্যন্ত দিশি, এবং গন্ধটাও দেখিলাম, আমাদের স্বজাতীয়ের মত। মহা রাগিয়া উঠিয়া সে কহিল "তুমি যোগাকার অনভ্য হে!" আমি কহিলাম "বৎস, তুমিও যেখানকার আমিও সেখানকার!"—ছোঁড়াটা আমাদেরই নিম্নস্থ কুটুম্ব—আধপয়সা। কোথা হইতে পারা যাথিয়া আসিয়াছে।

তাহার রকম-সকম দেখিয়া হা হাঃ শব্দে হাসিয়া উঠিলাম।

হাসির শব্দে জাগিয়া উঠিয়া দেখি, স্ত্রী পাশে শুইয়া কাঁদিতেছে। তৎক্ষণাৎ তাহার সঙ্গে তাল করিয়া লইলাম। ঘটনাটা আদ্যোপান্ত বিবৃত করিয়া বলিলাম—বড় ধরা পড়িয়াছে। কিন্তু মনে করিতেছি আমিও কাল হইতে পারা মাখিয়া আপিসে বাহির হইব।

আমার স্ত্রী কহিল, তাহার অপেক্ষা মারা খাইয়া মরা ভাল।

গুণের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দৈর্ঘ্যের আশ্রয় লইয়া প্রস্থ এবং বেধ উভয়ের কোনোটিই থাকিতে পারে না, প্রস্থ আশ্রয় ছাড়িয়া দৈর্ঘ্য অথবা বেধ থাকিতে পারে না; বেধ আশ্রয় ছাড়িয়া দৈর্ঘ্য অথবা প্রস্থ থাকিতে পারে না; তেমনি সত্ত্বরজস্তমোগুণের কোনো দুইটি গুণ তৃতীয়টির আশ্রয় ভিন্নকে থাকিতে পারে না। তাই বলা হইয়াছে যে, গুণেরা "অন্যোন্যাশ্রয়বৃত্তয়ঃ"।

(৩) তৃতীয় কথা এই যে, গুণত্রয়ের আর একটি ধর্ম পরস্পরকে উৎপাদন করা। দিবাকে যেমন একহিসাবে বলা যাইতে পারে যে, তাহা সন্ধ্যা (প্রাতঃসন্ধ্যা) এবং রাত্রির জননী, সন্ধ্যাকে (প্রাতঃ সায়ং উভয় সন্ধ্যাকে যথাক্রমে) তেমন বলা যাইতে পারে যে, তাহা দিবা এবং রাত্রির জননী; এবং রাত্রিকে তেমন বলা যাইতে পারে যে, তাহা সন্ধ্যা (প্রাতঃ সন্ধ্যা) এবং দিবার জননী; তেমনি গুণত্রয়ের প্রত্যেকটিকে বলা যাইতে পারে যে, তাহা অপর দুইটির উৎপাদক। বাস্তবিকও এইরূপ দেখা যায় যে, (১) জ্ঞানচর্চ্চায় এবং কর্ম্মচেষ্টায় (সত্ত্বরজোগুণের ব্যাপারে) ব্যাপৃত হইতে হইলে তৎপূর্ব্বে বিশ্রামের (তমোগুণের) তেমন আবশ্যক। (২) কর্ম্মচেষ্টা—জ্ঞান এবং বিশ্রাম উভয়েরই প্রসূতি; তাহার সাক্ষী—কর্ম্মচেষ্টা একদিকে সুখনিদ্রার সোপান আর একদিকে বহুদর্শিতার সোপান। (৩) জ্ঞান—প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি উভয়েরই উৎপাদক; তাহার সাক্ষী—কখন্ কোন্ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হয়, কখন্ কোন্ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইতে হয়, উভয়েতেই জ্ঞানের কর্তৃত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। তাই বলা হইয়াছে, গুণেরা "অন্যোন্যা শ্রয়বৃত্তয়ঃ"।

(৪) চতুর্থ কথা এই যে, গুণত্রয়ের আর একটী ধর্ম্ম পর-

চিন্তা করে? মুণ্ডিত-মস্তক, খালি-পা, গেরুয়া-বসনের মধ্য হইতে একটি হাত বাহির-করা, এই বৌদ্ধ পুরোহিতেরা মন্দিরের বাহির-দালানে নিঃশব্দে গমনাগমন করিতেছে। ইহাদের মুখে একটি রহস্যময় অবর্ণনীয় মধুর হাস্য সর্ব্বদাই বিরাজমান। আমার পাণ্ডা আমাকে মন্দিরের কেন্দ্রবর্ত্তী একটি বৃহৎ প্রাঙ্গণে লইয়া গেল। যে 'বো'-বৃক্ষ ধ্যানমগ্ন শাক্যমুনিকে পাঁচ বৎসর কাল ছায়া দান করিয়াছিল, তাহারই একটি চারা এই প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত। এই বৃক্ষের তলদেশে আমি নীত হইলাম। সুধীরে মস্তক ঈষৎ অবনত করিয়া সেই পাণ্ডা আমাকে সেই বৃক্ষ হইতে একটি পাতা ছিঁড়িয়া দিল। কান্দি-মঠের মঠধারী আচার্য্য শ্রীসুমঙ্গল অত্যন্ত বিজ্ঞ ও সুপণ্ডিত; ইনি আমাদের য়ুরোপের সমস্ত বিষয় জানিবার জন্য উৎসুক এবং আমাদের চিন্তাশীল লেখকদিগের বিজ্ঞানবাদ এবং দর্শন ও নীতিতন্ত্রের ভাব দেখিয়া মনে করেন যে, তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মের অনেকটা নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন। আধঘণ্টা কাল ইনি আমার সহিত বাক্যালাপ করিলেন ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান প্রধান গ্রন্থসকলের উল্লেখ করিলেন। বৌদ্ধেরা কিরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে তাহার কতকটা ভাব তাঁহার কথাবার্ত্তায় জানিতে পারা গেল।

বৌদ্ধদিগের মধ্যে দুই শ্রেণী; এক অভিনবব্রতী সামান্য ভিক্ষু, আর এক বৌদ্ধপুরোহিত শ্রমণ—এই শ্রমণেরা আপনার ইচ্ছাকে বশীভূত করিতে শিখিয়াছে। এই আত্মবশীকরণ-রূপ চরম লক্ষ্য সাধন করিবার জন্য ইহারা 'পিতৃমোক্ষ' নামক গ্রন্থের উপদেশ অনুসরণ করিয়া থাকে। ইহা বৌদ্ধধর্ম্মের একটি পুরাতন গ্রন্থ। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা আটটি বস্তু গ্রহণ করিতে পারে; তিনখানি পরিধান বস্ত্র, একটি কটীবন্ধ, একটি কমণ্ডলু, একটি ক্ষুর,

একটি ছুঁচ, পানীয় হইতে কীটাদি জীব ছাঁকিয়া ফেলিবার জন্য একটি ছাঁকুনি। মঠের অভ্যন্তরে এই দারিদ্র্য-ব্রতের খুঁটি-নাটি সমস্ত নিয়ম যথাশাস্ত্র পরিপালিত হয়। নবব্রতী ভিক্ষু অরুণোদয়ের পূর্ব্বে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করে, নিজ পরিধানবস্ত্র ধৌত করে, মন্দিরের দালান ও 'বো'-বৃক্ষের (বট) চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমি ঝাঁটি দেয়, সমস্ত দিনের পানীয় জল উত্তোলন করিয়া তাহা ছাঁকিয়া রাখে; অবশেষে একটি নির্জ্জন স্থানে গিয়া ধ্যান করে। পবিত্র বটবৃক্ষের সম্মুখে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া বুদ্ধদেবের মহৎ গুণসকল এবং নিজের ত্রুটি ও দোষের বিষয় সে চিন্তা করে। পরে, কমণ্ডলু হস্তে লইয়া, নিজ গুরুর সমভিব্যাহারে ভিক্ষার্থ বহির্গত হয়। উহারা মুখ ফুটিয়া কিছুই চাহে না—কেবল লোকের দ্বারে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকে। গৃহে প্রত্যাগত হইয়া, নবব্রতী ভিক্ষু গুরুর চরণ প্রক্ষালন করে, কমণ্ডলু ধৌত করে, চাউল সিদ্ধ করে এবং বুদ্ধের বিষয়—বুদ্ধের দয়া ও ঔদার্য্যের বিষয় চিন্তা করে। এক ঘণ্টা পরে, একটি প্রদীপ জ্বালাইয়া ভিক্ষু-গৃহে প্রবেশ করে—পুরাতন পাণ্ডুলিপির নকল করে কিম্বা গুরুর পদতলে বসিয়া তাঁহার উপদেশ-বাক্য শ্রবণ করে এবং দিনের মধ্যে যে সকল দোষ করিয়াছে তাহা তাঁহার নিকট প্রকাশ করে। পুরোহিত-শ্রেণীর বৌদ্ধদিগকে কোনপ্রকার শারীরিক শ্রম করিতে হয় না—তাহারা ধ্যান-ধারণায় অনেকটা সময় নিয়োগ করিতে পারে—কিন্তু তাহারা প্রার্থনা করে না—কারণ, বৌদ্ধধর্ম্ম কোন দেবতার সাহায্য চাহে না। দুঃখকষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য উহারা নিজের উপরেই নির্ভর করে—স্পিনোজা ও ষ্টোয়িক-সম্প্রদায় যে উপায় অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন, ইহারাও সেই উপায় অবলম্বন করিয়া

থাকে—সর্ব্বপ্রকার জীবের সমষ্টিকে ধ্যান করিবার জন্য ইহারা ক্ষণস্থায়ী 'আমি'-কে ভুলিয়া যায়। পাঁচ প্রকার ধ্যানের দ্বারা ইহারা সমস্ত জগৎকে চিন্তা করে। প্রথম ধ্যান, 'মুক্তি-ভাবনা'। সমস্ত কষ্ট, রিপুর উদ্রেক, অসৎ বাসনা হইতে মুক্ত হইলে আমি যেমন নিজে সুখী হইতে পারি বলিয়া মনে করি, সেইরূপ সমস্ত জগতের জীব ঐ প্রকারে সুখী হউক্ এইরূপ কামনা করা প্রথম ধ্যানটির বিষয়। এমন কি শত্রু হইলেও কেবল তাহার গুণের ভাগ গ্রহণ করিয়া, আমি যে সুখ নিজে চাহি, সে সুখ যেন সেও পায় এইরূপ কামনা অকপটভাবে করিতে হইবে।

দ্বিতীয় ধ্যান—'করুণা-ভাবনা'। সমস্ত জীব যে কষ্টযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে তাহা মনে করিয়া, আপনার অন্তরে সেই কষ্ট জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে—ইহাই দ্বিতীয় ধ্যানের বিষয়।

তৃতীয় ধ্যান—'মুদিত-ভাবনা'। যে সকল জীব সুখী কিম্বা মনে করে তাহারা সুখী, তাহাদের বিষয় চিন্তা করিয়া এইরূপ কামনা করিতে হইবে যাহাতে অন্যেরাও তাহাদের মত সুখী হয়—এবং তাহাদের সুখে যাহাতে আপনাকেও সুখী মনে করিতে পারি এইরূপ চেষ্টা করিতে হইবে।

চতুর্থ ধ্যান—'অশুভ-ভাবনা'। শরীরের হীনতা, অশুচিতা, রোগের ভীষণ যন্ত্রণাসকল মনে করিয়া এইরূপ ভাবিতে হইবে, সাগর-সম্ভূত ফেনপুঞ্জের ন্যায় এ সমস্ত দুঃখকষ্ট তিরোহিত হয়—অনন্ত জন্মমৃত্যুর পারম্পর্য্য বশতই উহাদের অস্তিত্ব—এবং এই জন্মমৃত্যুর পারম্পর্য্যে বাস্তবিকতা কিছুই নাই—উহা অলীক আবির্ভাবমাত্র। শেষ ধ্যান—'উপেক্ষা-ভাবনা'। যাহা কিছু মানুষ ভালমন্দ বলিয়া মনে করে, যাহা কিছু ক্ষণস্থায়ী,—স্বতন্ত্রতা, পরতন্ত্রতা, প্রেম দ্বেষ, ঐশ্বর্য্য দারিদ্র্য, যশ অপযশ, রূপযৌবন, জরা

ও রোগ, এই সমস্ত, নিতান্ত উপেক্ষার সহিত, সম্পূর্ণ প্রশান্তভাবে চিন্তা করিবে। ... ... কান্দি নগরের যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম ততই দেখি পথ লোকে লোকারণ্য। রাত্রিকালে, স্ত্রীপুরুষ দলে দলে নগরাভিমুখে আগ্রহের সহিত গমন করিতেছে। নিস্তব্ধতার মধ্যে, বৌদ্ধ পুরোহিত একপ্রকার সুর করিয়া জঙ্গলের ও ঘরের লোকদিগকে ডাকিতেছে, আর অমনি লোক-সকল পিল্‌পিল্ করিয়া কোথা হইতে যে বাহির হইতেছে বোঝা যায় না—বড় বড় গাছে ঢাকা, ঝোপঝাপের মধ্যে যে সকল গৃহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, মনে হয়, তাহা হইতে তাহারা যেন নির্গত হইতেছে। যে সকল ভক্তের দল নিস্তব্ধভাবে পুষ্পভার হস্তে লইয়া চলিতেছিল সেই গভীর অন্ধকার রাত্রিতে আমিও অদৃশ্য-ভাবে তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া গেলাম। কাঁসর ঘণ্টার রবে নগর পরিপূর্ণ—তা' ছাড়া আর কোন শব্দ শুনা যায় না। সেই কৃষ্ণ সরোবরের ধারে, মন্দিরের বৃহৎ দ্বারের নীচে সেই বিকট মূর্ত্তিগুলি চিরজাগ্রত এবং মন্দিরস্থিত উদ্যানের প্রবেশ-পথে পুরোহিতেরা নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান ও কোনপ্রকার অঙ্গভঙ্গী না করিয়া নীরবে ভক্তদিগের পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিতেছে। একটা রৌপ্যময় গরাদের নীচে দিয়া আমরা চলিলাম এবং তৎ-পরেই একটা ছায়াময় বড় দালানের মধ্যে গিয়া পড়িলাম। সেখানে ছোট ছোট পবিত্র দীপসকল একপ্রকার রহস্যময় অস্ফুট আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। শত শত ধূপাধার হইতে সুগন্ধী নীলাভ ধূমরাশি ঊর্দ্ধে প্রসারিত হইয়া স্থিরভাবে উপরে ভাসিতেছে। এই গুরুভার, নিদ্রাকর্ষক ধূপধূমের প্রভাবে সমস্ত দৃশ্যটি কেমন একপ্রকার অবাস্তব অলৌকিক আকার ধারণ করিয়াছে। অন্ধকারের মধ্যে বুদ্ধদেবের বিবিধ মূর্ত্তি হইতে

ছায়া পড়িয়া ইতস্ততঃ অর্দ্ধস্ফুট ভাবে দেখা যাইতেছে—কোন যুদ্ধমূর্ত্তি শয়ান, কোন বুদ্ধমূর্ত্তি আসীন—সকলের তলদেশে পুষ্প-রাশি বিকীর্ণ। আমরা একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন সিঁড়ি দিয়া উঠিলাম—তাহার ধারসকল অগ্নিকুণ্ড-নিক্ষিপ্ত কোলাহলময় দানবদৈত্যের চিত্রে চিত্রিত। উপরে একটি রৌপ্যময় গরাদের পশ্চাতে পুরো-হিতেরা দণ্ডায়মান—ভক্তেরা তাহাদের পুষ্পোপহার একটি বেদীর উপর রাখিতেছে, আর সেই পুষ্পোপহার পুরোহিতেরা গ্রহণ করি-তেছে। সেই নীরব ভক্তদলের সম্মুখে, একটি সুন্দর যুবক পুষ্পো-পহার-হস্তে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান। মূর্ত্তির সম্মুখে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া সে অনেকবার নতশির হইল। এইবার অর্দ্ধনত হইয়া বক্ষের উপর হস্তযুগল স্থাপন করিয়া খানিকটা স্থিরভাবে রহিল। তাহার সুবক্র সুন্দর ওষ্ঠে ও তাহার দীর্ঘায়ত সুন্দর নেত্রে, রহস্য-ময় মধুর প্রশান্ত হাস্য বিরাজমান। ... ... নিস্তব্ধতা আরও যেন গুরুভার হইয়া উঠিল—কিয়ৎকাল পরেই সহসা তুরী ভেরীর গভীর নিনাদে সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইল। কিন্তু জনতার মধ্য হইতে কোন শব্দ নাই। পবিত্র দীপাবলীর নিম্নে, পুষ্পরাশির পশ্চাতে, পুরোহিতেরা গম্ভীরভাবে দণ্ডায়মান।

মন্দিরের বিজন অন্তরতম প্রদেশে, পুরোহিতদিগের পশ্চাতে পবিত্রস্থানে, যোগাসনে উপবিষ্ট একটি বৃহৎ স্ফটিকমূর্ত্তি স্থাপিত—তাহার অবয়ব-রেখাসকল অস্পষ্ট। মূর্ত্তিটি এরূপ স্বচ্ছ যে, উহাকে উপছায়া বলিয়া মনে হয়—মনে হয় যেন জড়ভাব হইতে মুক্ত কোন অশরীরী আত্মা। যে মহাপুরুষ কঠোর সমাধিবলে আপন রক্তমাংসের বন্ধন, কামনার বন্ধনসকল ছিন্ন করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহারই উপযুক্ত মূর্ত্তি বটে। এই মূর্ত্তি জনসাধারণকে শাসন করিতেছে, অথচ কোলাহলময় মনুষ্যের জনতা হইতে দূরে

অবস্থিত—এবং ইহার স্বচ্ছ ওষ্ঠাধরে যে অনন্ত মধুর হাস্য বিরাজমান তাহাতে মনে হয়, যাঁহার এই মূর্ত্তি তিনি চিররাগের মত শান্তিধামে প্রবেশ করিয়াছেন।

যতই আমি এই দেশ ও দেশের লোকদিগকে দেখিতেছি ততই যেন আমি এই ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতি বুঝিতে পারিতেছি। আজ যাহা আমাদের য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা বলিতেছেন, ত্রয়োবিংশতি শতাব্দী হইতে বৌদ্ধমুনিরা তাহাই শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা বলেন, কিছুই নাই—সকলই হইতেছে। এই জগৎ ক্ষণস্থায়ী আবির্ভাবের প্রবাহমাত্র—পরিবর্ত্তন ব্যতীত ইহাতে আর কিছুই স্থায়ী নহে। পৃথিবী, আকাশ, অষ্টাদশ নরক, দানবগণ ও তাহাদের নিবাসভূমি নিকৃষ্ট লোক-সকল, সকলই নদীর জলের ন্যায় প্রবহমান। একটার পর আর একটা, তাহার পর আর একটা—এইরূপ ক্রমান্বয়ে এক কালচক্রের পর আর এক কালচক্র, এক যুগের পর যুগান্তর পুনরাবৃত্ত হইতেছে। এই শ্রেণীপরম্পরা অনন্ত—ইহা কস্মিন্ কালেও আরম্ভ হয় নাই, এবং কস্মিন্ কালেও ইহার শেষ হইবে না। এই জগতের মধ্যে 'মনুষ্য' পদার্থটা কি?—চিন্তাশীল জীব বটে, কিন্তু অন্যান্য জীবের ন্যায় মর্ত্ত, অর্থাৎ, কিছুকালের জন্য কতকগুলি শক্তি একাধারে সমবেত হইয়াছে—কিছুকাল পরেই উহা বিকিপ্ত ও বিলীন হইয়া যাইবে। 'মনুষ্য' কি?—কতকগুলি বৃত্তি, কতকগুলি ভাব, কতকগুলি কামনা, কতকগুলি ইচ্ছা, কতকগুলি সংস্কারের সমষ্টিমাত্র—যাহাদিগের মধ্যে কিছুকালের জন্য যোগ ও শৃঙ্খলা রক্ষিত হইতেছে। শরীরের মধ্যেও এইরূপ কোষাণুসকল অনুক্ষণ মরিতেছে, জন্মিতেছে; অথচ সমগ্র শরীরের গঠন কিছুকাল সমানভাবেই থাকিতেছে। মনুষ্যের মধ্যে কিছুই স্থায়ী নহে। জীবনের

ঘটনাসকল, যাহা কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে একত্র হইতেছে ও পরস্পরকে অনুসরণ করিতেছে এবং যাহা লইয়াই মনুষ্যের ব্যক্তিত্ব, সেই ঘটনাগুলিও স্থায়ী নহে—কিম্বা যে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে এই ঘটনাগুলি ঘটিতেছে তাহারও বৃদ্ধি হ্রাস হইয়া ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন হইতেছে। যে সকল উপাদানের সমষ্টি লইয়া প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব তাহা পঞ্চস্কন্ধে বিভক্ত; এবং বৌদ্ধেরা তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়া দেন যে, এই স্কন্ধগুলির মধ্যে কোন স্কন্ধই অথবা কোনও উপাদানই স্থায়ী নহে। প্রথম স্কন্ধে ভৌতিক পদার্থের গুণসমূহ—যথা বিস্তৃতি, গভীরতা, বর্ণ ইত্যাদি; ইহারা সাগরোৎপন্ন ফেনরাশির ন্যায় উৎপন্ন হইতেছে ও উৎপন্ন হইয়াই পুনরায় তিরোহিত হইতেছে। দ্বিতীয় স্কন্ধে ইন্দ্রিয়-বোধসমূহ—ইহারাও জলোপরি নৃত্যশীল বিম্ববৎ। তৃতীয় স্কন্ধে জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তি; ইহারাও দক্ষিণ প্রদেশের অনিশ্চিত মৃগতৃষ্ণিকা-সম। চতুর্থ স্কন্ধে মানসিক ও নৈতিক সংস্কারসমূহ—ইহা কদলী-কাণ্ডের ন্যায় অসার। শেষ কথা, চিন্তাসকল উপছায়ামাত্র—ঐন্দ্রজালিক মায়ামাত্র। 'গৌতম বলিলেন, হে ভিক্ষুগণ, ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী পণ্ডিতেরা যে ভাবেই আত্মাকে চিন্তা করুন না কেন, এই পঞ্চ স্কন্ধের অন্যতম স্কন্ধকে, কিম্বা তাহাদের সমষ্টিকে তাঁহারা আত্মা বলিয়া কল্পনা করেন। এই প্রকারে, হে ভিক্ষুগণ, যাহারা বৌদ্ধ হয় নাই কিম্বা যাহারা বৌদ্ধ ধর্ম্ম বুঝিতে পারে না, তাহারা কখন মনে করে, আত্মা ও ভৌতিক গুণ একই, কখনও বা মনে করে, আত্মা ও ইন্দ্রিয়-বোধ একই; এই প্রকারে আত্মাকে অপর শেষ তিনটি স্কন্ধরূপেও কল্পনা করিয়া থাকে—এই প্রকারে, একটার পর আর একটা স্কন্ধ কল্পনা করিয়া, অবশেষে এই সংস্কারটিতে উপনীত হয়। যে কি

না, আমি আছি, আমার আত্মা আছে। আমি থাকিব কিম্বা আমি থাকিব না—আমার ভৌতিক গুণ থাকিবে কিম্বা থাকিবে না—আমার সংস্কারসকল থাকিবে কিম্বা থাকিবে না। কিন্তু বুদ্ধের জ্ঞানবান শিষ্যেরা, পঞ্চেন্দ্রিয়ের অধিকারী হইলেও তাঁহারা অজ্ঞান হইতে মুক্ত এবং তাঁহারা সত্যে উপনীত হইয়াছেন। সেইজন্য তাঁহাদের সংস্কার অন্যরূপ ;—আমি আছি, আমার আত্মা আছে, আমি থাকিব কিম্বা থাকিব না, এবম্বিধ সংস্কার তাঁহাদের মানসক্ষেত্রে উপস্থিত হয় না।' ডেকার্ট বলিয়াছেন, আমি চিন্তা করিতেছি, অতএব আমি আছি। কিন্তু বুদ্ধদেব হইলে এইরূপ বলিতেন ;—আমি চিন্তা করিতেছি, অতএব আমি নাই। কারণ, চিন্তা কাহাকে বলে ? কতকগুলি পরিবর্ত্তনপরম্পরা—বিভিন্ন ঘটনার পারম্পর্য্য ভিন্ন ইহা আর কিছুই নহে। আধুনিক মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের ত এই মত। ইংলণ্ডের জন ষ্টুয়ার্ট মিল এবং ফ্রান্সের টেন এই বিষয় অনুশীলন করিয়া এই স্থির করিয়াছেন যে, ইহা একপ্রকার কল-কৌশল যাহাতে করিয়া 'আমি' বলিয়া একটা পদার্থ আমাদের মধ্যে আছে এইরূপ বিভ্রম উৎপন্ন হয়। বৌদ্ধেরা বলেন, এই ভ্রমটি সর্ব্বাপেক্ষা হানিজনক, আমাদের ফাঁদে ফেলিবার একটি প্রধান উপায় ; কারণ, এই বন্ধনেই আমরা বিষয়ের সহিত আবদ্ধ আছি—এই মৃগতৃষ্ণাই আমাদিগকে শান্তি ও উপেক্ষা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে নিক্ষেপ করে ও আমাদিগকে ক্রমাগত সম্মুখে ঠেলিয়া লইয়া যায়। বৌদ্ধেরা ইহাকে ব্যক্তিত্বরূপ বিভ্রম বলেন।

একবার যদি স্বীকার করা যায় যে, এই জগৎ কেবল ইন্দ্রিয়াভাসের প্রবাহমাত্র, আমাদের অন্তরে কিম্বা বাহিরে কোন [illegible] আমাদের অস্তিত্বও সহজে স্থিরীকৃত

হইতে পারে। যে 'আমি' এত গুরুতর বলিয়া আমার নিকট প্রতীয়মান হইত এক্ষণে আমি তাহা বিভ্রম বলিয়া জানিতেছি। ইহা জানিবামাত্র মনুষ্য মুক্তিলাভ করে—আর সে এই 'আমি' চিরকাল পুষিয়া রাখিবার জন্য লালায়িত হয় না—সে আর কোন চেষ্টা করে না, কামনা করে না—তাহার জীবন-তৃষ্ণা চলিয়া যায়, সে দুঃখ হইতে মুক্ত হয়। কারণ, দুঃখ কি? ব্যক্তিগত অস্তিত্ব হইতেই দুঃখ উৎপন্ন হয়। আর, জন্ম, বার্দ্ধক্য, রোগ, মৃত্যু প্রভৃতি ঘটনাগুলি লইয়াই আমাদের ব্যক্তিত্ব। আচ্ছা, এই সকল ঘটনায় কেন আমাদের দুঃখ উৎপন্ন হয়? কারণ, আসক্তিরূপ বিভ্রম হইতেই বাঁচিবার ইচ্ছা হয়—ভয় ও আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়—জরা মৃত্যু প্রভৃতি দূরীকৃত করিয়া তাহার বিপরীত বিষয় লাভের অভিলাষ হয়। এই অস্তিত্বের অনুরাগ যদি আমাদের অন্তর হইতে নির্ম্মূল করিয়া ফেলিতে পারি, ইচ্ছা, কর্ম্ম, চিন্তা হইতে বিরত হইয়া পরিবর্ত্তনের সার্ব্বভৌমিক নিয়মটির হাত যদি এড়াইতে পারি, তাহা হইলে পরিবর্ত্তনমূলক দুঃখ আর আমাদিগের নিকট আসিতে পারে না। 'যে এই ঘৃণিত জীবন-তৃষ্ণাকে দমন করিতে পারে, পদ্মপত্রস্থ জলবিন্দুবৎ দুঃখ তাহা হইতে সহজে অপসারিত হয়।'

এই পূর্ণ অবস্থা লাভের পন্থাগুলি এই;——প্রথম, আত্ম-বিভ্রম ও ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠানের বিশ্বাসকে বিনাশ করা। দ্বিতীয়, সমস্ত রিপু, সমস্ত বিদ্বেষ, সমস্ত মায়া বিনাশ করা; তৃতীয়, আত্মানুরাগের কোন চিহ্নমাত্র না রাখা; চতুর্থ, ধ্যানবলে মুক্তি লাভ করিয়া ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব্বপ্রকার অস্তিত্বের কামনা হইতে বিরত হওয়া। এই স্থলে উপনীত হইতে পারিলেই মনুষ্য মুক্ত হয়। আপনার উপর তাহার আর আস্থা থাকে না,

আকর্ষণ থাকে না। অন্যের কাজে আপনাকে সমর্পণ করিতে পারে—ঔদার্য্য, পরদুঃখকাতরতা তাহার মনকে অধিকার করে। 'যেমন মাতা, আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া আপনার একমাত্র সন্তানকে রক্ষা করে, সেইরূপ সে বিশ্বজনীন প্রেমের, অসীম পরানুরাগের অনুশীলন করে, এই প্রেম তাহার চতুর্দ্দিকে, তাহার ঊর্দ্ধে, তাহার নিম্নে বিকশিত হইয়া উঠে—এই বিশুদ্ধ প্রেম যাহার সহিত স্বার্থের কোন সম্পর্ক নাই। জাগিয়া থাকুক, দাঁড়াইয়া থাকুক, বসিয়া থাকুক, কার্য্য করুক অথবা শয়ন করুক, সকল অবস্থাতেই, সকল সময়েই এই ভাবটি তাহার মনে দৃঢ়রূপে নিবদ্ধ থাকে।'—'তাহার ইন্দ্রিয়সকল প্রশান্ত হইয়াছে। বশীভূত অশ্বের ন্যায়, সে গর্ব্ব হইতে মুক্ত—তাহার অজ্ঞান-মলা বিধৌত—দেহের উত্তেজনা, জীবনের উত্তেজনা তাহার আর অনুভব হয় না, দেবতারাও তাহার অবস্থাকে ঈর্ষা করেন।' 'যাহার চরিত্র সবল, সে ধরার ন্যায় অচল—স্তম্ভের ন্যায় অটল—স্ফটিক-স্বচ্ছ সরোবরের ন্যায় প্রশান্ত—তাহার আর পুনর্জ্জন্ম নাই।' 'যাহারা জ্ঞান-যোগে মুক্ত হইয়াছে, প্রশান্ত তাহাদের বাক্য, প্রশান্ত তাহাদের কার্য্য। তাহারা পর-জন্মের জন্য আকাঙ্ক্ষা করে না। জীবনের আকর্ষণ তিরোহিত হওয়ায় এবং অন্য কোন কামনা মনে উদিত না হওয়ায়, জ্ঞানীরা তৈল-বিরহিত দীপের ন্যায় নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।' ইহাই বৌদ্ধদিগের চরম সুখের অবস্থা। শাক্যমুনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণ-আচার্য্যদিগের ন্যায়, জগৎকে তলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন—যতই তলাইয়া দেখেন হাতে কিছুই ঠেকে না—হস্ত হইতে যেন সব সরিয়া যায়, গলিয়া যায়; অবশেষে তাঁহার দৃঢ়মুষ্টিতে কতকটা শূন্য সাপটিয়া ধরিলেন। চারিদিকেই মায়া বিভ্রম

বিভাসিত—চারিদিকেই ঘটনাসকলের চঞ্চল আবর্ত্ত—কিছুই স্থায়ী নহে। প্রকৃতি আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য অজ্ঞান মনুষ্যকে প্রবঞ্চনা করিতেছে—কিন্তু জ্ঞানী তাহাতে ভুলেন না। তিনি নির্ব্বাণ-শান্তির আশ্রয় লইবার জন্য এই ক্ষণস্থায়ী বিষয়-বিভ্রম হইতে দূরে পলায়ন করেন। তাঁহার অন্তরে তিনি এক মহাশূন্য স্থাপন করিয়াছেন—কিছুতেই তাঁহাকে আর বিচলিত করিতে পারে না। তাঁহার ওষ্ঠাধরে যদি কখন চাঞ্চল্যের রেখা দেখা যায়, সে কেবল বিশ্বজনীন ঔদার্য্য ও মানব-দুঃখের জন্য অনুকম্পা-জনিত মধুর প্রশান্ত হাস্যের ঈষৎ বিস্ফুরণ মাত্র।"

মধ্যবর্ত্তিনী।

নিবারণের সংসার নিতান্তই সচরাচর রকমের, তাহাতে কাব্য-রসের কোন নামগন্ধ ছিল না। জীবনে উক্ত রসের যে কোন আবশ্যক আছে এমন কথা তাহার মনে কখনও উদয় হয় নাই। যেমন পরিচিত পুরাতন চটিজোড়াটার মধ্যে পা দুটো দিব্য নিশ্চিন্তভাবে প্রবেশ করে, এই পুরাতন পৃথিবীটার মধ্যে নিবারণ সেইরূপ আপনার চিরাভ্যস্ত স্থানটি অধিকার করিয়া থাকে, সে সম্বন্ধে ভ্রমেও কোনরূপ চিন্তা, তর্ক বা তত্ত্বালোচনা করে না।

নিবারণ প্রাতঃকালে উঠিয়া গলির ধারে গৃহদ্বারে খোলা-গায়ে বসিয়া অত্যন্ত নিরুদ্বিগ্ন ভাবে হুঁকাটি লইয়া তামাক খাইতে থাকে। পথ দিয়া লোকজন যাতায়াত করে, গাড়িঘোড়া চলে, বৈষ্ণব-ভিখারী গান গাহে, পুরাতন বোতলসংগ্রহকারী হাঁকিয়া চলিয়া যায়; এই সমস্ত চঞ্চল দৃশ্য মনকে লঘুভাবে ব্যাপৃত রাখে

এবং যে দিন কাঁচা আম অথবা তপ্‌সী মাছওয়ালা আসে, সে দিন অনেক দরদাম করিয়া কিঞ্চিৎ বিশেষরূপ রন্ধনের আয়োজন হয়। তাহার পর যথাসময়ে তেল মাখিয়া স্নান করিয়া আহারান্তে দড়িতে ঝুলান চাপকানটি পরিয়া, এক ছিলিম তামাক পানের সহিত নিঃশেষপূর্ব্বক আর একটি পান মুখে পুরিয়া, আপিসে যাত্রা করে। আপিস্ হইতে ফিরিয়া আসিয়া সন্ধ্যাবেলাটা প্রতিবেশী রামলোচন ঘোষের বাড়িতে প্রশান্ত গম্ভীরভাবে সন্ধ্যা-যাপন করিয়া আহারান্তে রাত্রে শয়ন-গৃহে স্ত্রী হরসুন্দরীর সহিত সাক্ষাৎ হয়।

সেখানে মিত্রদের ছেলের বিবাহে জাইবড়ভাত পাঠান, নবনিযুক্ত ঝির অবাধ্যতা, ছেঁচ্‌কি বিশেষে ফোড়ন বিশেষের উপযোগিতা সম্বন্ধে যে সমস্ত সংক্ষিপ্ত সমালোচনা চলে, তাহা এ পর্য্যন্ত কোন কবি ছন্দোবদ্ধ করেন নাই. এবং সে জন্য নিবারণের মনে কখনও ক্ষোভের উদয় হয় নাই।

ইতিমধ্যে ফাল্গুনমাসে হরসুন্দরীর সঙ্কট পীড়া উপস্থিত হইল। জ্বর আরি কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না। ডাক্তার যতই কুইনাইন্ দেয়, বাধাপ্রাপ্ত প্রবল স্রোতের ন্যায় জ্বরও তত উর্দ্ধে চড়িতে থাকে। এমনি বিশ দিন, বাইশ দিন, চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত ব্যাধি চলিল।

নিবারণের আপিস্ বন্ধ; রামলোচনের বৈকালিক সভায় বহুকাল আর সে যায় না; কি যে করে তাহার ঠিক নাই। একবার শয়ন-গৃহে গিয়া রোগীর অবস্থা জানিয়া আসে, একবার বাহিরের বারান্দায় বসিয়া চিন্তিত মুখে তামাক টানিতে থাকে। দুই বেলা ডাক্তার বৈদ্য পরিবর্ত্তন করে এবং যে যাহা বলে সেই ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাহে।

ভালবাসার এইরূপ অব্যবস্থিত দুঃশ্রূষা সত্ত্বেও চতুর্থ দিনে হরসুন্দরী ব্যাধিমুক্ত হইল। কিন্তু এমনি দুর্ব্বল এবং শীর্ণ হইয়া গেল যে, শরীরটি যেন বহুদূর হইতে অতি ক্ষীণস্বরে "আছি" বলিয়া সাড়া দিতেছে মাত্র।

তখন বসন্তকালে দক্ষিণের হাওয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং উষ্ণ নিশীথের চন্দ্রালোকও সীমন্তিনীদের উন্মুক্ত শয়নকক্ষে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে।

হরসুন্দরীর ঘরের নীচেই প্রতিবেশীদের বিড়কীর বাগান। সেটী যে বিশেষ কিছু সুদৃশ্য রমণীয় স্থান তাহা বলিতে পারি না। এক সময় কে একজন সখ করিয়া গোটাকতক ক্রোটোন রোপণ করিয়াছিল, তার পরে আর সে দিকে বড় একটা দৃক্‌পাত করে নাই। শুষ্ক ডালের মাচার উপর কুষ্মাণ্ডলতা উঠিয়াছে; বৃদ্ধ কুলগাছের তলায় বিষম জঙ্গল; রান্নাঘরের পাশে প্রাচীর ভাঙ্গিয়া কতকগুলো ইঁট জড় হইয়া আছে এবং তাহারই সহিত ভগ্নাবশিষ্ট পাথুরে কয়লা এবং ছাই দিন দিন রাশীকৃত হইয়া উঠিতেছে।

কিন্তু বাতায়নতলে শয়ন করিয়া এই বাগানের দিকে চাহিয়া হরসুন্দরী প্রতিমুহূর্ত্তে যে একটি আনন্দরস পান করিতে লাগিল, তাহার অকিঞ্চিৎকর জীবনে এমন সে আর কখনো করে নাই। গ্রীষ্মকালে স্রোতোবেগ মন্দ হইয়া ক্ষুদ্র গ্রাম্যনদীটি যখন বালুশয্যার উপরে শীর্ণ হইয়া আসে, তখন সে যেমন অত্যন্ত স্বচ্ছ হয়; তখন যেমন প্রভাতের সূর্য্যালোক তাহার তলদেশ পর্য্যন্ত কম্পিত হইতে থাকে, বায়ুস্পর্শ তাহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত করিয়া তোলে, এবং আকাশের তারা তাহার স্ফটিক দর্পণের উপর সুখস্মৃতির ন্যায় অতি সুস্পষ্টভাবে প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনি [illegible]

সুন্দরীর ক্ষীণ জীবনতন্ত্রর উপর আনন্দময়ী প্রকৃতির প্রত্যেক অঙ্গুলি যেন স্পর্শ করিতে লাগিল এবং অন্তরের অধ্যে যে একটি সঙ্গীত উঠিতে লাগিল তাহার ঠিক ভাবটি সে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিত না।

এমন সময় তাহার স্বামী যখন পাশে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিত, "কেমন আছ" তখন তাহার চোখে যেন জল উছলিয়া উঠিত। রোগশীর্ণ মুখে তাহার চোখ দুটি অত্যন্ত বড় দেখায়, সেই বড় বড় প্রেমার্দ্র-সকৃতজ্ঞ চোখ স্বামীর মুখের দিকে তুলিয়া শীর্ণহস্তে স্বামীর হস্ত ধরিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিত, স্বামীর অন্তরেও যেন কোথা হইতে একটা নূতন অপরিচিত আনন্দরশ্মি প্রবেশ লাভ করিত।

এই ভাবে কিছুদিন যায়। একদিন রাত্রে ভাঙ্গা প্রাচীরের উপরিবর্ত্তী খর্ব্ব অশথগাছের কম্পমান শাখান্তরাল হইতে একখানি বৃহৎ চাঁদ উঠিতেছে এবং সন্ধ্যাবেলাকার গুমট্ ভাঙ্গিয়া হঠাৎ একটা নিশাচর বাতাস জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময় নিবারণের চুলের মধ্যে অঙ্গুলি বুলাইতে বুলাইতে হরসুন্দরী কহিল, "আমাদের ত ছেলেপুলে কিছুই হইল না, তুমি আর একটি বিবাহ কর!"

হরসুন্দরী কিছুদিন হইতে এই কথা ভাবিতেছিল। মনে যখন একটা প্রবল আনন্দ, একটা বৃহৎ প্রেমের সঞ্চার হয়, তখন মানুষ মনে করে আমি সব করিতে পারি। তখন হঠাৎ একটা আত্মবিসর্জ্জনের ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠে। স্রোতের উচ্ছ্বাস যেমন কঠিন তটের উপর আপনাকে সবেগে মূর্চ্ছিত করে, তেমনি প্রেমের আবেগ, আনন্দের উচ্ছ্বাস একটা মহৎ ত্যাগ, একটা বৃহৎ দুঃখের উপর আপনাকে যেন নিক্ষেপ করিতে চাহে।

সেইরূপ অবস্থায় অত্যন্ত পুলকিত চিত্তে একদিন হরসুন্দরী স্থির করিলেন, আমার স্বামীর জন্য আমি খুব বড় একটা কিছু করিব। কিন্তু হায়, যতখানি সাধ ততখানি সাধ্য কাহার আছে! হাতের কাছে কি আছে, কি দেওয়া যায়! ঐশ্বর্য্য নাই, বুদ্ধি নাই, ক্ষমতা নাই, শুধু একটা প্রাণ আছে, সেটাও যদি কোথাও দিবার থাকে এখনি দিয়া ফেলি, কিন্তু তাহারই বা মূল্য কি?

আর স্বামীকে যদি দুগ্ধফেনের মত শুভ্র, নবনীর মত কোমল, শিশুকন্দর্পের মত সুন্দর একটি স্নেহের পুত্তলি সন্তান দিতে পারিতাম! কিন্তু প্রাণপণে ইচ্ছা করিয়া মরিয়া গেলেও ত সে হইবে না। তখন মনে হইল, স্বামীর একটি বিবাহ দিতে হইবে। ভাবিল, স্ত্রীরা ইহাতে এত কাতর হয় কেন, একাজ ত কিছুই কঠিন নহে! স্বামীকে যে ভালবাসে, সপত্নীকে ভালবাসা তাহার পক্ষে কি এমন অসাধ্য! মনে করিয়া বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল।

প্রস্তাবটা প্রথম যখন শুনিল, নিবারণ হাসিয়া উড়াইয়া দিল, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বারও কর্ণপাত করিল না। স্বামীর এই অসম্মতি, এই অনিচ্ছা দেখিয়া হরসুন্দরীর বিশ্বাস এবং সুখ যতই বাড়িয়া উঠিল তাহার প্রতিজ্ঞাও ততই দৃঢ় হইতে লাগিল। এদিকে নিবারণ যত বারম্বার এই অনুরোধ শুনিল, ততই ইহার অসদ্ভাব্যতা তাহার মন হইতে দূর হইল, এবং গৃহদ্বারে বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে সন্তানপরিবৃত গৃহের সুখময় চিত্র তাহার মনে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। একদিন কহিল, "বুড়াবয়সে একটি কচি খুকিকে বিবাহ করিয়া আমি মানুষ করিতে পারিব না!"

হরসুন্দরী কহিল, "সে জন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না। মানুষ করিবার ভার আমার উপর রহিল।" বলিতে বলিতে

এই সন্তানহীনা রমণীর মনে একটি কিশোরবয়স্কা, সুকুমারী, লজ্জাশীলা, মাতৃক্রোড় হইতে সদ্যোবিচ্যুতা নববধূর মুখচ্ছবি উদয় হইল এবং হৃদয় স্নেহে বিগলিত হইয়া গেল।

নিবারণ কহিল, "আমার আপিস আছে, কাজ আছে, তুমি আছ, কচি মেয়ের আবদার শুনিবার অবসর আমি পাইবনা।"

হরসুন্দরী বারবার করিয়া কহিল তাহার জন্য কিছুমাত্র সময় নষ্ট করিতে হইবে না এবং অবশেষে পরিহাস করিয়া কহিল—"আচ্ছা গো, তখন দেখিব কোথায় বা তোমার কাজ থাকে, কোথায় বা আমি থাকি, আর কোথায় বা তুমি থাক।"

নিবারণ যে কথার উত্তরমাত্র দেওয়া আবশ্যক বোধ করিল না, শান্তির স্বরূপ হরসুন্দরীর কপোলে হাসিয়া তর্জ্জনী আঘাত করিল। এই ত গেল ভূমিকা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

একটি মলকপরা অশ্রুতরা ছোটখাটো মেয়ের সহিত নিবারণের বিবাহ হইল, তাহার নাম শৈলবালা।

নিবারণ ভাবিল, নামটি বড় মিষ্ট এবং মুখখানিও বেশ ঢলঢল। তাহার ভাবখানা, তাহার চেহারাখানি, তাহার চলাফেরা একটু বিশেষ মনোযোগ করিয়া চাহিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু সে আর কিছুতেই হইয়া উঠেনা। উল্টিয়া এমন ভাব দেখাইতে হয় যে, ঐত একফোঁটা মেয়ে, উহাকে লইয়া ত বিষম বিপদে পড়িলাম, কোনমতে পাশ কাটাইয়া আমার বয়সোচিত কর্ত্তব্য-ক্ষেত্রের মধ্যে গিয়া পড়িলে যেন পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

হরসুন্দরী নিবারণের এই বিষম বিপদ্‌গ্রস্ত ভাব দেখিয়া মনে মনে বড় আমোদ বোধ করিত। এক একদিন হাত চাপিয়া

ধরিয়া বলিত, "আহা, পালাও কোথায়! ঐটুকু মেয়ে, ওত আর তোমাকে খাইয়া ফেলিবে না।"—নিবারণ দ্বিগুণ শশব্যস্ত ভাব ধারণ করিয়া বলিত, "আরে রোস রোস, আমার একটু বিশেষ কাজ আছে।"—বলিয়া যেন পালাইবার পথ পাইত না। হরসুন্দরী হাসিয়া দ্বার আটক করিয়া বলিত, আজ ফাঁকি দিতে পারিবে না। অবশেষে নিবারণ নিতান্তই নিরুপায় হইয়া কাতরভাবে বসিয়া পড়িত। হরসুন্দরী তাহার কানের কাছে বলিত, "আহা, পরের মেয়েকে ঘরে আনিয়া অমন হতশ্রদ্ধা করিতে নাই।" এই বলিয়া শৈলবালাকে ধরিয়া নিবারণের বাম পার্শ্বে বসাইয়া দিত, এবং জোর করিয়া ঘোমটা খুলিয়া ও চিবুক ধরিয়া, তাহার অবনতমুখ তুলিয়া নিবারণকে বলিত, "আহা কেমন চাঁদের মত মুখখানি দেখ দেখি!"—কোন দিন বা উভয়কে ঘরে বসাইয়া কাজ আছে বলিয়া উঠিয়া যাইত এবং বাহির হইতে ঝনাৎ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিত। নিবারণ নিশ্চয় জানিত দু'টি কৌতূহলী চক্ষু কোন-না-কোন ছিদ্রে সংলগ্ন হইয়া আছে—অতিশয় উদাসীনভাবে পাশ ফিরিয়া নিদ্রার উপক্রম করিত, শৈলবালা ঘোমটা টানিয়া গুটি-সুটি মারিয়া মুখ ফিরাইয়া একটা কোণের মধ্যে মিলাইয়া থাকিত।

অবশেষে হরসুন্দরী নিতান্ত না পারিয়া হাল ছাড়িয়া দিল, কিন্তু খুব বেশি দুঃখিত হইল না।

হরসুন্দরী যখন হাল ছাড়িল, তখন স্বয়ং নিবারণ হাল ধরিল। এ বড় কৌতূহল, এ বড় রহস্য! একটুক্‌রা হীরক পাইলে তাহাকে নানাভাবে নানাদিকে ফিরাইয়া দেখিতে ইচ্ছা করে, আর এ একটি ক্ষুদ্র সুন্দর মানুষের মন বড় অপূর্ব্ব! ইহাকে কত রকম করিয়া স্পর্শ করিয়া, সোহাগ করিয়া, অন্তরাল হইতে, সম্মুখ হইতে, পার্শ্ব

হইতে দেখিতে হয়! কখন একবার কানের দুলে দোল দিয়া, কখনো ঘোমটা একটুখানি টানিয়া তুলিয়া, কখনো বিদ্যুতের মত সহসা সচকিতে, কখনো নক্ষত্রের মত দীর্ঘকাল একদৃষ্টে নবনব সৌন্দর্য্যের সীমা আবিষ্কার করিতে হয়।

ম্যাক্‌মোরান্ কোম্পানির আপিসের হেডবাবু নিবারণচন্দ্রের অদৃষ্টে এমন অভিজ্ঞতা ইতিপূর্ব্বে হয় নাই। সে যখন প্রথম বিবাহ করিয়াছিল তখন বালক ছিল, যখন যৌবন লাভ করিল তখন স্ত্রী তাহার নিকট চিরপরিচিত, বিবাহিত জীবন চিরাভ্যস্ত। হরসুন্দরীকে অবশ্যই সে ভালবাসিত, কিন্তু কখনই তাহার মনে ক্রমে ক্রমে প্রেমের সচেতন সঞ্চার হয় নাই। একেবারে পাকা আম্রের মধ্যেই যে পতঙ্গ জন্মলাভ করিয়াছে, যাহাকে কোন কালে রস অন্বেষণ করিতে হয় নাই, অল্পে অল্পে রসাস্বাদ করিতে হয় নাই, তাহাকে একবার বসন্তকালের বিকশিত পুষ্পবনের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হৌক্ দেখি—বিকচোন্মুখ গোলাপের আধখোলা মুখটির কাছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার কি আগ্রহ! একটুকু যে সৌরভ পায়, একটুকু যে মধুর আস্বাদ লাভ করে তাহাতে তাহার কি নেশা!

নিবারণ প্রথমটা কখন বা একটা গাউনপরা কাঁচের পুতুল, কখনো বা একশিশি এসেন্স, কখনো বা কিছু মিষ্টদ্রব্য কিনিয়া আনিয়া শৈলবালাকে গোপনে দিয়া যাইত। এমনি করিয়া একটুখানি ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হয়। অবশেষে কখন্ একদিন হরসুন্দরী গৃহকার্য্যের অবকাশে আসিয়া দ্বারের ছিদ্র দিয়া দেখিল, নিবারণ এবং শৈলবালা বসিয়া কড়ি লইয়া দশ পঁচিশ খেলিতেছে। বুড়া বয়সের এই খেলা বটে! নিবারণ সকালে আহারাদি করিয়া যেন আপিসে বাহির হইল কিন্তু আপিসে না গিয়া কখন্ অন্তঃ

পুরে প্রবেশ করিয়াছে! এ প্রবঞ্চনার কি আবশ্যক ছিল! হঠাৎ একটা জলন্ত বজ্রশলাকা দিয়া কে যেন হরসুন্দরীর চোক খুলিয়া দিল, সেই তীব্রতাপে চোকের জল বাষ্প হইয়া শুকাইয়া গেল।

হরসুন্দরী মনে মনে কহিল, আমিই ত উহাকে ঘরে আনিলাম, আমিই ত মিলন ঘটাইয়া দিলাম, তবে আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার কেন, যেন আমি উঁহাদের সুখের কাঁটা!

হরসুন্দরী শৈলবালাকে গৃহকার্য্য শিখাইত। একদিন নিবারণ মুখ ফুটিয়া বলিল, "ছেলেমানুষ, উহাকে তুমি বড় বেশি পরিশ্রম করাইতেছ, উহার শরীর তেমন সবল নহে।" বড় একটা তীব্র উত্তর হরসুন্দরীর মুখের কাছে আসিয়াছিল, কিন্তু কিছু বলিল না, চুপ করিয়া গেল। সেই অবধি বউকে কোন গৃহকার্য্যে হাত দিতে দিত না। রাঁধাবাড়া, দেখাশুনা সমস্ত কাজ নিজে করিত। এমন হইল, শৈলবালা আর নড়িয়া বসিতে পারে না, হরসুন্দরী দাসীর মত তাহার সেবা করে এবং স্বামী বিদূষকের মত তাহার মনোরঞ্জন করে। সংসারের কাজ করা, পরের দিকে তাকানো যে, জীবনের কর্ত্তব্য এ শিক্ষাই তাহার হইল না।

হরসুন্দরী যে নীরবে দাসীর মত কাজ করিতে লাগিল তাহার মধ্যে ভারি একটা গর্ব্ব আছে। তাহার মধ্যে ন্যূনতা এবং দীনতা নাই। সে কহিল, তোমরা দুই শিশুতে মিলিয়া খেলা কর, সংসারের সমস্ত ভার আমি লইলাম!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

হায়, আজ কোথায় সে বল, যে বলে হরসুন্দরী মনে করিয়াছিল স্বামীর জন্য চিরজীবনকাল সে আপনার প্রেমের দাবীর

অর্দ্ধেক অংশ অকাতরে ছাড়িয়া দিতে পারিবে। হঠাৎ এক-দিন পূর্ণিমায় রাত্রে জীবনে যখন জোয়ার আসে, তখন দুই কূল প্লাবিত করিয়া মানুষ মনে করে, আমার কোথাও সীমা নাই। তখন যে একটা বৃহৎ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে, জীবনের সুদীর্ঘ ভাঁটার সময় সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে তাহার সমস্ত প্রাণে টান পড়ে। হঠাৎ ঐশ্বর্য্যের দিনে লেখনীর এক আঁচড়ে যে দান-পত্র লিখিয়া দেয়, চির-দারিদ্র্যের দিনে পলে পলে তিল তিল করিয়া তাহা শোধ করিতে হয়। তখন বুঝা যায়, মানুষ বড় দীন, হৃদয় বড় দুর্ব্বল, তাহার ক্ষমতা অতি যৎসামান্য!

দীর্ঘ রোগাবসানে ক্ষীণ, রক্তহীন, পাণ্ডু কলেবরে হরসুন্দরী সে দিন শুক্ল দ্বিতীয়ার চাঁদের মত একটি শীর্ণ রেখামাত্র ছিল; সংসারে নিতান্ত লঘু হইয়া ভাসিতেছিল। মনে হইয়াছিল, আমার যেন কিছুই না হইলেও চলে। ক্রমে শরীর বলী হইয়া উঠিল, রক্তের তেজ বাড়িতে লাগিল, তখন হরসুন্দরীর মনে কোথা হইতে এক দল শরীক আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহারা উচ্চৈঃস্বরে কহিল, তুমি ত ত্যাগপত্র লিখিয়া বসিয়া আছ, কিন্তু আমাদের দাবী আমরা ছাড়িব না।

হরসুন্দরী যেদিন প্রথম পরিষ্কাররূপে আপন অবস্থা বুঝিতে পারিল, সেদিন নিবারণ ও শৈলবালাকে আপন শয়নগৃহ ছাড়িয়া দিয়া ভিন্ন গৃহে একাকিনী গিয়া শয়ন করিল। আট বৎসর বয়সে বাসররাত্রে যে শয্যায় প্রথম শয়ন করিয়াছিল, আজ সাতাশ বৎসর পরে সেই শয্যা ত্যাগ করিল। প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া এই সধবা রমণী যখন অসহ্য হৃদয়ভার লইয়া তাহার নূতন বৈধব্যশয্যার উপরে আসিয়া পড়িল, তখন গলির অপর প্রান্তে একজন সৌখীন যুবা বেহাগ রাগিণীতে মালিনীর গান গাহিতে-

ছিল; আর একজন বাঁয়া তব্‌লায় সঙ্গৎ করিতেছিল এবং শ্রোতৃবন্ধুগণ সমের কাছে হা-হাঃ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল।

তাহার সেই গান সেই নিস্তব্ধ জ্যোৎস্না-রাত্রে পার্শ্বের ঘরে মন্দ শুনাইতেছিল না। তখন বালিকা শৈলবালার ঘুমে চোখ ঢুলিয়া পড়িতেছিল, আর নিবারণ তাহার কানের কাছে মুখ রাখিয়া ধীরে ধীরে ডাকিতেছিল, সই!

লোকটা ইতিমধ্যে বঙ্কিম বাবুর চন্দ্রশেখর পড়িয়া ফেলিয়াছে এবং দুই একজন আধুনিক কবির কাব্যও শৈলবালাকে পড়িয়া শুনাইয়াছে।

নিবারণের জীবনের নিম্নস্তরে যে একটি যৌবন-উৎস বরাবর চাপা পড়িয়া ছিল, আঘাত পাইয়া হঠাৎ বড় অসময়ে তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কেহই সেজন্য প্রস্তুত ছিল না, এই জন্য অকস্মাৎ তাহার বুদ্ধিশুদ্ধি এবং সংসারের সমস্ত বন্দোবস্ত উল্টাপাল্টা হইয়া গেল। সে বেচারা কোন কালে জানিত না, মানুষের ভিতরে এমন সকল উপদ্রবজনক পদার্থ থাকে, এমন সকল দুর্দ্দাম দুরন্ত শক্তি, যাহা সমস্ত হিসাবকিতাব, শৃঙ্খলা সামঞ্জস্য একেবারে লণ্ডভণ্ড করিয়া দেয়।

কেবল নিবারণ নহে, হরসুন্দরীও একটা নূতন বেদনার পরিচয় পাইল। এ কিসের আকাঙ্ক্ষা, এ কিসের দুঃসহ যন্ত্রণা! মন এখন যাহা চায়, কখনো ত তাহা চাহেও নাই, কখনো ত তাহা পায়ও নাই। যখন ভদ্রভাবে নিবারণ নিয়মিত আপিসে যাইত, যখন নিদ্রার পূর্ব্বে কিয়ৎকালের জন্য গয়লার হিসাব, দ্রব্যের মহার্ঘতা এবং লৌকিকতার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা চলিত, তখন ত এই অন্তর্বিপ্লবের কোন সূত্রপাতমাত্র ছিল না।

ভালবাসিত বটে, কিন্তু তাহার ত কোন উজ্জ্বলতা, কোন উত্তাপ ছিল না। সে ভালবাসা অগ্নিজ্বলিত ইন্ধনের মত ছিল মাত্র।

আজ তাহার মনে হইল, জীবনের সফলতা হইতে যেন চিরকাল কে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছে। তাহার হৃদয় যেন চিরদিন উপবাসী হইয়া আছে। তাহার এই নারী-জীবন বড় দারিদ্র্যেই কাটিয়াছে। সে কেবল হাটবাজার পাসমস্লা ভরিতরকারীর ঝঞ্ঝাট লইয়াই সাতাশটা অমূল্য বৎসর দাসীবৃত্তি করিয়া কাটাইল, আর আজ জীবনের মধ্যপথে আসিয়া দেখিল, তাহারই শয়নকক্ষের পার্শ্বে এক গোপন মহামহৈশ্বর্য্যের ভাণ্ডারের কুলুপ খুলিয়া একটি ক্ষুদ্র বালিকা একেবারে রাজ্ঞী-রাজেশ্বরী হইয়া বসিল। নারী দাসী বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে নারী রাণীও বটে। কিন্তু ভাগাভাগী করিয়া এক জন নারী হইল দাসী, আর একজন নারী হইল রাণী; তাহাতে দাসীর গৌরব গেল, রাণীর সুখ রহিল না।

কারণ, শৈলবালাও নারী-জীবনের যথার্থ সুখের স্বাদ পাইল না। এত অবিশ্রাম আদর পাইল যে, ভালবাসিবার আর মুহূর্ত্ত অবসর রহিল না। সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হইয়া, সমুদ্রের মধ্যে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া বোধ করি নদীর একটি মহৎ চরিতার্থতা আছে, কিন্তু সমুদ্র যদি জোয়ারের টানে আকৃষ্ট হইয়া ক্রমাগতই নদীর উন্মুখীন হইয়া রহে, তবে নদী কেবল নিজের মধ্যেই নিজে ক্ষীত হইতে থাকে। সংসার তাহার সমস্ত আদর সোহাগ লইয়া দিবারাত্রি শৈবলিনীর দিকে অগ্রসর হইয়া রহিল, তাহাতে শৈবলিনীর আত্মাদর অতিশয় উত্তুঙ্গ হইয়া উঠিতে লাগিল, সংসারের প্রতি তাহার ভালবাসা পড়িতে পাইল না। সে জানিল, আমার জন্যই সমস্ত, এবং আমি কাহার জন্যও

নহি। এ অবস্থায় যথেষ্ট অহঙ্কার আছে কিন্তু পরিতৃপ্তি কিছুই নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

একদিন ঘনঘোর মেঘ করিয়া বর্ষা আসিয়াছে। এমনি অন্ধকার করিয়াছে যে, ঘরের মধ্যে কাজকর্ম্ম করা অসাধ্য। বাহিরে ঝুপ্‌ঝুপ্ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। কুলগাছের তলায় লতাগুল্মের জঙ্গল জলে প্রায় নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে এবং প্রাচীরের পার্শ্ববর্ত্তী নালা দিয়া ঘোলা জলস্রোত কল্‌কল্ শব্দে বহিয়া চলিয়াছে। হরসুন্দরী আপনার নূতন শয়ন-গৃহের নির্জ্জন অন্ধকারে জান্‌লার কাছে চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

এমন সময় নিবারণ চোরের মত ধীরে ধীরে দ্বারের কাছে প্রবেশ করিল, ফিরিয়া যাইবে কি অগ্রসর হইবে ভাবিয়া পাইল না। হরসুন্দরী তাহা লক্ষ্য করিল কিন্তু একটি কথাও কহিল না, তখন নিবারণ হঠাৎ একেবারে তীরের মত হরসুন্দরীর পার্শ্বে গিয়া এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিল—গোটাকতক গহনার আবশ্যক হইয়াছে। জান ত অনেকগুলো দেনা হইয়া পড়িয়াছে, দেনদার বড়ই অপমান করিতেছে—কিছু বন্ধক রাখিতে হইবে—শীঘ্রই ছাড়াইয়া লইতে পারিব।

হরসুন্দরী কোন উত্তর দিল না, নিবারণ চোরের মত দাঁড়াইয়া রহিল। অবশেষে পুনশ্চ কহিল, তবে আজ কি হইবে না?—হরসুন্দরী কহিল—"না।" ঘরে প্রবেশ করাও যেমন শক্ত, ঘর হইতে অবিলম্বে বাহির হওয়াও তেমনি কঠিন। নিবারণ একটু এদিকে ওদিকে চাহিয়া ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "তবে অন্যত্র চেষ্টা দেখিগে যাই"—বলিয়া প্রস্থান করিল।

ঋণ কোথায় এবং কোথায় গহনা বন্ধক দিতে হইবে হরসুন্দরী তাহা সমস্তই বুঝিল। বুঝিল নববধূ পূর্ব্বরাত্রে তাহার এই হত-বুদ্ধি পোষা পুরুষটিকে অত্যন্ত ঝঙ্কার দিয়া বলিয়াছিল, "দিদির সিন্দুকভরা গহনা, আর আমি বুঝি একখানি পরিতে পাই না?" নিবারণ চলিয়া গেলে ধীরে ধীরে উঠিয়া লোহার সিন্দুক খুলিয়া একে একে সমস্ত গহনা বাহির করিল। শৈলবালাকে ডাকিয়া প্রথমে তাহাকে আপনার বিবাহের বেণারসী সাড়িখানি পরাইল, তাহার পর তাহার আপাদমস্তক এক একখানি করিয়া গহনায় ভরিয়া দিল। ভাল করিয়া চুল বাঁধিয়া দিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া দেখিল বালিকার মুখখানি বড় সুমিষ্ট, একটি সদ্যঃপক্ক সুগন্ধ ফলের মত নিটোল, রসপূর্ণ। শৈলবালা যখন ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ করিয়া চলিয়া গেল, সেই শব্দ বহুক্ষণ ধরিয়া হরসুন্দরীর শিরার রক্তের মধ্যে ঝিম্‌ঝিম্‌ করিয়া বাজিতে লাগিল। মনে মনে কহিল, আজ আর কি লইয়া তোতে আমাতে তুলনা হইবে? কিন্তু এক সময়ে আমারও ত ঐ বয়স ছিল, আমিও ত অমনি যৌবনের শেষরেখা পর্য্যন্ত ভরিয়া উঠিয়াছিলাম; তবে আমাকে সে কথা কেহ জানায় নি কেন? কখন্‌ সে দিন আসিল এবং কখন্‌ সে দিন গেল তাহা একবার সংবাদও পাইলাম না! কিন্তু কি গর্ব্বে, কি গৌরবে, কি তরঙ্গ তুলিয়াই শৈলবালা চলিয়াছে।

হরসুন্দরী যখন কেবলমাত্র ঘরকন্নাই জানিত তখন এই গহনা-গুলি তাহার কাছে কত দামী ছিল! তখন কি নির্ব্বোধের মত এ সমস্ত এমন করিয়া এক মুহূর্ত্তে হাতছাড়া করিতে পরিত? এখন ঘরকন্না ছাড়া আর একটা বড় জিনিসের পরিচয় পাইয়াছে, এখন গহনার দাম, ভবিষ্যতের হিসাব, সমস্ত তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে।

আর শৈলবালা সোণামাণিক ঝক্‌মক্‌ করিয়া শয়নগৃহে চলিয়া

গেল, একবার মুহূর্ত্তের তরে ভাবিলও না হরসুন্দরী তাহাকে কতখানি দিল। সে জানিল চতুর্দ্দিক হইতে সমস্ত সেবা, সমস্ত সম্পদ, সমস্ত সৌভাগ্য স্বাভাবিক নিয়মে তাহার মধ্যে আসিয়া পরিসমাপ্ত হইবে, কারণ, সে হইল শৈলবালা, সে হইল সই!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

এক একজন লোক স্বপ্নাবস্থায় নির্ভীক ভাবে অত্যন্ত সঙ্কটের পথ দিয়া চলিয়া যায়, মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করে না। অনেক জাগ্রত মানুষেরও তেমনি চির-স্বপ্নাবস্থা উপস্থিত হয়, কিছুমাত্র জ্ঞান থাকে না, বিপদের সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া নিশ্চিন্ত মনে অগ্রসর হইতে থাকে, অবশেষে নিদারুণ সর্ব্বনাশের মধ্যে গিয়া জাগ্রত হইয়া উঠে! আমাদের ম্যাক্‌মোরান্ কোম্পানির হেড্ বাবুটিরও সেই দশা। শৈলবালা তাহার জীবনের মাঝখানে একটা প্রবল আবর্ত্তের মত ঘুরিতে লাগিল, এবং বহুদূর হইতে বিবিধ মহার্ঘ পদার্থ আকৃষ্ট হইয়া তাহার মধ্যে বিলুপ্ত হইতে লাগিল। কেবল যে নিবারণের মনুষ্যত্ব এবং মাসিক বেতন, হরসুন্দরীর সুখ-সৌভাগ্য এবং বসনভূষণ, তাহা নহে; সঙ্গে সঙ্গে ম্যাক্‌মোরান্ কোম্পানির ক্যাশ্ তহবিলেও গোপনে টান পড়িল। তাহার মধ্য হইতেও দুটা একটা করিয়া তোড়া অদৃশ্য হইতে লাগিল। নিবারণ স্থির করিত আগামী মাসের বেতন হইতে আস্তে আস্তে শোধ করিয়া রাখিব। কিন্তু আগামী মাসের বেতনটি হাতে আসিবামাত্র সেই আবর্ত্ত হইতে টান পড়ে এবং শেষ দুআনীটি পর্য্যন্ত চকিতের মত চিক্‌মিক্ করিয়া বিদ্যুৎ-বেগে অন্তর্হিত হয়।

শেষে একদিন ধরা পড়িল। পুরুষানুক্রমের চাকুরি; সাহেব

বড় ভালবাসে; তহবিল পূরণ করিয়া দিবার জন্য দুইদিনমাত্র সময় দিল।

কেমন করিয়া যে ক্রমে ক্রমে আড়াই হাজার টাকার তহবিল ভাঙ্গিয়াছে তাহা নিবারণ নিজেই বুঝিতে পারিল না। একেবারে পাগলের মত হইয়া হরসুন্দরীর কাছে গেল, বলিল, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে!" হরসুন্দরী সমস্ত শুনিয়া একেবারে পাংশুবর্ণ হইয়া গেল! নিবারণ কহিল, "শীঘ্র গহনাগুলা বাহির কর।" হরসুন্দরী কহিল "সে ত আমি সমস্তই ছোটবৌকে দিয়াছি!" নিবারণ নিতান্ত শিশুর মত অধীর হইয়া বলিতে লাগিল, "কেন দিলে ছোটবৌকে? কেন দিলে? কে তোমাকে দিতে বলিল?" হরসুন্দরী তাহার প্রকৃত উত্তর না দিয়া কহিল "তাহাতে ক্ষতি কি হইয়াছে? সে ত আর জলে পড়ে নাই?" ভীরু নিবারণ কাতর স্বরে কহিল, "তবে তুমি যদি কোন ছুতা করিয়া তাহার কাছ হইতে বাহির করিতে পার! কিন্তু আমার মাথা খাও বলিয়ো না যে, আমি চাহিতেছি, কিম্বা কি জন্য চাহিতেছি!" তখন হরসুন্দরী মর্ম্মান্তিক বিরক্তি ও ঘৃণা ভরে বলিয়া উঠিল, "এই কি তোমার ছল ছুতা করিবার এবং সোহাগ দেখাইবার সময়! চল!" বলিয়া স্বামীকে লইয়া ছোট-বৌয়ের ঘরে প্রবেশ করিল।

ছোট-বৌ কিছু বুঝিল না। সে সকল কথাতেই বলিল, "সে আমি কি জানি!" সংসারের কোন চিন্তা যে তাহাকে কখন ভাবিতে হইবে এমন কথা কি তাহার সহিত ছিল? সকলে আপনার ভাবনা ভাবিবে এবং সকলে মিলিয়া শৈলবালার আরাম চিন্তা করিবে, অকস্মাৎ ইহার ব্যতিক্রম হয়, এ কি ভয়ানক অন্যায়!

তখন নিবারণ শৈলবালার পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া পড়িল।

শৈলবালা কেবলি বলিল, "সে আমি জানি না। আমার জিনিষ আমি কেন দিব?" নিবারণ দেখিল ঐ দুর্ব্বল ক্ষুদ্র সুন্দর সুকুমারী বালিকাটি লোহার সিন্ধুকের অপেক্ষাও কঠিন। হরসুন্দরী সঙ্কটের সময় স্বামীর এই দুর্ব্বলতা দেখিয়া ঘৃণায় জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। শৈলবালার চাবি বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইতে গেল। শৈলবালা তৎক্ষণাৎ চাবির গোচ্ছা প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া পুষ্করিণীর মধ্যে ফেলিয়া দিল। হরসুন্দরী হতবুদ্ধি স্বামীকে কহিল, "তালা ভাঙ্গিয়া ফেল না!" শৈবলিনী প্রশান্তমুখে বলিল, "তাহা হইলে আমি গলায় দড়ি দিয়া মরিব!"—

নিবারণ কহিল, আমি আর একটা চেষ্টা দেখিতেছি, বলিয়া এলো-থেলো বেশে বাহির হইয়া গেল।

নিবারণ দুই ঘণ্টার মধ্যেই পৈতৃক বাড়ি আড়াই হাজার টাকায় বিক্রয় করিয়া আসিল।

বহুকষ্টে হাতে বেড়িটা বাঁচিল, কিন্তু চাকরী গেল। স্বামীর জঙ্গমের মধ্যে রহিল কেবল দুটিমাত্র স্ত্রী। তাহার মধ্যে রেশমকাতর বালিকা স্ত্রীটি গর্ভবতী হইয়া নিতান্ত স্থাবর হইয়াই পড়িল। গলির মধ্যে একটি ছোট স্যাঁৎসেঁতে বাড়িতে এই ক্ষুদ্র পরিবার আশ্রয় গ্রহণ করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ছোটবৌয়ের অসন্তোষ এবং অসুখের আর শেষ নাই। সে কিছুতেই বুঝিতে চায় না তাহার স্বামীর ক্ষমতা নাই। "ক্ষমতা নাই যদি ত বিবাহ করিলে কেন?"

উপরের তলায় কেবল দুটিমাত্র ঘর। একটি ঘরে নিবারণ ও শৈবলিনীর শয়নগৃহ। আর একটি ঘরে হরসুন্দরী থাকে।

শৈবলিনী খুঁৎখুঁৎ করিয়া বলে, "আমি দিনরাত্রি শোবার ঘরে কাটাইতে পারি না।" নিবারণ মিথ্যা আশ্বাস দিয়া বলিত, "আমি আর একটা ভাল বাড়ির সন্ধানে আছি, শীঘ্র বাড়ি বদল করিব।" শৈলবালা বলিত, "কেন, ঐ ত পাশে আর একটা ঘর আছে!"

শৈলবালা তাহার পূর্ব্ব প্রতিবেশিনীদের দিকে কখনো মুখ তুলিয়া চাহে নি। নিবারণের বর্ত্তমান দুরবস্থায় ব্যথিত হইয়া তাহারা একদিন দেখা করিতে আসিল, শৈলবালা ঘরে খিল দিয়া বসিয়া রহিল, কিছুতেই দ্বার খুলিল না। তাহারা চলিয়া গেলে রাগিয়া, কাঁদিয়া, উপবাসী থাকিয়া, হিষ্টিরিয়া করিয়া পাড়া মাথায় করিল। এমনতর উৎপাত প্রায় ঘটিতে লাগিল।

অবশেষে শৈলবালার এই শারীরিক সঙ্কটের অবস্থায় গুরুতর পীড়া হইল, এমন কি, গর্ভপাত হইবার উপক্রম হইল।

নিবারণ হরসুন্দরীর দুই হাত ধরিয়া বলিল, "তুমি শৈলকে বাঁচাও।"

হরসুন্দরী দিন নাই রাত্রি নাই শৈলবালার সেবা করিতে লাগিল। তিলমাত্র ত্রুটি হইলে শৈল তাহাকে দুর্ব্বাক্য বলিত, সে একটি উত্তরমাত্র করিত না।

শৈল কিছুতেই স্নান খাইতে চাহিত না, বাটিসুদ্ধ ছুঁড়িয়া ফেলিত—জ্বরের সময় কাঁচা আমের অম্বল দিয়া ভাত খাইতে চাহিত, না পাইলে রাগিয়া কাঁদিয়া অনর্থপাত করিত—হরসুন্দরী তাহাকে "লক্ষ্মী আমার", "বোন আমার", "দিদি আমার" বলিয়া শিশুর মত ভুলাইতে চেষ্টা করিত।

কিন্তু শৈলবালা বাঁচিল না। সংসারের সমস্ত সোহাগ আদর লইয়া পরম অসুখ ও অসন্তোষে বালিকার ক্ষুদ্র অসম্পূর্ণ ব্যর্থ জীবন অকালে নষ্ট হইয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নিবারণের প্রথমে খুব একটা আঘাত লাগিল, পরক্ষণেই দেখিল তাহার একটা মস্ত বাঁধন ছিঁড়িয়া গিয়াছে। শোকের মধ্যেও হঠাৎ তাহার একটা মুক্তির আনন্দ বোধ হইল। হঠাৎ মনে হইল এতদিন তাহার বুকের উপর একটা দুঃস্বপ্ন চাপিয়া ছিল। চৈতন্য হইয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে জীবন নিরতিশয় লঘু হইয়া গেল। মাধবীলতাটির মত এই যে কোমল জীবনপাশ ছিঁড়িয়া গেল, এই কি তাহার আদরের শৈলবালা? হঠাৎ নিঃশ্বাস টানিয়া দেখিল, না, সে তাহার উদ্বন্ধন-রজ্জু।

আর তাহার চিরজীবনের সঙ্গিনী হরসুন্দরী? দেখিল সেই ত তাহার সমস্ত সংসার একাকিনী অধিকার করিয়া তাহার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখের স্মৃতিমন্দিরের মাঝখানে বসিয়া আছে—কিন্তু তবু মধ্যে একটা বিচ্ছেদ। ঠিক যেন একটি ক্ষুদ্র উজ্জ্বল সুন্দর নিষ্ঠুর ছুরি আসিয়া একটি হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ এবং বাম অংশের মাঝখানে বেদনাপূর্ণ বিদারণ-রেখা টানিয়া দিয়া গেছে।

একদিন গভীর রাত্রে সমস্ত সহর যখন নিদ্রিত, নিবারণ ধীরে ধীরে হরসুন্দরীর নিভৃত শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। নীরবে সেই পুরাতন নিয়মমত সেই পুরাতন শয্যার দক্ষিণ অংশ গ্রহণ করিয়া শয়ন করিল। কিন্তু এবার তাহার সেই চির-অধিকারের মধ্যে চোরের মত প্রবেশ করিল।

হরসুন্দরীও একটি কথা বলিল না, নিবারণও একটি কথা বলিল না। উহারা পূর্ব্বে যেরূপ পাশাপাশি শয়ন করিত এখনো সেইরূপ পাশাপাশি শুইল, কিন্তু ঠিক মাঝখানে একটি মৃত বালিকা শুইয়া রহিল, তাহাকে কেহ লঙ্ঘন করিতে পারিল না।

সাময়িক সারসংগ্রহ।

পরিবারাশ্রম।

ফ্রান্সে ওয়াজ্ নদীর ধারে গীজ্ নামক একটি ক্ষুদ্র সহর আছে। সেখানে আজ চোদ্দ বৎসর হইল গোড্যাঁ সাহেব নূতন ধরণে এক বৃহৎ কারখানা খুলিয়াছেন, তাহার নাম দিয়াছেন, পরিবারাশ্রম সভা।

লোকটি তালাচাবি-নির্ম্মাতা একটি কর্ম্মকারের পুত্র। নিজের যত্নে ধন উপার্জ্জন করিয়া, তিনি সমাজ হইতে কিসে দৈন্য দুঃখ দূর হয় এবং কি উপায়ে শ্রমজীবী লোকেরা রোগ, বার্দ্ধক্য প্রভৃতি অনিবার্য্য কারণজনিত অর্থক্লেশ হইতে রক্ষিত হইতে পারে সেই চিন্তা ও চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন।

তাঁহার সেই আমরণ চেষ্টার ফল এই পারিবারিক সমাজ। ইহা একটি কারখানা। এখানে প্রধানতঃ লোহার উনান, অগ্নি-কুণ্ড, ইমায়ৎ প্রস্তুতের সরঞ্জাম প্রভৃতি তৈয়ারি হয়।

এখানকার কর্ম্মপ্রণালী অন্যান্য কারখানা হইতে অনেক স্বতন্ত্র। সংক্ষেপে এখানকার নিয়ম এই, কারবারের সুদ খরচা বাদে মোট যে লাভ হয়, তাহা হইতে শতকরা পঁচিশ অংশ বুদ্ধি অনুসারে এবং পঁচাত্তর অংশ পরিশ্রম অনুসারে কর্ম্মচারীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। ইহা ব্যতীত তাহাদের যথানিয়মিত বেতন আছে। ত্রিশ বৎসর কাজের পর পেন্‌শন্ নির্দ্দিষ্ট হয়, কিন্তু বিশেষ কারণে অক্ষম হইয়া পড়িলে পনেরো বৎসরের পরেই একটা মাসহারার অধিকারী হওয়া যায়। দুঃখদুর্দ্দিনের জন্য একটা বিশেষ বন্দোবস্ত আছে, এবং এই সভাভুক্ত যে কেহ

ইচ্ছা করিলে সন্তানদিগকে চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সরকারী ব্যয়ে বিদ্যাশিক্ষা দিতে পারে।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে গোড্যাঁ সাহেবের মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার উপার্জ্জিত ধনের অর্দ্ধেক, অর্থাৎ, এক লক্ষ চল্লিশ হাজার পৌণ্ড এই কারখানায় দান করিয়া যান। সর্ত্ত এই থাকে যে, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পরিবার যেখানে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রার সামান্য অভাবসকল অনুভব না করিয়া কালযাপন করিতে পারে, এমন বাসস্থানের বন্দোবস্ত করা হইবে।

পীড়িত, অক্ষম, বৃদ্ধ, বিধবা, পিতৃমাতৃহীন বালকবালিকা, এমন কি, সর্ব্বপ্রকার অশক্ত লোকদিগের জন্য ইন্সিউরেন্সের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আশ্রমবাসীদের আহার্য্য যোগাইতে হইবে।

তাহাদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য যে সকল আমোদ আহ্লাদের আবশ্যক, তাহার উপায় করিতে হইবে।

বালকবালিকারা যে পর্য্যন্ত না কাযে নিযুক্ত হয় সে পর্য্যন্ত তাহাদিগকে পালন করিতে ও শিক্ষা দিতে হইবে।

কর্ম্মশালার নিকটেই মজুরদের বাসা ঠিক করিয়া দিতে হইবে।

এক কথায়, এমন বন্দোবস্ত করিতে হইবে, যাহাতে কারখানার শ্রমজীবীরা সুখে একত্র বাস করিতে পারে; যাহাতে কারখানা ও ব্যবসায়ের লাভ কর্ম্মকারদের মধ্যে ন্যায়নিয়মে ভাগ হইতে পারে এবং যাহাতে ক্রমে ক্রমে এই সমাজের সমুদয় সম্পত্তি অল্পে অল্পে তাহাদেরই হস্তগত হয়।

ছয় কারণে সভ্যগণ সমাজ হইতে দূরীভূত হইতে পারেন। (১) পানদোষ; (২) বাসস্থানের বায়ু দূষিত করা; (৩)

গর্হিত আচরণ; (৪) শ্রমবিমুখতা; (৫) নিয়মের অবাধ্যতা অথবা উপদ্রব করা; (৬) সন্তানদিগকে উপযুক্ত শিক্ষাদানে শৈথিল্যাচরণ।

কেহ না মনে করেন, এই সমাজে পদে পদে নিয়মের কড়াকড়। প্রত্যেককে যথাসম্ভব স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। ফর্টনাইটলি রিভিয়ু পত্রে যে লেখক এই প্রবন্ধ লিখিতেছেন, তিনি স্বয়ং সেখানে গিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন। তিনি বলেন, সকলেই বেশ প্রফুল্লমুখে সন্তুষ্টভাবে কাজকর্মে প্রবৃত্ত আছে। স্ত্রীলোকেরা স্ব স্ব পরিবারের জন্য কাপড় কাচিতেছে, এবং কাজ করিতে করিতে গুন্‌গুনস্বরে গান ও গল্প করিতেছে, কেহ বা বাগানে মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে বসিয়া বসিয়া খেলাই করিতেছে। ছেলেদের থাকিবার ঘর ভিন্ন ভিন্ন বয়সের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত এবং তাহার সমস্ত বন্দোবস্ত অতি চমৎকার। সাধারণের জন্য রুটি তৈয়ারির ঘর, রুটিখানা, সন্তরণ-শিক্ষার উপযোগী স্নানগৃহ, খেলা ও আমোদের জায়গা, নাট্যশালা, ভাণ্ডার প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট আছে। ঘরদ্বার সমস্তই বহুযত্নে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়। এ সমাজের একটি বিশেষ নিয়ম এই যে, ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রত্যেকের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথার সহিত এই পরিবারাশ্রমের ঐক্য নিঃসন্দেহ পাঠকদের মনে উদয় হইয়াছে। কিন্তু আমাদের পরিবারতন্ত্রের যে সকল কুপ্রথা হইতে সমাজে বিস্তর অমঙ্গলের উদ্ভব হয় সেগুলি উক্ত বাণিজ্য-সমাজে নাই। প্রথমতঃ, সকলকেই কাজ করিতে হয়, এবং প্রত্যেকে আপন কার্য্য ও যোগ্যতা অনুসারেই অংশ পাইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যপালন সম্বন্ধে প্রত্যেকের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা। তৃতীয়তঃ, একান্নবর্ত্তী

পরিবারের মধ্যে একজনের চরিত্র দূষিত হইলে তাহার দৃষ্টান্ত ও ব্যবহারে সমস্ত পরিবারের গুরুতর অহিত ও অসুখের কারণ হইয়া দাঁড়ায়, কিন্তু পরিবারাশ্রমের সভ্যগণ চরিত্রদোষ ও গর্হিতাচরণের জন্য সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইবার যোগ্য। এমন কি আলস্য ও অপরিচ্ছন্নতাবশতঃ বাসস্থানের স্বাস্থ্যহানি করিয়া কেহ নিজের ও অন্যের অসুবিধা ঘটাইতে পারে না। এক কথায়, ইহাতে একত্র-বাসের সমুদয় সুবিধা রক্ষা করিয়া অসুবিধাগুলি দূর করা হইয়াছে।

উদয়াস্তের চন্দ্রসূর্য্য।

উদয়াস্তের সময় দিক্‌সীমান্তে চন্দ্র সূর্য্যকে কেন বড় দেখিতে হয় ইহাই লইয়া প্রথম বৎসরের সাধনায় কিঞ্চিৎ আলোচনা চলে। সাধনায় কোন পাঠক লিখিয়া পাঠান, বায়ুর রিফ্রাক্‌শন্ বশতই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। তৎসম্বন্ধে প্রক্টর ও র‍্যানিয়ার্ড সাহেবের রচিত "ওল্‌ড্ অ্যাণ্ড্ নিউ অ্যাস্‌ট্রনমি" নামক গ্রন্থে যাহা কথিত হইয়াছে আমরা তাহার সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

"প্রক্টর সাহেব দেখাইয়াছেন, বায়ুর রিফ্রাক্‌শন্ বশতঃ সূর্য্যের দৃশ্যমান পরিধি লম্বভাগে কমিয়া যায় অথচ পার্শ্বের দিকে বাড়ে না। এমন কি, চন্দ্রের পরিধি লম্বভাগে এবং পার্শ্বভাগে উভয়তই কমিয়া যায়।"

কি কি কারণবশতঃ এরূপ ঘটে তাহার বিস্তারিত বিবরণ অনেক পাঠকের নিকট জটিল ও বিরক্তিজনক হইবে জানিয়া আমরা বিবৃত করিতে ক্ষান্ত হইলাম। ইচ্ছা করিলে পাঠকগণ আমাদের বর্ত্তমান অবলম্বনীয় গ্রন্থের ২৪৭ পৃষ্ঠা পাঠ করিলে সমস্ত জানিতে পারিবেন।

যাহা হৌক্, বায়ুর রিফ্র্যাক্‌শনে চন্দ্রসূর্য্যমণ্ডল ছোট দেখিতে হয়—তবে তাহাদিগকে বড় বলিয়া ভ্রম হয় কেন?

প্রক্টর সাহেব বলেন, আকাশ আমাদের চক্ষে একটি গোলাকার মণ্ডপরূপে দেখা দেয়। আমাদের মাথার উপরে এই মণ্ডপ যতটা দূর মনে হয়, নিম্নে দিগন্তের দিকে ইহার সীমা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী দূরবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। তাহার কারণ, সাধারণতঃ আকাশের উচ্চতা পরিমাপের সামগ্রী বড় বেশি নাই, কিন্তু যখন দেখি, বাড়ি ঘর, লোকালয়, শস্যক্ষেত নদী অরণ্য পর্ব্বত অতিক্রম করিয়াও আকাশ দিগন্তে মিশিয়াছে তখন সেই দিকে তাহার দূরত্ব নির্দ্দেশ করিবার অনেকগুলি পদার্থ পাওয়া যায়। এইরূপে চিরাভ্যাসক্রমে অজ্ঞানতঃ দিগন্তবর্ত্তী আকাশকে ঊর্দ্ধাকাশের অপেক্ষা আমরা অনেক দূরস্থ বলিয়া মনে করি।

অতএব চন্দ্র সূর্য্যকে যখন উদয়াস্তকালে দিগন্তসংলগ্ন দেখি তখন উক্ত সংস্কারবশতঃ তাহাকে অপেক্ষাকৃত বহুদূরবর্ত্তী বলিয়া জ্ঞান হয়; এইজন্য, চক্ষে তাহার পরিধি যতটা দেখা যায় মনে মনে তদপেক্ষা তাহাকে বড় করিয়া লই।

ইহার অনুকূলে একটি পরীক্ষাসিদ্ধ প্রমাণ আছে। শাদা কাগজে খুব বড় একটি কালো অক্ষর আঁকিয়া তাহার প্রতি অনেকক্ষণ চাহিয়া থাক। অবশেষে চাহিয়া চাহিয়া চক্ষু যখন পরিশ্রান্ত হইয়া যাইবে, তখন অক্ষর হইতে চোখ তুলিয়া লইয়া যদি সেই কাগজের শাদা অংশে দৃষ্টিপাত কর, তবে সেখানেও সেই অক্ষরের অনুরূপ একটা শাদা অক্ষর দেখিতে পাইবে। কারণ, বহুক্ষণ চাহিয়া থাকায় চক্ষুতারকায় উক্ত অক্ষর মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই অক্ষরের দিকে দীর্ঘকাল চাহিয়া যদি সহসা

দূরের দেয়ালের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ কর, তবে অতিশয় বৃহদাকারের একটা অক্ষর দেখিতে পাইবে। অথচ প্রকৃতপক্ষে কাগজে লিখিত অক্ষরের অপেক্ষা তাহা কখনই বৃহৎ নহে, কারণ, ঠিক সেই অক্ষরটিই চক্ষুতারকায় অঙ্কিত হইয়াছে। কিন্তু দেয়ালের দূরত্বের সহিত গুণ করিয়া লইয়া আমরা চিরসংস্কার অনুসারে তাহাকে মনে মনে বাড়াইয়া লই।

অনেক সময় কুয়াশার ভিতর দিয়া চন্দ্র সূর্য্যকে ঐ একই কারণে, তাহার যথার্থ দৃশ্যমান আয়তনের অপেক্ষা বড় বলিয়া মনে হয়। কারণ, দূরের জিনিষ ঝাপ্‌সা হয়, এইজন্য, ঝাপসা জিনিষকে বেশি দূরের বলিয়া ভ্রম হয়। যত বেশি দূর মনে হইবে, আয়তনও তদনুসারে বৃহত্তর বলিয়া প্রতিভাত হইবে। লেখক বলেন, অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কুয়াশার ভিতর দিয়া একটা জাহাজ বিসদৃশ বৃহৎ দেখায়, কিন্তু উপযুক্ত যন্ত্রের দ্বারা তুলনা করিয়া পরিমাপ করিলে দেখা যায়, কুয়াশামুক্ত অবস্থার সহিত তাহার আয়তনের কিছুমাত্র ইতর বিশেষ নাই।

যথারীতি পরিমাপের দ্বারা দিগন্তবিলম্বী চন্দ্র নভ্যাকাশগত চন্দ্রের অপেক্ষা কিছুমাত্র বড় প্রমাণ হয় নাই।

সশস্ত্র য়ুরোপ।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দের নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের পর প্রায় পঁচিশ বৎসর কাল য়ুরোপে তেমন যুদ্ধবিগ্রহের কথা আর বড় শুনা যায় না। ত্রিশ সালে সমস্ত য়ুরোপের উপর দিয়া যে মহা বিপ্লবের ঝটিকা বহিয়া যায় তাহাতে অনেক বড় বড় সিংহাসন এবং বহুদিনের প্রাচীন প্রবলপ্রতাপ কম্পান্বিত হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু

রীতিমত গুরুতর কোনও যুদ্ধাদি ঘটে নাই। বেলজিয়াম হলাণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইল, কিন্তু এত বড় একটা গুরুতর ব্যাপার সমাধা করিতে এক বিন্দু রক্তপাত আবশ্যক হইল না; কাগজে কলমেই নির্ব্বিবাদে লাপোষে মীমাংসা হইয়া গেল। লোকে মনে করিল, এতদিনে রাজপুরুষদিগের চৈতন্য উদয় হইয়াছে—এবার অবধি তবে বুঝি শস্ত্রের ব্যবহার বন্ধ হইয়া যায়।

একান্ন সালের হাইড্ পার্কের প্রদর্শনীতে শান্তির এক মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল। শান্তি ভিন্ন লোকের মুখে আর কথা নাই।

কিন্তু এ শান্তির প্রতিষ্ঠা কেবলি বালির বাঁধ। প্রদর্শনী শেষ হইয়া গেল, তাহার পর এই কয় বৎসরে য়ুরোপের রঙ্গ-ভূমিতে আটটি মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে। লেং সাহেব তাহার কর্দ্দ দিয়াছেন।

(১) ক্রিমীয় সমর; একদিকে রুষিয়া, অন্যদিকে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, তুরস্ক।

(২) ইতালীয় সমর; একদিকে ইতালী, অন্যদিকে অষ্ট্রীয়া।

(৩) হঙ্গেরীয় সমর; অষ্ট্রীয়া, রুষিয়া, হঙ্গেরী।

(৪) তৃতীয় ইতালীয় সমর; ফ্রান্স, অষ্ট্রীয়া, ইতালী।

(৫) অষ্ট্রীয়-প্রুস সমর; প্রুসিয়া, অষ্ট্রীয়া, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জর্ম্মণ রাজ্যসমূহ।

(৬) রুষ-তুরস্ক সমর; রুষিয়া এবং তুরস্ক।

(৭) ফ্রাঙ্কো-জর্ম্মণ সমর; জর্ম্মণি এবং ফ্রান্স।

(৮) মার্কিন সমর; মার্কিন যুক্তরাজ্যের উত্তর এবং দক্ষিণ প্রদেশ।*

---

* য়ুরোপীয় রাজনীতির সহিত যোগসূত্রে এখানে ইহার উল্লেখ নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না।

ইহা ভিন্ন, মেক্সিকো, রোম এবং টনকিনে ফ্রান্সের, ডেন্‌মার্কের বিরুদ্ধে প্রুসিয়া ও অষ্ট্রিয়ার, পোলাণ্ড এবং ককেসীয় প্রদেশে রুষিয়ার, ইতালীতে গারিবল্ডির, মেক্সিকো প্রদেশে মার্কিন যুক্তরাজ্যের, এবং আফগানিস্থান, চীন, মিসর, দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজিলণ্ডে ইংলণ্ডের যে কয়েকটি যুদ্ধঘটনা হইয়াছিল, সেগুলিও নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে।

কিন্তু এগুলিকে বাদ দিয়া ধরিলেও য়ুরোপে যে কয়টি কুরুক্ষেত্র ব্যাপার অভিনীত হইয়াছে, তাহা হইতেই দেখা যায় যে, ক্রিমীয় সময়ে প্রথম শান্তিভঙ্গ হইয়া অবধি য়ুরোপের সৈন্যবল ক্রমেই বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে এবং যুদ্ধকার্য্য উত্তরোত্তর গুরুতর, জটিল ও সর্ব্বধ্বংসী হইয়া দাঁড়াইতেছে। পূর্ব্বে ম্যাজেণ্টা ও সল্‌ফেরিনোতে উভয়পক্ষে এক লক্ষের অধিক সৈন্যসমাগম হয় নাই; কিন্তু প্রুস-অষ্ট্রীয় সময়ে উভয় পক্ষের সৈন্যসংখ্যা পাঁচ লক্ষেরও অধিক হইয়াছিল, এবং ফ্রাঙ্কো-প্রুসীয় যুদ্ধে কেবলমাত্র এক পক্ষের সৈন্যসংখ্যাই প্রুস-অষ্ট্রীয় সমরের উভয় পক্ষীয় সৈন্যসংখ্যা ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু এই সকল যুদ্ধের ফলে য়ুরোপে যে অক্ষয় শান্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহা বলা যায় না। ভিন্ন ভিন্ন প্রবলপ্রতাপগণের মধ্যে একটা সশস্ত্র সশঙ্ক সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে মাত্র এবং শস্ত্রগৌরব ও সৈন্যবৃদ্ধি লইয়া রাজায় রাজায় নিয়ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছে। একটা বড়রকম যুদ্ধ বাধিলে এখনই

রুষিয়া	... ...	৫০,০০,০০০
জর্ম্মণি	... ...	৩৫,০০,০০০
ফ্রান্স	... ...	৩০,০০,০০০

অষ্ট্রিয়া	...	...	২০,০০,০০০
ইতালী	...	...	১৫,০০,০০০

সৈন্য সমরক্ষেত্রে উপস্থিত করিতে পারে।

তথাপি নিবৃত্তি নাই। আরও সৈন্য চাহি। ট্যাক্সের উপর ট্যাক্স যোগাইয়া দেশ নির্ধন হইয়া যাইতেছে, ঋণভারে লোকের জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু কামান গোলাগুলি এবং লাল-কুর্ত্তিতে কিছুতেই কূল পাইতেছে না। জলে স্থলে, এমন কি, আকাশে পর্য্যন্ত এই অবিশ্রান্ত রণসজ্জা চলিয়াছে।

এমন সম্ভাবনাও নাহি যে, কেহ সহসা আপন সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করিবে। ফ্রান্স না পথপ্রদর্শন করিলে প্রুসিয়া অথবা ইতালীর পক্ষে এ বিষয়ে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। কারণ, ফ্রান্সের প্রতাপ অধিক হইলে এই উভয় দেশেরই স্বল্পদিনলব্ধ রাজনৈতিক একতা অক্ষুণ্ণ থাকা অসম্ভব। ফ্রান্সও আলসেস্ লোরেন প্রদেশের সহিত তাহার লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের আশা একেবারে না পরিত্যাগ করিলে সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করিতে পারে না। এদিকে অষ্ট্রিয়া রুষিয়ার সৈন্যবল উপেক্ষা করিয়া আপন বিপদ ডাকিয়া আনিবে না। এবং রুষিয়াও তাহার গ্রীক চার্চ্চের উপর প্রভুত্ব এবং তুরস্ক সাম্রাজ্যের পতনের সহিত কনষ্টাণ্টিনোপলে আধিপত্য বিস্তারের আশা ছাড়িয়া পঞ্চাশ লক্ষকে পাঁচ লক্ষে পরিণত করিবে না।

কনষ্টাণ্টিনোপল রুষিয়ার খিড়কি-দ্বার। এবং সমস্ত য়ুরোপীয় গোলযোগের শেষ মীমাংসা ঐখানে। সেখানে যদি কোনও প্রবলপরাক্রম বিদেশী ঘাটি বাঁধিয়া বসে, কৃষ্ণসাগরের রুষীয় রণতরীর নির্গমনপথ একেবারে বন্ধ হইয়া যায় এবং রুষিয়ার পোতবল সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। কনষ্টাণ্টিনোপল শত্রুহস্তগত হইলে

রুষীয় বাণিজ্যেরও বিশেষ ক্ষতি—কারণ, তাহাকে পরের অনুগ্রহের উপর একান্ত নির্ভর করিতে হইবে। সুতরাং কনষ্টাণ্টিনোপলে আপন অধিকার দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করিতে রুষিয়া শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা করিবে।

এবং ইহার জন্যই ফ্রান্সের সহিতও তাহার কতকটা সদ্ভাব থাকার প্রয়োজন। (১) প্রতিবেশী অষ্ট্রিয়া কিছুতেই রুষিয়াকে অতিরিক্ত মাত্রায় বাড়িতে দিতে পারে না। অষ্ট্রীয় সম্রাটের অধীনে অনেকগুলি জাতির বাস—কতক টুটনিক, কতক স্লাভ এবং অন্যান্য। বিশেষতঃ ইহাদের মধ্যে গ্রীক-চার্চ্চভুক্ত লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। অষ্ট্রিয়ার প্রতাপ ক্ষুণ্ণ হইলে এই সকল গ্রীক-চার্চ্চীয়েরা অবিলম্বে রুষিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিবে। সুতরাং কনষ্টাণ্টিনোপলে রুষিয়াকে প্রাধান্য লাভ করিতে অষ্ট্রিয়া কিছুতেই দিতে পারে না। কারণ, সেখানে সম্যক্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে ভিয়েনা পর্য্যন্ত রুষিয়ার প্রায় অপ্রতিহত প্রভাব। (২) জর্ম্মণিও অষ্ট্রিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিবে। একত অষ্ট্রীয়দিগের সহিত জর্ম্মাণদিগের কতকটা জাতিগত ঐক্য আছে, দ্বিতীয়তঃ, কনষ্টাণ্টিনোপলে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে রুষীয় রণতরীর প্রতাপে য়ুরোপ অস্থির হইয়া উঠিবে। কনষ্টাণ্টিনোপল দখলে রাখিতে পারিলে রুষিয়ার পক্ষে জর্ম্মণি আক্রমণেরও অনেকটা সুবিধা হয়। বিশেষতঃ ফ্রান্স যখন জর্ম্মণির অধঃপতন সাধন করিবার জন্য সর্ব্বদাই উন্মুখ হইয়া আছে। (৩) ইংলণ্ড এবং ইতালী কিছুতেই ডার্ডেনালিসে রুষীয় বৈজয়ন্তীর প্রতিষ্ঠা হইতে দিবে না। কারণ, তাহা হইলে ভূমধ্যসাগরে রুষিয়ার একাধিপত্যে বাধা দেওয়া অসম্ভব। কৃষ্ণসাগরের দুর্ভেদ্য আশ্রয় হইতে বাহির হইয়া, রুষীয় রণতরী অন্যের বাণিজ্য-তরী

আক্রমণ করিবে এবং অন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে ডার্ডেনালিসের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সম্পূর্ণ নিরাপদ হইবে। কনষ্টাণ্টিনোপল্ রুষিয়াকে ছাড়িয়া দিলে য়ুরোপের প্রধান জলদুর্গ তাহার আয়ত্ত হইল। সে এখন ভাণ্ডার বাষ আছে, ক্রমে জলেরও কুম্ভীর হইয়া উঠিবে।—সুতরাং প্রায় সমগ্র য়ুরোপই রুষিয়াকে ডার্ডেনালিসে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে দিবে না। এতগুলা জাতির বিপক্ষে রুষিয়ার কিছু করিয়া উঠাও কঠিন। তাই ফ্রান্সের সহিত রুষিয়ার সদ্ভাব রাখিতে হয়। ফ্রান্স আবশ্যক হইলে স্থলে জর্ম্মণিকে কিম্বা জলে ইংলণ্ডকে কতকটা ব্যস্ত করিয়া তুলিতে পারে।

য়ুরোপে ইংলণ্ডের বাস্তবিক প্রবল শত্রু ফ্রান্স। ফ্রান্সের প্রায় তিনদিকে সমুদ্র, এইজন্য, জলে তাহার প্রভাব নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। বিশেষতঃ আজকাল যখন সকল জাতিরই ভাল ভাল রণতরীর অভাব নাই, তখন কেবলমাত্র পূর্ব্বগৌরব-টুকুর উপর নির্ভর করিয়া এমন বলা যায় না যে, একটা রীতিমত যুদ্ধ বাধিলে ইংলণ্ড সহসা ফ্রান্সকে হটাইতে পারে। আর, কোনপ্রকারে ইংলণ্ডকে জলযুদ্ধে একবার পরাস্ত করিতে পারিলেই ফ্রান্স লণ্ডনের দ্বারে গিয়া আঘাত করিবে। এবং অন্যান্য য়ুরোপীয় জাতি হয় ত নানা যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইয়া তখন ইংলণ্ডকে সাহায্য করিতেও পারিবে না।

জলে এই ফ্রান্সের ভয়। এদিকে রুষিয়া ভারতবর্ষে গোল-যোগ বাধাইয়া য়ুরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্র হইতে ইংলণ্ডের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিতে চাহে। য়ুরোপে রুষিয়ার পথে ইংরাজ একটা প্রধান কণ্টক। এই কণ্টককে সরাইতে পারিলে তাহার কা উদ্ধার অনেক সহজ হইয়া আসে। এবং চাই কি, অচিরে

ভূমধ্যসাগরে রুষীয় রণতরী নিরাপদে যথেচ্ছা বিচরণ করিতে পারে।

ইংলণ্ড সেইজন্যই ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্ত লইয়া যেমন ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, য়ুরোপে পোতবল বৃদ্ধি করিবার জন্যও সেইরূপ নানা আয়োজন করিতেছেন।—কেহই নিশ্চিন্ত নাই। সকল জাতিই অহরহ রণসজ্জায় সজ্জিত হইতেছে। বর্ত্তমানে যে শান্তিটুকু রহিয়াছে সে কেবল একটা সশস্ত্র সন্ধিমাত্র; একটু সুবিধা হইলেই চতুর্দ্দিক হইতে অস্ত্রে অস্ত্রে ঝন্‌ঝনা উঠিবে।—

ডায়ারী।

এই যে মধ্যাহ্নকালে নদীর ধারে পাড়াগাঁয়ের একটি একতলা ঘরে বসিয়া আছি; টিক্‌টিকি ঘরের কোণে টিক্‌টিক্ করিতেছে; দেয়ালে পাখা টানিবার ছিদ্রের মধ্যে এক যোড়া চড়ুই পাখী বাসা তৈরি করিবার অভিপ্রায়ে বাহির হইতে কুটা সংগ্রহ করিয়া কিচ্‌মিচ্ শব্দে মহাব্যস্তভাবে ক্রমাগত যাতায়াত করিতেছে; নদীর মধ্যে নৌকা ভাসিয়া চলিয়াছে—উচ্চতটের অন্তরালে নীলাকাশে তাহাদের মাস্তুল এবং স্ফীত পালের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে; বাতাসটি স্নিগ্ধ, আকাশটি পরিষ্কার, পরপারের অতি দূরতীররেখা হইতে আর আমার বারান্দার সম্মুখবর্ত্তী বেড়া-দেওয়া ছোট বাগানটি পর্য্যন্ত উজ্জ্বল রৌদ্রে একখণ্ড ছবির মত দেখাইতেছে;—এইত বেশ আছি; মায়ের কোলের মধ্যে সন্তান যেমন একটি উত্তাপ, একটি আরাম, একটি স্নেহ পায়, তেমনি এই পুরাতন প্রকৃতির কোল ঘেঁষিয়া বসিয়া একটি জীবনপূর্ণ আদর-

পূর্ণ মৃদু উত্তাপ চতুর্দ্দিক হইতে আমার সর্ব্বাঙ্গে প্রবেশ করিতেছে। তবে এই ভাবে থাকিয়া গেলে ক্ষতি কি? কাগজ কলম লইয়া বসিবার জন্য কে তোমাকে খোঁচাইতেছিল? কোন বিষয়ে তোমার কি মত, কিসে তোমার সম্মতি বা অসম্মতি সে কথা লইয়া হঠাৎ ধুমধাম করিয়া কোমর বাঁধিয়া বসিবার কি দরকার ছিল? ঐ দেখ, মাঠের মাঝখানে, কোথাও কিছু নাই, একটা ঘূর্ণা বাতাস খানিকটা ধূলা এবং শুক্‌নো পাতার গুড়না উড়াইয়া কেমন চমৎকার ভাবে ঘুরিয়া নাচিয়া গেল! পদাঙ্গুলিমাত্রের উপর ভর করিয়া দীর্ঘ সরল হইয়া কেমন ভঙ্গীটি করিয়া মুহূর্ত্ত কাল দাঁড়াইল, তাহার পর হুস্‌হাস্ করিয়া সমস্ত উড়াইয়া ছড়াইয়া দিয়া কোথায় চলিয়া গেল তাহার ঠিকানা নাই। সম্বল ত ভারি! গোটাকতক খড়কুটা ধূলাবালি সুবিধামত যাহা হাতের কাছে আসে তাহাই লইয়া বেশ একটু ভাবভঙ্গী করিয়া কেমন একটি খেলা খেলিয়া লইল! এমনি করিয়া জনহীন মধ্যাহ্নে সমস্ত মাঠময় নাচিয়া নাচিয়া বেড়ায়! না আছে তাহার কোন উদ্দেশ্য, না আছে তাহার কেহ দর্শক! না আছে তাহার মত, না আছে তাহার তত্ত্ব, না আছে সমাজ এবং ইতিহাস সম্বন্ধে অতি সমীচীন উপদেশ! পৃথিবীতে যাহা কিছু সর্ব্বাপেক্ষা অনাবশ্যক, সেই সমস্ত বিস্মৃত পরিত্যক্ত পদার্থগুলির মধ্যে একটি উত্তপ্ত ফুৎকার দিয়া তাহাদিগকে মুহূর্ত্তকালের জন্য জীবিত জাগ্রত সুন্দর করিয়া তোলে!

অমনি যদি অত্যন্ত সহজে এক নিঃশ্বাসে কতকগুলা যাহা-তাহা খাড়া করিয়া সুন্দর করিয়া ঘুরাইয়া উড়াইয়া লাঠিম খেলাইয়া চলিয়া যাইতে পারিতাম! অমনি অবলীলাক্রমে সৃজন করিতাম, অমনি ফুঁ দিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতাম! চিন্তা নাই, চেষ্টা নাই, লক্ষ্য

নাই ; শুধু একটা নৃত্যের আনন্দ, শুধু একটা সৌন্দর্য্যের আবেগ, শুধু একটা জীবনের ঘূর্ণা! অবারিত প্রান্তর, অনাবৃত আকাশ, পরিব্যাপ্ত সূর্য্যালোক,—তাহারই মাঝখানে মুঠা মুঠা ধূলি লইয়া ইন্দ্রজাল নির্ম্মাণ করা, সে কেবল ক্ষ্যাপা-হৃদয়ের উদার উল্লাসে।

এ হইলে ত বুঝা যায়। কিন্তু বসিয়া বসিয়া পাথরের উপর পাথর চাপাইয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া কতকগুলা নিশ্চল মতামত উচ্চ করিয়া তোলা! তাহার মধ্যে না আছে গতি, না আছে প্রীতি, না আছে প্রাণ! কেবল একটা কঠিন কীর্ত্তি। তাহাকে কেহ বা হাঁ করিয়া দেখে, কেহ বা পা দিয়া ঠেলে—যোগ্যতা যেমনি থাক্!

কিন্তু ইচ্ছা করিলেও একাজে ক্ষান্ত হইতে পারি কই? সভ্যতার খাতিরে মানুষ মন নামক আপনার এক অংশকে অপরিমিত প্রশ্রয় দিয়া অত্যন্ত বাড়াইয়া তুলিয়াছে, এখন, তুমি যদি তাহাকে ছাড়িতে চাও সে তোমাকে ছাড়ে না।

লিখিতে লিখিতে আমি বাহিরে চাহিয়া দেখিতেছি ঐ একটি লোক রৌদ্র নিবারণের জন্য মাথায় একটি চাদর চাপাইয়া দক্ষিণ হস্তে শালপাতের ঠোঙায় খানিকটা দহি লইয়া রন্ধনশালা অভিমুখে চলিয়াছে। ওটি আমার ভৃত্য, নাম, নারায়ণ সিং। দিব্য হৃষ্টপুষ্ট, নিশ্চিন্ত, প্রফুল্লচিত্ত। উপযুক্ত সারপ্রাপ্ত পর্য্যাপ্ত-পল্লবপূর্ণ মসৃণ চিকণ কাঁঠাল-গাছটির মত। এইরূপ মানুষ, এই বহিঃপ্রকৃতির সহিত ঠিক মিশ খায়। প্রকৃতি এবং ইহার মাঝখানে বড় একটা বিচ্ছেদচিহ্ন নাই। এই জীবধাত্রী শস্যশালিনী বৃহৎ বসুন্ধরার অঙ্গসংলগ্ন হইয়া এ লোকটি বেশ সহজে বাস করিতেছে, ইহার নিজের মধ্যে নিজের তিলমাত্র বিরোধ বিসম্বাদ নাই। ঐ গাছটি যেমন শিকড় হইতে পল্লবাগ্র পর্য্যন্ত কেবল একটি আস্তাগাছ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার আর কিছুর জন্য কোন

মাথাব্যথা নাই, আমার হৃষ্টপুষ্ট নারায়ণ সিংটি তেমনি আদ্যোপান্ত কেবলমাত্র একখানি আস্ত নারায়ণ সিং।

কোন কৌতুকপ্রিয় শিশু-দেবতা যদি দুষ্টামি করিয়া ঐ আতা-গাছটির মাঝখানে কেবল একটি ফোঁটা মন ফেলিয়া দেয়! তবে ঐ নরম শ্যামল দারু-জীবনের মধ্যে কি এক বিষম উপদ্রব বাধিয়া যায়! তবে চিন্তায় উহার চিকণ সবুজ পাতাগুলি ভূর্জ্জপত্রের মত পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যায়, এবং গুঁড়ি হইতে প্রশাখা পর্য্যন্ত বৃদ্ধের ললাটের মত কুঞ্চিত হইয়া আসে। তখন বসন্তকালে আর কি অমন দুই চারিদিনের মধ্যে সর্ব্বাঙ্গ কচিপাতায় পুলকিত হইয়া উঠে, ঐ গুটি-আঁকা গোল গোল গুচ্ছ গুচ্ছ ফলে প্রত্যেক শাখা ভরিয়া যায়! তখন সমস্ত দিন একপায়ের উপর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে থাকে আমার কেবল কতকগুলা পাতা হইল কেন, পাখা হইল না কেন? প্রাণপণে সিধা হইয়া এত উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়া আছি, তবু কেন যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাইতেছি না? ঐ দিগন্তের পরপারে কি আছে? ঐ আকাশের তারাগুলি যে গাছের শাখায় ফুটিয়া আছে সে গাছে কেমন করিয়া নাগাল পাইব? আমি কোথা হইতে আসিলাম, কোথায় যাইব, এ কথা যতক্ষণ না স্থির হইবে ততক্ষণ আমি পাতা ঝরাইয়া, ডাল শুকাইয়া কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া ধ্যান করিতে থাকিব। আমি আছি অথবা আমি নাই, অথবা আমি আছিও বটে নাইও বটে, এ প্রশ্নের যতক্ষণ মীমাংসা না হয় ততক্ষণ আমার জীবনে কোন সুখ নাই। দীর্ঘ বর্ষার পর যে দিন প্রাতঃকালে প্রথম সূর্য্য উঠে, সে দিন আমার মজ্জার মধ্যে যে একটি পুলক সঞ্চার হয় সেটা আমি ঠিক কেমন করিয়া প্রকাশ করিব, এবং শীতান্তে ফাল্গুনের মাঝামাঝি যে দিন হঠাৎ সায়ংকালে একটা দক্ষিণের

বাতাস উঠে, সে দিন ইচ্ছা করে—কি ইচ্ছা করে কে আমাকে বুঝাইয়া দিবে!

এই সমস্ত কাণ্ড! গেল বেচারার ফুল ফোটানো, রসশস্য-পূর্ণ আতাফল পাকানো! যাহা আছে তাহা অপেক্ষা বেশি হইবার চেষ্টা করিয়া, যে রকম আছে আর একরকম হইবার ইচ্ছা করিয়া, না হয় এদিক, না হয় ওদিক। অবশেষে একদিন হঠাৎ অন্তর্বেদনায় গুঁড়ি হইতে অগ্রশাখা পর্য্যন্ত বিদীর্ণ হইয়া বাহির হয়, একটা সাময়িক পত্রের প্রবন্ধ, একটা সমালোচনা, আরণ্যসমাজ সম্বন্ধে একটা অসাময়িক উপদেশ। তাহার মধ্যে না থাকে সেই পল্লবমর্ম্মর, না থাকে সেই ছায়া, না থাকে সর্ব্বাঙ্গব্যাপ্ত সরস সম্পূর্ণতা।

যদি কোন প্রবল সয়তান সরীসৃপের মত লুকাইয়া গুঁড়ি-মারিয়া মাটির নীচে প্রবেশ করিয়া, শত লক্ষ আঁকাবাঁকা শিকড়ের ভিতর দিয়া পৃথিবীর সমস্ত তরুলতা তৃণগুল্মের মধ্যে অনঃসঞ্চার করিয়া দেয় তাহা হইলে পৃথিবীতে কোথায় জুড়াইবার স্থান থাকে! ভাগ্যে বাগানে আসিয়া পাখীর গানের মধ্যে কোন অর্থ পাওয়া যায় না এবং অক্ষরহীন সবুজ পত্রের পরিবর্ত্তে শাখায় শাখায় শুষ্ক শ্বেতবর্ণ মাসিকপত্র সংবাদপত্র এবং বিজ্ঞাপন ঝুলিতে দেখা যায় না!

ভাগ্যে গাছেদের মধ্যে চিন্তাশীলতা নাই! ভাগ্যে ধুতুরা-গাছ কামিনীগাছকে সমালোচনা করিয়া বলে না, তোমার ফুলের মধ্যে কোমলতা আছে, কিন্তু ওজস্বিতা নাই এবং কুলকল কাঁঠালকে বলে না, তুমি আপনাকে বড় মনে কর কিন্তু আমি তোমা অপেক্ষা কুষ্মাণ্ডকে ঢের উচ্চ আসন দিই। কদলী বলে না, আমি সর্ব্বাপেক্ষা অল্পমূল্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎপত্র প্রচার

করি, এবং কচু তাহার প্রতিযোগিতা করিয়া তদপেক্ষা সুলভ মূল্যে তদপেক্ষা বৃহৎপত্রের আয়োজন করে না!

তর্কতাড়িত চিন্তাতাপিত বক্তৃতাশ্রান্ত মানুষ উহার উন্মুক্ত আকাশের চিন্তা-রেখাহীন জ্যোতির্ময় প্রশস্ত ললাট দেখিয়া, অরণ্যের ভাষাহীন মর্ম্মর ও তরঙ্গের অর্থহীন কলধ্বনি শুনিয়া, এই মনোবিহীন অগাধ প্রশান্ত প্রকৃতির মধ্যে অবগাহন করিয়া ভবে কতকটা স্নিগ্ধ ও সংযত হইয়া আছে। ঐ একটুখানি মনঃক্ষুণ্নিজের দাহ নিবৃত্ত করিবার জন্য এই অনন্তপ্রসারিত জীবনঃ সমুদ্রের প্রশান্ত নীলাম্বুরাশির আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

আসল কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের ভিতরকার সমস্ত সামঞ্জস্য নষ্ট করিয়া আমাদের মনটা অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে কোথাও আর কুলাইয়া উঠিতেছে না। খাইবার, পরিবার, জীবনধারণ করিবার, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবার পক্ষে যতখানি আবশ্যক, মনটা তাহার অপেক্ষা ঢের বেশি বড় হইয়া পড়িয়াছে। এইজন্য, প্রয়োজনীয় সমস্ত কাজ সারিয়া ফেলিয়াও চতুর্দ্দিকে অনেকখানি মন বাকি থাকে। কাজেই সে বসিয়া বসিয়া ডায়ারি লেখে, তর্ক করে, সংবাদপত্রের সংবাদদাতা হয়, যাহাকে সহজে বোঝা যায় তাহাকে কঠিন করিয়া তুলে, যাহাকে এক ভাবে বোঝা উচিত তাহাকে আর একভাবে দাঁড় করায়, যাহা কোন কালে কিছুতেই বোঝা যায় না, অন্য সমস্ত ফেলিয়া তাহা লইয়াই লাগিয়া থাকে, এমন কি, এ সকল অপেক্ষাও অনেক অকৃতর গর্হিত কার্য্য করে।

কিন্তু আমার ঐ অনতিসভ্য নারায়ণ সিংহের মনটি উহার শরীরের মাপে; উহার আবশ্যকের গায়ে গায়ে ঠিক ফিট্ করিয়া লাগিয়া আছে। উহার মনটি উহার জীবনকে শীতাতপ, অসুখ

স্বাস্থ্য এবং লজ্জা হইতে রক্ষা করে কিন্তু যখন-তখন উনপঞ্চাশ বায়ুবেগে চতুর্দ্দিকে উড়ু উড়ু করে না। এক আধটা বোতামের ছিদ্র দিয়া বাহিরের চোরা-হাওয়া উহার মানস আবরণের ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে যে কখনও একটু-আধটু স্ফীত করিয়া তোলে না তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু ততটুকু মনশ্চাঞ্চল্য তাহার জীবনের স্বাস্থ্যের পক্ষেই বিশেষ আবশ্যক।

কিন্তু যখন খাওয়া-পরা, শোওয়া বসা, চলাফেরা সমস্তই বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের দ্বারা সম্পন্ন হইবে তখন দুর্দ্দান্ত মনটি লইয়া মানুষ কি করিবে?

তখন বোধ করি চালডালের বাজার উঠিয়া গিয়া হাটে একমাত্র রব উঠিবে, "ওগো কে আমার মন নেবে গো?" "ওগো কে তোমরা মন দেবে গো?" এবং মুন্সেফী-আদালতে হৃদয়ের অধিকার লইয়া বিচার চলিবে—কিন্তু হায়, ক্ষতিপূরণ কি করিয়া আদায় হইবে?

আর একটা হইবে! তখন অনেক লেখক উঠিবে, এমন কি, প্রায় সকলেই লিখিবে! অতএব প্রার্থনা করি, সেই মহাদুর্দ্দিনের বহুপূর্ব্বেই আমার এই ডায়ারি শেষ করিয়া দেন এই মুদ্রাযন্ত্র-বিহীন নীরব নিস্তব্ধ স্নিগ্ধ শীতল মৃত্তিকার সহিত মিশিয়া আমার এই চিন্তাজ্বরাতুর মনোভারাক্রান্ত দেহখানি চিরবিশ্রাম লাভ করে! ইতি।

স্বরলিপি।

ভারতের জয়।

খাম্বাজ—তাল ফের্‌তা।

মিলে সবে ভারত-সন্তান, একতান মন প্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান।
ভারতভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান,
কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী,
শতখনি রত্নের নিধান।
হোক্ ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়।
কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়॥

রূপবতী সাধ্বীসতী ভারত-ললনা,
কোথা দিবে তাদের তুলনা?
খর্ম্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী পতিব্রতা,
অতুলনা ভারত-ললনা।
হোক্ ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়।
কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়॥

বশিষ্ঠ গৌতম অত্রি মহামুনিগণ
বিশ্বামিত্র ভৃগু তপোধন
বাল্মীকি বেদব্যাস ভবভূতি কালিদাস
কবিকুল ভারতভূষণ।
হোক্ ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়।
কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়॥

ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জুন নাহি কি স্মরণ ?
আর যত মহাবীরগণ ?
ভারতের ছিল সেতু, রিপুদল ধূমকেতু,
আর্ত্তবন্ধু, দুষ্টের দমন।
হোক্ ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়।
কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়।

কেন ডর ভীরু, কর সাহস আশ্রয়,
"যতোধর্ম্মস্ততোজয়"।
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়।
হোক্ ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়।
কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়।

৪।৩

। ঞা -ন্ ঝাঃ মঃ। গমপা -মা -গরা -গা। মমা পা -ধপ্পা মা।
। মি — লে স । বে — — —। ভা র ত — স ।

। পা -ন্ -ন্ -ন্। মা মা গাঃ গঃ। গমপা -মা গাঃ -রঃ।
। ন্তা — — ন্। এ -ক তান্ ম । ন — — প্রা —।

। -সা -ন্ -ঃ সঃ। মা গমা ঞধা -পধঞর্সা। না র্সা -ন্ -ন্।
। — — খ্ গা। ও ভা র — । ভে ন্ — —।

। না -ন্ র্সাঃ -ঞধঃ। ধঞর্সা -ঞর্সঞা ন্নাঃ ঋঃ।
। ব — শো — । গা — ন্ — স ।

। গমপা -মা -গরা -গা। মমা পা -ধপা মা। পা -ন্ -ন্ ।
। বে — — —। ভা র ত — স। ন্তা — — ন।

৩।
। সা -। মা। গা -। গা। মা -। মা। পা -। পা।
। ভা— র। ত ভূ। মি র। ভু —ল্য।

। ঞা -। ধা। পা -মা -গা। মা -। -। -। -। ।
। আ — ছে। কো — ন। স্থা —। ন্ ।

। র্সা -। র্সা। র্সা -ঞা -ধা। ঞা -। ঞা। ঞা -ধা -পা।
। কো—ন। অ — ত্রি। কো — ন। অ — ত্রি।

। ধা -। পা। ধা -। গা। মা -। -। -। -। ।। মা -। মা।
। হি — মা। ত্রি ন। মা —। ন্ ।ক — ল।

। ধা -। ঞা। র্সা -। না। র্সা -। র্সা। র্গা -। র্গা।
। ব — তী। ব — সু। ম — তী। শ্রো — ত।

। র্গা -র্সা -র্গা। র্রা -। র্সা। ঞা -। ধা। মা -। মা।
। খ — তী। পু — ণ্য। ব — তী। শ — ত।

। পা -। ধা। পা -। মা। গা -। গা। সা -। সা।
। থ — নি। শ — ত। থ — নি। র — ত্নে।

। গা -। গা। মা -। -। -। -। ।। গা -। গা।
। র — নি। ধা —। ন্ ।শ — ত।

। গা -। গা। গা -র্সা -র্রা। র্সা -। র্সা। ধা -ঞধা -পা।
। থ — নি। শ — ত। থ — নি। র — ত্নে।

৪।৩
। মা -। গা। মা -। -। -। -। ।। মা পা মা গরগা।
। ব নি। ধা —। ন্ ।ভা র তে র ।

৩।১
। জয় -। -। সা। মা -। মা। মা -। মা। মা -। -।
। জয় —হোক্। ভা — র। তে — র। জয়

। মা -ন -ন। পা -ন পা। পা -ন গা। পা -ন -ন।
। গাও । ভা — র। তে — র। জ — য়।

। পা -ন -ন। ধা -ন ধা। ধা -ন ধা। ধা -ন -ন।
। জ — য়। ভা — র। তে — র। জ — য়।

। -ন -ন মা। না -ন -ন। -ন -ন র্সা। র্সা -ন -ন।
। — — কি। ভ — য়। — — কি। ভ — য়।

। র্সা -ন -ন। ধা -ন -ন। পা -ন -ন। মা -ন -ন।
। গাও — — । ভা — — । র — — । তে — — ।

। গা -রা -গা। মা -ন -ন। -ন -ন -ন। -ন -ন -ন॥
। র — — । জ — — । — — — । — য় ॥

৪।৩
। মমা মঞ্ঞা -মপধাঃ নঃ। র্সঃ -নর্রঃ র্সনা র্সা -ন।
। রূপ বতী — সা। ধ্বী — ন তী — ।

। গমা পধা ধঞ্ঞা -ধঞ্ঞর্সা। -ঞ্ঞর্সঞ্ঞা ধপাঃ -ধঃ পমা।
। ভার ত ল ননা — । — কোথা — দি।

। মা -গরগা মমা পধা। পমা পা -ন মমা।
। বে — তাদে র। তুল না র্পর্সি।

। ঞ্ঞা -ধঞ্ঞধপা -ধা ননা। র্সঃ -নর্রঃ র্সনা র্সাঃ নঃ।
। ষ্ঠী — — সাবি। ত্রী — সী তা দ।

। নর্সর্রা র্সর্রা -র্সনাঃ নঃ। র্সনর্রর্সা -ঞ্ঞর্সঞ্ঞা ধাঃঙ্ঘধ্ঃ।
। ম য়ন্তী — প। তি র তা — ।

। পর্সা নর্সা -ন ননা। র্সঃ র্সর্সঃ নর্রর্সঞ্ঞা -ধা -ন।
। অতু লনা ভার। ত ল না — —।

৩।৮
। মা পা মা গরগা। মা -ন -ন সা। মা -ন -মা।
। ভা র তে র। জ — য় হোক্। ভা — র।

৪।৩
। মা ণ মা। মা -ণ -ণ। ইত্যাদি॥ র্সাঃ ঞধপঃ মর্সাঃ ঞধঃ।
। তে — র। জয় । ইত্যাদি॥ কে নডর ভীরু ডুকর।

। পমগা গমা মা -ণ। মমা -ণ পা গা। ধা না র্সা -ণ।
। সাহস আ শ্রয় । যতো— ধ র্ম্ম। স্ত তো জয়।

। মমা ঞঃধপঃ -ধা ননা। র্সঃ -নর্রঃ র্সনা র্সাঃ নঃ।
। ছিন্ন ভি — ন্নহী। ন — ব ল ঐ।

। নর্সর্রাঃ র্সঃ র্রর্সা -ননা। র্সনর্রর্সা -ঞর্স ঞা ধা -ণ।
। ক্যে তে পা ই। বে ব ল ।

। ঞা ধপা মগা মা। ঞধপধা -নর্সনা র্সা -ণ।
। মা য়ের মু— খ। উ জ্জ ল ।

। র্গা র্গা র্মা র্গর্মর্পা। র্মা -ণ -ণ -ণ। মা পধা মা গরগা।
। ক রি তে কি । ভয় — — —। ভা র ভে র ।

৩।১
। মা -ণ -ণ সা। মা -ণ মা। মা -ণ র্মা।
। জয় — —হোক্। ভা — র। তে র।

। মা -ণ -ণ। ইত্যাদি॥
। জয় । ইত্যাদি॥

ব্যাখ্যা।

১। "মিলে সবে ভারত সন্তান" ইহার আরম্ভে যুগলছেদ নাই, কারণ, এই গানে আস্থায়ীর গোড়ায় ফিরিয়া যাইতে হইবে না।

২। "ভারতের জয় হোক্ ভারতের জয়, গাও ভারতের জয়, কি ভয়, কি

জয়, গাও ভারতের জয়" ইহাই এই গানের ধুয়া—ইহা প্রতিবার পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে। প্রথম বারে, ধুয়াটির শেষ পর্য্যন্ত স্বরলিপি দেওয়া হইয়াছে—তাহার পর, যতবার ধুয়া আসিয়াছে, "হোক্ ভারতের জয়" পর্য্যন্ত স্বরলিপি দিয়া ইত্যাদি বলা হইয়াছে। অতএব, প্রতিবার পূর্ব্বের স্বরলিপি দেখিয়া ধুয়াটি শেষ করিতে হইবে। এই ধুয়াটি সকলে সমস্বরে গাইলে ভাল শুনায়।

৩। অর্দ্ধমাত্রার চিহ্ন বিসর্গ ঃ।

৪। কোমল ন=ঞ।

৫। এই গানের কোন অংশ বিলম্বিত ও কোন অংশ দ্রুত লয়ে গাইতে হইবে। সেই সেই অংশের গোড়ায় ভালাঙ্ক দেওয়া হইয়াছে।

৬। এই গানের অন্যান্য চরণ "রূপবতী মাতৃভূমি সতী" ইত্যাদি সুরের অনুরূপ।

ইক্ষু।

(কৃষিকথা।)

চাউলের পর দালের কথাই হিসাবমত লিখিতে হয়, কিন্তু আমরা তাহা না লিখিয়া অগ্রে ইক্ষুচাষের বিবরণ লিখিতেছি, কারণ, ইক্ষুচাষে প্রায় ধান্যের চাষের ন্যায় পরিশ্রম যত্ন ও সময়-ক্ষেপ করিতে হয়।

আখ কয়েক শ্রেণীর আছে, তন্মধ্যে বোম্বাই, কাজলা, পুরী ও শ্যামসারা এই কয়টিই প্রধান। বোম্বাই-আখ খুব বড় হয়। ইহার ছাল খুব কঠিন, রস খুব মিষ্ট, কিন্তু ইহাতে বড় পোকা ধরে। সেইজন্য, আমাদের দেশ হইতে এই আখের আবাদ ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে। কাজলা-আখ বড় কঠিন, এবং তাদৃশ রসাল নহে। পুরী-আখ নরম, কিন্তু খুব মোটা হয় না এবং রস কম। শ্যামসারা খুব উৎকৃষ্ট আখ। ইহার আকৃতি

যেমন বৃহৎ, ইহাতে রসও প্রচুর পরিমাণে থাকে এবং ইহা এত নরম যে চিবাইয়া খাইতে কোন কষ্ট হয় না। তাহা ছাড়া বর্ষা একটু চাপিয়া হইলে তদ্দ্বারা অন্যান্য আখের যেরূপ অনিষ্ট হয়, এই আখের সেরূপ অনিষ্ট হয় না। এই সব কারণে, এদেশে এই আখের চাষ খুব বাড়িতেছে।

আখের জমী একটু ডাঙ্গামত হইলেই ভাল। জোল, অর্থাৎ খাল-জমীতে, ভাল আখ জন্মে না। তাহা ছাড়া, আর সকল-প্রকার জমীতেই উত্তম আখ হইয়া থাকে। এই জমী কোন পুষ্করিণী, বিল বা নদীর সমীপবর্ত্তী হওয়া আবশ্যক। কারণ, আখের জমীতে অনেক সময় জল সেচিতে হয়। যে জমীর মৃত্তিকায় বালুর অংশ বেশী, তাহাতে ভাল আখ জন্মে, বাস্তু বা ভিটা জমীতে বেশ আখ হয়।

প্রথমতঃ, আখের জমীর মৃত্তিকা বেশ উত্তমরূপ চষিতে ও মই দিয়া গুঁড়া করিতে হয়। মৃত্তিকা ধূলিবৎ গুঁড়া হওয়া আবশ্যক। এই কার্য্য চৈত্র মাসের শেষে বা বৈশাখের প্রথমে করা উচিত। তদনন্তর জমীখানি একগাছি দড়ি দিয়া মাপিয়া সমভাবে বিভক্ত করিতে হইবে এবং ঐ এক এক ভাগে এক একটি লাইন টানিতে হইবে। সেই লাইনের ধারে ধারে কোদাল দিয়া এক একটি ড্রেণ বা পয়ঃপ্রণালী কাটিতে হইবে। মধ্যস্থ জমীটা সমান করিয়া তদুপরি "খুরী" বা গর্ত্ত কাটিতে হইবে। সেই "খুরী"র মধ্যে কিছু কিছু খইল নিক্ষেপ করিয়া আখের চারা বসাইয়া একটু জল দিয়া মৃত্তিকা ঢাকা দিতে হইবে। এই-রূপ জল কলসী করিয়া পাঁচ সাত দিন দেওয়ার পর যখন গাছ বেশ লাগিয়া যাইবে, তখন সমুদায় জমীটা একবার সেচিয়া দিবে।

এক্ষণে চারা-প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলা

আবশ্যক, কারণ, উহা প্রস্তুত করা নিতান্ত সহজ নহে—বিশেষ যত্ন-সাপেক্ষ। যে সময়ে লোকে আখ কাটিয়া গুড় প্রস্তুত করে, সেই সময়ে কতকগুলি আখের ডগা কাটিয়া রাখিতে হয়। সেই ডগা-গুলি বাটী আনিয়া সচরাচর পুষ্করিণী বা ডোবার ধারে একটা ভিজা জায়গায় বিছাইয়া তাহার উপর পাতলা পাঁক চাপা দিয়া মধ্যে মধ্যে জল ছিটাইয়া দিতে হয়; ইহাকে জল হাপর দেওয়া বলে। অল্প দিন মধ্যে সমস্ত ডগাগুলি গজাইয়া উঠে। তখন ঐ স্থান হইতে উঠাইয়া প্রত্যেক ডগা তিন চারি খণ্ড করিয়া কাটিতে হয়। এক এক খণ্ডে একটি বা দুইটি অঙ্কুর অথবা "কল" থাকা আবশ্যক। পরে পরিষ্কার সমতল ভূমিতে উত্তমরূপে বালু বিছাইয়া, তদুপরি ডগাগুলি শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সাজাইয়া বসাইতে হয় এবং খড়ের কুটি দিয়া ঢাকিয়া দিয়া মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প জল দিতে হয়। ইহাকে বালি হাপর দেওয়া বলে। কিছু দিন পরে প্রত্যেক খণ্ডের অঙ্কুর বড় হইয়া শস্যের আকার ধারণ করে। তখন উহা উঠাইয়া লইয়া গিয়া উপরোক্ত চষা জমীতে বসাইতে হইবে। এই কার্য্যে পরিদর্শন নিতান্ত আবশ্যক। কারণ, প্রথমে দেখিতে হয় যে, অতিরিক্ত জল বা পাঁক দ্বারা ডগাগুলি পচিয়া না যায়, পরে দেখিতে হয় যে উহাতে কোন প্রকারে উই না ধরে।

আখের চারা ভূমিতে বসাইয়া সেচিয়া দেওয়া হইলে, এক-বার কোদাল দিয়া অল্প অল্প খুঁড়িয়া দিতে হইবে এবং মৃত্তিকা বেশ শুষ্ক হইয়া গেলে আবার ছেঁচিয়া দিতে হইবে, এইরূপ দুই তিন বার ছেঁচা ও খোঁড়া হইলে যখন গাছগুলি একটু বড় হয়, তখন প্রত্যেক গাছের গোড়ায় মাটি ধরাইতে হইবে। এই কাল পর্য্যন্ত চারাগুলি বিশেষ যত্নপূর্ব্বক পরিদর্শন করা আবশ্যক।

কারণ, এই সময়ে অনেক চারা মরিয়া যায়, অনেক চারা "থুবী" হইতে বাহিরই হয় না, বা অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়। কৃষকের ক্রটীতে জমীতে ধান জন্মিয়া গেলে চারাসকল তেজ করিতে পারে না। বেশী বৃষ্টি হইলে, গোড়া পচিয়া অনেক চারা নষ্ট হইতে পারে। এইপ্রকার শত বিঘ্ন আছে। কিন্তু একবার গোড়ায় মাটি ধরাইয়া চারাগুলি সজীব করিয়া তুলিতে পারিলে আর বড় ভাবনা থাকে না। তখন মাঝে মাঝে সেচিতে ও খুঁড়িতে হয়। এই কার্য্য বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ দুই মাস করিতে হয়। আষাঢ় মাসে আর সেচিবার আবশ্যক হয় না। বরং পাছে অতিরিক্ত জল বসিয়া গাছগুলি নষ্ট হয়, সেইজন্য পূর্ব্বোক্ত পয়ঃপ্রণালী দ্বারা জল নির্গমের ব্যবস্থা করিতে হয়। এই সময়ে গাছগুলি একটু বড় হইলে উহাদের গায়ে, উহাদের পাতাগুলি একবার জড়াইয়া দিতে হয়। গাছ যত বড় হইতে থাকিবে, ততই মাঝে মাঝে উহার গায়ে পাতা জড়াইয়া দিতে হইবে। ভাদ্র মাসে ইক্ষুক্ষেতগুলি জলপূর্ণ করিয়া তাহাতে খইল ছড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক। ঐরূপ করিলে অতি অল্প সময় মধ্যে মৃত্তিকা পচিয়া উঠে এবং গাছসকল অতিশয় তেজ করে। আশ্বিন হইতে পৌষ পর্য্যন্ত এই কয় মাসে অন্য কোন পাট করিবার আবশ্যক হয় না। কেবল মাঝে মাঝে পাতা বাঁধিয়া দিতে হয় এবং দুই একবার সেচিতে হয়। এই সময়ে কেবল এইটুকু দৃষ্টি রাখিতে হয় যে, উইপোকায় গাছগুলি নষ্ট না করে। উইপোকা আখের এক বিষম শত্রু। ইহার হস্ত হইতে গাছ সকল রক্ষা করিতে না পারিলে অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। কার্ত্তিক মাসে কিছু বাঁশ সংগ্রহ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। কারণ, এই সময়ে ঝড় হইলে আখসকল মাটিতে পড়িয়া যায়, বাঁশের ঠেস্ দিয়া

ঐ সকল আখ আবার তুলিয়া দিতে হয়। তাহা হইলে আবার সমান তেজে বাড়ে।

আখের জমীতে দুই তিন প্রকারের সার ব্যবহৃত হইতে পারে। সচরাচর আমাদের দেশে কেবল খইল দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু খইল ছাড়া সোরা ও অস্থিচূর্ণ ব্যবহার করিলে বেশ উপকার হয়। এক বিঘা জমীতে সোরা ৸০ সের, শরিষার খইল ৫/ মন, রেড়ির খইল ৫/ মন, অস্থি চূর্ণ ॥০ সের পরিমাণে দিলে প্রচুর লাভ হইতে পারে। সরকার বাহাদুরের বর্দ্ধমানস্থ কৃষিবিভাগে সার দিয়া প্রত্যেক বিঘায় আশী টাকার উপর লাভ হইয়াছিল। সাধারণতঃ কৃষকদিগের এরূপ লাভ হয় না। তাহার কারণ, তাহারা সার ব্যবহারে নিতান্ত কৃপণতা প্রকাশ করিয়া থাকে।

সচরাচর মাঘ মাসে গুড় প্রস্তুত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যখন আখ-মাড়া কলের সৃষ্টি হয় নাই, তখন এই কার্য্য অনেক শ্রম-সাপেক্ষ ও ব্যয়বাহুল্য ছিল। এক্ষণে কলের সৃষ্টি হওয়ার পর হইতে লোকে অল্প কষ্টে ও অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে গুড় প্রস্তুত করিয়া থাকে। আখ কাটিয়া কলের মুখে খণ্ড খণ্ড নিক্ষেপ করিলেই রস বাহির হয় এবং ঐ রস অগ্নিতে জ্বাল দিলেই গুড় হইয়া থাকে। প্রস্তুতপ্রণালীও কঠিন নহে, দুই একবার দেখিলেই শিখিতে পারা যায়। কেবল একটা বিষয় লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। আকাশে মেঘ থাকিলে বা কুয়াশা হইলে কল বন্ধ রাখা উচিত, কারণ, এই কালে যে রস প্রস্তুত হয়, সেই রসের গুড়ে আটা জন্মে, সে গুড় ভাল হয় না।

আখের গুড় ছাড়া খেজুর গুড় ও কুণ্ডই গুড় আছে। আখের গুড়ের বিষয় বলিতে বলিতে দুই গুড়ের কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক

হইলেও এই স্থলে উল্লেখ করিলাম, কারণ, ঐ সকল গুড়-উৎপাদক গাছের কোন বিশেষ চাষ নাই, সুতরাং সে চাষের বিবরণ আমাদিগকে লিখিতে হইবে না।

বুদ্ধচরিত।

অষ্টম অধ্যায়।

বাল্যকাল।

ললিতবিস্তর গ্রন্থে আমরা আর একটি কথা পাই। সিদ্ধার্থের বিদ্যারম্ভ হইবার সময়ে তাঁহার "হাতেখড়ি" হয়। যখন গুরুমহাশয় উপস্থিত তখন তিনি অক্লেশে অনেকগুলি লিপির নাম করিয়া গেলেন। তিনি আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কোন্ কোন্ লিপি আমাকে শিক্ষা দিবেন?" এই বলিয়া তিনি চতুঃষষ্টি লিপির নাম করিলেন। ইহাদিগের মধ্যে অনেকগুলি কেবল কল্পিত এবং অনেকগুলি তখনকার ভাষাসমূহের লিপির যথার্থ নাম বলিয়া বোধ হয়। কতকগুলির নাম এখানে দেওয়া যাইতেছে। যথা, অঙ্গলিপি, বঙ্গলিপি, মগধ-লিপি, শকারি-লিপি, দ্রাবিড়-লিপি, দক্ষিণ-লিপি, দরদ-লিপি, চীন-লিপি, হূন-লিপি, "পূর্ব্ববিদেহ-লিপি ইত্যাদি। এই গল্পটি বিশ্বাস করিতে হইলে অনেকগুলি কথা বিশ্বাস করিতে হয়। কিন্তু এত বড় অনৈসর্গিক ব্যাপার স্বীকার না করিয়া কেবল ঐতিহাসিক সত্যটি গ্রহণ করিলেই আমাদিগের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। বঙ্গপ্রদেশের পশ্চিম বিভাগকে অঙ্গ বলিয়া ডাকিত। ভাগলপুর ইহার অন্তর্গত ছিল। পূর্ব্ববাঙ্গলা বঙ্গ বলিয়া অভিহিত ছিল।

সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, যে সময়ে ললিতবিস্তর রচিত হইয়াছিল তখন বাঙ্গলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের ভিন্ন ভিন্ন লিপি ছিল। ইহা বাঙ্গালিদিগের পক্ষে একটী নূতন কথা। খ্রীঃ অব্দের প্রারম্ভে বাঙ্গালাভাষা প্রচলিত ছিল ইহা আমরা জানিতে পারিতেছি।

জ্যোতিষীরা যখন সিদ্ধার্থের ভবিষ্যৎ ইতিহাস গণনা করিয়া বলিলেন, তখন অনেক উচ্চবংশোদ্ভূত শাক্যেরা তাঁহাদিগের সন্তানদিগকে সিদ্ধার্থের অনুচররূপে নিযুক্ত করিবার জন্য বিশেষ উৎসাহ ও ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মনে এইরূপ সংস্কার হইল যে, "কি জানি যদি এই বালক কোন দিন একজন চক্রবর্ত্তী রাজা হইয়া পড়েন, তাহা হইলে আমাদিগের সন্তানেরা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রকার উচ্চ পদবী লাভ করিতে পারিবে এবং তাহাদিগের সাংসারিক উন্নতির শেষ থাকিবে না। আর যদি ইনি বুদ্ধ হন, তাহা হইলে ইহারাও তাঁহার সঙ্গে সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে।" এই সকল মহানুভব শাক্যেরা বোধ হয় ততটা নিঃস্বার্থ ছিলেন না। সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করা অপেক্ষা বোধ হয় ভাবী সাংসারিক উন্নতির দিকেই তাঁহাদিগের অধিক দৃষ্টি ছিল। সে যাহা হউক, বাল্যকালাবধি সিদ্ধার্থের প্রতি সকল লোকেরই দৃষ্টি পড়িয়াছিল। তিনি যে একজন মহাপুরুষ হইবেন ইহা সকলের বিশ্বাস হইয়াছিল।

শাক্যদিগের মনে অতিশয় আহ্লাদ হইয়াছিল বটে, কিন্তু সিদ্ধার্থের পিতার হৃদয়ে এক মুহূর্ত্তের জন্য শান্তি ছিল না। তাঁহার পুত্র সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে পারেন একথাটী চিন্তা করিয়া তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। যাহাতে জ্যোতির্বিদ্

গণিতদিগের গণনার এক অঙ্ক মিথ্যা হইয়া যায়, অর্থাৎ কি না, যাহাতে সিদ্ধার্থ ভিক্ষুক না হইয়া মহারাজাধিরাজ হন এইজন্য তিনি পূজা দিতে লাগিলেন এবং নানা প্রকারে তাঁহার সন্তানের মনকে প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। বিলাস দ্বারা তাঁহার হৃদয় হইতে বৈরাগ্যের অঙ্কুর নাশ করিতে হইবে এই ভাবিয়া শুদ্ধোদন তাঁহার পুত্রকে কেবল সম্ভোগের মধ্যে রাখিয়াছিলেন। যাহাতে তাঁহার কোন কষ্ট না হয় এইজন্য শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, তিন কালের জন্য তিনটি অষ্টতল মনোহর অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়। তন্মধ্যে একটিকে "রম্য", একটিকে "সুরম্য," এবং অন্যটিকে "শুভ" নাম দেওয়া হইল। এই সকল অট্টালিকায় অন্যূন চল্লিশ সহস্র যুবতী নিত্য বাস করিত। এতদ্ব্যতীত শুদ্ধোদন চারিদিকে প্রহরী নিযুক্ত করিয়া দিলেন। কোন অন্ধ, কুব্জ, খঞ্জ, বৃদ্ধ বা অন্য কোন প্রকার দুঃখার্ত্ত লোক সিদ্ধার্থের দৃষ্টিপথে আসিবার সম্ভাবনা ছিল না।* শুদ্ধোদন সর্ব্বদাই সশঙ্কিত ছিলেন, কি জানি যদি তাহাদিগকে দেখিয়া পুত্রের মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়।

নবম অধ্যায়।

বিবাহ।

যখন শুদ্ধোদন তাঁহার পুত্রকে সংসারে বদ্ধ রাখিবার জন্য এই সকল উপায় অবলম্বন করিতেছিলেন, তখন সিদ্ধার্থের

* রাজাদিগের মধ্যে এই সকল লোকদিগের প্রতি একটি বিজাতীয় দ্বেষ আছে দেখা যায়। ইতিহাসে লিখিত আছে যে, ইংলণ্ডের মহারাণী এলিজাবেথ যখন নগরের পথ দিয়া যাতায়াত করিতেন, কেবল যে এই প্রকার লোকদিগকে তাঁহার দৃষ্টি হইতে বহিষ্কৃত করা হইত তাহা নহে, যতপ্রকার কুৎসিত লোক পথে থাকিত তাহাদিগকে প্রহরীরা তাড়াইয়া দিত।

বয়ঃক্রম ষোড়শ বর্ষ। এখন একটি উপযুক্তা পাত্রীর সহিত বিবাহ হইলেই সিদ্ধার্থ আর সংসার পরিত্যাগ করিতে চাহিবেন না। শুদ্ধোদন এই চিন্তা করিয়া উপযুক্তা পাত্রীর অন্বেষণে চারিদিকে লোক পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন। সিদ্ধার্থ ব্যাঘ্রপুরের রাজকন্যা যশোধরাকে মনে মনে বরণ করিয়াছেন এই সংবাদ তিনি কোন প্রকারে জানিতে পারিয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি প্রথমেই ব্যাঘ্রপুরে লোক পাঠাইলেন। কিন্তু সিদ্ধার্থ সর্ব্বদা বিলাসে মগ্ন থাকিতেন, তাঁহার পিতা তাঁহাকে আদর দিয়া একপ্রকার অপদার্থ করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহার বিদ্যা কিছুই হয় নাই এবং যুদ্ধশাস্ত্রে পারদর্শিতা জন্মে নাই—এইরূপ জনরব চারিদিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। যশোধরার পিতা সুপ্রবুদ্ধ শুদ্ধোদন-প্রেরিত দূতের মুখ হইতে বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বলিলেন—"কপিলবস্তুর রাজবংশে আমার কন্যার বিবাহ হইবারই কথা। কিন্তু আমি শুনিয়াছি যে, সিদ্ধার্থ কোন শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিতে পারেন নাই। আপনি ত জানেন শাক্যদিগের মধ্যে এ বিষয়ে কি কঠোর নিয়ম প্রচলিত আছে। একজন শাক্য যুবা ধনুর্ব্বেদ অশ্বারোহণ বা তরবারি-চালনাতে উত্তমরূপ দক্ষতার পরিচয় দিতে না পারিলে, কোন পিতা সেই যুবার হস্তে তাঁহার কন্যাকে সমর্পণ করিতে সাহস করেন না। অতএব কপিলবস্তুর মহারাজকে বলিবেন যে, যশোধরার স্বয়ম্বরে এইপ্রকার বিদ্যা প্রদর্শন করিয়াই যশোধরাকে লাভ করিতে হইবে।" শুদ্ধোদন এই কথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইলেন। কিন্তু ইহাতে সিদ্ধার্থের মন কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। তিনি বলিলেন—"আপনাদিগের ভয় পাইবার কোন কারণ নাই। আমি সকল শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছি। অতএব

আপনি রাজ্য মধ্যে ঘোষণা করিয়া দিন যে, অদ্য হইতে সপ্ত দিবসের মধ্যে আমি সমস্ত শাক্য যুবকদিগের সহিত বাহুবলের পরীক্ষা দিব।" শুদ্ধোদন পুত্রের কথায় আশ্বস্ত হইয়া রাজ্য মধ্যে তদনুরূপ ঘোষণা করিয়া দিলেন। যশোধরার স্বয়ম্বর হইবে এই সমাচার পাইয়া শাক্য যুবকেরা মহা আনন্দিত হইল। তাহারা সকলেই যশোধরাকে লাভ করিবার জন্য প্রয়াসী ছিল। তন্মধ্যে দেবদত্ত ধনুর্ব্বেদে অগ্রগণ্য এবং নন্দ তরবারিচালনায় অদ্বিতীয় বলিয়া পরিচিত ছিলেন। নন্দ সিদ্ধার্থের মাতৃষ্বস্রেয় ছিলেন, অর্থাৎ মহাপ্রজাবতী গৌতমীর পুত্র। পাঠকেরা মনে রাখিবেন যে, মহাপ্রজাবতী সিদ্ধার্থের মাতা মায়াদেবীর ভগ্নী, শুদ্ধোদনের পত্নী এবং সিদ্ধার্থের বিমাতা ও মাতৃষসা ছিলেন। দেবদত্তের সহিত পাঠকদিগের এখন হইতেই কিছু কিছু পরিচয় হওয়া আবশ্যক। ইনি বাল্যকাল হইতে সিদ্ধার্থের সমকক্ষ বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত ছিলেন। সিদ্ধার্থ যাহা করিতেন দেবদত্ত তাহাতেই সিদ্ধার্থকে পরাস্ত করিতে চেষ্টা করিতেন। দেবদত্ত শৈশবাবস্থা হইতেই এইরূপ হিংসার ভাব পোষণ করিয়া আসিয়াছিলেন। যুবায় যুবায় প্রতিদ্বন্দ্বীভাব আপাততঃ সর্ব্বতোভাবে নির্দ্দোষ বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু অল্প বয়স হইতে বিষাক্ত সর্পের বিষদন্ত বাহির হইয়া থাকে। দেবদত্তের হৃদয়ে এখন হইতে সেই বিষের সঞ্চার হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

সপ্তম দিবস আসিল। নগরের বাহিরে এক বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে মহোচ্চবংশোদ্ভূত সম্ভ্রান্ত শাক্যনরনারীগণ সমাগত হইল। শুদ্ধোদন কুটুম্বগণ দ্বারা বেষ্টিত হইয়া যশোধরাকে লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। চারিদিকে উৎসাহ, চারিদিকে সমারোহ,

সমাগত লোকদিগের মধ্যে প্রত্যেকেই প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের একজন বা একজনের শুভ কামনা করিতে লাগিল। কিন্তু সিদ্ধার্থ রূপে গুণে বলে অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি এক এক করিয়া সকলকে অনায়াসে পরাস্ত করিলেন। যে রাজকুমার আজন্ম খাঁচার পাখীর মত গৃহে অবরুদ্ধ থাকিতেন এবং সংসার কাহাকে বলে জানিতেন না, তিনি পরীক্ষাস্থলে উপস্থিত হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বীরা যে বিদ্যায় অতুল্য ছিল তাহাতেই তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া দিলেন—এ ব্যাপার দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত, বিস্মিত ও পুলকিত হইল। সুপ্রবুদ্ধসর্ব্বসমক্ষে সিদ্ধার্থকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন—"হে সিদ্ধার্থ আমাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, তুমিই এই পরীক্ষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়া উত্তীর্ণ হও। কিন্তু বল দেখি, তুমি কোথা হইতে বা কাহার নিকটে বিলাসভবনে থাকিয়া রণভূমির ক্লেশজনক ও শ্রমসাধ্য কার্য্যগুলি শিক্ষা করিয়াছ? তোমার অসাধারণ ক্ষমতা ও কৌশল আমাদিগকে বিস্মিত করিয়াছে। অতএব যে রত্নকে লাভ করিবার জন্য তুমি অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া এরূপ অতুল বীরত্বের পরিচয় দিলে এখন সেই রত্ন তুমি ধারণ কর।" পিতার সস্নেহ বচন শুনিয়া যশোধরা সহাস্য বদনে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সিদ্ধার্থের সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইয়া ঈষৎ অবগুণ্ঠন উত্তোলন করিয়া, সিদ্ধার্থকে মাল্য প্রদান করিলেন। চারিদিকে আনন্দধ্বনি উঠিল। সিদ্ধার্থ যশোধরার কর গ্রহণ করিয়া রথে উঠিলেন। শুদ্ধোদন নিশ্চিন্ত হইলেন। দুই জনের বয়স এক, দুইজন পরস্পরকে বরণ করিয়াছে—সিদ্ধার্থের সন্ন্যাসী হইবার আর কোন সম্ভাবনা নাই।

দশম অধ্যায়।

বিবাহের পর।

শুদ্ধোদন ইহাতেও তৃপ্ত হইলেন না। তিনি সন্তানের জন্য উচ্চপ্রাচীরবেষ্টিত একটি মনোহর ভবন নির্ম্মাণ করাইলেন। এই প্রাচীরের মধ্যে এক প্রকাণ্ড দ্বার সন্নিবিষ্ট ছিল। এই দ্বার পিত্তল নির্ম্মিত এবং এত ভারি যে, তাহার উদ্ঘাটন শব্দ অনেক দূর পর্য্যন্ত শুনা যাইত। এই প্রাচীরের অন্তর্গত আর দুইটি প্রাচীর ছিল, এবং তাহাদিগের ভিতর যাইতে হইলে আর দুইটি প্রকাণ্ড দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে হইত। কেহ যে সহজে রাজভবন হইতে বাহিরে যাইবেন তাহার সম্ভাবনা ছিল না। শুদ্ধোদনের দ্বারপালদিগের প্রতি আদেশ ছিল যে, তাহারা যেন কাহাকেও অট্টালিকা হইতে বাহিরে যাইতে না দেয়। এমন কি, রাজকুমার বাহিরে যাইতে চাহিলেও তাঁহাকেও যেন রোধ করে। সিদ্ধার্থ এই সুন্দর কারাগারে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিকট সুখ সম্পদ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। বৃদ্ধ, রুগ্ন, দরিদ্র, কুৎসিত ইহাদিগের নাম পর্য্যন্তও তিনি জানিতেন না। তাঁহার পরিচারিকারা নিরন্তর নৃত্যগীত হাস্যকৌতুকাদি লইয়া থাকিত। জরা, মৃত্যু, দুঃখ, রোগ প্রভৃতির নাম পর্য্যন্তও করিবার আজ্ঞা ছিল না। যদি কাহারও পীড়া হইত তাহাকে তখনি জন্মের মত সেখান হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইত। কে কি কথা বলিতেছে শুদ্ধোদনকে জানাইবার জন্য রাজভবনের সংবাদদাতারা সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিত। যদি কেহ বার্দ্ধক্যবশতঃ পলিত বা দন্তহীন হইত, তাহার সে দোষের ক্ষমা ছিল না। দস্যুর ন্যায় নিপীড়িত হইয়া তাহাকে ঐ ভবন হইতে পলায়ন করিতে হইত।

সকল পুষ্প দ্বারা গৃহ সুসজ্জিত হইত এবং সুন্দর সুন্দর মালা
চিত হইত, অথবা যে সকল পুষ্প বৃক্ষে প্রস্ফুটিত হইয়া থাকিত,
াহারা শুষ্ক হইলেই তৎক্ষণাৎ স্থানান্তরিত হইত। অতএব
ন্দ কাহাকে বলে সিদ্ধার্থ তাহা জানিতেন না। মানববুদ্ধি
াহা কিছু ভাবিয়া স্থির করিতে পারে সিদ্ধার্থকে সুখে রাখি-
ার জন্য সকলই উদ্ভাবিত হইয়াছিল। স্নেহময় পিতা স্নেহের
ন্তানকে ভাল রাখিবার জন্য যাহা করিতে হয় সকলই করিয়া-
ছলেন।

কিন্তু শুদ্ধোদন বিধাতার সহিত সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত
ইয়াছিলেন। ভগবানের একরূপ বিধি বা ইচ্ছা। শুদ্ধো-
ন তাঁহাকেই অতিক্রম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি
হা বুঝিতে পারিলেন না যে, মানুষ অন্য মানুষকে কারাগারে
ৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিতে পারে, কিন্তু তাহার মনকে কদাপি
ধীনস্থ করিতে পারে না। মনুষ্য স্বাধীন জীব, যাহা ভাবিবার
াহা ভাবিবে, যাহা করিবার তাহা করিবে। ভগবান ভিন্ন মানু-
ের অধিপতি আর কেহই হইতে পারে না। তিনি ইহাও
ঝিলেন না যে, মানুষ সকলপ্রকারে নিজের প্রভুত্ব স্থাপন করিতে
ারে কিন্তু ঘটনাবলীকে কোন প্রকারে আয়ত্ত করিতে পারে না।

সিদ্ধার্থ ইহারই মধ্যে জীবনের দুই একটি কথার মর্ম্ম হৃদয়-
ম করিতে পারিয়াছিলেন। একদিন তিনি এবং দেবদত্ত
গানে বেড়াইতেছিলেন এমন সময় একদল পক্ষী উড়িয়া
ইতেছিল। পক্ষীগুলি দেখিতে অতি সুন্দর। দেবদত্ত লোভ
হরণ করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের মধ্যে এক
কে শরবিদ্ধ করিলেন। পক্ষী ধড়ফড় করিতে করিতে
মিতে পতিত হইল। সিদ্ধার্থ তাহার যন্ত্রণা দেখিয়া তখনি

তাহাকে উত্তো
সান্ত্বনা দিতে ল
গেল না। কেন
তেছি তথাপি স
করিতে পারিলে
যে, যেখানে শ
প্রবাহিত হইতে
হইতে নির্গত ক
হস্তে বিদ্ধ করিয়া
যন্ত্রণা উপস্থিত হ
কি কষ্ট হইতেছি
স্থানকে আবরণ ব
কাহাকে বলে সি
শাক্যদিগের
হইত। সেই সম
পুত্রকন্যাগণ সমা
কৃষকেরা সাঙ্গল
বীজ বপন কা
দিন। সেই দিন
শাক্যদিগের মত
সুতরাং কৃষিকার্য
হইয়া উঠিয়াছিল
যে দিবসের
লিত ছিল, কেব
বহিঃসংসারে আ

উৎসবক্ষেত্রে সুখশয্যা নাই, নৃত্যগীত নাই। তিনি দেখিলেন যে, কৃষকেরা কার্য্য করিতে করিতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতেছে এবং বৃষদিগকে অনেক প্রহার সহ্য করিতে হইতেছে। তখন তিনি ভাবিলেন—হায়! এই কি সেই সুখের সংসার যেখানে শুনিয়াছিলাম মনুষ্যেরা কেবল নৃত্যগীত করে এবং নির্ভাবনায় দিনাতিপাত করে? এখনত দেখিতেছি যে জীবিকানির্ব্বাহ করিবার জন্য লোকের বহু কষ্ট পাইতে হয়।

শুদ্ধোদন গৃহের দ্বার অবরোধ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মনের দ্বার অবরোধ করিতে পারেন নাই। মনের এই দ্বার দিয়া নূতন ভাব, নূতন চিন্তা কোনদিক-না-কোনদিক দিয়া আসিয়া পড়িবেই। কেহ তাহা বারণ করিতে পারে না। প্রাকৃতিক নিয়মকে অবজ্ঞা করিলে লোকে তাহার হাতে হাতে ফল পায়। সিদ্ধার্থ সুখসম্ভোগ ভিন্ন আর কিছুরই শিক্ষা পান নাই। সুতরাং তিনি যখন একটি কষ্টের ব্যাপার দেখিলেন তাঁহার মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল, আর সেই ভাবের তাড়নায় তিনি সংসারক্ষেত্রে আসিয়া পড়িলেন। শিক্ষক ও নেতৃগণের পক্ষে ইহা একটি বিশেষ শিক্ষার বিষয় যে, কোন বিষয়ে বাড়াবাড়ি করা ভাল নহে। বাড়াবাড়ি করিলেই ঠিক বিপরীত ফলটি আসিয়া পড়ে। সিদ্ধার্থকে তাঁহার পিতা আমোদে ভুলাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার ফল এই হইল যে, তিনি সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া কেবল যে নিজে বৈরাগী হইলেন তাহা নহে, আজ পর্য্যন্ত কত সহস্র সহস্র লোক তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া বৈরাগী হইতেছে। স্ত্রীলোক দিয়া সিদ্ধার্থের পিতা সিদ্ধার্থকে ভুলাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সিদ্ধার্থ যে ধর্ম্ম প্রচার করিলেন তাহাতে স্ত্রীলোক সকল অনর্থের মূল বলিয়া

নির্দ্ধারিত হইয়াছে। শুদ্ধোদন সিদ্ধার্থকে এই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, পৃথিবীতে সুখ ভিন্ন আর কিছুই নাই। সিদ্ধার্থ যে ধর্ম্ম প্রচার করিলেন তাহার মূল বিশ্বাস এই যে, পৃথিবীতে দুঃখ ভিন্ন আর কোন পদার্থ নাই এবং সেই দুঃখের কারণ দূর করিবার জন্যই তাঁহার ধর্ম্ম জগতে অবতীর্ণ হয়। শুদ্ধোদনের চেষ্টাসমূহ কি অদ্ভুত কৌশলে ব্যর্থ হইয়া গেল তাহা এইবার বর্ণনা করিতে হইবে।

প্রশ্ন।

বাঙ্গলা ভাষায় "এবং" আর "ও" এই দুইটীর কোন অর্থ পার্থক্য আছে কি না? দুইটিই সংযোজক অব্যয়রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাঙ্গলা লেখকগণ ইচ্ছামত কোথাও "এবং" কোথাও "ও" ব্যবহার করেন। সংস্কৃতে "এবং" শব্দ সাদৃশ্য অর্থে প্রযুক্ত হয়। যথা এবম্প্রকার এবম্ভূত। কিন্তু বাঙ্গালায় সংযোজক অব্যয় রূপে ব্যবহার করিতে হইলে কোন নিয়মাধীন হওয়া আবশ্যক কি না? পূর্ব্ব সূত্রস্থ স্থলেই ইহার পরিবর্ত্তে "ও" বসিতে পারে কি না?

শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়।

যোধপুর।

ভ্রম সংশোধন।

"পরবর্ত্তিনী" নামক গল্পের স্থানে স্থানে "শৈলবালা"র পরিবর্ত্তে ভ্রমক্রমে "শৈবলিনী" ছাপা হইয়াছে।

"ভারতবর্ষে" নামক প্রবন্ধের ৩২ পৃষ্ঠা ৩ লাইনে "জঙ্গলের ও বনের" পরিবর্ত্তে "জঙ্গলের ওধারের" হইবে।

সাধনা।

প্রাচীন দেবতার নূতন বিপদ।

মীটিংয়ে প্রায় সকল দেবতাই একযোগে স্ব স্ব কর্ম্মে রিজাইন্ দিতে উদ্যত হইলেন।

পিতামহ ব্রহ্মা বৈদিক ভাষায় উদাত্ত অনুদাত্ত এবং স্বরিত সংযোগপূর্ব্বক কহিলেন, ভো ভো দেবগণ শৃণুত।

আমার কথা স্বতন্ত্র। আমি ত এই বিশ্ব সৃষ্টি এবং বেদরচনা সমাপ্ত করিয়া সমস্ত কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া পেন্‌সন্ লইয়াছি। এমন কি, আমার কাছে আর কোন প্রত্যাশা নাই বলিয়া সকলে আমার পূজা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়াছে। এবং আমার প্রথম বয়সের বিশ্ব এবং বেদ নামক দুটো রচনা লইয়া লোকে নির্ভয়ে স্ব স্ব ভাষায় অনুবাদ এবং সমালোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কেহ বলে রচনা মন্দ হয় নাই কিন্তু আরও ঢের ভাল হইতে পারিত, কেহ বলে আমাদের হাতে যদি প্রুফ সংশোধনের ভার থাকিত তাহা হইলে ছত্রে ছত্রে এত মুদ্রাকর প্রমাদ থাকিত না। আমি চুপ করিয়া থাকি, মনে মনে তাহাদের সম্বোধন করিয়া বলি, "বাবা, ঐ আমার প্রথম রচনা। তোমরা অবশ্য আমার চেয়ে অনেক পাকা হইয়াছ, কিন্তু তখন যে বিশ্ব-বিদ্যালয় ছিল না; একেবারে সমস্তই মন হইতে গড়িতে হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে তোমরা যদি একটু মনোযোগ করিয়া জন্ম

গ্রহণ করিতে তাহা হইলে সমালোচনা শুনিয়া অনেক জ্ঞানলাভ করিতাম, একটা মস্ত 'ট্যাগার্ড' পাওয়া যাইত। দুর্ভাগ্যক্রমে তোমরা বড়ই বিলম্বে জন্মিয়াছ। যাহা হউক, যখন দ্বিতীয় সংস্করণ আরম্ভ হইবে তখন তোমাদের কথা স্মরণ রাখিব।"

আমার কেহ কেহ, রচনা দুটো যে আমার তাহা একেবারে অস্বীকার করে। হয় ত অনায়াসে প্রমাণ করিতে পারিত ওটা তাহাদেরই নিজের, কিন্তু তাহা হইলে তাহাদের কল্পনাশক্তি ও প্রতিভার খর্ব্বতা স্বীকার করা হয় বলিয়া ক্ষান্ত আছে। হরি হরি, এই দীর্ঘ জীবনে ঐ দুটো বই আর কোন দুষ্কর্ম্ম করি নাই ইহা-তেই এত কথা শুনিতে হইল।

যাহা হউক্ এ ত গেল আমার আক্ষেপের কথা। কিন্তু তোমরা কি মনোদুঃখে, মর্ত্ত্যলোকের প্রতি কি অভিমানে তোমাদের বহুকালের পদ পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ?

তখন দেবতারা কেহ বা বৈদিক, কেহ বা পৌরাণিক ভাষায়, কেহ বা ত্রিষ্টুভ্ কেহ বা অনুষ্টুভ্ ছন্দে, দন্ত্য ন মূর্দ্ধন্য ণ, অন্তঃস্থ ব বর্গীয় ব এবং তিন সয়ের উচ্চারণ রক্ষা করিয়া বলিলেন—"ভগবন্, সায়াণ্ নামক একটা দানব অত্যন্ত জুলুম আরম্ভ করিয়াছে। ইহার নিকটে বৃত্র প্রভৃতি প্রাচীন অসুরদিগকে গণ্যই করি না!"

বৃদ্ধ পিতামহ মনে মনে হাসিলেন, ভাবিলেন, কোন্ মতে মানে মানে তাহার হাত হইতে উদ্ধার পাইয়াছ এখন তাহাকে গণ্য না করিলেও চলে, কিন্তু তখন যে নাকালটা হইয়াছিলে সে বেশ মনে আছে!—কিন্তু সে কথা আর উত্থাপন না করিয়া গম্ভীরভাবে চারিটি মস্তক নাড়িয়া কহিলেন, "অবশ্য অবশ্য!"

সুরগুরু বৃহস্পতি কহিলেন, আর্য্য, শত্রুটাকে তত ডরাই না,

কিন্তু মিত্রদের উপদ্রবে অতিষ্ঠ হইয়াছি। এতদিন আমরা ছিলাম মানুষের হৃদয়লোকে বিশ্বাসের স্বর্গধামে; এখন তাহারা সায়ান্সের সহিত গোপন সন্ধি স্থাপনপূর্ব্বক সেখান হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া আমাদিগকে মাথার খুলির এক কোণে অত্যন্ত শুষ্ক সঙ্কীর্ণ জায়গায় একটুখানি স্থান দিতে চায়। সেখানে একফোঁটা বিশ্বাসের অমৃত নাই। বলে, "দেখ, তোমাদের কত গৌরব বাড়িল! ছিলে অজ্ঞানান্ধ হৃদয়গহ্বরে, এখন উঠিলে মস্তিষ্কস্থতজ্বালিত জ্ঞানালোকিত মস্তকচূড়ায়! তাগো আমরা কয়জনা বুদ্ধিমান ছিলাম, নতুবা স্বর্গে মর্ত্ত্যে কোথাও তোমাদের স্থান হইত না! আমরা সকলের কাছে প্রমাণ করিয়াছি যে, তোমরা আর কোথাও যদি না থাক, নিদেন, আমাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার মধ্যে আছ—প্রতিবাদ করিয়া সেখান হইতে তোমাদিগকে বিচলিত করে এমন বুদ্ধিমান এখনও কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই। বিষ্ণুর নীন কূর্ম্ম বরাহ প্রভৃতি অবতারগুলিকে আমরা এভোল্যুশন্ থিওরি বলিয়া প্রচার করিয়াছি! দেবতাদের উদ্ধারের জন্য আমরা এত প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছি!"

ভগবন্, যথার্থ আন্তরিক ভক্তি কখনই নিজের দেবতাকে এরূপ ছেলে ভুলাইবার চেষ্টা করে না। দেব চতুরানন, এতকাল দেবতা ছিলাম, কেবল মাঝে মাঝে দৈত্যদের উপদ্রবে স্বর্গছাড়া হইয়াছি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমাদিগকে কেহ এভোল্যুশন্ থিওরি করিয়া দেয় নাই। প্রভো, তুমি যদি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়া থাক তুমি জান আমরা কি, কিন্তু আজকাল তোমার অপেক্ষা যাহারা কিঞ্চিৎ বেশি শিখিয়াছে তাহাদের হাত হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর!" বড় আশা দিয়াছিলে তোমার দেবতারা অমর, কিন্তু এইভাবে যদি কিছু দিন চলে, আমাদের

ঋষিবন্ধুরা যদি সাংঘাতিক মেহভরে আরো কিছুকাল আমাদের ব্যাখ্যা করিতে থাকেন, তবে সে আশা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবে।

বৃহস্পতির মুখে এইসমস্ত সংবাদ শ্রবণ করিয়া পিতামহ ব্রহ্মা আর উত্তর করিতে পারিলেন না, চারিটি শুভ্র মস্তক নত করিয়া চিন্তিতভাবে বসিয়া রহিলেন।

তখন দেবতাগণ স্ব স্ব পদ সম্বন্ধে পরিবর্ত্তন প্রার্থনা করিলেন। বিত্ত দেবতা প্রজাপতি এবং বালক-দেবতা কন্দর্প সুরসভায় দাঁড়াইয়া কহিলেন, সকলেই জানেন, বিবাহ-ডিপার্টমেণ্টে বহুকাল আমাদের কিঞ্চিৎ কর্ত্তৃত্ব ছিল; সেজন্য আমাদের কোনরূপ নিয়মিত নৈবেদ্য অথবা উপরি পাওনা ছিল না বটে, কিন্তু কৌতুক যথেষ্ট ছিল। সম্প্রতি টাকা নামক একটা চক্রমুখো হঠাৎদেবতা টহখালা হইতে নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রাকারে আবির্ভূত হইয়া একপ্রকার গায়ের জোরে আমাদের সে কাজ কাড়িয়া লইয়াছে। অতএব উক্ত ডিপার্টমেণ্ট হইতে আমাদের নাম কাটিয়া আজ হইতে সেই প্রবল শক্তি নূতন দেবতার নাম বাহাল হউক্।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহাই স্থির হইল।

তখন যম উঠিয়া কহিলেন, এতকাল আমিই নরলোকের সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ের কারণ ছিলাম, কিন্তু এখন সেখানে আমা অপেক্ষা ভয় করে এমন সকল প্রাণীর উদ্ভব হইয়াছে। অতএব, পুলিস্ দারোগাকে আমার যমদণ্ড ছাড়িয়া দিয়া আমি অদ্য হইতে কাজে ইস্তফা দিতে চাই।

অধিকাংশ দেবতার মতে যমরাজের প্রস্তাব নিতান্ত অসঙ্গত না হইলেও ব্যাপারটা গুরুতর বিধায় আগামী মীটিংয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আপাততঃ স্থগিত রহিল।

কার্ত্তিকেয় উঠিয়া কহিলেন, গুরুদেবের বক্তৃতার পর আমাকে আর অধিক কিছু বলিতে হইবে না। আমি দেবসেনাপতি। কিন্তু দেবগণকে রক্ষা করা আমার প্রায় অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, অতএব, হয় আমার পোষ্ট্ এবলিশ্ করিয়া এষ্টাব্লিশ্‌মেণ্ট্ কমানো হৌক্, নয় কোন সাময়িক পত্রের সম্পাদকের উপর স্বর্গরক্ষাকার্য্যের ভার দেওয়া হৌক্। এমন কি, আমার বহুকালের ময়ূরটিও আমি বিনামূল্যে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছি। ইহার পেখম ছড়াইলে তাঁহাদের অনেকটা বিজ্ঞাপনের কাজ হইবে।

দেবতাদের সম্মতিক্রমে সেনাপতির পোষ্ট্ এবলিশ হইল, এখন হইতে ময়ূরের খোরাকী তাঁহার নিজের তহবিল হইতে পড়িবে।

বরুণ উঠিয়া অশ্রুজল বর্ষণ করিয়া কহিলেন—নরলোকে আমার কি আর কোন আবশ্যক আছে? খোলাতাঁটিবাহিনী বারুণী আমাকে উচ্ছেদ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। এই বেলা মানে মানে সময় থাকিতে সরিতে ইচ্ছা করি।

দেবতাগণ বহুল চিন্তা ও তর্কের পর ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্ দেখিয়া অবশেষে স্থির করিলেন, এখনো সময় হয় নাই। কারণ, এখনো সময়ে সময়ে বারুণীর প্রাথর্য্য নিবারণের জন্য দুর্ব্বল মানব বরুণের সহায়তা প্রার্থনা করিয়া থাকে।

তখন ধর্ম্ম বলিলেন, লোকাচারকে আমার অধীনস্থ কর্ম্মচারী বলিয়া জানিতাম, কিন্তু সে ত আমার—সঙ্গে—পরামর্শমাত্র না করিয়া আপন ইচ্ছামতে যাহা-তাহা করে, তবে সেই ছোঁড়াটাকেই সিংহাসন ছাড়িয়া দিলাম। বায়ু কহিলেন, পৃথিবীতে এখন ঊনপঞ্চাশ দিকে ঊনপঞ্চাশ বায়ু বহিতেছে, চাই কি,

এখন আমি অবসর লইতে পারি। আদিত্য কহিলেন, মানব-সমাজে বিস্তর খদ্যোত উঠিয়াছে, তাহারা মনে করিতেছে, সূর্য্য না হইলেও আমরা একলা কাজ চালাইতে পারি, জগৎ আলোকিত করিবার ভার তাহাদের উপর দিয়া আমি অস্তাচলে বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা করি। ভগবান চন্দ্রমা শুক্লপ্রতিপদের ক্ষুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া কহিলেন, নরলোকে কবিরা তাঁহাদের প্রেয়সীর পদনখরকে আমা অপেক্ষা দশগুণ প্রাধান্য দিয়া থাকেন, অতএব, যে পর্য্যন্ত কবিরমণীমহলে পাদুকার সম্পূর্ণ প্রচলন না হয়, সে পর্য্যন্ত আমি অন্তঃপুরে যাপন করিতে চাই। এমন কি, ভোলানাথ শিব অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে কহিলেন, আমা অপেক্ষা বেশি গাঁজা টানে পৃথিবীতে এমন লোকের ত অভাব নাই, সেই সমস্ত সংস্কারকদিগের উপর আমার প্রলয়কার্য্যের ভার দিয়া আমি অনায়াসে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি। এমন কি, আমি নিশ্চয় জানি, আমার ভূতগুলারও কোনি আবশ্যক হইবে না।

সর্ব্বশেষে যখন শুভ্রবসনা অমলকমলাসনা সরস্বতী উঠিয়া বীণানিন্দিত মধুরস্বরে দেবসমাজে তাঁহার নিবেদন আরম্ভ করিলেন, তখন দেবগণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন এবং মহেন্দ্রের সহস্র চক্ষের পল্লব সিক্ত হইয়া উঠিল।

দেবী কহিলেন, অন্যান্য নানা কার্য্যের মধ্যে বালকদিগকে শিক্ষাদানের ভার এতদিন আমার উপর ছিল, কিন্তু সে কার্য্য আমি কিছুতেই চালাইতে পারিব না। আমি রমণী, আমার মাতৃহৃদয়ে শিশুদিগের প্রতি কিছু দয়ামায়া আছে—তাহাদের পাঠের জন্য আজকাল যে সকল পুস্তক নির্ব্বাচিত হয়, সে আমি কিছুতেই পড়াইতে পারিব না। আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয় এবং তাহাদের ক্ষুদ্র শক্তি ভাঙ্গিয়া পড়ে। এ নিষ্ঠুর কার্য্য একজন

বশিষ্ঠ পুরুষের প্রতি অর্পিত হইলেই ভাল হয়। অতএব সুর-সভায় আমি সানুনয়ে প্রার্থনা করি, যমরাজের প্রতি উক্ত ভার দেওয়া হউক্।

যমরাজ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া প্রতিবাদ করিলেন, আমার কোন আবশ্যক নাই, কারণ, ইস্কুলের মাষ্টার আছে।

শিশুশিক্ষা বিভাগে যমরাজের বিশেষ নিয়োগ যে বাহুল্য, এ সম্বন্ধে দেবতাদের কোন মতভেদ রহিল না।

অসম্ভব গল্প।

এক যে ছিল রাজা।

তখন ইহার বেশি কিছু জানিবার আবশ্যক ছিল না! কোথাকার রাজা, রাজার নাম কি, এ সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া গল্পের প্রবাহ রোধ করিতাম না। রাজার নাম শিলাদিত্য কি শালিবাহন, কাশী কাঞ্চি কনোজ কোশল অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের মধ্যে ঠিক কোন্‌খানটিতে তাঁহার রাজত্ব, এ সকল ইতিহাস ভূগোলের কথা আমাদের কাছে নিতান্তই তুচ্ছ ছিল;—আসল যে কথাটি শুনিলে অন্তর পুলকিত হইয়া উঠিত এবং সমস্ত হৃদয় এক মুহূর্ত্তের মধ্যে বিদ্যুদ্বেগে চুম্বকের মত আকৃষ্ট হইত, সেই হইতেছে—এক যে ছিল রাজা!

এখনকার পাঠক যেন একেবারে কোমর বাঁধিয়া বসে! গোড়াতেই ধরিয়া লয় লেখক মিথ্যা কথা বলিতেছে। সেই-জন্য অত্যন্ত সেয়ানার মত মুখ করিয়া জিজ্ঞাসা করে—"লেখক

মহাশয়, তুমি যে বলিতেছ এক যে ছিল রাজা, আচ্ছা বল দেখি, কে ছিল সেই রাজা!"

লেখকেরাও সেয়ানা হইয়া উঠিয়াছে; তাহারা প্রকাণ্ড প্রত্নতত্ত্বপণ্ডিতের মত মুখমণ্ডল চতুর্গুণ মণ্ডলাকার করিয়া বলে, "এক যে ছিল রাজা, তাহার নাম ছিল অজাতশত্রু।"

পাঠক চোখ টিপিয়া জিজ্ঞাসা করে, "অজাতশত্রু? ভাল, কোন্ অজাতশত্রু বল দেখি?"

লেখক অবিচলিত মুখভাব ধারণ করিয়া বলিয়া যায়, "অজাতশত্রু তিন জন ছিল। একজন খৃষ্টজন্মের তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়া দুই বৎসর আটমাস বয়ঃক্রম কালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার জীবনের বিস্তারিত বিবরণ কোন গ্রন্থেই পাওয়া যায় না।" অবশেষে দ্বিতীয় অজাতশত্রু সম্বন্ধে দশ জন ঐতিহাসিকের দশ ভিন্ন মত সমালোচনা শেষ করিয়া যখন গ্রন্থের নায়ক তৃতীয় অজাতশত্রু পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছায়, তখন পাঠক বলিয়া উঠে, "ওরে বাস্‌রে, কি পাণ্ডিত্য! এক গল্প শুনিতে আসিয়া কত শিক্ষাই হইল! এ লোকটাকে আর অবিশ্বাস করা যাইতে পারে না! আচ্ছা লেখক মহাশয়, তার পরে কি হইল!"

হায়রে হায়, মানুষ ঠকিতেই চায়, ঠকিতেই ভালবাসে, অথচ পাছে কেহ নির্ব্বোধ মনে করে এ ভয়টুকুও ষোলআনা আছে; এইজন্য প্রাণপণে সেয়ানা হইবার চেষ্টা করে। তাহার ফল হয় এই যে, সেই শেষকালটা ঠকে কিন্তু বিস্তর আড়ম্বর করিয়া ঠকে।

ইংরাজিতে একটি প্রবাদ আছে, "প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও না, তাহা হইলে মিথ্যা জবাব শুনিতে হইবে না।" বালক

সেইটি বোঝে, সে কোন প্রশ্ন করে না! এইজন্য রূপকথার সুন্দর মিথ্যাটুকু শিশুর মত উলঙ্গ, সত্যের মত সরল, সদ্য-উৎসারিত উৎসের মত স্বচ্ছ—আর এখনকার দিনের সুচতুর মিথ্যা মুখস্পর্দ্ধা মিথ্যা। কোথাও যদি তিলমাত্র ছিদ্র থাকে অমনি ভিতর হইতে সমস্ত ফাঁকি ধরা পড়ে, পাঠক বিমুখ হয়, লেখক পালাইবার পথ পায় না।

শিশুকালে আমরা যথার্থ রসজ্ঞ ছিলাম, এইজন্য যখন গল্প শুনিতে বসিয়াছি তখন জ্ঞানলাভ করিবার জন্য আমাদের তিলমাত্র আগ্রহ উপস্থিত হইত না, এবং অশিক্ষিত সরল হৃদয়টি ঠিক বুঝিত আসল কথাটি কোন্‌টুকু। আর এখনকার দিনে এত বাহুল্য কথাও বকিতে হয়, এত অনাবশ্যক কথারও আবশ্যক হইয়া পড়ে! কিন্তু সবশেষে সেই আসল কথাটিতে গিয়া দাঁড়ায়—এক যে ছিল রাজা।

বেশ মনে আছে সেদিন সন্ধ্যাবেলা ঝড়বৃষ্টি হইতেছিল। কলিকাতা সহর একেবারে ভাসিয়া গিয়াছিল। গলির মধ্যে একহাঁটু জল। মনে একান্ত আশা ছিল, আজ আর মাষ্টার আসিবে না। কিন্তু তবু তাঁহার আসার নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত ভীতচিত্তে পথের দিকে চাহিয়া বারান্দায় চৌকি লইয়া বসিয়া আছি। যদি বৃষ্টি একটু ধরিয়া আসিবার উপক্রম হয়, তবে একাগ্র চিত্তে প্রার্থনা করি, হে দেবতা আর একটুখানি! কোনমতে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পার করিয়া দাও! তখন মনে হইত পৃথিবীতে বৃষ্টির আর কোন আবশ্যক নাই কেবল একটিমাত্র সন্ধ্যার নগরপ্রান্তের একটিমাত্র ব্যাকুল বালককে মাষ্টারের করাল হস্ত হইতে রক্ষা করা ছাড়া। পুরাকালে কোন একটি নির্ব্বাসিত যক্ষও ত মনে করিয়াছিল, আষাঢ়ের মেঘের বড়

একটা কোন কাজ নাই, অতএব রামগিরি-শিখরের একটি-মাত্র বিরহীর দুঃখকথা বিশদার হইয়া অলকার সৌধবাতায়নে কোন একটি বিরহিণীর কাছে লইয়া যাওয়া তাহার পক্ষে কিছু-মাত্র গুরুতর নহে; বিশেষতঃ পথটি যখন এমন সুরম্য এবং তাহার হৃদয়-বেদনা এমন দুঃসহ।

বালকের প্রার্থনামতে না হৌক, ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতের বিশেষ কোন নিয়মানুসারে, বৃষ্টি ছাড়িল না। কিন্তু হায়, মাষ্টারও ছাড়িল না। গলির মোড়ে ঠিক সময়ে একটি পরিচিত ছাতা দেখা দিল—সমস্ত আশাবাষ্প এক মুহূর্ত্তে কাটিয়া বাহির হইয়া আমার বুকটি যেন পঞ্জরের মধ্যে মিলাইয়া গেল। পরপীড়ন পাপের যদি যথোপযুক্ত শাস্তি থাকে তবে নিশ্চয় পরজন্মে আমি মাষ্টার হইয়া এবং আমার মাষ্টার মহাশয় ছাত্র হইয়া জন্মিবেন। তাহার বিরুদ্ধে কেবল একটি আপত্তি এই যে, আমাকে মাষ্টার মহাশয়ের মাষ্টার হইতে গেলে অতিশয় অকালে ইহসংসার হইতে বিদায় লইতে হয়—অতএব আমি তাঁহাকে অন্তরের সহিত মার্জ্জনা করিলাম।

ছাতাটি দেখিবামাত্র ছুটিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম। মা তখন দিদিমার সহিত মুখামুখী বসিয়া প্রদীপালোকে বিন্তি খেলিতেছিলেন। ঝুপ্ করিয়া একপাশে শুইয়া পড়িলাম। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে?" আমি মুখ হাঁড়ির মত করিয়া কহিলাম, "আমার অসুখ করিয়াছে, আজ আর আমি মাষ্টারের কাছে পড়িতে যাইব না।"

আশা করি, অপ্রাপ্তবয়স্ক কেহ আমার এ লেখা পড়িবে না, এবং ইস্কুলের কোন সিলেক্‌শন বহিতে আমার এ লেখা উদ্ধৃত হইবে না। কারণ, আমি যে কাজ করিয়াছিলাম তাহা নীতি

বিরুদ্ধ এবং সে জন্য কোন শাস্তিও পাই নাই। বরঞ্চ আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল।

মা চাকরকে বলিয়া দিলেন—"আজ তবে থাক্, মাষ্টারকে যেতে বলে' দে!"

কিন্তু তিনি যেরূপ নিরুদ্বিগ্নভাবে বিস্তি খেলিতে লাগিলেন, বেশ বোঝা গেল মা তাঁহার পুত্রের অসুখের উৎকট লক্ষণগুলি মিলাইয়া দেখিয়া মনে মনে হাসিলেন; আমিও মনের সুখে বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া খুব হাসিলাম—আমাদের উভয়ের মন উভয়ের কাছে অগোচর রহিল না।

কিন্তু সকলেই জানেন, এ প্রকারের অসুখ অধিকক্ষণ স্থায়ী করিয়া রাখা রোগীর পক্ষে বড়ই দুষ্কর। মিনিটপাঁনেক না যাইতে যাইতে দিদিমাকে ধরিয়া পড়িলাম—দিদিমা, একটা গল্প বল। দুই চারিবার কোন উত্তর পাওয়া গেল না। মা বলিলেন, "হোস্ বাছা, খেলাটা আগে শেষ করি!"

আমি কহিলাম, "না, মা, খেলা তুমি কাল শেষ কোরো, আজ দিদিমাকে গল্প বল্‌তে বল না!"

মা কাগজ ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, "যাও খুড়ি! উহার সঙ্গে এখন কে পারিবে!" মনে মনে হয় ত ভাবিলেন—আমার ত কাল মাষ্টার আসিবে না, আমি কালও খেলিতে পারিব।

আমি দিদিমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া একেবারে মশারির মধ্যে বিছানার উপরে গিয়া উঠিলাম। প্রথমে খানিকটা পাশ-বালিশ জড়াইয়া, পা ছুঁড়িয়া, নড়িয়া-চড়িয়া, মনের আনন্দ সম্বরণ করিতে গেল—তার পরে বলিলাম—গল্প বল।

তখনো ঝুপ্‌ঝুপ্ করিয়া বাহিরে বৃষ্টি পড়িতেছিল—দিদিমা মৃদুস্বরে আরম্ভ করিলেন—এক যে ছিল রাজা।

তাহার এক রাণী। আঃ, বাঁচা গেল। সুয়ো এবং দুয়ো রাণী শুনিলেই বুকটা কাঁপিয়া উঠে—বুঝিতে পারি দুয়ো হতভাগিনীর বিপদের আর বড় বিলম্ব নাই। পূর্ব্ব হইতে মনে বিষম একটা উৎকণ্ঠা চাপিয়া থাকে।

যখন শোনা গেল আর কোন চিন্তার বিষয় নাই, কেবল রাজার পুত্রসন্তান হয় নাই বলিয়া ব্যাকুল হইয়া আছে এবং দেবতার নিকটে প্রার্থনা করিয়া কঠিন তপস্যা করিবার জন্য বনগমনে উদ্যত হইয়াছে, তখন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। আমার পুত্রসন্তান না হইলে আমি ত দুঃখিত হইবার কোন কারণ দেখি না এবং যদি কিছুর জন্যে বনে যাইবার কখনো আবশ্যক হয় সে কেবল মাষ্টারের কাছ হইতে পালাইবার জন্য।

রাণী এবং একটি বালিকা-কন্যা ঘরে ফেলিয়া রাজা তপস্যা করিতে চলিয়া গেল। এক বৎসর দুই বৎসর করিয়া ক্রমে বারো বৎসর হইয়া যায় তবু রাজার আর দেখা নাই।

এ দিকে রাজকন্যা ষোড়শী হইয়া উঠিয়াছে। বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইয়া গেল কিন্তু রাজা ফিরিল না।

মেয়ের মুখের দিকে চায়, আর রাণীর মুখে অন্নজল রুচে না। আহা, আমার এমন সোণার মেয়ে কি চিরকাল আইবড় হইয়া থাকিবে? ওগো আমি কি কপাল করিয়াছিলাম?

অবশেষে রাণী রাজাকে অনেক অনুনয় করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, আমি আর কিছু চাহি না, তুমি একদিন কেবল আমার ঘরে আসিয়া খাইয়া যাও।

রাজা বলিলেন, আচ্ছা।

রাণী ত সেদিন বহুযত্নে চৌষট্টি ব্যঞ্জন স্বহস্তে রাঁধিলেন এবং সমস্ত সোণার থালে ও রূপার বাটিতে সাজাইয়া চন্দনকাষ্ঠের

পিঁড়ি পাতিয়া দিলেন। রাজকন্যা চামর হাতে করিয়া দাঁড়াইলেন।

রাজা আজ বারো বৎসর পরে অন্তঃপুরে ফিরিয়া আসিয়া খাইতে বসিলেন। রাজকন্যা রূপে আলো করিয়া দাঁড়াইয়া চামর করিতে লাগিলেন।

মেয়ের মুখের দিকে চায় আর রাজার খাওয়া হয় না। শেষে রাণীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হাঁ গো রাণী, এমন সোণার প্রতিমা লক্ষ্মীঠাকরুণটির মত এ মেয়েটি কে গা? এ কাহাদের মেয়ে?

রাণী কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, হা আমার পোড়া কপাল! উহাকে চিনিতে পারিলে না? ও যে তোমারি মেয়ে!

রাজা বড় আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—আমার সেই সেদিনকার এতটুকু মেয়ে আজ এত বড়টি হইয়াছে?

রাণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—তা' আর হইবে না? বল কি, আজ বারো বৎসর হইয়া গেল!

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—মেয়ের বিবাহ দাও নাই?

রাণী কহিলেন—তুমি ঘরে নাই উহার বিবাহ কে দেয়? আমি কি নিজে পাত্র খুঁজিতে বাহির হইব?

রাজা শুনিয়া হঠাৎ ভারি শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বলিলেন—রোস, আমি কাল সকালে উঠিয়া রাজদ্বারে যাহার মুখ দেখিব তাহারই সহিত উহার বিবাহ দিয়া দিব।

রাজকন্যা চামর করিতে লাগিলেন। রাজার আহার হইয়া গেল।

পরদিন ঘুম হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিয়া রাজা দেখিলেন একটি ব্রাহ্মণের ছেলে রাজবাড়ির বাহিরে জঙ্গল হইতে শুক্‌না কাঠ সংগ্রহ করিতেছে। তাহার বয়স বছর সাত আট হইবে।

রাজা বলিলেন, ইহারই সহিত আমার মেয়ের বিবাহ দিব। রাজার হুকুম কে লঙ্ঘন করিতে পারে, তখনি ছেলেটিকে ধরিয়া তাহার সহিত রাজকন্যার মালা বদল করিয়া দেওয়া হইল।

আমি এই জায়গাটাতে দিদিমার খুব কাছে ঘেঁষিয়া গিয়া নিরতিশয় ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম—তার পরে? নিজেকে সেই সাত আট বৎসরের সৌভাগ্যবান্ কাঠকুড়ানে ব্রাহ্মণের ছেলের স্থলাভিষিক্ত করিতে কি একটুখানি ইচ্ছা যায় নাই? যখন সেই রাত্রে ঝুপ্‌ঝুপ্ বৃষ্টি পড়িতেছিল, মিট্‌মিট্ করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছিল এবং গুন্‌গুন্ স্বরে দিদিমা মশারির মধ্যে গল্প বলিতেছিল, তখন কি বালকহৃদয়ের বিশ্বাসপরায়ণ রহস্যময় অনাবিষ্কৃত এক ক্ষুদ্র প্রান্তে এমন একটি অত্যন্ত সম্ভবপর ছবি জাগিয়া উঠে নাই যে, আমিও একদিন সকাল বেলায় কোথায় এক রাজার দেশে রাজার দরজায় কাঠ কুড়াইতেছি, হঠাৎ একটি সোণার প্রতিমা লক্ষ্মীঠাকরুণটির মত রাজকন্যার সহিত আমার মালা বদল হইয়া গেল; মাথায় তাহার সীঁথি, কাণে তাহার দুল, গলায় তাহার কণ্ঠী, হাতে তাহার কাঁকণ, কটিতে তাহার চন্দ্রহার, এবং আল্‌তা-পরা দুটি পায়ে নূপুর ঝম্‌ঝম্ করিয়া বাজিতেছে!

কিন্তু আমার সেই দিদিমা যদি লেখকজন্মধারণ করিয়া আজ-কালকার সেয়ানা পাঠকদের কাছে এই গল্প বলিতেন তবে ইতি-মধ্যে তাঁহাকে কত হিসাব দিতে হইত? প্রথমতঃ রাজা যে বারো বৎসর বনে বসিয়া থাকে এবং ততদিন রাজকন্যার বিবাহ হয় না, একবাক্যে সকলেই বলিত ইহা অসম্ভব। সেটুকুও যদি কোন গতিকে গোলমালে পার পাইয়া যাইত কিন্তু কন্যা

বিবাহের জায়গায় বিষম একটা কলরব উঠিত। এক ত, এমন কখন হয় না, দ্বিতীয়তঃ, সকলেই আশঙ্কা করিত ব্রাহ্মণের ছেলের সহিত ক্ষত্রিয় কন্যার বিবাহ ঘটাইয়া লেখক নিশ্চয়ই ফাঁকি দিয়া সমাজবিরুদ্ধ মত প্রচার করিতেছেন। কিন্তু পাঠকরা তেমন ছেলেই নয়। তাহারা তাঁহার নাতি নয় যে, সকল কথা চুপ করিয়া শুনিয়া যাইবে। তাহারা কাগজে সমালোচনা করিবে। অতএব একান্তমনে প্রার্থনা করি, দিদিমা যেন পুনর্ব্বার দিদিমা হইয়াই জন্মগ্রহণ করেন, হতভাগ্য নাতিটার মত তাঁহাকে গ্রহদোষে যেন লেখক হইতে না হয়।

আমি একেবারে পুলকিত কম্পান্বিত হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, তার পরে?

দিদিমা বলিতে লাগিলেন—তার পরে রাজকন্যা মনের দুঃখে তাহার সেই ছোট স্বামীটিকে লইয়া চলিয়া গেল।

অনেক দূরদেশে গিয়া একটি বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া সেই ব্রাহ্মণের ছেলেটিকে, আপনার সেই অতি ক্ষুদ্র স্বামীটিকে, বড় যত্নে মানুষ করিতে লাগিল।

—আমি একটুখানি নড়িয়া-চড়িয়া পাশবালিশ আর একটু সবলে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলাম, তার পরে?

দিদিমা কহিলেন, তার পরে, ছেলেটি পুঁথি হাতে প্রতিদিন পাঠশালে যায়।

এমনি করিয়া গুরু মহাশয়ের কাছে নানা বিদ্যা শিখিয়া ছেলেটি ক্রমে যত বড় হইয়া উঠিতে লাগিল ততই তাহার সহ-

পাঠীরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, ঐ যে সাতমহল বাড়িতে তোমাকে লইয়া থাকে সেই মেয়েটি তোমার কে হয়?

ব্রাহ্মণের ছেলে ত ভাবিয়া অস্থির—কিছুতেই ঠিক করিয়া বলিতে পারে না মেয়েটি তাহার কে হয়। একটু একটু মনে পড়ে একদিন সকালে রাজবাড়ির দ্বারের সম্মুখে শুক্‌না কাঠ কুড়াইতে গিয়াছিল—কিন্তু সেদিন কি একটা মস্ত গোলমালে কাঠকুড়ানো হইল না। সে অনেক দিনের কথা, সে কি কিছু মনে আছে?

এম্‌নি করিয়া চারি পাঁচ বৎসর যায়। ছেলেটিকে রোজই তাহার সঙ্গীরা জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা ঐ যে সাতমহলা বাড়িতে পরমা রূপসী মেয়েটি থাকে ও তোমার কে হয়?

ব্রাহ্মণ একদিন পাঠশালা হইতে মুখ বড় বিমর্ষ করিয়া আসিয়া রাজকন্যাকে কহিল, আমাকে আমার পাঠশালার পোড়োরা প্রতিদিন জিজ্ঞাসা করে—ঐ যে সাতমহলা বাড়িতে যে পরমা সুন্দরী মেয়েটি থাকে সে তোমার কে হয়? আমি তাহার কোন উত্তর দিতে পারি না। তুমি আমার কে হও, বল?

রাজকন্যা বলিল, আজিকার দিন থাক্ সে কথা আর এক দিন বলিব।

ব্রাহ্মণের ছেলে প্রতিদিন পাঠশালা হইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, তুমি আমার কে হও?

রাজকন্যা প্রতিদিন উত্তর করে, সে কথা আজ থাক্ আর এক দিন বলিব।

এম্‌নি করিয়া আরো চার পাঁচ বৎসর কাটিয়া যায়। শেষে ব্রাহ্মণ একদিন আসিয়া বড় রাগ করিয়া বলিল—আজ যদি তুমি না বল তুমি আমার কে হও তবে আমি তোমার এই সাতমহল বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।

তখন রাজকন্যা কহিলেন—আচ্ছা কাল নিশ্চয়ই বলিব।

পরদিন ব্রাহ্মণ-তনয় পাঠশালা হইতে ঘরে আসিয়াই রাজকন্যাকে বলিল—আজ বলিবে বলিয়াছিলে, তবে বল ?

রাজকন্যা বলিলেন, আজ রাত্রে আহার করিয়া যখন তুমি শয়ন করিবে তখন বলিব।

ব্রাহ্মণ বলিল—আচ্ছা। বলিয়া সূর্য্যাস্তের অপেক্ষায় প্রহর গণিতে লাগিল।

এদিকে রাজকন্যা সোণার পালঙ্কে একটি ধব্‌ধবে ফুলের বিছানা পাতিলেন,—ঘরে সোণার প্রদীপে সুগন্ধ তেল দিয়া বাতি জ্বালাইলেন, এবং চুলটি বাঁধিয়া নীলাম্বরী কাপড়টি পরিয়া সাজিয়া বসিয়া প্রহর গণিতে লাগিলেন; কখন রাত্রি আসে!

রাত্রে তাঁহার স্বামী কোন মতে আহার শেষ করিয়া শয়নগৃহে সোণার পালঙ্কে ফুলের বিছানায় গিয়া শয়ন করিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, আজ শুনিতে পাইব এই সাতমহলা বাড়িতে যে সুন্দরীটি থাকে সে আমার কে হয়!

রাজকন্যা তাঁহার স্বামীর পাত্রে প্রসাদ খাইয়া ধীরে ধীরে শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। আজ বহুদিন পরে প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে এই সাতমহলা অট্টালিকার একমাত্র অধীশ্বরী আমি তোমার কে হই।

বলিতে গিয়া বিছানায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন ফুলের মধ্যে সাপ ছিল, তাঁহার স্বামীকে কখন্ দংশন করিয়াছে। স্বামীর মৃত দেহখানি মলিন হইয়া সোণার পালঙ্কে পুষ্পশয্যায় পড়িয়া আছে।

—আমার যেন বক্ষস্পন্দন হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। আমি কম্পিত স্বরে বিবর্ণমুখে জিজ্ঞাসা করিলাম—তার পরে কি হইল!

দিদিমা বলিতে লাগিলেন—তার পরে—

—কিন্তু সে কথায় আর কাজ কি? সে যে আরো অসম্ভব! গল্পের প্রধান নায়ক সর্পাঘাতে মারা গেল, তবুও তার পরে? বালক তখন জানিত না, মৃত্যুর পরেও একটা তার-পরে থাকিতে পারে বটে, কিন্তু সে তার-পরের উত্তর কোন দিদিমার দিদিমাও দিতে পারে না। বিশ্বাসের বলে সাবিত্রী মৃত্যুরও অনুগমন করিয়াছিলেন। শিশুরও প্রবল বিশ্বাস. এইজন্য সে মৃত্যুর অঞ্চল ধরিয়া ফিরাইতে চায়; কিছুতেই মনে করিতে পারে না যে, তাহার মাষ্টারবিহীন এক-সন্ধ্যাবেলাকার এত সাধের গল্পটি হঠাৎ একটি সর্পাঘাতেই মারা গেল! কাজেই দিদিমাকে সেই মহাপরিণামের চিররুদ্ধ গৃহ হইতে গল্পটিকে আবার ফিরাইয়া আনিতে হয়। কিন্তু এত সহজে যেটি সাধন করেন, এমন অনায়াসে;—কেবল হয় ত একটা কলার ভেলায় ভাসাইয়া দিয়া গুটি দুই মন্ত্র পড়িয়া মাত্র—যে, সেই ঝুপ্‌ঝুপ্‌ বৃষ্টির রাত্রে স্তিমিত প্রদীপে বালকের মনে মৃত্যুর মূর্ত্তি অত্যন্ত অকঠোর হইয়া আসে, তাহাকে এক রাত্রের সুখনিদ্রার চেয়ে বেশি মনে হয় না। গল্প যখন ফুরাইয়া যায়, আরামে শ্রান্ত দুটি চক্ষু আপনি মুদিয়া আসে, তখনো ত শিশুর ক্ষুদ্র প্রাণটিকে একটি স্নিগ্ধ নিস্তব্ধ নিস্তরঙ্গ স্রোতের মধ্যে সুষুপ্তির ভেলায় করিয়া ভাসাইয়া দেওয়া হয়, তার পরে ভোরের বেলায় কে দুটি মায়ামন্ত্র পড়িয়া তাহাকে এই জগতের মধ্যে জাগ্রত করিয়া তোলে!

কিন্তু যাহার বিশ্বাস নাই, যে ভীরু এ সৌন্দর্য্যরসাস্বাদনে জনাও এক ইঞ্চি পরিমাণ অসম্ভবকে লঙ্ঘন করিতে পরাঙ্মুখ হয়, তাহার কাছে কোন কিছুর আর তার-পরে নাই, সমস্তই হঠ

অসময়ে এক অসমাপ্তিতে সমাপ্ত হইয়া গেছে। ছেলেবেলায় সাতসমুদ্র পার হইয়া মৃত্যুকেও লঙ্ঘন করিয়া গল্পের যেখানে যথার্থ বিরাম, সেখানে স্নেহময় সুমিষ্টস্বরে শুনিতাম—

আমার কথাটি ফুরোলো,
নটে গাছটি মুড়োলো।

এখন বয়স হইয়াছে, এখন গল্পের ঠিক মাঝখানটাতে হঠাৎ থামিয়া গিয়া একটা নিষ্ঠুর কঠিন কণ্ঠে শুনিতে পাই—

আমার কথাটি ফুরোলো না,
নটে গাছটি মুড়োলো না।
কেন্‌রে নটে মুড়োলি নে কেন,
তোর গরুতে—

দূর হোক গে, ঐ নিরীহ প্রাণীটির নাম করিয়া কাজ নাই, আবার কে কোন্ দিক হইতে গায়ে পাতিয়া লইবে!

কন্যাদায়।

ভাই, তোমার বড় মেয়েটীর বিবাহের একটী সম্বন্ধ করিবার জন্য আমাকে যে চিঠি লিখিয়াছ তাহা পাইয়াছি। তবে এত-দিনে আমাদের মনে পড়িয়াছে, এতদিন পরে দেশে আসিতে ইচ্ছা হইয়াছে! তুমি বিদেশে থাক—বিদেশ তোমার ভাল লাগে—দেশে আসিতে ইচ্ছা হয় না;—আমাদের মায়া ও স্নেহের শ্রব একেবারে কাটাইয়াছ বলিয়া তোমার উপর কত মান রিয়াছি কিন্তু এখন দেশে আসিয়া মেয়েটীর বিবাহ দেখে স্থির য়াছ শুনিয়া হরিষে বিষাদ হইতেছে। তোমার চিঠির ভাবে

বুঝিতেছি যে, এখনো তুমি তেমনি ছেলেমানুষ আছ—এখনো তোমরা সেই সকল সঙ্গিনী মিলিয়া বনভোজন, যমুনা-স্নান, দেব-দর্শন করিয়া থাক। এখানে ভাই, আমাদের সে সব কিছু নাই। কেবল নিয়মিত রাঁধা-বাড়া, খাওয়া শোয়া এবং অন্ন-চিন্তা ছাড়া আর কোন রকম আমোদ-আহ্লাদ নাই। এমন কি, আমার শ্বশুরবাড়ি আবার গঙ্গাস্নানে যাইবারও নিয়ম নাই। মেয়েটীর শীঘ্র বিয়ে হবে বলে' দেখ্‌ছি তোমার বড়ই আহ্লাদ হ'য়েছে—তোমার প্রতি অক্ষরে অক্ষরে যেন তোমার সেই হাসিভরা কচি মুখখানা ফুটিয়া উঠিতেছে দেখিতে পাইতেছি। আহা ভাই, আশীর্ব্বাদ করি, ললিতার বিয়ে দিয়ে যেন তোমার মায়ের মত কুটুম্ব এবং পুত্রের মত জামাতা হয়।

ললিতার জন্য বর এখানে যথাসাধ্য খোঁজা হইতেছে, কিন্তু আজও তোমার ফরমাস মত গহনা তাহার জন্য প্রস্তুত করিতে দেওয়া হয় নাই। আর তোমাকেও লিখিতেছি যে, তুমিও আপাততঃ সেখানে গহনা প্রস্তুত করাইতে বারণ করিবে। কারণ, আজকাল এখানে নগদ টাকা ধরিয়া লওয়া নিয়ম হইয়াছে। এখন যে রকম সব বিবাহের নিয়ম হইয়াছে, তাহার কতক কতক তোমায় লিখি, তা'হ'লে তুমি সব বুঝিতে পারিবে।

এদেশে ক্রমশঃ দেখিতেছি যে, পুত্রসন্তানের মূল্য হুহু শব্দে বাড়িতেছে। যেমন ছেলের দাম বাড়িতেছে তেমনি মেয়ের দাম কমিতেছে। মেয়েদের নিজস্ব সম্পত্তির মধ্যে এক রূপ, তা'এখন শুদ্ধ রূপে আর কিছু হয় না। এক একটী কুমারী কন্যা এক একটি বিশমনী বোঝার স্বরূপ পিতামাতার জ্ঞান হয়—একটীর বিবাহ দেন, একটু হাঁপ ছাড়িয়া সুস্থ বোধ করেন।

সকল রকম বরের মধ্যে পাশ-করা বরের দর বড় বেশি।

যদি একটী পাশ-করা এবং দরিদ্র হন, তবে দেড় হাজার দুই হাজারে বিবাহ হইতে পারে। গৃহস্থ হইলে চার পাঁচ হাজার—ধনী হইলে পাঁচ সাত দশ হাজার। পিতা উপার্জ্জন করিতেছেন, ছেলে এলে কি বিয়ে, সে স্থলে দর বড় ভারি, সাত আট হাজার হাতে না করিয়া সেস্থানে সম্বন্ধ করিবার যো নাই। পূর্ব্ব সালঙ্কারা কন্যাদান বিধি ছিল, এখন নিরলঙ্কারা কন্যা ও নগদ টাকা বা কোম্পানীর কাগজসহ বিবাহ বিধি হইয়াছে। শুনিয়াছি, কোন কোন বুদ্ধিমান বর যতক্ষণ না টাকা গণনা শেষ হয়, ততক্ষণ ছালনা-তলার পিঁড়ায় উঠিয়া দাঁড়ান না; ভয়, পাছে কন্যাটী সমর্পণ করিয়া কন্যাকর্ত্তা টাকা কিছু কম দেন—তখন ত ঐ অপদার্থ মেয়েটা ফেরৎ যাবে না।

তুমি আজ তোমার এত আদরের, এত সাধের মেয়েটীকে পরের হাতে সঁপিয়া দিতে বসিয়াছ, তুমি নিজের অবস্থামত যে তাহাকে সাজাইবে তাহার আর যো নাই। তোমার ইচ্ছা যে, আপাততঃ তাহার যাহা কিছু আবশ্যক সকলি তুমি তাহাকে দাও। যাঁদের ঘরে তোমার মেয়ের বিবাহ হইবে, তাঁহাদের রীতিনীতি স্বভাবচরিত্র কেমন—তাঁরা মাদুর পেতে শুতে ভালবাসেন কিম্বা খাটে গদিতে শোয়া পসন্দ করেন তাহার কিছুই তোমরা জান না—অথচ তোমার মেয়ের খাটে না শুলে ঘুম হয় না, তাই তুমি মেয়ে জামাই চিরজন্ম ব্যবহার করিবে বলিয়া ভাল খাট বিছানা ফরমাস্ দিয়া তৈরি করাইতে লিখিয়াছ—কিন্তু হায়, তোমার সে সাধ পূর্ণ করা দুঃসাধ্য বোধ হইতেছে। যে ভাগ্যবান তোমার বেহাই হইবেন, তিনি খাটের পরিবর্ত্তে নগদ দেড়শত টাকা চাহিবেন—তিনি কহিবেন, "এখনকার যেমন সব টাকা ধরে' নওয়া

নিয়ম হ
ধরিয়া
তা' হবে
দাও,—
খাট বিছ
দের টা
গহনা গ
হিসাবে
টাকাও
গহনা
ভুলিয়া
দিলে স্ব
তাহার
টাকার
স্থলে গ
বরপক্ষ
অনেক
ব্যবহার্য
বধূর পি
করেন।
কন্যাদা
সমর্পণ
ভাল ক
কন্যা
বিবাহ

ও পুত্রের বরসজ্জার দ্বারা অনায়াসে নিজ কন্যার বিবাহ
হয়। এ বিষয়ে মাঝে থেকে তোমাকে একটী ঘরের
দিই শুন।—তোমার মনে আছে বোধ হয় যে, দুই বৎসর
তোমাকে আমার সর্ব্বকনিষ্ঠ বোন কমলার বিবাহের
লিখিয়াছিলাম। বাবা তাঁহার এই শেষ কন্যার বিবাহ
সাধ্যাতীত খরচপত্র করিয়া তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন।
ার ভগ্নীপতির পিতামাতা নাই বলিয়া তাঁহারা কেহ নগদ
কার জন্য অনুরোধ করেন নাই। তবে বরের খুড়ি জেঠাই বহুল
ত খুব লম্বা-চওড়া রকম গহনাপত্রের ফর্দ্দ আসিয়াছিল।
া হউক, বাবা তাহাকে সুন্দর সুন্দর ব্যবহারোপযোগী সমস্ত
না ও বরসজ্জা দিয়াছিলেন। মা বলিতেন, "দেখো যেন কোন
না বা জিনিস যেন খারাপ হয় না। আমার কমলা যেন
নাগুলি আজন্মকাল ব্যবহার করিতে পারে ও জিনিসপত্র
াগ করিতে পারে।" কমলাকে গহনা ব্যতীত সুন্দর সুন্দর
্যবান শাড়ী ও গৃহসজ্জার নিমিত্ত খেলেনা ও আলমারী,
দা শাড়ী রেসমী শাড়ী এবং জরীর শাড়ী ইত্যাদি রাখিবার
্য পৃথক পৃথক তোরঙ্গ, খাট-বিছানা সকলি দিয়াছিলেন।
কেও উৎকৃষ্ট ঘড়ি, আংটী, দু' তিনটী চেন, রূপার বাসন
ভৃতি দিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। এখন সেই সকল
ধের জিনিসের দশা কি হইয়াছে শুন। পরশু দিন, ভাগুর-
র বিবাহ-শেষে নিরাভরণা কমলা একটীমাত্র তোরঙ্গে
চারিখানি শাদা কাপড় লইয়া বাপের বাড়ি আসি-
ছে। কমলার ভাশুর, তাহার সমস্ত গহনাপত্র লইয়া নিজ
্যাটী পার করিয়াছেন। নিত্য পরিহিত তিন খানি সোণার
লা ও পায়ের চারিগাছি মল ব্যতীত, তাহার আর সমস্তই

গিয়াছে। তাহার যতগুলি গহনা, যতগুলি কাপড় জামা, খেলেনা, খেলেনার বাক্স, আলমারী খাট প্রভৃতি গৃহসজ্জাসামগ্রী ছিল সমস্তই এখন হইতে তাহার ভাশুরঝির সম্পত্তি হইল। আমার ভগ্নীপতি তাঁহার নিজের ঘরসজ্জার সামগ্রীগুলি দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই—কিন্তু ছেলেমানুষ কমলার গহনা, কাপড় ও খেলেনাগুলি পর্য্যন্ত দিতে তাঁহার মনে মনে ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তাঁহার কথা কহিবার যো কি! একদিন তিনি খুড়ি জেঠাই মহলে ইঙ্গিতে ইহার কিছু আভাস দিয়াছিলেন, অমনি তাঁহারা কহিয়া উঠিলেন—"অমন কথা বলিস্‌নি—হ্যাঁ রে, স্ত্রীর গহনা আগে, না ভাইঝির বিয়ে আগে? কলি-কালের সকলি একতরো।" কমলার বড় যা কহিলেন, "ঠাকুর-পোর এখন ষোলআনা টান্ ছোটবৌএর উপর, এখন কি আর রত্নময়ীর উপর মায়া আছে!" কথাটা ক্রমে কমলার শ্বশুরও নানা অলঙ্কারে সজ্জিত-রকমে শুনিলেন। তিনি গায়ে-হলুদের দিন রাগে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া কখনো রত্নময়ীর অঙ্গ হইতে গহনা খুলিয়া, "এই নে তোর স্ত্রীর গহনা" বলিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেন, কখনো বলেন, "বৌটাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও, আমি ও ভাই এবং ভাদ্রবধূর মুখ দেখিতে চাহি না"—হুলুস্থুল ব্যাপার! আমার ভগ্নীপতি ভয়ে লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া অনেক কষ্টে হাতে পায়ে ধরিয়া ভ্রাতাকে শান্ত করেন। কমলা তো ভয়ে সারা—তাহার বড় যা স্বামীকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, "ওগো ঠাকুরপোর কিছু দোষ নেই, ছোটবৌ যেমন শিখিয়ে দিয়েছে, তেমনি বলেছে। শ্বশুরবাড়িতে শাশুড়ি মায় জানিয়ে, দিবারাত্র কাণে মন্ত্র পড়ছেন যেন মেয়ের গহনা দায়—তাতেই ঠাকুর পো অমন হ'য়েছেন।" মা বাপ কখনই

বিষয়ে কোন কথা কহেন না, কারণ, তাঁহারা জানেন যে, যখন মেয়ে দান করিয়াছেন তখন তাহারা যাহা ইচ্ছা করিবে, তাঁহাদের কথা থাকিবে না। আর বেচারী কমলা সবে এই এগার বৎসরের! সে আজও স্বামীর সহিত ভাল করিয়া কথা কহে না। গহনা কাপড়ের প্রতি আজও তার তেমন টান পড়ে নাই—তাহার এত জিনিসের মধ্যে যে খেলেনাসুদ্ধ আলমারীটি গিয়াছে এই কষ্টই তাহার বড় মনে লাগিয়াছে। আহা, তাহাতে তাহার কতদিনের, কত দেশদেশান্তরের পুতুল খেলেনা সঞ্চিত ছিল, সেইগুলির সহিত তাহার কত স্নেহস্মৃতি গাঁথা ছিল! কত আত্মীয় স্বজন যত্ন করিয়া, আদর করিয়া তাহার জন্য ঐগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কমলা বিশেষ যত্নে সেইগুলি রাখিত ঢাকিত, তাহার নিকট সেইগুলি অমূল্য—তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহার মর্ম্মান্তিক কষ্ট হইয়াছে। আমার ভগ্নীপতি জানিতেন যে, সেগুলি কমলার বড় যত্নের, এবং তাঁহারও ঐ সকলের মধ্যে একটু যত্ন নিহিত ছিল—কারণ, তাহার মধ্যে কতক কতক তিনি নিজে এবং তাঁহার বন্ধুরা কমলাকে উপহার দিয়াছিলেন। তাই তিনি কহিয়াছিলেন, "কমলার খেলেনা কাপড়-চোপড় নিয়ে কাজ নেই, দাদা ত কিছু দিচ্ছেন না, তিনি ঐ সকল আবশ্যকীয় জিনিসগুলি কিনে দিন, আর অত ভারি ভারি রূপার দান এবং ভারি ভারি গহনা রত্নময়ীকে দিবার আবশ্যক নাই। ঐ গহনার কতক এবং রূপার বাসন কতক বিক্রয় করিয়া রত্নময়ীর হাল্কা করিয়া গহনা গড়ান' হউক্—যা যখন অত চাহিতেছে না তখন আমাদের অত দেবার আবশ্যক কি? এইরূপ করিলে কতক গহনা উহার থাকে।" যুক্তিসঙ্গত কথাতে যখন এতটা লঙ্কাকাণ্ড উপস্থিত হইল,

দেখিলেন, তখন তিনি নিতান্ত যমোকষ্টে কমলাকে কহিলেন, "তোমার যাহা কিছু আছে সকলি উঁহাদের ফেলে দাও; আমি উপার্জ্জনক্ষম হইয়াছি, আমি ক্রমে ক্রমে তোমাকে সকলি দিব।" হায়, তিনি সকলি দিবেন সত্য, কিন্তু সেই সকল জিনিসে আর তাহার পিতামাতার স্নেহ গাঁথা থাকিবে না! তাই কি কমলার শ্বশুরবাড়ি একটু যত্ন আছে! যত্নের কথা উঠিলেই সকলে কহেন—"শ্বশুর শাশুড়ি নেই, আদর যত্ন তত্ত্বতাবাস্ আর কে করবে? তিনি ত জেনেশুনেই মেয়ে দিয়েছেন।" কমলা যে নিতান্ত ছেলেমানুষ, এ কথা কাহারও মনে হয় না। তাহাকে পুতুল খেলিতে দেখিলে, "বেশ্ বুড়োমাগীর কি হ'চ্ছে দেখ!" বলিয়া উপহাস করিতে কেহ কুণ্ঠিত হইতেন না। কমলার ভাশুরঝি তাহা হইতে বয়সে কিছু বড়, সে এখনো ছেলেমানুষ, কিন্তু কমলার নাম বুড়োমাগী! কমলার ভাশুরঝি এখনো প্রাতে উঠিয়া খাবার চাহে, বিসর্জ্জনের দিন গাড়ি করিয়া ডাসান্ দেখিতে যায়—সে পুতুল কিনিবার জন্য আবদার করে, না পাইলে অভিমান করে। একদিন সে কমলার নিকট কি একটী ছোট পুতুল চাহে, কমলা বলে যে, "না ভাই, ওটী আমার সেজবৌএর ছেলে, ওটী দেব না, বরং একটী কাঁচের পুতুল দেব এখন।" এই আর কোথা আছে! রত্নময়ী কাঁদিয়া অস্থির, সকলের কাছে নালিশ করিল যে, "কাকীমার কাছে একটী পুতুল চাইলুম তা' কাকীমা দিলে না।" তখন কমলার লাঞ্ছনার আর সীমা রহিল না,—কেহ কহেন, "কি ছোটলোকের মেয়ে!" কেহ কহেন, "পুতুল ত ভারি, পয়সায় আটটা বেণেপুতুল, তার আবার কথা!" কেহ কহিলেন, "ও বৌ কাউকে নিয়ে ঘর করতে পারে না।" কমলা তখন অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া তাহার

পুতুলের রাক্‌সটী রত্নময়ীকে দান করে, কিন্তু তবুও তাহার উদারতা তাহাতে কিছুমাত্র প্রকাশ পায় নাই। রুচি মেয়ে যে কতখানি ত্যাগস্বীকার করিল তাহা কেহ বুঝিল না, মাঝে থেকে সেই অবধি তাহার পুতুল-খেলা শেষ হইয়াছে।

কথায় কথায় অনেক বাজে কথায় আসিয়া পড়িয়াছি, এখন আসল কথায় আসি। সত্য বটে যে, গহনা আগে, না ভাশুরঝির বিয়ে আগে, সত্য বটে যে, স্বামী, দেবর, ভাশুর, শ্বশুর বর্ত্তমান হইলে বধূর গহনা লইয়া মান রক্ষা করাতে কোন কথা নাই—কিন্তু তাই বলিয়া এমন নির্দ্দয় ব্যবহার অমার্জ্জনীয়। তুমি লিখেছ, কন্যা দেখাইবার যদি তেমন আবশ্যক হয়, তবে বিবাহের মাস ছয়েক পূর্ব্বে তুমি দেশে আসিবে। কিন্তু আমি দেখিতেছি তাহার বিশেষ আবশ্যক নাই, কারণ, এখন মেয়ে দেখিয়া সম্বন্ধ স্থির হয় না। পূর্ব্বে ছেলের দরদাম, অর্থাৎ পাওনা ঠিক না হইলে, কেহ মেয়ে দেখিতেও আসেন না। বরকর্ত্তা কহেন, "আগে পাওনা ঠিক হউক, পরে তখন মেয়ে দেখে আসা যাবে।" তাই আমরা ভাই, বর পসন্দ করিয়া দেনা-পাওনা ঠিক করিয়া, দিন স্থির করিয়া রাখিব, তুমি সময়-মত দেশে আসিয়া বিবাহ সম্পন্ন করিবে। আমাদের লণিতার মত সুন্দর মেয়ে দেখিয়া কেহ অপসন্দ করিবেন না, তবে টাকা যে কত লাগিবে তাহার কিছুই স্থির করিয়া এখন লিখিতে পারিলাম না। যদিও বরকর্ত্তা অনুগ্রহ করে তোমার কাছ থেকে মেয়ের গহনার টাকাসুদ্ধ নগদ না ধরিয়া লন, তথাপি বরসজ্জার ও বিবাহসামগ্রীর টাকা নগদ দিতেই হইবে। হয় ত তাহা ছাড়া আবার বরসজ্জাও দিতে হইবে। ফুলশয্যার টাকাও নগদ ধরিয়া না হইয়া থাকে। বিবাহের মধ্যে আর স্নেহ বা প্রেম নাই—

বর নাই, কন্যা
পিতার টাকা।
জন্যই ফুলশয্যার
বন্ধুবান্ধবের স
সহিত আহারাদি
শয়ন করিয়া, ত
কন্যার পিতা
ফুল ফল সকলই
মনে অনটনের
প্রশান্ত মনে স
তাই কন্যার পি
সে জিনিস-পাঠা
নহে—বরকর্ত্তা
নগদ টাকা গণ,
ধরে' দিয়েছেন
খাবারটী দেবে
জামাইকে আশী
ব্যাঘাত না করে'
তাঁর মেয়ে জামা
কাঁদারা কহেন—
বসনেই শয়ন কর
আবার সেই সব
ইয়া দেন। এই
হইতেছে যে, আ
আদায় করা হয়

করেন। মাঝে মাঝে এমন দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাসি-বিয়ের দিন, কন্যা বরের বাড়ি পৌঁছিবার পরেই অলঙ্কারগুলি ফেরৎ আসে। দাসী আসিয়া উপস্থিত, কি সমাচার? না, "কর্ত্তা এই গহনা ফেরৎ দিলেন, আর বল্লেন যে, তাঁর গহনার কাজ নেই, তাঁর এমন ক্ষমতা আছে যে, তিনি তাঁর বৌকে এমন পাঁচ সুট গহনা দিতে পারবেন! তা' আপনারা আর মেয়ে আন্‌তে যাবেন না—তা হ'লে সুবিধে হবে না!" সবে মাত্র বরকন্যা বিদায় করিয়া মাতা কাতর হৃদয়ে ভবিষ্যৎ ভাবিতেছেন, কুটম্বিনীরা ঘরদুয়ার গুছাইতে ব্যস্ত, কর্ত্তা গৃহসজ্জা—ঝাড় লণ্ঠন যথাস্থানে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। সন্দেশ-ওয়ালা ফুলশয্যার সন্দেশের ফরমাস্ লইতে আসিয়াছে, মালিনী ফুলের গহনার বায়নার টাকা চাহিতেছে, এমন সময় এই অলঙ্কার সমেত প্রেরিত প্রস্তাবে, যে যেখানে ছিল, সে সেইখানে নিস্তব্ধভাবে রহিল। পরে, কেন কেন, কি হয়েছে বাছা, আজকের দিন কি ওর সন্ধ্যাবেলা গহনা খুলিতে আছে!" ইত্যাদি কথা কোন মুখরা প্রতিবেশিনীর মুখ হইতে বাহির হইলে, তবে পিতামাতা বিনয় দ্বারা আসল কথাটা অবগত হয়েন। কথাটা এই গহনা ওজন করিয়া দেখা হইয়াছে যে, সোণা ভরি হিসাবে আছে এবং গহনায় অনেক পান বাদ যাইবে। সুতরাং যদি চাও তবে গহনাগুলি ফেরৎ লইয়া নগদ টাকা ধরিয়া দেওয়া হোক্। এই ত ব্যাপার! যাহা হউক, এই যে মনভঙ্গ আরম্ভ হয় ইহার শীঘ্র যোড়া লাগে না। বরের পক্ষের অমোঘ পাঠাইব না। এই অস্ত্র তাঁহারা মধ্যে মধ্যে ব্যবহার কন্যাপক্ষের এস্প্রেস্‌মুখী চাল থাকে, তবে তাঁহারা নচেৎ জন্মের মতন প্রতিমা বিসর্জ্জন দিতে হয়।

তোমার মনে আছে ভাই, ছেলেবেলা দিদিমার কাছে আমরা কত ঘুম-পাড়ানি গান শিখেছিলুম? সেইটে মনে পড়ে কি?

"আজ দুর্গার অধিবাস, কাল দুর্গার বিয়ে,
দুর্গা যাবেন শ্বশুর-বাড়ি কোন্ খান্ দিয়ে,
আম কাঁঠালের বাগান দেব ছায়ায় ছায়ায় যেতে,
সরু-ধানের চিঁড়ে দেব পথে জল খেতে।"

এখন যদি ভাই, কন্যা ছায়ায় ছায়ায় যাবে বলে', কোন মা স্নেহবশে আম কাঁঠালের বাগান দিতে চাহিতেছেন, এমন কথা যেহাই শুনিতে পান—তা হ'লে অমনি কহিবেন—"বেয়ান্, আম কাঁঠালের বাগান আর কি হবে, আমরা কলিকাতায় থাকি, এতদূরে এসে আম কাঁঠাল নিয়ে যেতে ঢের খরচ পড়বে—আর কে দেখে, কে বা শুনে, তা' দুর্গাকে আমরা ভিজে গামছা মাথায় দিয়ে নিয়ে যাব এখন, আম কাঁঠালের বাগানের দামটা আমাকে দিয়ে দাও—ও টাকা তোমার মেয়ে জামাইএরই থাকিবে।"

পুরাতন কথা আছে, লিখিলে পুঁথি ঢের বেড়ে যায়—তা' আজিকার মত আমার এই চিঠি শেষ করি—আশা করি, এই পত্রপাঠে ছেলেবেলাকার আম কাঁঠালের শ্লোকটা সকলের মনে পড়িবে, এবং আম কাঁঠালের বাগানের ছায়ার দাবীটাও যে বর কর্ত্তার ন্যায্য প্রাপ্য এই প্রথা ঘরে ঘরে প্রচলিত হইবে। এবং সকলে আমাকে চির আয়ুষ্মতী হও বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন।

সূক্ষ্মবুদ্ধির সিদ্ধান্ত অপেক্ষা সামান্য লোকের সহজ বুদ্ধির সিদ্ধান্ত অনেকটা সত্যের কাছাকাছি যায়। সহজ বুদ্ধির সিদ্ধান্ত এই যে, জ্ঞানধর্ম্ম সত্ত্বগুণের লক্ষণ; অহঙ্কার মূঢ়তা, তমোগুণের লক্ষণ; মত্ততা, চপলতা, রজোগুণের লক্ষণ। পূর্ব্বে আমরা সাদা, লাল নীল রঙের সঙ্গে সত্ত্বরজস্তমোগুণের উপমা দিয়াছি; এক্ষণে বক্তব্য এই যে, সে উপমাটির মধ্যেও আপেক্ষিকতা রহিয়াছে; তাহার সাক্ষী—সাদা বলিতে গেলে ঘোলাটে সাদা, লালচে সাদা এবং ফুটফুটে সাদা তিনই বুঝায়; লাল বলিতে ফিকে লাল, গাঢ় লাল এবং উজ্জ্বল লাল তিনই বুঝায়; নীল বলিতেও ফ্যাকাসে নীল, ঘোর নীল এবং রঙ্গীন নীল তিনই বুঝায়। গুণের ক্রমাভিব্যক্তি প্রদর্শন করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য—কিন্তু তাহা করিবার পূর্ব্বে ভূমিকাস্বরূপে গুণ-ত্রয়ের বিভিন্ন লক্ষণের পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক বিবেচনায় আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবে সত্ত্বরজস্তমোগুণের পরস্পরাপেক্ষিতার প্রতি পাঠককে পূর্ব্বাহ্নে সতর্ক করিয়া দিলাম—যেন পারিভাষা-মাত্রকেই যথেষ্ট মনে করিয়া একের গুণ অন্যেতে আরোপ না করেন। প্রকৃতির গোড়াতে যে সাম্যাবস্থার ইঙ্গিত করিয়াছি তাহা প্রবন্ধের শেষ ভাগে পর্য্যালোচিত হইবে। পরে কোন এক সময়ে—প্রকৃতি হইতে বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি কিরূপে ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হয় এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে গুণত্রয়ের কাহার কিরূপ অভিভব প্রাদুর্ভাব হয়, তাহা প্রদর্শন করিবার ইচ্ছা রহিল।

104,952

আমার কৈফিয়ৎ।

ছেলেবেলা হইতেই ঝোঁক, চাকরী করিব না। পরের এস্তাজারিতে আমি বরাবরই নারাজ। পৈতৃক বিষয়সম্পত্তি এমন কিছু ছিল না, যাহাতে অনায়াসে দিনপাত হইতে পারে, তবুও যে চাকরীর প্রতি এত বিতৃষ্ণা, সে কেবল একটা কারণে। মনে বড় আশা ছিল, হয় ডাক্তার নয় উকীল, দুয়ের একটা হবই হব; আর সঙ্গে সঙ্গে এ ধারণাটাও ছিল যে, ডাক্তারী কিম্বা ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই এক লম্ফে স্বর্ণলঙ্কায় পৌঁছান যায়। কোনরূপে সেখানে পাড়ি জমাইতে পারিলে আর ভাবনা কি? কিন্তু হায়, বড় আশাতেই ছাই পড়িল, আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলাম না। মাঝ দরিয়ায় পড়িয়া রহিলাম।

এলে পরীক্ষায় ফেল হইয়া বড় দাগা পাইলাম। কিন্তু তখনও আশা, একটা কিছু হইতেই হইবে।

এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষা দেওয়ার পরই আমার বিবাহ হয়। এক ত্রয়োদশবর্ষীয়া কন্যাভারাক্রান্ত পিতাকে দায়মুক্ত করিবার জন্য পিতৃদেব তাড়াতাড়ি আমার বিবাহ দিলেন। বিবাহের পর, আমার সম্বন্ধে নানা কথা উঠিল। মুরুব্বী পক্ষ বলিলেন, "ছোঁড়াটা এইবার মাটী হ'ল, ওর বাপ এই বয়সে যে কলসী গলায় বেঁধে দিলে, ওতে কি আর ও মাথা তুল্‌তে পারবে!" এলে পরীক্ষায় ফেল হওয়ার পর এই সকল ভবিষ্যদ্বাণীর সার্থকতা, সকলেরই অধিকমাত্রায় উপলব্ধি হইতে লাগিল। আমার কথা উঠিলেই লোকে বলিত, "তখনই ত বলেছিলাম ও ছোঁড়ার কিছু হবে না!" পিতাও বোধ হয় মনে করিলেন, "অন্যের ভারটা ছেলের ঘাড়ে

য়োছিলেন। এখন বুঝিতেছি, পূর্ণের চেয়ে অর্দ্ধেক ভাল। ার বুদ্ধিতেই কষ্টেসৃষ্টে দু'মুটো জুটিতেছে। যে কলসীর ভারে কাপাথারে ডুবিয়াছিলাম বলিয়া লোকের বিশ্বাস, আজ সেই ীকে আশ্রয় করিয়া সংসার-সমুদ্রে ভাসিয়া আছি। "স্বাধীন নবহনের তৃষ্ণাটা মিটিয়া আসিয়াছে—এখন চাকরী জুটিলে তে পারি। কিন্তু পাই কোথায়?

ভারতবর্ষে।

(৩)

সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম।

ফরাসিস্ পর্য্যটক আব্রে শেভ্রিয়েঁা সিংহলবাসী বৌদ্ধদিগের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিষয় যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের সারাংশ বেশ অল্পের মধ্যে জানা যায়। তিনি বলেন, "এই কান্দি সিংহলের একটী পুরাতন নগর—সিংহল-রাজদিগের পুরাতন রাজধানী। এই স্থানে বড় বড় তালবৃক্ষের নীচে কৃষ্ণাভ-সলিল একটি সরোবর আছে—তাহার ধারে রাজাদিগের পুরাতন প্রাসাদ অবস্থিত। প্রাসাদের সন্নিকট, সেই মরাল-প্রতিবিম্বিত কৃষ্ণ সরোবরের ধারে একটি পুরাতন বৌদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের দ্বারদেশে যে তিনটি বিকট অদ্ভুত মূর্ত্তি রহিয়াছে তাহার অর্থ কি? আর, এই বৌদ্ধ পুরোহিতেরা, যাহারা মন্দিরের মর্ম্মর-শোভিত দালানের উপর দিয়া ক্রমাগত যাতায়াত করিতেছে, ইহারা না-জানি সমস্ত দিন

গ্রামে গহনা ও জমী বন্ধক দিয়া বাকী টাকা সংগ্রহ
আবার নূতন উৎসাহে, কলিকাতায় আসিয়া কাপড়ের
আরম্ভ করিলাম। বন্ধুবান্ধব অনেকেই বিশেষ অনুগ্রহ দে
আমাদের দোকান হইতে কাপড় কিনিতে লাগিলেন—খুব
পূজার পূর্ব্বে দোকান খুলিয়াছিলাম, অল্পদিনেই অধিকাংশ ক
নিঃশেষ হইল। দ্বিতীয় চালান আনিবার প্রয়োজন, কিন্তু
কই। খাতা দেখিলাম, বেশীর ভাগই বিলাত বাকী। ত
তাগাদা আরম্ভ করিলাম, কিন্তু কেহই উপরহস্ত করিলেন
মহাজনেরা হিসাব পরিষ্কারের জন্য অস্থির করিল, ধার বি
বন্ধ করিয়াছি বলিয়া আর খরিদদারও তেমন ঘেঁষে না
দিন দেখিয়া মহাজন আর ধাতির করিল না, বাকী কাপড় বা
ক্রোক করিয়া লইল। তখন মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল; হা
সকল আশা ফুরাইল, ব্যবসার বাজার হইতে এতদিনে আমা
দোকান পাট তুলিতে হইল।

আমি লজ্জায় কিছুদিন বাটী যাইতে ইতস্ততঃ করিতেছিলাম,
এমন সময় গৃহিণীর একখানি স্নেহমাখা পত্র পাইলাম, "আমি
সব শুনেছি, আর কলিকাতায় কষ্ট করে' আছ কেন, শীঘ্র বাড়ী
এস, আমি একটা সংস্থান করেছি।" লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল।

বাড়ী গিয়া দেখি, বন্ধকী গহনা বেচিয়া, দেনাপত্র শোধ
করিয়া গৃহিণী জমীগুলি খালাস করিয়াছেন। দুই একজন
আত্মীয়ের সাহায্যে চাষ আরম্ভ হইয়াছে। বাড়ীতে এক ঠাকুরাণী
দিদি ছিলেন, তিনি কিছু রহস্যপ্রিয়, আমায় বলিলেন, "নাও রে
ত লাঙ্গল ধরেছে, এখন তুই আর কি করবি, কাঁধ দে।"

শুনিয়াছিলাম, ব্যবসার অর্দ্ধেক চাষ, কথাটা প্রকৃত। আমি
ভাবনা ধরিয়াছিলাম, আর গৃহিণী আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী, কাজেই চাষে

দিন আর কোন উচ্চবাচ্য করিলাম না। এক দিন কথায় কথায় হিন্দু স্ত্রীলোকের সম্বন্ধের কথা উঠিয়া পড়িল। বলা বাহুল্য, কৌশলে এ কথাটা আমিই প্রসঙ্গতঃ তুলিয়াছিলাম; কথাটা যখন পড়িল তখন আর আমায় পায় কে! সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া আমি দুঃখ করিলাম, সে দিন আর এ দিনে কত প্রভেদ! এদেশে, স্ত্রীরা স্বামীর জন্য প্রাণ দিতেও তিলমাত্র কুণ্ঠিতা হইত না, আর এখনকার স্ত্রীরা স্বামীর বিপদ আপদ কিছুই দেখে না। ললিতা ফণিনীর মত গৃহিণী আমার, এই কথায় জ্বলিয়া উঠিলেন—বলিলেন, "তোমাদের ওই এক কথা, কই এমন মেয়ে দেখাও দেখি?" আমি কথাটা একটু ফিরাইয়া বলিলাম, "তা'ত ঢেরই আছে, স্বামী টাকার দায়ে জেলে যাচ্চে, আর স্ত্রী, একগা গহনা পরিয়া আছে, এ ত আক্‌সের!" গৃহিণী দৃঢ় অবিশ্বাসে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "একটীও না"। আমি, গম্ভীর ভাবে বলিলাম, "আচ্ছা, তা'দেখাই যাবে।" গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিসে?" আমি হাসিয়া উত্তর করিলাম, "সম্প্রতি তোমার স্বামীই বিপন্ন, কেমন উদ্ধার কর দেখি!" গৃহিণীও হাসিলেন, বুঝি সে বড় কষ্টের হাসি। হাসিয়া উত্তর করিলেন, "তা' বেশ, কি করতে হবে বল, এর জন্য আর এত ভূমিকা কেন?" হায়, সরলা, আপনার ফাঁদে আপনি পড়িল।

রামচন্দ্র একদিন বশিষ্ঠকে বলিয়াছিলেন, প্রজারঞ্জনের জন্য যদি সীতাকে ত্যাগ করিতে হয় তা'ও করিব, কিন্তু তিনি স্বপ্নে ভাবেন নাই সত্যই সেজন্য সীতাকে ত্যাগ করিতে হইবে। সীতা বিসর্জ্জনের সময় রামচন্দ্রের মনে কি হইয়াছিল জানি না, কিন্তু অলঙ্কার বাহির করিবার সময় গৃহিণীর মুখ দেখিয়া রামচন্দ্রের অবস্থাটা কতক অনুভব করিয়াছিলাম।

হইতে কতকগুলি বই বেশী আনাইয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম, অধিক লাভ পাইব। কিন্তু পরবৎসর কোর্স্ সব বদলাইয়া গেল— অধিকাংশ বই আর শীঘ্র বিক্রয় হইবে এ আশা রহিল না। মূলধন আটক পড়িল, কাজেই পরবৎসর আর বিলাত হইতে চালান আনিতে পারিলাম না। এদিকে কাট্‌তি কম পড়িয়া আসিল, শেষ এস্‌টাব্‌লিশ্‌মেণ্ট-খরচা ঘর হইতে দিতে হইতেছে দেখিয়া, দোকানটী জলের দামে বিক্রয় করিলাম। দুই হাজার টাকা লইয়া ব্যবসা করিতে আসিয়াছিলাম, এখন সব বেচিয়া পাঁচ-শত টাকাও হইল না। কিন্তু ইহাতেও একবারে হতাশ হই-লাম না, দুই একবার লোকসান না দিয়া কি লাভ হয়? এক-বারে কে কোন্ কালে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারিয়াছে? এবার ঠিক করিলাম, কাপড়ের ব্যবসা করিতে হইবে। এক-জন অংশীদারও জুটিল, ঠিক হইল, দুইজনে, দুই হাজার টাকা দিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিব। কিন্তু আমার ত তত টাকা নাই, বাকী টাকা কিরূপে সংগ্রহ করি? বিশ পঁচিশ বিঘা জমী আছে, কিন্তু তা' সব বিক্রয় করিলেও এত টাকা হয় না। স্ত্রীর গহনা যে কিছু না আছে তা' নয়, কিন্তু সেটা চাই কি করিয়া? আমি এইরূপ ব্যবসা করিতেছি জানিয়া সে কি গহনা দিবে? স্ত্রীলোক ত সহজে গহনা ছাড়িতে চাহে না। তাদের এক একখানি গহনাও আমাদের মত স্বামীর চেয়ে ঢ ভারী। গহনা ও সোনার ভারীত্বের প্রতি এতটা বিশ্বাস ন বলিয়াই বোধ হয়, সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণকে তুলাদণ্ডে াইতে সাহস করিয়াছিলেন। তা' সে কথা যাক্, এখন গহনা লি, আদায় করি কোন ফিকিরে? নানান্ কৌশল ভাবিতে াবিতে বাড়ী রওনা হইলাম। বাড়ী গিয়া প্রথম দুই চারি

শীক্ষা দিবার আশা ফুরাইল। পিতৃদেবের চাকরীই আমাদের একমাত্র ভরসা ছিল, তাঁহার অভাবে সকল দিক শূন্যময় দেখিলাম। সংসারের ভার আমার উপর পড়িল, এদিকে কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা অচল, চাকরী করিবনা—এখন উপায়? বাবা কিছু নগদ টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন—একমাত্র সেই অবলম্বন,—কিন্তু তা'ও বেশী নয়, ষোট দুই হাজার। স্বাধীনচেতা আমি মনে করিলাম, ইহাই মূলধন করিয়া ব্যবসা ফাঁদিব, চাকরী করিয়া দেশের লোকগুলা উচ্ছন্নে যাইতেছে, আমি দেখাইব কেমন করিয়া নিজের ও দেশের শ্রীবৃদ্ধি করিতে হয়। দুই একজন আত্মীয় বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি ব্যবসা করা যায়। কিন্তু সদুত্তর কেহই দিতে পারিলেন না, তাঁহারা যাহা বলিলেন, অন্য লোক হইলে, হয় ত দমিয়া যাইত। শেষ আমার স্ত্রীকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, লোকের "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী," আর কপালগুণে আমার "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী!" যাইহোক, আমি আমার স্ত্রীকে ব্যবসা বাণিজ্যের মাহাত্ম্য অনেক বুঝাইলাম, কিন্তু সে কিছুতেই বুঝিল না; তখন মনে করিলাম, কেবল যে পথেই নারী বিবর্জ্জিতা তা'নয়, পরামর্শেও বটে। আমার মন ব্যবসার দিকে ছুটিয়াছে, কোন বাধাবিপত্তি মানিল না; তখন আশা ও স্বদেশানুরাগ বড় প্রবল হইয়া পড়িয়াছে, স্থির করিলাম, যে যা' বলে বলুক, ব্যবসা করিতেই হইবে।

কলিকাতা আসিয়াই পুস্তকের দোকান খুলিলাম। দেড়-হাজার টাকায় বিলাত হইতে চালান আনাইলাম। বাকী টাকা অন্য অন্য খরচের ও বাঙ্গলা পুস্তকের জন্য রাখিলাম। মহা ধুমধামে ব্যবসা আরম্ভ করিলাম। প্রথম সেসন্ খুলিতেছিল, বিক্রয় মন্দ হইল না। কিন্তু একটা ভুল হইয়াছিল, বিলাত

চাপাইয়া ভাল করেন নাই, তাঁর পুত্ররত্ন বধূমাতাভারাক্রান্ত হইয়াই বুঝি পরীক্ষা-পাথারে হাবুডুবু খাইতেছে।

আমি মহা লজ্জায় পড়িলাম, একে ত ফেল হওয়াই লজ্জার কথা তার উপর আবার এইরূপ টীকাটিপ্পনী—লজ্জার কথায় আর কাজ কি! আমাপেক্ষাও কিন্তু আর একজন অধিক লজ্জায় পড়িয়াছিল। জানি না সে বেচারীর কি দোষ, কিন্তু সকলেই বলিত "অত বড় বৌয়ের জন্যই ছেলেটা ফেল হ'ল।" রাত্রে ডাগর ডাগর চোখ দু'টী আমার মুখের দিকে রাখিয়া, বালিকা বলিত "তুমি ফেল হ'লে কেন? পাশ হওনা।" ফেল পাশ কি, সে বিষয়ে বালিকার জ্ঞান কতটুকু ঠিক জানি না, কিন্তু ফেল হওয়াটা যে একটা মহা কলঙ্ক, ইহা সে নিশ্চয়ই বুঝিয়াছিল। বোধ হয়, এটাও তার বিশ্বাস হইয়াছিল যে, স্বামী কোন একটা ধর্ম্মকর্ম্ম করিলে যেমন অর্দ্ধাঙ্গিনী হিন্দু স্ত্রী অর্দ্ধেক ফল পায়, সেইরূপ স্বামীর ফেলের কলঙ্কেও স্ত্রীর অর্দ্ধেক ভাগ। আমি এ কথার কিছু উত্তর না দিয়া একটু দুঃখের হাসি হাসিয়া বলিতাম—

"কলঙ্কে ভয় ক'রোনা হ'য়ে আমার দুখের দুখী।"

কিন্তু মনে মনে একটা প্রতিজ্ঞা ছিল। শ্রীকৃষ্ণ ছিদ্রকুম্ভে বারি আনাইয়া শ্রীমতীর কলঙ্ক ভঞ্জন করিয়াছিলেন; আমিও আমার ভাঙ্গা-মন জোড়া দিয়া আবার পড়িতে আরম্ভ করিলাম, আশা, পাশ করিয়া আমার শ্রীমতীর কলঙ্ক ঘুচাইব। কিন্তু মনের আশা মনেই রহিল। আমার আর পরীক্ষা দেওয়া ঘটিল না। দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দিবার কিছু পূর্ব্বে, পিতৃদেবের কঠিন পীড়ার কথা শুনিয়া, তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। যাহা দেখিলাম, তাহাতে আর ফিরিতে পারিলাম না। পরীক্ষার পূর্ব্ব দিন পিতা ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেলেন। আমারও

সোণার তরী।

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে' আছি, নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা
ধান কাটা হ'ল সারা,
ভরা নদী ক্ষুরধারা
খর-পরশা।
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।

একখানি ছোট ক্ষেত আমি একেলা,
চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।
পরপারে দেখি আঁকা
তরুছায়ামসীমাখা
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা
প্রভাত বেলা।
এপারেতে ছোট ক্ষেত আমি একেলা।

গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে!
দেখে' যেন মনে হয় চিনি উহারে।
ভরা-পালে চলে যায়,
কোন দিকে নাহি চায়,
ঢেউগুলি নিরুপায়
ভাঙ্গে দু'ধারে,
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।

ওগো তুমি কোথা যাও কোন্ বিদেশে!
বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে!
যেথা যেতে চাও,
যারে খুসি তারে দাও
শুধু তুমি নিয়ে যাও
ক্ষণিক হেসে
আমার সোণার ধান কূলেতে এসে!

যত চাও তত লও তরণী পরে।
আর আছে?—আর নাই, দিয়েছি ভরে'।
এতকাল নদীকূলে
যাহা ল'য়ে ছিনু ভুলে'
সকলি দিলাম তুলে'
থরে বিথরে
এখন আমারে লহ করুণা করে'!

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই! ছোট সে তরী
আমারি সোণার ধানে গিয়েছে ভরি'।
শ্রাবণ গগনে ঘিরে
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,
শূন্য নদীর তীরে
রহিনু পড়ি',
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোণার তরী।

মহতের অভিব্যক্তি।

সাংখ্যের মতে প্রকৃতি ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা এবং "মহৎ" সেই সাম্যাবস্থার প্রথম বিচ্যুতি—"মহৎ" প্রকৃতির প্রথম অভিব্যক্তি। সাংখ্যদর্শন মহৎ শব্দের যেরূপ সংজ্ঞা করিয়াছেন তাহাতে মহৎ শব্দে বুদ্ধি পর্য্যন্তই বুঝায়, তাহার উপরে আর কিছু বুঝায় না। কিন্তু বেদান্ত-দর্শন সাংখ্যের বিরুদ্ধে বেদের বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সাধারণতঃ সকল বুদ্ধি মহৎ শব্দের বাচ্য হইতে পারে না, কেবল "যা প্রথমজস্ত হিরণ্যগর্ভস্ত বুদ্ধিঃ সা সর্ব্বাসাং বুদ্ধীনাং প্রথমা প্রতিষ্ঠা, সেহ মহান্ আত্মেত্যুচ্যতে।"—প্রথম-জাত হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধি যাবতীয় বুদ্ধির প্রথম প্রতিষ্ঠা; তাহাই মহান্ আত্মা বলিয়া বেদে উক্ত হইয়াছে,—তাৎপর্য্য এই যে, তাহাই মহৎ শব্দের বাচ্য।

সাংখ্যের বিরুদ্ধে বেদান্তের এই যে প্রতিবাদ, ইহা অসঙ্গত নহে—কেন না, যে বুদ্ধি আদি সৃষ্টি তাহা যে, তোমার আমার যে সে ব্যক্তির বুদ্ধি, এ কথা হইতেই পারে না।

কিন্তু হিরণ্যগর্ভ নামক ব্যক্তি-কল্পনা একটা দার্শনিক রূপক ভিন্ন আর কিছুই নহে। বেদান্তদর্শনও তাহা মনে মনে জানেন; কেন না, বেদান্ত-দর্শন প্রথমে বলিয়াছেন, আত্মাই মহৎ শব্দের বাচ্য, তাহার পরে বিকল্পে বলিয়াছেন—অথবা, হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধি মহৎ শব্দের বাচ্য। হিরণ্যগর্ভ কি না, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা। রূপক ছাড়িয়া দিয়া বেদান্ত-দর্শনের কথাটির ভাবে ইহাই বুঝাইতেছে যে, সৃষ্টিশক্তির আধারভূত পরমাত্মাই মহৎ শব্দের বাচ্য। এই এক একটি কথা;—বেদান্ত-দর্শনের আর একটি কথা এই যে, অজা শব্দে "স্বতন্ত্রা প্রকৃতি" এরূপ অর্থ বেদের অভিপ্রেত নহে;

অব্যক্ত শব্দের অর্থ কি? না, কারণ-শরীর; শরীর-মাত্রই পরতন্ত্র, সুতরাং কারণ-শরীরও পরতন্ত্র। শরীরমাত্রেরই অধিষ্ঠাতা আত্মা—কারণ-শরীরেরও তাই। বেদান্তের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, স্থূলশরীর আত্মার জাগ্রৎকালের আবরণ, সূক্ষ্মশরীর স্বপ্নকালের আবরণ এবং কারণ-শরীর অথবা বীজ-শরীর সুষুপ্তি-কালের তমোময় আবরণ। কারণ-শরীরের সহিত স্থূলশরীরের কোনো সাদৃশ্য নাই; কেন না, সুষুপ্তিকালের অজ্ঞানান্ধকারই কারণ-শরীর নামে অভিহিত হয়।

সেই তমোময় আবরণের আরএক নাম অবিদ্যা; এবং জীবগণকে আশ্রয় করিয়া জগতে যেখানে যত অবিদ্যা আছে সমুদয়ের সমষ্টির নাম মায়া। এই মায়া পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র এবং পরমেশ্বরের সম্পূর্ণ পরতন্ত্র। যথা,—বেদান্তদর্শন বলেন, "পরমেশ্বরাধীনা ত্বিয়ং অস্মাভিঃ প্রাগবস্থা জগতোঽভ্যুপগম্যতে ন স্বতন্ত্রা। * * * অবিদ্যাত্মিকা হি সা বীজশক্তিরব্যক্তশব্দনির্দ্দেশ্যা পরমেশ্বরাশ্রয়া মায়াময়ী মহা সুষুপ্তির্যস্যাং স্বরূপপ্রতিবোধরহিতা শেরতে সংসারিণো জীবাঃ।" ইহার অনুবাদ;—আমরা বলি জগতের এই প্রাগবস্থা (অর্থাৎ অব্যক্ত প্রকৃতি) পরমেশ্বরের অধীনা—তাহা স্বতন্ত্রা নহে (অর্থাৎ সাংখ্য যাহা বলেন তাহা নহে)। সেই বীজশক্তি অবিদ্যাত্মিকা—অব্যক্ত শব্দের বাচ্যা—পরমেশ্বরাশ্রিতা মায়াময়ী মহাসুষুপ্তি, যাহাতে আত্মবোধ-বিবর্জ্জিত সংসারী জীবেরা শয়ন করিয়া রহিয়াছে।

বেদান্তানুমোদিত মহৎ শব্দের অর্থ পূর্ব্বে যাহা প্রদর্শন করিয়াছি এবং অব্যক্ত শব্দের অর্থ এস্থলে যাহা প্রদর্শন করিলাম, দুইকে একত্র করিয়া পাইতেছি:—

বেদান্তের মতানুসারে "মহৎ" পরমাত্মার সর্ব্ববিষয়িনী বীজশক্তি, এবং অব্যক্ত প্রকৃতি পরমাত্মার ঐশী শক্তি। ইহাতে এইরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পরমেশ্বরের শক্তি জ্ঞানময় এবং জ্ঞান শক্তিময়। সাংখ্য যাহা বলেন তাহাতে এইরূপ প্রতিপন্ন হয় যে, অগ্রে অন্ধ প্রকৃতি—পরে, তাহা হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি। জ্ঞান বলিতে এখানে সত্ত্বগুণের উৎকর্ষস্বরূপ বুদ্ধিরূপী জ্ঞান বুঝিতে হইবে—সাংখ্য যাহাকে "জ্ঞ" (অর্থাৎ পুরুষ) বলেন তাহা স্বতন্ত্র।

সাংখ্য এবং বেদান্তের মত এইরূপ ছায়াতপের ন্যায় পরস্পর-বিরোধী। কিন্তু পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি যে, আমরা বিবাদপ্রিয় নহি। আমরা দেখিতেছি যে, দুয়ের মধ্যেই সত্য আছে—কিন্তু প্রকারভেদে। দেখিতে হইবে যে, বেদান্ত যে সকল প্রশ্নের মীমাংসায় ব্রতী হইয়াছেন, তাহার অধিকাংশই অভিব্যক্তি-রাজ্যের মূলস্থানীয় এবং অতীতস্থানীয়;—সাংখ্য যে সকল প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহার অধিকাংশই অভিব্যক্তি-রাজ্যের অন্তঃপাতী। আপন আপন রাজ্যে সকলেরই জিত। রসোরায় গোলাপের জিত; মানসসরোবরে পদ্মের জিত। অভিব্যক্তি-রাজ্যের মূলস্থানে সাংখ্যের কথায় তেমন বল পৌঁছে না—অভিব্যক্তি-রাজ্যের সীমার মধ্যে সাংখ্যের কথা খুবই বলশালী। তাহার সাক্ষী, মনুষ্য যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন মনুষ্য প্রকৃতির সঙ্গে এমনি মাখামাখি ভাবে অবস্থিতি করে যে, দেখিলে মনে হয় যেন সে তখন মাতৃশরীরেরই একটি অঙ্গ। ক্রমে সেই বালকের অভ্যন্তরে বুদ্ধি আবির্ভূত হইয়া তাহাকে প্রকৃতির হস্ত হইতে ছিনাইয়া লয়। প্রথম প্রথম কিছু কাল ধরিয়া বালক নির্ব্বিঘ্নে জ্ঞানোপার্জ্জনে অগ্রসর হয় এবং এইরূপ করিয়া সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। যাহারা সংসারের তুফানে হাবুডুবু খান সকলেই বলেন, বাল্যকাল

শৈশবদশা কি সুখের অবস্থা! বাল্যাবস্থাসুলভ জ্ঞানের নব নব উন্মেষ এবং বিমল সুখের নব নব উচ্ছ্বাস সত্ত্বগুণেরই লক্ষণ। প্রকৃতির অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া বালক জ্ঞান-রাজ্যের স্বাতন্ত্র্যে অল্পে অল্পে পা বাড়াইতে থাকিলে প্রকৃতি প্রথম প্রথম কিছু বলেন না—আড়াল হইতে লীলা দেখেন মাত্র; কিছু কাল পরে প্রকৃতি তমোময় ভীষণ অহঙ্কার-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সত্ত্বগুণের নির্ম্মল আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করিয়া ফেলেন। এই অহঙ্কারই সমস্ত রিপুগণের কেন্দ্র-স্বরূপ—"নাহঙ্কারাৎ পরো রিপুঃ"। প্রথমে, আমি সর্ব্বাপেক্ষা বড় এইরূপ অহঙ্কার, তাহার পরে আপনার সুখের প্রতি দৃষ্টি, আপনার বস্তুর প্রতি টান—ইন্দ্রিয়সেবা এবং তাহারই আনুষঙ্গিক রিপুগণের প্রাদুর্ভাব, ক্রমে দেখা দেয়। এই বন্য হস্তিটাকে —অহঙ্কারকে—দমন করিবার জন্য ধর্ম্মরূপ অঙ্কুশের নিতান্তই প্রয়োজন। বিখ্যাত দার্শনিক শোপেন্ হাওয়ার তাঁহার প্রণীত "The world as will and idea" নামক গ্রন্থে বলেন;—

"It is because the brain attains its full size in the seventh year that from that time forward children become so remarkably intelligent, inquisitive and reasonable. But then comes puberty; to a certain extent it affords a support to the brain, or a resounding board; and raises the intellect at once by a large step, as it were by an octave, corresponding to the lowering of the voice by that amount. But at once the animal desires and passions that now appear resist the reasonableness that has hitherto prevailed and to which they have been added." ইহার অনুবাদ;—

"সাত বৎসর বয়ঃক্রমে মস্তিষ্ক পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয় বলিয়া সেই সময় হইতে বালকেরা অমন চমৎকার বুদ্ধিমত্তা জ্ঞানান্বেষিতা এবং বিবেচকতা প্রদর্শন করে। কিন্তু তাহার পরেই যৌবন আইসে; যৌবন কিয়ৎ পরিমাণে মস্তিষ্কের আশ্রয়স্তম্ভের কার্য্য করে—অথবা বীণাদি যন্ত্রের অনুনাদক অলাবুর কার্য্য করে; এইরূপ করিয়া বুদ্ধিকে বিপুল এক ধাপ উচ্চে উঠাইয়া দেয়—বাল্য-সুলভ তার-কণ্ঠ যেমনি এক গ্রাম নীচে নামিয়া যায় সেই সঙ্গে যেন বুদ্ধি এক গ্রাম উচ্চে সমুত্থিত হয়। কিন্তু হইলে হইবে কি—যে সদ্‌বুদ্ধি এ কাল যাবৎ বালকের মনে নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব করিয়া আসিয়াছে, এক্ষণে যৌবনের অভ্যুদয়ে পাশব বাসনা এবং রিপু-সকল আবির্ভূত হইয়া তাহার প্রতিবন্ধকতাচরণে প্রবৃত্ত হয়।" সাধারণ মনুষ্যজীবনের ইতিবৃত্তে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাত্রি হইতে যেমন প্রাতঃকাল আবির্ভূত হয়, তেমনি অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে বুদ্ধি আবির্ভূত হয়; বুদ্ধি কিয়ৎদূর অগ্রসর হইলে অহঙ্কার, অর্থাৎ আপনার বড়ত্ব অভিমান আবির্ভূত হয়। আপনার প্রতি আসক্তি হইতে ইন্দ্রিয়াসক্তি এবং বিষয়-বাসনাদি আবির্ভূত হয়। এইরূপ করিয়া প্রকৃতির প্রথম তিনটি সন্তান একে একে জন্মগ্রহণ করে,—(১) বুদ্ধি (২) অহঙ্কার (৩) মন। প্রকৃতির প্রথমজাত মহত্তত্ত্ব সত্ত্বগুণপ্রধান; দ্বিতীয়জাত অহঙ্কারতত্ত্ব তমোগুণপ্রধান; তৃতীয়জাত বাসনাদি মনোবৃত্তি-সমূহ (এক কথায় মন) রজোগুণপ্রধান; ইহা ভাবে বুঝিতে পারা যাইতেছে। মোটামুটি এই যাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে, ইহার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে; অবকাশমতে বারান্তরে তাহার প্রতি মনোনিবেশ করা যাইবে।

সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যা।

ভাবিয়া দেখিলে সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যার মধ্যে অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে আমার যেরূপ মনে হয়, নিবেদন করিতেছি।

দুই বিষয়ের দুইটী মূল—শব্দ ও বর্ণ (আলোক)। তরঙ্গের রাজ্যে ইহারা প্রতিবেশী। এই তরঙ্গমূলকত্বই ইহাদের ঘনিষ্ঠতার কারণ বলিয়া বোধ হয়।

সাত সুর; সাত রঙ। লোহিতাদি সাতটী রঙ, ইহারা ক্রমান্বয়ে চিত্রবিদ্যার "সা রি গা ম"র স্থানীয়। প্রভেদ এই—সঙ্গীতের সাত সপ্তক, চিত্রবিদ্যার একটিমাত্র সপ্তক। কিন্তু তাহা বলিলেই ছাড়ে কে? এ বিষয়ে অনেক বড় লোকের মস্তিষ্ক-কণ্ডূয়ন হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, তদনুরূপ ফল হয় নাই। স্বরসপ্তক ও বর্ণসপ্তকের কম্পনসংখ্যাগুলিকে অনেক মোচড়াইলে তবে নাকি দেখা যায় যে, ইহাদের অনুপাতগুলির কতকটা সাদৃশ্য আছে। সে সাদৃশ্য যে ঠিক কি রকম, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার উপযুক্ত মোচড়ান আজও মোচড়াইয়া উঠিতে পারি নাই। যাহা হউক, মোটামুটী কয়েকটা কথা সহজেই বুঝা যায়। সুর, গান্ধার, পঞ্চম, একসঙ্গে বাজিলে শুনিতে অতিশয় মিষ্ট হয়, এই কারণে সপ্তকের ভিতরে এই তিন সুরের প্রাধান্য হইয়াছে। প্রথম কয়েকটী হারমনিক এই তিন সুরেই সীমাবদ্ধ। বৈজ্ঞানিক উপায়ে সুরবোধ জন্মাইতে চেষ্টা করিলে দেখা যায় যে, এই তিন সুরই শিক্ষার্থিরা সর্ব্বপ্রথমে আয়ত্ত করিতে পারে। সুতরাং ইহাদিগকে সপ্তকের তিনটী মূল সুর বলিলেও নিতান্ত অন্যায় হয় না। এবিষয়ে আর একটী অকাট্য যুক্তি

এই দেওয়া যাইতে পারে যে, এই তিন সুরের অন্তরগুলিকে অবলম্বন করিয়া সপ্তকের আর কয়টী সুরকে পাওয়া যাইতে পারে। এইরূপে দেখা যায় যে, স্বরসপ্তকের প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম, ইহারা মূল সুর। সেইরূপ, বর্ণসপ্তকেরও প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম, অর্থাৎ লোহিত, পীত ও নীল, ইহারা মূলবর্ণ। আপত্তি হইতে পারে যে, মূলবর্ণ সম্বন্ধে সাধারণ লোকের ঐ বিশ্বাস ভ্রান্তিমূলক। বাস্তবিক বৈজ্ঞানিকেরা লাল, সবুজ ও ভায়লেটকেই মূলবর্ণ বলিয়া মানেন। উত্তরে আমার এক প্রশ্ন এবং এক প্রার্থনা। প্রশ্ন এই,—বৈজ্ঞানিক এবং সাধারণ লোকের এরূপ দ্বন্দ্ব হইবার কারণ কি? যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে এ বিষয়টী তলাইয়া দেখেন নাই, তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা এই যে, বৈজ্ঞানিকেরা কি করিয়া বৈজ্ঞানিক হইল, আর সাধারণ লোকেরা (অন্ততঃ এ বিষয়ে) কি করিয়া সাধারণ লোক থাকিয়া গেল, একবার বিচার করুন। বৈজ্ঞানিকেরা আলোককে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া তাহার গুপ্ত খবর বাহির করিয়াছেন; চক্ষের ভিতরে কোন্ অন্ধকার কুঠরীতে এক অদ্ভুত পর্দ্দায় বাহিরের বর্ণসকলের প্রতিরূপ প্রকাশিত হয়; সেই পর্দ্দার লাল সবুজ এবং ভায়লেট্ বর্ণের কম্পনগুলির সহিত প্রবল সহানুভূতিসম্পন্ন তিন প্রকারের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম "কি যেন" আছে, তাহার তথ্য লইয়াছেন। আর সাধারণ লোকেরা দোকান হইতে রঙ কিনিয়া আনিয়া মিলাইয়া দেখিয়াছে। অত গোলমালের ভিতরে তাহারা যায় নাই, কারণ, ইহাতেই তাহাদের কাজ চলিয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা যদি ইহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন, তবে তাঁহারাও সাধারণ লোকই থাকিয়া যাইতেন। আর সাধারণ লোকের যদি অতটা কারখানা না করিলে না চলিত, তবে তাহাদের সাধারণ লোক-

থাকাই তার হইত। আসল কথা, আলোক মিশাইয়া যে ফল পাওয়া যায়, রঙ (পিগ্‌মেণ্টস্) মিলাইয়া সে ফল পাওয়া যায় না। লাল আর সবুজ আলোক মিশিয়া প্রায় সাদা রঙ হয়, কিন্তু লাল আর সবুজ রঙ মিশাইলে ধোঁয়াটে রঙ হয়। উভয়ের কথাই সত্য। বাজারের রঙ কিনিয়া মিশাইয়া দেখিতে চাও ত লাল, হলদে নীল, ইহারাই মূলবর্ণ। আলোক মিশাইয়া দেখিতে হইলে লাল, সবুজ ভায়লেট, মূলবর্ণ।

সুর, মধ্যম ধৈবত মিলিয়া মাইনর কর্ড্ হয়। এ হিসাবে এই তিনটী সুরের মৌলিকতা না হউক, ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রতিপন্ন হয়। এই ঘনিষ্ঠতা এবং লাল, সবুজ ভায়লেটের মৌলিকতার যতকটা সাদৃশ্য দেখা যায়, কেবল ঐ ধৈবতটায় মুস্কিল বাধাইয়াছে। ধৈবত না হইয়া যদি নিষাদ হইত তবে আর কথা ছিল না। কিন্তু এক কথা। ভায়লেট নিষাদের স্থানীয়, আর ইণ্ডিগো ধৈবত-স্থানীয়। ইণ্ডিগো রঙটার প্রকৃত পক্ষে কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। ইহা ভায়লেটই, কেবল একটু বেশী নীল-ঘেঁষা। মৌলিক বর্ণ সম্বন্ধে সাধারণ লোকের বিশ্বাস অনুযায়ী হিসাব ধরিলে দেখা যায় যে, নীল ও লাল মিলিয়া ইণ্ডিগো ভায়লেট উভয় রঙেরই উৎপত্তি—ইণ্ডিগোতে নীলের ভাগ বেশী, ভায়লেটে লালের ভাগ বেশী। বর্ণসপ্তকের এই স্থানটায় বড় বেশী জায়গা বলিয়াই বোধ হয় ইণ্ডিগো ভায়লেটের ভেদ হইয়াছে। এত জায়গা এখানে থাকিবার কি দরকার ছিল? এ স্থানটা বাস্তবিকই কেমন একটু যেন বেখাপ্পা। আশ্চর্য্য দেখুন, স্বরসপ্তকের ধৈবতের স্থানটাও কেমন একটু বেখাপ্পা। ওখানে দুটা ধৈবতের স্থান, তাহার একটা সাহেবেরা নিয়াছেন, একটা ভারতবাসীরা রাখিয়াছেন। কে জিতিলেন, কে ঠকি-

লেন, সে সম্বন্ধে অবশ্য আমি কিছু বলিতেছি না। বোধ হয়, কেহই ঠকেন নাই।

সাধারণ হিসাবে দেখিতেছি বর্ণসপ্তকের শেষভাগে লাল রঙ আবার দেখা দিয়াছে। বর্ণসপ্তকের পৌনঃপুনিকতা সম্ভব হইলে ভায়লেটের পরেই আবার লাল রঙ দেখিতে আশা করা যাইত। বাস্তবিকই বর্ণসপ্তকের একটা প্রচ্ছন্ন অংশ আছে, তাহা প্রত্যক্ষ হইলে বোধ হয় বর্ণেরও যন্ত্র এবং তার সপ্তক হইত; তবে তাহার চেহারা কি রকম হইত কল্পনা করা কিছু কঠিন।

তরঙ্গের আর একটা দিক আছে; ইংরাজিতে যাহাকে ইণ্টেন্সিটি বলে। বাঙলায় ইহাকে প্রবলতা বলা যাইতে পারে। তরঙ্গের গতিকে বিশ্লিষ্ট করিলে, তাহার ভিতরে একটা "দোল" এবং একটা "দৌড়" পাওয়া যায়। অর্থাৎ, তরঙ্গ যেমন অগ্রসর হয়, তেমনি তাহার একটা অভ্যন্তরীণ ইতস্ততঃ গতি থাকে। এই ইতস্ততঃ গতিকেই "দোল" বলিলাম, ইহাতেই "তরঙ্গত্ব"। দোলের উৎসাহ বেশী হইবার অর্থ দোলটা অধিকতর স্থান ব্যাপিয়া হওয়া—দোলের প্রবলতা বৃদ্ধি পাওয়া। এই প্রবলতার তারতম্যেই আলোক উজ্জ্বল অথবা নিস্তেজ হয়, শব্দ প্রবল অথবা মৃদু হয়। ইহার ফল চিত্রে আলোক এবং ছায়া, এবং সঙ্গীতে ভাবব্যক্তি।

ছবি আঁকিবার সময় যে ভিন্ন ভিন্ন রঙ মিশ্রিত করিয়া স্বাভাবিক পদার্থের বর্ণের অনুকরণ করা হয়, তাহার অনুরূপ সঙ্গীতে কি আছে? হারমনি তাহার অনুরূপ। আমাদের দেশীয় সঙ্গীতে যেমন হারমনি নাই, আমাদের "পটো"দিগের চিত্রেও তেমনি রঙ স্বাভাবিক হয় না। হলদে মানুষটি বাঁ

কাপড় পরিয়া কালো রঙের গদা দিয়া সবুজ মানুষটাকে ঠেঙায়।

চিত্রের পক্ষে যেমন স্থান, সঙ্গীতের পক্ষে তেমনি সময়। চিত্রেতে ভিন্ন ভিন্ন রঙ ভিন্ন ভিন্ন স্থান অধিকার করিয়া থাকে। সঙ্গীতে ভিন্ন ভিন্ন সুর ভিন্ন ভিন্ন সময় অধিকার করিয়া থাকে। সীমা-রেখা চিত্রের পক্ষে যাহা করে, তাল সঙ্গীতের পক্ষে তাহা করে।

কবিতা উভয়েরই সঙ্গিনী। বাস্তবিক ইহারা তিন ভাই বোন্।

উত্তরচরিত।

উত্তররামচরিত কালিদাসের কাব্যের মত কেবলি মধুর ও সুন্দর চিত্রপরম্পরার সমাবেশ নহে; সেখানে মেঘমন্দ্রসমাসে যেমন প্রকৃতির নিবিড় নিশ্চল গাম্ভীর্য্য মুদ্রিত হইয়া উঠে, তীব্র করুণ আবেগে সেইরূপ মানবহৃদয়ের সমস্ত গভীর সুখদুঃখ, বেদনা আনন্দ প্রগাঢ় হইয়া আসে; এবং এই নির্ঝরঝঙ্কৃত উত্তাল তরঙ্গকল্লোলিত প্রচণ্ড প্রকৃতি মানবের মেঘমেদুর অন্তরে ঘনীভূত হইয়া চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিয়া থাকে। কালিদাসের চিত্রশালা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ভবভূতির কাব্যজগৎ যেন এক সম্পূর্ণ নূতন দেশ—এখানেও সৌন্দর্য্যের পর সৌন্দর্য্য সুবিন্যস্ত এবং মানবহৃদয় বহিঃপ্রকৃতির সহিত নানা অদৃশ্য সূত্রে গ্রথিত হইয়া আপনাকে নানা ভাবে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে; কিন্তু কালিদাসের চিত্রশালায় মন যেরূপ ভ্রমরবৎ চিত্র হইতে চিত্রান্তরে, সৌন্দর্য্য হইতে সৌন্দর্য্যান্তরে, উপমা হইতে উপমান্তরে নীত হয় এবং নানা ফুল হইতে কেবল মধুর সৌন্দর্য্যটুকু সঞ্চয় করিতে করিতে অগ্রসর হইতে থাকে, ভবভূতির কুঞ্জ

কাব্যে মনে সেরূপ হিল্লোল সঞ্চারিত হয় না—চক্ষের সম্মুখে ঘন-নিবিড় অরণ্যানীর লীরন্ধ্রনিচুলনীলিম একটি গম্ভীর দৃশ্যপট উদ্ঘাটিত হয় এবং দূর দিগন্তপটে মুদ্রিত মেঘমালাবৎ নীল শৈলশ্রেণী, গদ্‌গদভাষিণী নদী গোদাবরী, নিরন্তরধ্বনিত নিবিড় বিজনতা সমস্ত মিলিয়া সেই নিবিড়তা আরও নিবিড় করিয়া তুলে; একটি সমগ্র জমাট্ দৃশ্যগাম্ভীর্য্যে মন অভিভূত হইয়া পড়ে। কালিদাস যেখানে ফুলটি, মালাটি, মদরাগ ও চুম্বনবিলাস এবং তদানুষঙ্গিক সুন্দর জ্যোৎস্না, মধুর মলয় ও উদ্ভিন্ন-যৌবনা প্রকৃতি দিয়া খণ্ড খণ্ড সৌন্দর্য্য উদ্রেকে প্রিয়জনকে স্মরণ করাইয়া দেন, ভবভূতি সেখানে অন্তরের অন্তরে ডুবিয়া মানবহৃদয়ের গভীর বেদনা অনুভব করেন এবং সেই বেদনার মধ্য হইতে প্রিয়জনকে যেন মন্থন করিয়া তুলেন; সেইজন্য প্রিয়জন তাঁহার নিকট এমন কি-জানি-কি এবং প্রিয়স্পর্শে তিনি একেবারে আকুল হইয়া উঠেন—নিশ্চয় করিতে পারেন না, সুখ না দুঃখ, প্রবোধ না নিদ্রা, শরীরে [illegible] হইয়াছে অথবা মরিয়া গান করিয়াছেন, চৈতন্য লুপ্ত কি উন্মীলিত।

সর্ব্বাঙ্গ দিয়া এবং সকল হৃদয় দিয়া ভবভূতি প্রিয়জনকে অন্তরের অন্তরদেশে যতই চাপিয়া ধরেন, সে কি-জানি-কিকে সম্যক্ অনুভব করিয়া উঠা যায় না; অঙ্গ অবশ হইয়া আসে, চিত্ত বিবশ হইয়া পড়ে, ভবভূতি আত্মহারা হইয়া যান, কিন্তু প্রিয়জন ততই কি-জানি-কি। উত্তরচরিত নাটকের সপ্ত অঙ্কের মধ্য দিয়া বরাবর এই একটি করুণ বেদনা সঞ্চারিত হইয়া উঠিয়াছে। নাটকের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যেন কোন্ প্রিয়াতুর করুণ হৃদয় আপন গোপন মর্ম্মস্থলে প্রিয়জনকে বিদ্ধ করিয়া বিন্ধ্ বিন্ধ্ করিয়া আপনাকে তাঁহাতে ক্ষীণ করিতেছে এবং সেই

নিবিড় মর্ম্মনিপীড়িত বেদনা কোথাও দেহ অবলম্বনে, কোথাও হৃদয় অবলম্বনে, কোথাও চিত্র অবলম্বনে, কোথাও বা ছায়া অবলম্বনে অন্তরে বাহিরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

উত্তরচরিতে তবে সুখ কি নাই? কেবলি একটি ধারাবাহিক করুণ ব্যাকুলতা? কেবলি হা হতোস্মি, হা রাম, হা সীতে, কিম্বা কোথা প্রিয়ে, প্রাণনাথ, এবং অন্তর্বাষ্পাবস্থা ও সাশ্রুনয়ন? লক্ষ্মণ যখন পিতৃবিচ্ছেদে দুর্ম্মনায়মানা সীতাদেবীকে তাঁহাদের পূর্ব্ববৃত্তান্তের চিত্রগুলি দেখাইতেছেন, তখন কি সকলের মনে সুখসঞ্চার হয় নাই? নিদ্রালসে শিথিলাঙ্গী আলিঙ্গনবদ্ধা সীতার স্পর্শে রামচন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গে যে পুলক সঞ্চার হইয়াছিল সে কি সুখ নহে? দীর্ঘ বিরহনিশাবসানে সীতার সহিত রামের যখন মিলন সম্পাদিত হইল তখন কি সুখের সীমা ছিল?—কিন্তু ভবভূতির কাব্যে সুখও যেন অত্যন্ত প্রগাঢ় হইয়া অনেকটা দুঃখেরই মত হইয়া আসে। হয় তাহার সহিত কতকগুলি দুঃখকাহিনী বিজড়িত, নয় তাহার মধ্যে একটা অনির্দ্দেশ্য বিবশ আকুলতা—সুখ কি দুঃখ নির্ণয় করিয়া উঠা কঠিন; যদি বা মিলন হয়, মিলনের মাঝখানে যেন শতবর্ষের বিরহ জাগিয়া থাকে এবং মিলনান্ত উপসংহারেও পুরাতন বিরহ পরিতৃপ্ত হয় না। কালিদাসের কাব্যে যেমন দুঃখও বিলাস-অলসিত মোহন মধুরবেশে কতকগুলি সুন্দর চিত্রবদ্ধ হইয়া মোহ উদ্রেক করিয়া দেয়, ভবভূতির কাব্যে সুখ সেইরূপ মর্ম্মস্থলে বেদনাবিদ্ধ হইয়া অত্যন্ত করুণ ও নিবিড় হইয়া উঠে।

নাট্যারম্ভের অল্পক্ষণ মধ্যেই সীতার বিনোদন জন্য চিত্রিত কতকগুলি আলেখ্য লইয়া লক্ষ্মণ যখন প্রবেশ করিলেন, রামচন্দ্র ও সীতাদেবী অষ্টাবক্রকে সবেমাত্র বিদায় দিয়া নিভৃতে বসিয়া

আছেন। লক্ষ্মণের আগমনে প্রথম সেই নীরবতা ভঙ্গ হইল। রামচন্দ্র আলেখ্যের কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস, ইহাতে কি অবধি চিত্রিত হইয়াছে? লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য্যা বর্ণ্যাকুরাণীর অগ্নিশুদ্ধি পর্য্যন্ত। প্রিয়াগতপ্রাণ রামচন্দ্রের নেত্রপল্লব সিক্ত হইয়া আসিল, তিনি দুঃখ করিতে লাগিলেন যে, হায়, জন্মপরিশুদ্ধাকেও আবার অগ্নিতে শুদ্ধ করিয়া লইতে হইল। সীতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, প্রিয়ে, তোমার প্রতি যে রুক্ষ আচরণ করিয়াছি তাহা সর্ব্বথা তোমার অযোগ্য, অপরাধ মার্জ্জনা কর। সীতা তাড়াতাড়ি কথাটা চাপা দিবার জন্য আলেখ্যের প্রতি রামের মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন।

সে বহুদিনের কথা; প্রথম যখন আর্য্যপুত্র, ঋষি বিশ্বামিত্র সমভিব্যাহারে, মিথিলায় শুভাগমন করেন—উদ্ভিদ্যমান নবনীলোৎপলশ্যাম স্নিগ্ধ মসৃণ চারুদেহ, সৌম্য সুন্দর মুখশ্রী, কেমন অবলীলাক্রমে হরধনু ভঙ্গ করিতেছেন—পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাত জনক; বিস্মিত দৃষ্টি বালকের মুখমণ্ডলে নিবদ্ধ করিয়া নিশ্চল। সেই শুভ বিবাহ-রজনী—মঙ্গলাচার, হুলুধ্বনি, রাজন্যবর্গ ও ঋষিগণ-পরিবৃত সভামণ্ডপ—চারি ভ্রাতার চারি বধূ—তাত দশরথ বধূ-সমাগমে পরিপূর্ণহৃদয়। জানকীকে দেখিয়া মাতৃগণের কি আনন্দই হইয়াছিল! বালিকার অনতিনিবিড় সূক্ষ্ম দন্তপংক্তি, উভয় গণ্ডদেশে চারু অলকাবলী আসিয়া পড়িয়াছে, চন্দ্রকরনির্ম্মল মনোহর মুখশ্রী, বিভ্রমবিলাসহীন সরল অঙ্গযষ্টি। তখন জীবন অতি লঘু—তাত জীবিত—ভাবনা নাই চিন্তা নাই, দিনগুলি নিশ্চিন্তমনে কাটিয়া যাইত। "তে হি নো দিবসা গতাঃ।"

লক্ষ্মণ একটির পর একটি চিত্র উল্টাইয়া যাইতেছেন, এবং পুরাতন বিস্মৃতপ্রায় দিনগুলি সকলের চক্ষের সম্মুখে জাজ্বল্যমান

হইয়া উঠিতেছে। সীতা রামকে বলিতেছেন, কখনও বা রাম সীতাকে বলিতেছেন, সেই দিন স্মরণ হয় কি?—এই সেই কালিন্দী-তটস্থ শ্যামবট—হে প্রিয়ে, এখানে একদিন পথশ্রমে ক্লান্তদেহ তুমি আমার বক্ষের মধ্যে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া সুখে নিদ্রা গিয়াছিলে। ঐ যে সেই বিন্ধ্যাটবীর প্রবেশদ্বার—আর্য্যপুত্র হস্ত-স্থিত তালবৃন্তের দ্বারা এইখানে একদিন আমার আতপ নিবারণ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ দেখাইয়া দিলেন, দূরে ঐ ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষসমূহে নিরন্তর স্নিগ্ধনীলপরিণয় গোদাবরীমুখরিত অরণ্যপ্রদেশ দেখা যায়, বনভূমির মধ্য হইতে মেঘমেদুরিতনীলিমা প্রস্রবণ গিরি উঠিয়াছে। রামচন্দ্র সীতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই পর্ব্বতের পর্য্যন্তভাগে গোদাবরীশিশিরকণাসম্পৃক্ত বায়ুসেবনে আমাদের বিজন স্বচ্ছন্দসঞ্চরণ মনে পড়ে কি? কপোলে-কপোল সংসক্ত এবং পরস্পরকে প্রগাঢ় বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করিয়া সুখ-পর্ণশয্যায় অবিরত মৃদু গল্পগুঞ্জনে অজ্ঞাতসারে নিশাতিবাহন মনে পড়ে কি? লক্ষ্মণ আর একটি চিত্র উদ্‌ঘাটন করিলেন—রাম-চন্দ্রের সেই প্রথম বিরহ। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার চোখ ফুলিয়াছে এবং অধর ও নাসাপুট রুদ্ধ আবেগে ঈষৎ স্ফুরিত। রাম-চন্দ্র বলিলেন, বৎস, বৈরপ্রতিমোচন বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া তৎকালে কোনরূপে এ দারুণ বিরহও সহ্য করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন দুঃখাগ্নি পুনঃপ্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়া ছিন্নমর্ম্মব্রণের ন্যায় অন্তরে অত্যন্ত দুঃসহ বেদনা দিতেছে। এইরূপ বহুতর চিত্রের মধ্য দিয়া গিয়া সেই প্রাগ্বগম্ভীর বনরাজি এবং চিরাকাঙ্ক্ষিত পবিত্রসৌম্যশিশিরাবগাহা ভাগীরথী—যাহা দেখিয়া সীতার মন তপোবনের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং রামচন্দ্র অচিরেই তাঁহার দোহদাভিলাষ পূর্ণ করিতে স্বীকৃত হইলেন।

সকল চিত্রগুলি আমরা অবশ্য এখানে উল্লেখ করিলাম না। ঊর্ম্মিলার চিত্র লইয়া লক্ষ্মণের প্রতি সীতার মৃদু পরিহাস "বচ্ছ ইঅং বি অবরা কা", সূর্পনখাকে দেখিয়া তাঁহার স্ত্রীজনোচিত ভীতিভাব, মন্থরার চিত্র হইতে অবিচলিত অবলীলাক্রমে রামের চিত্রান্তরে গমন, এই সকলের মধ্যে কাব্যকলা যথেষ্ট আছে। এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সীতার বনবাস প্রথম পরিচ্ছেদের কল্যাণে বঙ্গীয় পাঠকসমাজে তাহা অপ্রকাশও নাই। আমরা যে চিত্রগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি সেইগুলি হইতে কালিদাসের বর্ণনার সহিত ভবভূতির বর্ণনা তুলনা করিয়া দেখিবার কতকটা সহায়তা হইতে পারে বোধ হয়।

কালিদাসও এই পথ দিয়া দু'একবার যাত্রা করিয়াছেন। এবং ভবভূতি যে তরুসমাচ্ছন্ন গোদাবরীপ্রদেশ, হংসকারণ্ডবাদিবিচরিত কমলশোভিত রমণীয় পম্পাসরোবর ও ককুভসুরভিত নীল স্নিগ্ধ নূতন তোয়বাহবেষ্টিত মাল্যবান্ শৃঙ্গের বর্ণনা করিয়াছেন, কালিদাসের লেখনী তাহার একটিকেও পরিত্যাগ করে নাই এবং এই সকল প্রাকৃতিক দৃশ্য তাঁহারও মনে পত্নীগতপ্রাণ রামচন্দ্রের বিরহ উদ্রেক করিয়া দিয়াছে। রামচন্দ্র সীতাকে লিতেছেন, এইখানে বেতসকুঞ্জে গোদাবরীতরঙ্গশীতল সমীরণ বন করিতে করিতে তোমার উৎসঙ্গে মস্তক রাখিয়া কত নিশি যাপন করিয়াছি; এই মাল্যবান্ গিরি—নূতন মেঘবারির সহিত এইখানে আমারও বিরহজনিত নেত্রজল পতিত হইয়াছিল; নবোদকসিক্ত পনসগন্ধ, অর্দ্ধোদ্গতকেশর কদম্বপুষ্প, শিখিকুলের কেকাধ্বনি তোমার বিরহে অসহ্য বোধ হইয়াছিল; মেঘগর্জ্জনে ভীত হইয়া তুমি যে গাঢ়ভাবে আমাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিতে তাহারই স্মৃতি লইয়া গুহায় গুহায় প্রতিধ্বনিত ঘনগর্জ্জন শুনি

কষ্টে সহ্য করিতাম; ঐ পম্পাতীর—অয়ি প্রিয়ে, ঐখানে চক্রবাক্-মিথুন ক্ষণমাত্র-বিযুক্ত না হইয়া পরস্পরের মুখে পদ্মের কেশর-প্রদান করিত, তাহা দেখিয়া বহু কষ্টে আমি তোমার বিরহ যাপন করিতাম; পম্পাতটে ঐ স্তনাভিরামস্তরকাভিনম্রা তন্বী শ্যামলতাকে দেখিয়া তোমা ভ্রমে আলিঙ্গন করিতে গিয়াছিলাম। ইহার পর যেখানে ঋষ্যাশ্রম আসিয়াছে, সুরাঙ্গনাগণের ব্যর্থ বিভ্রমচেষ্টা দিয়া তপঃপ্রভাব প্রদর্শনচ্ছলে কালিদাস রূপসীর উন্মুক্ত যৌবন বিকশিত করিয়া তুলিয়াছেন এবং গিরিপাদপ্রবাহিত নগনদী দর্শনে মুক্তাহারবিন্যস্ত পীনপয়োধর চিত্রিত করিয়াছেন। ভবভূতির বর্ণনায় বাল্যবান্ চিত্র দেখিয়া রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে কেবল বলিয়াছেন, বৎস, থাক্ থাক্, আর পারি না, আমার জানকীবিপ্রয়োগ পুনঃপ্রত্যাবৃত্ত হইতেছে; পম্পাসরোবরে অশ্রুজলের আভাস আছে মাত্র; এবং ঋষ্যাশ্রম ও প্রকৃতি-দর্শনে কেবল সরল গম্ভীর ভাষায় তাহার বিরলোপমা বর্ণনা।

কিন্তু ভবভূতির পরিচয় এপর্য্যন্ত আমরা অল্পই পাইয়াছি। চিত্রদর্শনে এই বেদনাবিদ্ধ কবিহৃদয়ের একাংশমাত্র প্রকাশ পাইয়াছে। লক্ষ্মণ বাহির হইয়া গেলে সীতাদেবী বাহুপাশে রামচন্দ্রের কণ্ঠদেশ বেষ্টন করিয়া বাভারনসন্নিহিত নিভৃত প্রদেশে শয়ন করিলেন। সেই স্পর্শটুকুমাত্রে ভবভূতির সমস্ত বেদনা যেন সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। একখানি নবনীসুকুমার কোমল করস্পর্শ—শুধু একটা আত্মবিস্মৃত অনির্দ্দেশ্য আবেগের মত। রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, "প্রিয়ে কিমেতৎ

বিনিশ্চেতুং শক্যে ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা
প্রবোধো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমু মদঃ।
তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো
বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি সমুন্মীলয়তি চ॥"

বহুবর্ষ পরে নাইটিঙ্গেলের কণ্ঠস্বরে একজন বিদেশী কবির হৃদয়ে অনেকটা এইরূপ ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল।

"My heart aches, and a drowsy numbness pains
My sense, as though of hemlock I had drunk,
Or emptied some dull opiate to the drains
One minute past, and Lethe-wards had sunk."

শুধু কি তাই? গান শুনিতে শুনিতে কীট্‌সেরও রামচন্দ্রের দশা ঘটিয়াছে—"প্রবোধো নিদ্রা বা"—"Do I wake or sleep?".

রামচন্দ্রের বাহুপরি মস্তক রাখিয়া সীতা নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। বিবাহসময় হইতে গৃহে বনে, শৈশবে যৌবনে চিরদিনই এই বাহু তাঁহার উপাধান হইয়া আসিয়াছে। নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিয়া সীতা বলিয়া উঠিলেন, "আর্য্যপুত্র, আছ ত?" রামচন্দ্র স্নেহভরে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে করস্পর্শ করিলেন। সীতা তাঁহার গৃহের লক্ষ্মী, নয়নের অমৃতশলাকা, সীতার স্পর্শ সর্ব্বাঙ্গে বহুল চন্দনরস লেপন, কণ্ঠদেশে এই বাহু শিশিরসম্পৃক্ত মুক্তাহার; অসহ্য বিরহ ভিন্ন সীতার কিই না প্রিয়? "হা আর্য্যপুত্র, সৌম্য, কোথা তুমি?" চিত্রদর্শনজনিত বিরহভাবনা স্বপ্নাবস্থায়ও প্রিয়ার চিত্তোদ্বেগ ঘটাইতেছে।

"অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগুণং সর্ব্বাবস্থাসু য-
দ্বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরসা যস্মিন্নহার্য্যো রসঃ।
কালেনাবরণাত্যয়াৎ পরিণতে যৎ স্নেহসারে স্থিতম্
ভদ্রং প্রেম মমানুষস্য কথমপ্যেকং হি তৎ প্রাপ্যতে॥"

সুখে দুঃখে একরূপ, সর্ব্বাবস্থাতেই অনুকূল, হৃদয় যাহাতে বিশ্রাম লাভ করে, বয়সে যাহার রসক্ষয় হয় না, কালক্রমে লজ্জা ভয় সঙ্কোচ অপগত হইয়া যাহা পরিণত স্নেহসারে অবস্থিতি

করে, মনুষ্যের সেই অদ্বিতীয় নিরুপধি প্রেম কত পুণ্যেই পাওয়া যায়!

এমন সময়ে দুর্ম্মুখ আসিয়া সেই দারুণ লোকাপবাদ-সংবাদ নিবেদন করিল। কোথায় এত প্রেম? কোথায় সেই চিরন্তন পত্নীগতপ্রাণতা? প্রবল কুলগৌরব আসিয়া বলিল, সীতাকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। হৃদয় বলিল, সীতা যে নিরপরাধিনী। আর, হে রাম, সীতাকে বিসর্জ্জন দিয়া তোমার জীবনধারণে প্রয়োজন কি? তোমার জগৎ ত সীতাবিহনে জীর্ণারণ্য। ইক্ষ্বাকু বংশের কলঙ্ক মোচনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু যে অখণ্ড প্রেম সমস্ত প্রজাপুঞ্জের প্রীতি হইতেও গুরুতর ও উচ্চতর, যে অদ্বিতীয় প্রীতি, শুধু ইক্ষ্বাকুবংশ কেন, সমস্ত মানবকুলের জীবন, তাহাকে অকারণে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়া কলঙ্কক্ষালন কিরূপ? তবে আশৈশব এত করিয়া সীতাকে পোষণ করিলে কেন? সৌমিকবৃত্তিই যদি অবলম্বন করিবে, ক্ষুদ্রা পক্ষিণীকে বজ্রনীড়ে টানিয়া রাখিবার কি প্রয়োজন ছিল? কুলগৌরব বলিল, ও কথা নয়; তুমি রাজা, তুমি দশরথের পুত্র, রঘুর প্রপৌত্র, সূর্য্য তোমার আদিগুরুষ স্মরণ রাখিয়ো; তুমি শুধু সীতার স্বামী নহ, সসাগরা ধরিত্রী তোমাকে পতিরূপে বরণ করিয়াছে, তাহাকে ভুলিয়ো না; পত্নী ত্যাগ কর—নহিলে, আজ তুমি রাজা হইয়া যে দৃষ্টান্ত দেখাইবে তাহার ফলে লক্ষ লক্ষ গৃহে বিষবৃক্ষ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিবে; তুমি রাজা, তুমি শুদ্ধমাত্র প্রেয়সীর প্রেয়ান্ নহ, দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ করিয়া চিরন্তন বিধি রক্ষা কর। রামচন্দ্র কুলগৌরবের নিকট শির নত করিলেন। হৃদয় বলিতে লাগিল—কি করিলে! হায় রামচন্দ্র, কি করিলে!

দ্বিতীয় অঙ্কে ঘটনা বড় নাই। একটি সুন্দর বিষ্কম্ভক—সেই

বিষ্কম্ভকে ঋষিপত্নী আত্রেয়ী ও বনদেবতা বাসন্তীর কথোপকথনচ্ছলে দ্বাদশবৎসরের ঘটনাবলী সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে; যথা, সীতার যমক সন্তান প্রসবানন্তর রসাতলপ্রবেশ, সন্তানদ্বয়ের বাল্মীকি-আশ্রমে অবস্থান, রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের উদ্যোগ, লক্ষ্মণাত্মজ চন্দ্রকেতুর প্রতি অশ্বরক্ষণ ভার, নীচজাতীয় শম্বূকের তপশ্চর্য্যা নিবন্ধন রাজ্যে অকালমৃত্যুর প্রাদুর্ভাব ও শম্বূকের শিরশ্ছেদনমানসে রামের পঞ্চবটী আগমন বৃত্তান্ত। বিষ্কম্ভক এই; এবং অঙ্কটি রামখড়্গাঘাতে শাপবিমুক্ত দিব্যপুরুষ শম্বূকের সহিত রামের কথোপকথনে পঞ্চবটী বর্ণনাদি।

সম্মুখে দণ্ডকারণ্য। কোথাও স্নিগ্ধশ্যাম, কোথাও ভীষণ কদৃশ্য; স্থানে স্থানে নিরন্তর নির্ঝর-ঝরঝর-মুখরিত; কোথাও তীর্থাশ্রম, কোথাও পর্ব্বত, কোথাও নদী, কোথাও ঘন বন। ঐ যে জনস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত দীর্ঘ দক্ষিণারণ্য চলিয়াছে। এই অরণ্যভূমি চিরদিন সর্ব্বলোকলোমহর্ষণ—এখানকার গিরিগহ্বর সকল উন্মত্ত প্রচণ্ড শ্বাপদসঙ্কুল। কোথাও একেবারে নিষ্কম্প স্তিমিত, কোথাও নিরন্তর গর্জ্জনধ্বনিত, কোথাও বা স্বেচ্ছাসুপ্ত গভীরগর্জ্জনকারী ভুজঙ্গগণের নিশ্বাসে জ্বালিত অগ্নি; কোথাও গর্ত্তমধ্যে অল্প জল দেখা যাইতেছে, এবং তৃষিত কৃষ্ণসারেরা অজগরের স্বেদবিন্দু পান করিতেছে!—রামের সেইসকল পুরাতন কথা মনে পড়িতেছে, সীতা তাঁহার সহিত এই বনে বনে থাকিতে কত ভালবাসিতেন এবং সীতাসান্নিধ্যে তাঁহার সকল দুঃখ কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যাইত!

"তত্তস্য কিমপি দ্রব্যং যো হি যস্য প্রিয়ো জনঃ।"

এই মধ্যমারণ্য সকল কেমন প্রশান্ত-গম্ভীর! মদকল ময়ূরের কণ্ঠসদৃশ কোমলচ্ছবি পর্ব্বতে অবকীর্ণ, ঘননিবিষ্ট নীলগ্রাবাল

তরুণ তরুসমূহে শোভিত এবং অনাকুল বিবিধ মৃগযূথে পূ
স্বচ্ছতোয়া নির্ঝরিণী সকল বহুস্রোতে বহিতেছে; মদমত্ত
গণের অধিষ্ঠানে বৃন্তচ্যুত বেতসকুসুম পতিত হইয়া সেই
নির্ম্ম ও সুরভিত করিতেছে; এবং পরিপক্ক ফলময় শ
বনান্তে স্রোত স্খলিত হইয়া মুখরিত হইতেছে। গুহাবাসী
গণের ঘুৎকারনিঃস্বরণসহিত শব্দ চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত
অত্যন্ত গম্ভীর বোধ হইতেছে, এবং গজভগ্ন শল্লকীবৃক্ষের
গ্রন্থিসকল হইতে শিশিরকটুকষায় গন্ধ বাহির হইতেছে
পঞ্চবটী বনে সীতার সহিত বিশ্রম্ভালাপে কতদিন কাটিয়াছে
সকল কথা মনে হইয়া রামের রুদ্ধশোকপ্রবাহ উথলিয়া
তেছে—শরীরপ্রবিষ্ট তীব্র বিষরস যেমন বহুদিন পরে
আপন বেগ প্রকাশ করে।

"চিরাদেবারণ্যে প্রকৃত ইব তীব্রো বিষরসঃ
কুতশ্চিৎ সংবেগাচ্চলিত ইব শল্যস্য শকলঃ।
ব্রণে রূঢ়গ্রন্থিঃ স্ফুটিত ইব দুর্ম্মর্ম্মণি পুন-
র্ঘনীভূতঃ শোকো বিকলয়তি মাং নূতন ইব॥"

অগস্ত্যাশ্রমে আমন্ত্রিত হইয়া রামকে এই পঞ্চবটী ত
করিয়া যাইতে হইয়াছিল। পথে

"গুঞ্জৎকুঞ্জকুটীরকৌশিকঘটাঘুৎকারবৎকীচক-
স্তব্ধাড়ম্বরঘূকমৌকুলিকুলঃ ক্রৌঞ্চাবতোঽয়ং গিরিঃ।
এতস্মিন্ প্রচলাকিনাং প্রচলতামুদ্বেজিতাঃ কূজিতৈ-
রুদ্বেল্লন্তি পুরাণরোহিণতরুস্কন্ধেষু কুঞ্জীনসাঃ॥"

এই ক্রৌঞ্চাবত গিরি। এখানে অব্যক্তনাদী কুঞ্জকুটী
পেচককুলের ঘুৎকারবৎ বায়ুপ্রবিষ্ট বংশগুচ্ছের শব্দে ভী
কাকেরা নিঃশব্দ, এবং চঞ্চল ময়ূরগণের কেকারবে ভীত
সর্পেরা প্রাচীন বটের স্কন্ধদেশে লুক্কায়িত।

অদূরে

"এতে তে কুহরেষু গর্জ্জদনদদ্গোদাবরীবারয়ো
মেঘালঙ্কৃতমৌলিনীলশিখরাঃ ক্ষৌণীভৃতো দক্ষিণাঃ।
অন্যোন্যপ্রতিঘাতসঙ্কুলচলৎকল্লোলকোলাহলৈ-
রুত্তালাস্ত ইমে গভীরপয়সঃ পুণ্যাঃ সরিৎসঙ্গমাঃ॥"

এই সকল দক্ষিণ পর্ব্বত। পর্ব্বতের কুহরে গোদাবরীর বারি রাশি গর্জ্জদনিনাদ করিতেছে; নীল শিখরদেশ মেঘালঙ্কৃত এবং অন্যোন্যপ্রতিঘাতসঙ্কুল চঞ্চল তরঙ্গকোলাহলে দুর্দ্ধর্ষ গভী বারি নদীগণের পুণ্য সঙ্গম দেখা যায়।

এই পঞ্চবটীপ্রবেশ নামক অঙ্কের পরেই সেই ছায়াঙ্ক। মধ্যে হর ক্ষুদ্র বিষ্কম্ভকে কলকলভাষিণী তমসা ও মুরলা আসিয়া মি য়াছে—এবং বিরহক্ষীণ "অন্তর্গূঢ়ঘনব্যথঃ" রামচন্দ্রের—চতুর্দ্দি বধূসহবাসবিস্রম্ভের স্মৃতিদংশনে—ধৈর্য্যচ্যুতি আশঙ্কা করি গোদাবরীর নিকটে শীতল জলকণাসম্পৃক্ত বায়ুহিল্লোল প্রা করিতেছে। ভগবতী ভাগীরথীর অনুগ্রহে সীতা ছায়ারূপিণী স্পর্শ আছে, কিন্তু দর্শনের অতীত; ঠিক ছায়ার মত নয়, বাতাসের মত—স্পর্শে তেমনি সঞ্জীবনী এবং বাতাসেরই নয়নের অতীত। কিন্তু বাতাসের মত সীতা কেবলি এ হাহাকার নহে—যখন নর্ম্মদাহ্রদ হইতে উঠিয়া আ গাণ্ডুর্ব্বলকপোলসুন্দর বিলোলকবরী মুখখানি—দে হয় যেন করুণার মূর্ত্তি অথবা শরীরিণী বিরহব্যথা সমুপস্থি উত্তরচরিতের তৃতীয় অঙ্কটিই এই করুণাবিগলিত-বেদনা চিত। একদিকে পূর্ব্বস্মৃতি সীতাকে বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছে কবে কোন্ করিশাবককে তিনি শল্লকীপত্র খাওয়াইয়া নির্ব্বিশেষে পালন করিয়াছিলেন, তাহার বিপদ্ হইয়াছে শু

দ্বাদশ বৎসরের ব্যবধান স্মরণ করিয়া একেবারে যেন ধূলিসাৎ হইয়া যান; অন্যদিকে রামও সেই পঞ্চবটীর তরুলতা, মৃগ মৃগী, ময়ূর ময়ূরী, সর্ব্বত্র সীতার স্নেহ অনুভব করিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠেন এবং সীতা সীতা করিতে করিতে মোহপ্রাপ্ত হয়েন।

তখন সীতার স্পর্শ ভিন্ন কিছুই আর তাঁহার চেতনা সম্পাদন করিতে পারে না। সেই ছায়ারূপিণীর সৃজ্যী বন-স্পর্শে তাঁহার মূর্চ্ছা অপনোদিত হইয়া আনন্দে একটা অবশ অলস বিহ্বলতা জন্মে। সেই ছায়াহস্তকে তিনি চাপিয়া ধরেন—করে করস্পর্শে উভয়েরই অঙ্গে অঙ্গে যেন পুলক সঞ্চারিত হইয়া উঠে—কিন্তু ধরিয়া রাখা যায় না, অঙ্গ শিথিল হইয়া আসে, হাত ছাড়িয়া যায়। যেন সফল হইতে আসিয়া আশা সহসা বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়ে।

চেতনা সম্পাদিত হইলেও জীবন অত্যন্ত দুর্ব্বহ। একে সেই পঞ্চবটী বন—এইখানে বসিয়া সীতা মৃগদম্পতিকে তৃণভক্ষণ করাইতেন, ঐ তাঁহার স্বহস্তরোপিত কদম্বতরু, সম্মুখে সেই উল্লাসচঞ্চলা ময়ূরবধূ—চতুর্দ্দিক সীতাময়; তাহার উপর বাসন্তীর সেই মর্ম্মবেধী বজ্রকঠিন বিদ্রূপাচরণ। মহারাজ, অঙ্গের অমৃত, নয়নের কৌমুদী, দ্বিতীয় হৃদয় বলিয়া যাহাকে ভুলাইতে, লোকাপবাদ মিথ্যা জানিয়াও তাহাকে বিসর্জ্জন দিলে কোন্ হৃদয়ে প্রেয়সী তবে শুধু কথার কথা, যশই তোমাদের একমাত্র ভি রামচন্দ্রের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। কিন্তু তাহাই বা হয় কৈ?

"দলতি হৃদয়ং গাঢ়োদ্বেগং দ্বিধা তু ন ভিদ্যতে
বহতি বিকলঃ কায়ো মোহং ন মুঞ্চতি চেতনাম্।
জ্বলয়তি তনূমন্তর্দাহঃ করোতি ন ভস্মসাৎ
প্রহরতি বিধির্মর্ম্মচ্ছেদী ন কৃন্ততি জীবিতম্॥"

এ শুধু অনন্ত দহন, ভস্মসাৎ করে না, জ্বালা দেয় মাত্র; শুধু মর্ম্মচ্ছেদ করিতে থাকে, জীবন শেষ করিয়া দেয় না।

হা জানকি! হা চণ্ডি! চতুর্দ্দিকেই তোমাকে দেখিতেছি—তবু তুমি নির্দ্দয় হইয়া আছ কেন? হৃদয় স্ফুটিত হইতেছে, দেহবন্ধ শিথিল হইয়া আসিতেছে, জগৎ শূন্য, অন্তরে নিরন্তর জ্বালা, মোহ আমাকে আচ্ছন্ন করিতেছে, আমি অতি মন্দভাগ্য! বলিতে বলিতে রাম মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সীতা তাঁহার ললাট স্পর্শ করিতে চেতনা সঞ্চার হইল। সেই স্পর্শ অন্তরে বাহিরে অমৃতের প্রলেপ; চেতনা ফিরিয়া আসিল, কিন্তু আনন্দও যেন মোহ উৎপাদন করে।

ভবভূতির হৃদয় এই অশরীরী স্পর্শটুকু—এই আনন্দেও বেদনা, চৈতন্যেও মোহ, এই আবেগ, আকুলতা, মায়া, রহস্য। বাসন্তী তমসা সীতা রাম পঞ্চবটী সমস্ত মিলিয়া যে একটি নিবিড় মায়ারহস্য রচনা করিয়াছে তাহা শুধু এই বেদনাবিদ্ধ কবিহৃদয়ের বহিরুচ্ছ্বাস। সৃষ্টি যেমন মায়াও বটে, সত্যও বটে, ইহাও সেইরূপ। এই ছায়াস্থ সম্বন্ধে বোধ করি বলা খাটে "স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু।"

এই স্বপ্ন মায়া মতিভ্রম উত্তরচরিতের মেরুদণ্ড বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাল্মীকি-আশ্রমে কৌশল্যা জনকাদি সমাগমেই কি, লব-চন্দ্রকেতুর সুবর্ণিত সৌজন্যপরিপূর্ণ যুদ্ধদৃশ্যেই কি, এবং সপ্তম অঙ্কের নাট্যাভিনয়েই বা কি, সর্ব্বত্রই যেন একটা কি ধরি-ধরি-ধরা-যায়-না, যেন কাহাকে জানি না অথচ জানি, যেন অভিনয় কি সত্য, ভ্রম কি বাস্তব ঠাহরাইয়া উঠা কঠিন। সেইজন্য সুখের মধ্যেও বেদনা, জ্ঞানেও সংশয়। এবং যখন সেই রসাতলোদ্ভূত সিংহাসনে গঙ্গা ও ধরিত্রীর মধ্যস্থলে দেবী সীতা আবির্ভূতা হইলেন তখন সকলে নিষ্ফল স্তিমিত—সত্য না মায়া! সেই কৃপাজনের মুখে "হা তাত, হা অম্ব, হা পাতাবহ",

সেই রামের মেহার্দ্র সহর্ষ আলিঙ্গন, সেই অযুতাতী সীতা গঙ্গা পৃথিবী বাল্মীকি কুশ-লব প্রজাপুঞ্জ, স্নেহ প্রেম ভক্তি বিস্ময় সুখ দুঃখ মোহ চৈতন্যের অনির্ব্বচনীয় মহাসঙ্গম—সত্য কি মায়া!

জগতের অস্তিত্ব।

তর্কশাস্ত্রে "লাঠির যুক্তি" নামে একটা প্রভাবশালী বিচার-প্রণালীর উল্লেখ দেখা যায়। যে জাতি অমুক অমুক কাজ সম্পন্ন করে সেই জাতি শ্রেষ্ঠ; হিন্দুজাতি সেই সেই কাজ করিয়াছে, অতএব হিন্দুজাতি শ্রেষ্ঠ; এইরূপে বিচার করিতে গেলে বিস্তর গবেষণা ব্যয় করিতে হয়। হিন্দুজাতির শ্রেষ্ঠতা স্বীকার কর, নতুবা লাঠি—এই প্রবল ন্যায়ের নিকট সকলকেই মাথা নোয়াইতে হয়; এবং বলা বাহুল্য, আমরা এই সংক্ষিপ্ত যুক্তিরই বিশেষ পক্ষপাতী। শুনা যায়, এই পরাক্রান্ত যুক্তিবলে মহম্মদীয় ধর্ম্মের প্রচার হইয়াছিল এবং ইহারই সাহায্যে প্রোটেষ্টাণ্ট ও ক্যাথলিকের চিতাগ্নির আলোকে মধ্যযুগের আঁধার দূর করিবার চেষ্টা হইয়াছিল।

শুধু মানুষের অপবাদ দেওয়া যায় না। প্রকৃতিমাতা স্বয়ং তাঁহার যত্নপালিত ক্ষীণকায় মানবসন্তানগুলির প্রতি এই কঠোর যুক্তির প্রয়োগে কুণ্ঠিত হন না। তাঁহার কঠোর শাসনে আমাদিগকে এমন অনেকগুলি কথা মানিয়া লইতে হয়, যাহা অন্যরূপ বিচার-প্রণালীর সম্মুখে টিকে কি না সন্দেহ। সত্য বলিয়া স্বীকার কর, নতুবা জীবনযাত্রা চলে না। কাজেই স্বীকার করিতে হয়; বৈরাগী সম্প্রদায় সকলের প্রবল অভিযোগ সত্ত্বেও

ডারউইনের সময় হইতে জীবিকা ও জীবিকার মুখ্য সাধন উদর-তৃপ্তির মাহাত্ম্য মহত্ত্বগুণে বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। জীবজগতের সমুদয় অভিব্যক্তিটা স্থূলতঃ এই একমাত্র ব্যবসায়কে আশ্রয় করিয়া ঘটিয়া আসিতেছে। এমন কি, ধর্মাধর্ম্মের ব্যাখ্যাতেও সেই উদরপূরণের ও জীবিকানির্ব্বাহের উপযোগিতার দিকে বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হয়। যাহা না মানিলে জীবনযাত্রা চলে না তাহাই সত্য, এইরূপে সত্যের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে আজিকালি অনেকে সাহসী হইতেছেন। আজিকালি মাত্র; কেন না, তিন শত বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ দুঃসাহস অবলম্বন করিলে জীবনযাত্রা বড়ই সংক্ষিপ্ত হইবার সম্ভাবনা ছিল।

যাই হউক, সত্যের এইরূপ সংজ্ঞা দিলে একটা কঠিন সমস্যার একরকম মীমাংসায় উপস্থিত হওয়া যাইতে পারে। সমস্যাটা আর কিছু নহে—জগতের অস্তিত্ব। সাধারণ মানবজাতি অন্ন-পানাদির আহরণে এতদূর ব্যাপৃত আছে যে, জগতের অস্তিত্ব বিষয়ে তাহাদের মনোমধ্যে কস্মিন্‌কালে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না। কিন্তু কতকগুলি অতিবুদ্ধি লোকের আহারনিদ্রাদি অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য যথাবিধানে সম্পাদন করিয়া ত এত অবকাশ অবশিষ্ট থাকে যে, জঠরজ্বালারূপ তীব্রানুভব জাগতিক ব্যাপার বর্ত্তমান সত্ত্বেও তাঁহারা জগতের অস্তিত্বটা একবারে লোপ করিতে বসেন। এবং বলিতে কি, প্রচলিত ন্যায়শাস্ত্রের পন্থা এতই বিচ্ছিন্ন যে, সেই মার্গ ধরিয়া একটা মীমাংসায় উপস্থিত হওয়া একরকম দুঃসাধ্য ব্যাপার। এক সম্প্রদায়ের মতে জগতের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ সত্য; অন্য সম্প্রদায়ের মতে ইহা একেবারে কাল্পনিক। ন্যায়শাস্ত্র উভয়বিধ সিদ্ধান্তেই নিরীহ মানুষকে টানিয়া লইয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য বিধান বড় ভরসাস্থল নহে।

বোধ করি, সেইজন্যই নিরাশ সময়ে লাঠির যুক্তি অবলম্বন করিতে হয়।

যদি জগৎ থাকে, তবে উহা কি, এ প্রশ্নও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া পড়ে। বলা বাহুল্য, এ কথাটা আজ পর্য্যন্ত সুনিরূপিত হয় নাই। জগতের প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া আত্মা, জড়, শক্তি প্রভৃতি আভিধানিক শব্দের এমনি একটা স্তূপ আসিয়া দৃষ্টিরোধ করে যে, মানুষকে পথহারা ও আত্মহারা হইতে হয়। কেহ বলেন, জগৎ এক, কেহ বলেন দুই; অপরে সংখ্যার এতাদৃশ অল্পতায় সন্তুষ্ট নহেন। কেহ বলেন জগৎ অনাদি, অনন্ত; কেহ বলেন আদি, সৃষ্ট। কাহারও মতে জগতের অস্তিত্ব আমার মনের সহব্যাপী। আমি যতদিন, জগৎও ততদিন। আবার অন্যের মতে অতীত ও ভবিষ্যৎ এই দুইটা কথার কথা। অতীত বর্ত্তমানকে নিয়মিত করে; বর্ত্তমান ভবিষ্যতের মুখ রাখিয়া চলে। অতএব তিনই একদা বর্ত্তমান। দুই বৎসর হইল ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের সম্মুখে অধ্যাপক লজ্ এইরূপ একটা আজগুবি কথার প্রবর্ত্তনা করেন। কেহ বলেন জগতের স্রোত একটানে নিরবচ্ছেদে বহিয়া আসিতেছে; আবার কাহারও মতে সেই স্রোত একটা নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক একটানা প্রবাহ নহে। জোনাকি-পোকার আলোকের মত, মনুষ্যহৃদয়ের স্পন্দনের মত সেই স্রোত এই আছে, এই নাই, এই আছে, এই নাই, এইরূপ করিয়া, অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের পরম্পরাক্রমে বহিয়া যায়। ম্যাজিক-লণ্ঠনের ছবি যেমন শীঘ্রহস্তে পর পর বদলাইয়া গেলে, দুইখানা ছবির মাঝের ব্যবধানটুকু বুঝা যায় না; তেমনি জগতের দৃশ্য-পট এত দ্রুতগতিতে ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে যে, দৃষ্টি-ক্লান্ত মানুষ বাকের নাস্তিত্বের ব্যবধানটুকু টের পাইতেছে না।

যাহাই হউক, এই সকল পরস্পরবিরোধী মতের মূলে জগতের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয় নাই; সুতরাং অস্তিত্বের বিচারে ইহাদিগকে টানিয়া আনার দরকার নাই।

জগৎকে বিশ্লেষণ করিলে মোটামুটি দুইটা জিনিস পাওয়া যায়। প্রথম আমি, ও দ্বিতীয় আমি-ছাড়া, অর্থাৎ আমার বাহিরে আর যা' কিছু আছে। "আমি" শব্দের অর্থ এস্থলে ঠিক্ সেই হস্ত-পদ-যুক্ত শরীরী জীব নহে, যাহার উপভোগের নিমিত্ত এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড বর্ত্তমান। "আমি" শব্দের অর্থ এখানে আমার সেই সঙ্কীর্ণ অংশটুকু, যাহা অনুভব করে, চিন্তা করে, ইচ্ছা করে। অনুভূতি, চিন্তা, কামনা এই তিনের সমবায় ও পরম্পরাকে যদি চৈতন্য বলা যায়, তবে "আমি" অর্থে আমার চৈতন্যমাত্র। "আমি-ছাড়া"র অর্থ আমার চৈতন্য বাদ দিয়া জগতের বাকী সমগ্রটা, অর্থাৎ যাহা-কিছু আমার অনুভূতির বিষয়, আমার চিন্তার উদ্দীপক, আমার ইচ্ছার প্রয়োগক্ষেত্র। এই অর্থে বাহিরের জড়জগৎ ব্যতীত তুমি ও তোমার চৈতন্য এবং আমার ভৌতিক শরীর পর্য্যন্ত আমার বাহিরে। জগতের অস্তিত্ব বলিলে আমার অস্তিত্ব ও আমার বহিঃস্থ এই জগতের অস্তিত্ব, এই দুই বুঝিতে হইবে।

প্রথম, আমার অস্তিত্ব। এই বিষয়টাতে বড় দুই মত হইবার উপায় নাই। কেন না, আমার অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে আর কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। তর্কের ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত লুপ্ত হয়। যদি স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া কোন সত্য বা সিদ্ধান্ত থাকে, আমার অস্তিত্ব সেই স্বতঃসিদ্ধ। ইহা অন্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। অপর যাবতীয় সিদ্ধান্তের প্রমাণ এই স্বতঃসিদ্ধের উপর নির্ভর করে। পক্ষান্তরে দুর্ভাগ্যক্রমে আমার

অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার বড় সংশয় নাই; নতুবা এইখানেই লেখনীকে বিরাম দিয়া তাঁহাকে অব্যাহতি দিতে বাধ্য হইতাম।

তার পর বাহিরের, অর্থাৎ আমি-ছাড়া জগতের কথা। এইখানেই যত গণ্ডগোল। আঁধার পথ আজকাল কতকটা আলোকিত হইয়াছে বলিতে হইবে। বার্কলি ও হিউমের স্থাপিত ভিত্তির উপর হেলম্‌হোল্‌ট্‌জ্‌ শারীর-বিজ্ঞানের মসলা দিয়া দৃঢ়বদ্ধ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

আপাততঃ বাহ্যজগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইলাম। বাহিরের সহিত আমার সংস্পর্শে আমার জীবন। পরস্পরের প্রতিঘাত লইয়া জীবনের কাহিনী। যেখানে পরস্পর প্রতিঘাতের শেষ, সেইখানে জীবলীলার অবসান। বহির্জগতের খানিকটা আমার প্রত্যক্ষ বিষয়, ইন্দ্রিয়গোচর। খানিকটা অনুমানগোচর। তোমার ভৌতিক শরীর আমার প্রত্যক্ষ বিষয়, তোমার চৈতন্য আমার অনুমানগোচর। প্রত্যক্ষ ভাগের সহিতই আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও সংস্পর্শ। সেই সংস্পর্শ হইতে তোমার অনুমানগোচর ভাগটার ও সমগ্র তুমিটার অস্তিত্ব আমি টানিয়া লই। কিন্তু সংস্পর্শ বলিলে ভুল হয়। উভয়ের মাঝে এত ব্যবধান যে, স্পর্শ বলিলে অভিধানের প্রতি বিষে অবিচার হয়। আমি তোমাকে কখন ছুঁই না; তোমার নাই আমাকে স্পর্শ কর। কতকগুলা সঙ্কেত লইয়া আমি কারবার করি। সঙ্কেতগুলা রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শময়। সংকেতগুলা কোনরূপে তোমার নিকট হইতে আসিয়া আমার নিকট পৌঁছে। কিন্তু সঙ্কেতের সহিত তোমার কোন সাদৃশ্য নাই। টেলিগ্রাফের কেরাণী কাঁটার আক্ষেপ দেখিয়া স্থির করেন, বিলাতে পার্লেমেণ্ট বসিয়াছে। শাদা কাগজে কালির আঁচড়

দেখিয়া আমরা নিউটনের চিন্তাপরম্পরা বুঝিয়া লই
কাঁটার আন্দোলনের সহিত পার্লেমেণ্টের, অথবা ছাপ
সহিত নিউটনের চিন্তা-প্রণালীর যে সাদৃশ্য, তোমা
তোমার রূপরসগন্ধাদির সাদৃশ্য তার চেয়েও কম। তোমা
হইতে চারিদিকের ঈথরে ধাক্কা লাগে। সেই ধাক্কা
চক্ষুর পটে লাগে। স্নায়ুযোগে সেই ধাক্কা মস্তিষ্কে নী
মস্তিষ্কের স্থানবিশেষে বিশেষ একরকম আন্দোলন
করে। সেই আন্দোলনের সঙ্গে তোমার রূপানুভূতি
ঈথরের ধাক্কা মস্তিষ্কে পৌঁছান পর্য্যন্ত একরকম বু
মস্তিষ্কের আন্দোলনের সঙ্গে রূপানুভূতির সম্বন্ধ বুঝা
সাদৃশ্য ত কিছুই নাই, সম্বন্ধ একটা আছে, সাহচর্য্য ও
লইয়া। এই সম্বন্ধ লইয়া সঙ্কেত। যখনই সেইরূপ স
তখনই সেইরূপ অনুভূতি। তাই যখনই সেই অনুভূতি
তখনি তার কারণস্বরূপ তোমার অস্তিত্ব অনুমা
অনুভূতিটা আমার অংশ, আমার চৈতন্যের এক
চৈতন্যপ্রবাহের একটি ঢেউ; সুতরাং সত্য। তোমার
আমার অনুমান, আমার বুদ্ধিশক্তির একটা কারিগরি
সৃষ্টি, একটা কল্পনা। কল্পনাটাতে আমার দৈনিক
চলিয়া যায়; তার উপর ভর করিয়া আমার জীবনের
আয়ব্যয়ের বজেট তৈয়ার করি; সাবধান হইয়া চলিলে
যাত্রা বেশ একরকম চলে। কিন্তু মাঝে মাঝে ঠকি
প্রতারিত হইতে হয়; তখন ফাজিল অঙ্ক আসিয়
চিরজীবনটা সঙ্কেতের উপর চালাইয়া থাকি। সঙ্কে
কারবার করিতে হইলে মাঝে মাঝে ঠকিতে হয়।
গ্রাফের কেরাণী ইহা বেশ বুঝেন। কাঁটা নড়িল, সঙ্কে

গেল ; ফেরারী মহা
মূলে তার সত্য নাই
প্রাচীর নাই ; বিশ্বা
সেইরূপ রূপানুভূতি
করি। কিন্তু এমনও
বান্ নাই। ভিত্তিকে
সময়ে ঘটে ; রূপানু
কারণ নাই। সাপ ে
আছে, তাহা সকল
যথাগত সঙ্কেত ও ত
নির্ম্মাণ করি। স্মৃতি
সঙ্গত ব্যাখ্যা এইরূ
ইলিউশন্ বা হালু
হিপ্‌নটিক্ রোগীকে
তাই দেখে। বিশ্বা
করিয়াছিলেন ; কি
ভর জগৎ নির্ম্মাণ ক
তেন না, তাই তাঁ
তেন ; তাই বিশ্বামি
রূপানুভূতি সম্ব
সর্ব্বত্রই সঙ্কেত ল
সেগুলা সত্যপদার্থ
নাই পূর্ব্বেই স্বীকা
বুদ্ধিসৃষ্ট বাহ্যজগৎ
নাম ভর করিয়া

কিন্তু সময়ে সময়ে ঠকিতে হয়। কেন চলে সে স্বতন্ত্র কথা। এইরূপ মায়ারাজ্যের কল্পনা করিয়া তন্মধ্যে মানব চৈতন্যকে যথেচ্ছবিহারী দেখিয়া প্রকৃতির কি উদ্দেশ্য সাধিত হয়, সে কথা না তোলাই ভাল। স্থূল কথা এই, বাহ্যজগৎ যদি থাকে তাহাকে আমি (অর্থাৎ আমার চৈতন্য) স্পর্শ করিতে অক্ষম ; স্পর্শ করিতে যখন অক্ষম, তখন জোর করিয়া বলিতে পারি না, আছে। অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া তাহা বুঝাইবার জন্য মস্তিষ্কে আন্দোলন টানিয়া আনি ; এবং আন্দোলনের সঙ্গে সাহচর্য্য পারম্পর্য্য সম্বন্ধ তুলিয়া অনুভূতি-সঙ্কেতের আশ্রয় লই। স্পর্শ করিতে পারি না, অথচ অস্তিত্ব স্বীকার করি ; ব্যাখ্যার আবশ্যকতা, তাই সঙ্কেত-থিওরি দিয়া একটা ব্যাখ্যা গড়িয়া লই। আমার মস্তিষ্ক আমার অংশ নহে ; সেটা ভৌতিক প্রত্যক্ষ বিষয়, আমার চৈতন্যের বাহিরে ; সুতরাং বহিঃস্থ আমি-ছাড়া জগতের অন্তর্ভুক্ত। মস্তিষ্কের আন্দোলনে কিরূপে অনুভূতি বা চৈতন্য জন্মে তাহার ব্যাখ্যা নাই। শর্করায় পরমাণু সমাবেশের-ব্যতিক্রমে মাদকধর্ম্ম জন্মে ; সেইরূপ জীবশরীরে পরমাণু-সমাবেশের ব্যতিক্রমে চৈতন্যধর্ম্ম জন্মে ; এই ব্যাখ্যা অশ্রদ্ধেয়। শর্করা ও শর্করার ধর্ম্ম উভয়ই আমি-ছাড়া, সুতরাং একহিসাবে সজাতীয়। আমার মস্তিষ্ক আমার বাহিরে ; কিন্তু আমার অনুভব, আমার চৈতন্য, আমার মধ্যে ; সুতরাং এই হিসাবে বিজাতীয়। কাজেই এ যুক্তি টিকে না ; একের সহিত অন্যের তুলনা হয় না।

বাহ্যজগৎ একটা বিশাল স্বপ্ন, এবং মানুষমাত্রই এক একটি সনাতন আফিমখোর, এইরূপ সিদ্ধান্ত আসিয়া পড়ে। কথাটা শুনিতে মিষ্ট লাগে না ; কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি

প্রযুক্ত হয়, তাহার সারবত্তা ভাল বুঝা যায় না। আমি যদি বলি জগৎ স্বপ্নমাত্র, তাহা হইলে আমার কথাটা কেহ উলটাইতে পারে বোধ হয় না। স্বপ্ন কতকগুলি অনুভূতির সমবায় ও পরম্পরামাত্র; জগৎও তেমনি কতকগুলি অনুভূতির সমবায় ও পরম্পরা ব্যতীত আর কিছুই নহে। উভয়ে প্রকৃতিগত কোন তফাৎ দেখি না। আমি উভয়ত্র বর্ত্তমান; বাহ্যজগৎ আমার বাহিরে আমার অনুভবের বিষয়ীভূত একটা কিছু, উভয়ত্রই বর্ত্তমান। তবে স্বপ্নটা অপ্রকৃত আর জাগ্রৎ ব্যাপারটা প্রকৃত কিসে হইল? বলিতে পার স্বপ্নে ঘটনাবলীর মধ্যে সামঞ্জস্য নাই, পরস্পর মিল নাই, সবই খাক্‌ছাড়া, স্বতঃপ্রধান; আর জাগ্রৎ ঘটনাবলীর মধ্যে সামঞ্জস্য আছে; সব ঘটনাগুলা অবিরোধে একটা কাহিনী বা প্লটের স্বরূপে একটা উদ্দেশ্যের দিকে চলিতেছে। কিন্তু স্বপ্নে সামঞ্জস্যের অভাব আমরা সুপ্ত অবস্থায় কিছুই বুঝিতে পারি না; তখন একটা বিচিত্র অভিনয়, বিচিত্র প্লটই দেখিতে পাই। জীবন যদি স্বপ্নাবস্থা হয়, তবে জীবনসত্ত্বে এ স্বপ্নে সামঞ্জস্যের অভাব ধরিব কি রূপে? বলিতে পার একটা অনুভূতি আমাদের ভ্রমজ্ঞান দিতে পারে; কিন্তু যখন পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের পাঁচটা অনুভূতি পরস্পরের পক্ষে সাক্ষ্য দিতেছে; চোখের ভ্রম স্পর্শে, স্পর্শের ভ্রম শব্দে নিরাকৃত হইতেছে; পরস্পরের মধ্যে অবিসম্বাদী অবিরোধ; তখন জগৎকে মিথ্যা কিরূপে বলিব? উত্তর, স্বপ্নাবস্থাতেও একটা অনুভূতিমাত্র একসময়ে থাকে না; দৃষ্টি, শ্রুতি, স্পর্শ, সমুদয় একত্রে কাজ করিয়া পরস্পর অবিরোধে এক সুখদুঃখময়, হাসিকান্নাময়, মনোজ্ঞ, কৌতুকময় জগতের সৃষ্টি করে। আবার অস্তিত্বের প্রমাণ যদি ইন্দ্রিয়ানুভূতির সংখ্যার উপর নির্ভর করে বল, তাহা হইলে সে প্রমাণের

ভিত্তি নিতান্ত শিথিল হইল। ভাগ্যে মানুষের পাঁচরকম অনুভূতি আছে, তাই কথাটা তুলিতেছ। আমার রূপানুভূতি আছে, তাই ইন্দু আমার নিকট অমৃতধার ঢালে; শব্দানুভূতি আছে, তাই বিহগকুল সুরবসার ঢালে; গন্ধানুভূতি আছে, তাই কুসুম সুরভিভার ঢালে। আর যার অনুভূতি নাই তার কাছে সবই মহাশূন্য; তার কাছে যুক্তিতর্ক কোথায় লাগিবে? আবার আর এক কথা বলিতে পার, আমি না হয় ভ্রান্ত, সকলেই কি ভ্রান্ত? তুমি, তিনি, সে, সকলেই কি একই ভ্রমে ভ্রান্ত হইয়া একই স্বপ্নদর্শনে নিমগ্ন? কিন্তু হায়, তুমিই বা কে, আর তিনিই বা কে? তুমি ও তিনি ত আমারই কল্পিত। তোমরা ত বাহ্যজগতেরই অংশ, সুতরাং আমারই সৃষ্টপদার্থ। আমি দেখিতেছি সত্য, কিন্তু তুমি দেখিতেছ ইহা আমারই বোধ হইতেছে মাত্র, তুমি ত আমারই হাতগড়া সাক্ষী; তোমার সাক্ষ্যে আমাকে ছাড়িয়া স্বতন্ত্রতা নাই।

দাঁড়াইল এই। আমি চিন্তা করি, অনুভব করি, অতএব আমি আছি। জগৎটাকে অনুভব করি বলিয়া যে জগৎ আছে তাহার প্রমাণাভাব। এটা আমার আফিমখুরীর পরিচয়। তোমাকে ও তাঁহাকে ও আমার ভৌতিক কলেবরটাকে লইয়া সমগ্র বাহ্যজগৎটা আমার কল্পনা, আমার চিন্তা, আমার অনুভূতি, বাসনা ও কামনা ও তৃপ্তি; এক কথায় সবটাই আমার ভিতর; আমিই সব। ফলে যুক্তিশাস্ত্র এই ঘোরতর স্বার্থময় সিদ্ধান্তে আনয়ন করে। আমিই সব, তুমি আবার কে? ইহার ফল বৈরাগ্য। জগৎ মিথ্যা, মায়া, মোহ; নিজের কাজ দেখ। এই স্বার্থময় বৈরাগ্যধর্ম্মের বিরুদ্ধে অন্য যুক্তি নাই, একমাত্র যুক্তি লাঠি। প্রকৃতি স্বয়ং লগুড়হস্তে দণ্ডায়মানী। আমি উত্তমপুরুষ, তুমি

মধ্যমপুরুষ, বাকিটা প্রথমপুরুষ। প্রথম বলিতেছেন, ওহে উত্তমপুরুষ, তুমি তোমার সহবর্ত্তী মধ্যমপুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার কর; নতুবা তোমার কল্যাণ নাই। আমি উত্তমপুরুষের অস্তিত্বে সন্দিহান নহি, এবং উত্তমপুরুষের কল্যাণ বিশেষরূপে বুঝি। উত্তমপুরুষের কল্যাণসাধন আমার পরমপুরুষার্থ। উত্তমপুরুষের কল্যাণসাধনার্থ আমি মধ্যমপুরুষ তোমার অস্তিত্ব মানিয়া লই। তোমার ভৌতিকশরীরের অস্তিত্বের জন্য আমি প্রমাণ সংগ্রহে ব্যাপৃত। কিন্তু তোমার চৈতন্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে আমার জীবনযাত্রা চলে না। আমি যেমন চৈতন্যশালী একটা-না-একটা কিছু, তুমিও তেমনি সর্ব্বতোভাবে আমারই মত আহারনিদ্রাভয়তৎপর, ঈর্ষ্যী ঘৃণী অসন্তুষ্ট, চৈতন্যশালী কিছু-না-কিছু, ইহা আমি অকপটে কায়মনোবাক্যে স্বীকার করি। নতুবা, প্রতিপদে আমাকে বাধিত হইতে হয়। নহিলে জীবনযাত্রা এক পদ অগ্রসর হয় না। নহিলে উত্তমপুরুষের কল্যাণসাধন হয় না, এবং উত্তমপুরুষের কল্যাণসাধনই আমার পরমপুরুষার্থ। প্রমাণের অভাব; যুক্তি নাই; কিন্তু প্রকৃতিপ্রযুক্ত লণ্ডভের ভয় আছে। সুতরাং আমি আছি, তুমিও আছ। তুমি বিনা কি ভাই চলে?

তুমি আছ, সুতরাং রাম, হরি, কৃষ্ণ সকলেই আছেন। কেন না, সময়বিশেষে সকলেই মধ্যমপুরুষস্থলীয় হইয়া দাঁড়ান। আবার তোমাদের দূরস্থ জ্ঞাতি ওরাং, হনুমান্, জাম্ববান্ পর্য্যন্ত সকলেই আছেন। কেন না, শাখালম্বী হনুমান্ হইতে কাফ্রি মহাশয় যতদূরে, কাফ্রি মহাশয় হইতে তোমার দূরস্থ ভায়ি চেয়ে কম, সকলসময়ে একথা বলিতে সাহস হয় না। বলিলে তুমি রাগ করিবে। একবার পদস্খলন হইলে আর নিস্তার নাই।

ক্রমেই অগ্রসর হইতে হয়। মীন বর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া আসিডিয়ান্, আম্ফিঅক্সস্, ও শেষে দুরহ প্রোটোপ্লাজম্ সকলেই তোমার জ্ঞাতিকুটুম্ব, সুতরাং সকলেই মধ্যম-পুরুষস্থলীয় হইবার অধিকারী, সুতরাং সকলেই সত্তি। তোমাকে চেতন স্বীকার করিলে সকলকেই চেতন মানিতে হইবে। জীবশ্রেণীর পরম্পরায় পরস্পরের এমনি সম্বন্ধ, কাহাকে ছাড়িয়া কাহার চৈতন্য স্বীকার করিব। তোমার যদি চৈতন্য থাকে, কীটাণুরও আছে, প্রোটোপ্লাজমেরও আছে। চৈতন্যের সীমানা নির্দ্দেশ অসম্ভব। এই রেখার ঊর্দ্ধে সমুদয় জীব চৈতন্যবিশিষ্ট, ইহার নীচে চৈতন্য নাই, কে বলিবে? অবশ্য তোমার চৈতন্যে ও কীটাণুর চৈতন্যে পার্থক্য আছে; কিন্তু সে প্রকৃতি-গত নহে, মৌলিক নহে, কেবল অভিব্যক্তির মাত্রাগত। যেমন কীটাণুর দেহে ও তোমার দেহে অভিব্যক্তির মাত্রাগত তারতম্য, উভয়েরই চৈতন্যে সেইরূপ মাত্রাগত ব্যবধান মাত্র; উভয়েই একজাতীয়।

প্রোটোপ্লাজমে নামিয়াও থামা চলে না। প্রোটোপ্লাজম্ আজি-কালিকার নিম্নতম জীব। কিন্তু এই নিম্নতম জীবের ও জড়ের মধ্যে যে একটা ব্যবধান অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়, সেটা ভৌতিক ব্যবধানমাত্র। আজ বিজ্ঞান তাহা লঙ্ঘন করিতে অসমর্থ, কিন্তু দুই দিন পরে এই ব্যবধান লঙ্ঘিত হইবে তাহার সংশয় নাই। জীবনীক্রিয়া (অবশ্য চৈতন্যভাগ বাদ দিয়া) ভৌতিক ক্রিয়ারই অবান্তর ভেদমাত্র, সুতরাং পদার্থবিদ্যা ও জড়বিজ্ঞানেরই ব্যাখ্যার বিষয়। কালে ইহা ব্যাখ্যাত হইবেক। অম্লজান উদজানের সমাবেশে জল ও অলের সমুদয় ধর্ম্ম; সেইরূপ কার্ব্বন, অম্লজান উদজানাদির সমাবেশে প্রোটোপ্লাজম্ ও

তাহার সমুদয় ধর্ম্ম। প্রভেদ কেবল জটিলতায়। জটিলতার শৃঙ্খল মুক্ত হইবে সংশয় নাই। সুতরাং কীটাণুতে ও প্রোটোপ্লাজমে যদি চৈতন্যের অস্তিত্ব স্বীকার কর, অঙ্গার ও উদজানের পরমাণুতেও স্বীকার করিতে হইবে। চৈতন্য নামটা দিতে রাজি না হও ক্ষতি নাই; কিন্তু যাহা আছে তাহা চৈতন্যের সজাতীয়, সপ্রকৃতিক। চৈতন্য না বলিয়া চিৎ বল, চিদ্ধর্ম্ম বল, চৈতন্য-কণা বল, মনোবীজ বল, ক্ষতি নাই। যাহা আছে তাহা অনুভূতি না হইতে পারে, বুদ্ধি বা চিন্তা না হইতে পারে; কিন্তু যাহার সমাবেশে, যাহার অভিব্যক্তিতে অনুভূতি, চিন্তা ও বুদ্ধি; যাহার অঙ্কুর হইতে অনুভূতি, চিন্তা ও বুদ্ধির বিকাশ।

জড় কিরূপে চৈতন্যকে স্পর্শ করিবে বুঝা যায় না, মস্তিষ্কের আন্দোলনে কিরূপে অনুভূতি জন্মিবে বুঝা যায় না; কিন্তু চৈতন্য বা তৎপ্রকৃতিক পদার্থ কিরূপে চৈতন্যকে স্পর্শ করিবে তাহা কতক বুঝা যায়। বাহ্যজগৎ চৈতন্যময়; আমিও চৈতন্যময়। তাই বাহিরে ও অন্তরে প্রতিক্রিয়া, ঘাতপ্রতিঘাত। চৈতন্যের অস্তিত্ব বাহিরে ও ভিতরে, আমার পূর্ব্বে ও আমার পরে, এই অর্থে প্রমাণিত ও স্বীকৃত হইতে পারে। দেশব্যাপ্তি ও কালব্যাপ্তি লইয়া একটু গোল হইতে পারে, সেকথা এখানে তুলিব না।

কতকটা বেদান্তবাদে আসিয়া দাঁড়ায়। একটা কিছু আছে; সেইটা সৎ; সেটা চিদ্বস্তু। তাহারই অবস্থাভেদে, ক্রিয়াভেদে (অবস্থাভেদ, ক্রিয়াভেদ কিরূপ?) খণ্ড চৈতন্য, তুমি, আমি, সে, বৃক্ষ, লতা। জড় চৈতন্যেরই আভাস, প্রতিবিম্ব, ছায়া। ভ্রান্তি বল ক্ষতি নাই। স্পেন্সার বলেন ক ও খ। ক বিনা খ নাই, খ বিনা ক নাই। এক দিকে দেখিলে ক, অন্যদিকে দেখিলে

ও। কিন্তু উভয়ই অনির্দ্দেশ্য, লক্ষণাতীত। একটারই দুই দিক্, সেটা কি, বলিবার উপায় নাই।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের গতি এই মুখে। একটার দুই ভাব। চৈতন্য ও জড়; একভাবে চেতনাক্রিয়া, একভাবে ভৌতিক-ক্রিয়া। একভাবে অনুভূতি, অন্যভাবে মস্তিষ্কে পারমাণবিক আন্দোলন।

জগতের অস্তিত্ব এইরূপ সত্য। সত্যের পক্ষে প্রধান যুক্তি প্রকৃতির লাঠি। সত্যমাত্রই বুঝি এইরূপ। সকলেরই এই সংজ্ঞা। না মানিলে নয়, তাই মানি। অগত্যা।

মানুষের পক্ষে ইহার উপরে উঠিবার দরকার নাই, শক্তিও নাই।

স্বরলিপি।

সিন্ধু—একতালা।

আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না।
একি শুধু হাসি খেলা প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা ছলনা।
আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না।
এ যে নয়নের জল, হতাশের শ্বাস,
কলঙ্কের কথা দরিদ্রের আশ,
এ যে বুকফাটা দুখে গুমরিছে বুকে
গভীর মরম-বেদনা।
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা ছলনা।

আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না!
এসেছি কি হেথা যশের কাঙালি,
কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি,
মিছে কথা ক'য়ে মিছে যশ ল'য়ে
মিছে কাজে নিশি-যাপনা।
কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ,
কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ,
কাতরে কাঁদিবে, মায়ের পায়ে দিবে
সফল প্রাণের কামনা।
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা, ছলনা!
আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না!

৮।৩

।সসা -না ॥ {নসা -নসরা রা। রররা ঘাঃ -গঃ।
।আমা য় ॥ {বোল — না। গাহি তে —।

।সরাঃ -পঃ পা। (ঃ মঃ জমজ্ঞা -রা।)}। -ন না না।
।বোল — না। (আ মা য়।)}। এ কি।

{নর্সা-নর্সর্রা র্রর্সা। র্সাঃ র্সঃ র্সা। এ্ঞা র্সা এ্ঞর্সএ্ঞা।
{শুধু — হা। সি খে লা। প্র মো দে ।

।(ধএ্ঞা পপা না।)} ধএ্ঞা পা ধা। এ্ঞর্সা -ন ধএ্ঞর্সা।
।(র মে লা।)} র মে লা। শুধু — মি ।

।এ্ঞা ধপাঃ -ধপঃ। মমা -গমপা পা। -ঃমঃ জ্ঞমজ্ঞা -রা॥
।ছে কথা — । ছল — না। (আ মা য়)॥

। -। পা পা। পা পা পধা। মা পা -ধা।
। — ও যে। ন য় নে। র ম ণ্।

। নর্সা -। নর্সর্রা। র্সনা র্সা -। নর্সা -। নর্সর্রা।
। হতা — শে। র ঘাস্। ফল — ক্তে।

। র্রর্জ্ঞা র্রর্সাঃ -র্সঃ। নর্সা -। নর্সর্রা। র্সা র্সর্রজ্ঞাঃ সর্সা।
। র কথা — । দরি — ত্রে। র আশ্ এসে।

। ঞর্সর্জ্ঞা -ধপা পা। পাঃ পঃ ধা। ঞ্ঞা র্সা ঞর্সর্জ্ঞা।
। বু ক্ ফা। টা দু খে। শু ন রি।

। ধঞ্ঞা পা ধা। ঞ্ঞা ধঞ্ঞর্সা ঞ্ঞা। ধঞ্ঞধা পধা পধপাঃ।
। ছে বু কে। গ ভী র। ম র ম।

। মমা -গমপা পা। -। না না। ..... ইত্যাদি॥
। বেদ — না। —(এ কি)। শুধু হাসি···ছলনা (আমায়)॥

। । । ।। সসা -। নসরা। {রাঃ রঃ রা। রপা -। ধা।
। । এসে — ছি। {কি হে ধা। বশে — র ম।

। রমঙ্গাঃ মঃ সা। পপধা -ঞর্সা র্সা। ঞর্সর্জ্ঞা ধঃ রর্সাঃ
। কা ঙ্গা লী। কথা — শো। থে শে থে।

। পমা -গা গমা। (রগমাঃ মঃ -গমপা। মা ঙ্গরা সা।)}
। নিতে — ক। (র তা লি। এ সে ছি।)}

। রগমা -গপমগা মা। পনা -। পা। না র্সর্সা র্সা॥
। র তা লি। মিছে — ক। থা কু ছে।

। নর্সর্রা র্সা র্সঞ্ঞা। ধপা মর্গা মা। গপা -র্সা ঞ্রর্সঞ্ঞা।
। মি ছে ত । শ্ ল রে। মিছে — কা ।

। ঞ্রঞ্ঞা পধা পধপা। মমা -গমপা মা। ১ ১ ১।
। জে নি শি । যাপ — না। ।

। পপা -। পধা। {মা পা ধা। নর্সা -। নর্সর্রা।
। কেজা — গি । {বে আ জ্। কেক — রি ।

। র্সমা র্সা -। নর্সা -। নর্সর্রা। র্রর্জ্ঞা র্রর্সাঃ -র্রর্সঃ।
। বে কা জ্। কেযু — চা । তে চাহে — ।

। নর্সা -। নর্সর্রা। র্সা র্সর্রঞ্ঞা -। (র্সঞ্ঞাঃ ধঃ পধা)}।
। জন — নী । র লাজ্ —। (কেজা — গি)}।

। র্সঞ্ঞাঃ -ধঃ পা। পাঃ পঃ ধা। ঞ্রর্সা -। ঞ্রর্সঞ্ঞা।
। কাভ — রে। কাঁ দি বে। যারে র্ পা ।

। ধপাঃ পঃ ধা। ঞ্ঞা ধঞ্রর্সা ঞ্ঞা। ধঃ-ঞ্রধঃ পধা পা।
। রে দি বে। ম ক ল। প্রা ণে র।

। মমা -গমপা পা। -। না না । ..... ইত্যাদি॥
। কাম — না। — (এ কি)। শুধু হাসি···ছলনা (আমার)॥

ব্যাখ্যা।

১। "একি" র পরে যেখানে "ইত্যাদি" আছে, তাহার অর্থ, "একি" হইতে আরম্ভ করিয়া "ছলনা" (আমার) পর্য্যন্ত গাহিতে হইবে। তাহার পর গোড়ায় ফিরিয়া "বোলো না" ইত্যাদি।

২। যুগল ভেদ গোড়ায় ফিরিয়া যাইবার চিহ্ন। গোড়ায় যেখানে যুগল

ছেদ আছে সেইখান হইতে আবার পরিতে হইবে, এবং যেখানে ছিন্নবন্ধন ছেদ আছে সেইখানে আসিয়া থামিতে হইবে। খামিয়া পুনঃ অন্তরা ধরিবে।

৬। গুম্ফবন্ধনী পুনরাবৃত্তির চিহ্ন। গানের মধ্যে মধ্যে কতকগুলি গুম্ফ বন্ধনী থাকিলে, অব্যবহিত পূর্ব্বস্থিত প্রমুখী { গুম্ফ বন্ধনীতে ফিরিয়া যাইতে হইবে। বিমুখী } গুম্ফবন্ধনী হইতে ফিরিতে হইবে। পুনরাবৃত্তি করিতে ফিরিতে যখনই বক্র ( ) বন্ধনী দেখিবে, অমনি বক্র বন্ধনীর স্বরগুলি ছাড়িয়া তাহার পরের স্বরগুলি ধরিতে হইবে। পুনরাবৃত্তির সময়েই ছাড়িতে হয়, প্রথমবারে ছাড়িতে হয় না। এইটী যেন মনে থাকে।

৭। হাইফেন্ বিরহিত আকার, একমাত্রা স্থায়ী বিরামের চিহ্ন।

সাময়িক সারসংগ্রহ।

অভ্যাসজনিত পরিবর্ত্তন।

অভ্যাসের দ্বারা আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারে। হলধারী চাষা এবং লেখনীধারী ভদ্রলোকের হাতের অনেক প্রভেদ। কৃত্রিম উপায়ে চীনরমণীর পা কিরূপ ক্ষুদ্র ও বিকৃত হইয়া যায় তাহা সকলেই অবগত আছেন।

কিন্তু এইরূপ অভ্যাস ও কৃত্রিমকারণজনিত পরিবর্ত্তন সকল পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত হয় কি না ইহা লইয়া আজকাল বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে আলোচনা চলিতেছে।

হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সর বলেন হয় যে, এ কথা না মানিলে অভিব্যক্তিবাদ অসম্পূর্ণ থাকে। কিন্তু জর্ম্মান পণ্ডিত বাইস্‌ম্যান্ বহুল যুক্তি, দৃষ্টান্ত ও পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, অভ্যাসজনিত পরিবর্ত্তনসাধিত অঙ্গবৈচিত্র্য সন্ততিপরম্পরায় সঞ্চারিত হয় না।

বিখ্যাত অভিব্যক্তিবাদী ওয়ালেস্ সাহেবও বাইস্‌ম্যানের পক্ষ সমর্থন করেন।

তিনি বলেন, ভাল জাতের যুবক ঘোড়া অথবা কুকুর যদি কোন কারণে পঙ্গু অথবা অঙ্গহীন হইয়া পড়ে, তবে পশুব্যবসায়ীরা তাহাকে সন্তান উৎপাদনের জন্য স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়া দেয়। এবং তাহার সন্ততিবর্গ তাহার পূর্ব্বপুরুষদের অপেক্ষা কোন অংশে হীন হয় না।

সাধারণের মধ্যেও একটা সংস্কার আছে যে, তন্তুবায় প্রভৃতি শিল্পীশ্রেণীদের মধ্যে পূর্ব্বপুরুষদিগের অভ্যাসপ্রসূত বিশেষ কার্য্যনৈপুণ্য উত্তরবংশীয়েরা বিনা শিক্ষাতেও প্রাপ্ত হয়। ওয়ালেস্ বলেন ইহা ভ্রম। কারণ, যদি ইহা সত্য হইত তবে পিতার অধিক বয়সের সন্তান অধিকতর স্বাভাবিক নিপুণতা লাভ করিত। তাহা হইলে কনিষ্ঠ ছেলেরাই শ্রেষ্ঠ হইত। কিন্তু তৎপক্ষে কোন প্রমাণ নাই। প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির সন্তানেরা প্রতিভাসম্পন্ন হয় না, বরং তাহার বিপরীত হয় এরূপ দৃষ্টান্তই অধিক পাওয়া যায়। তাহা যদি না হইত তবে জগতে শিল্পনৈপুণ্য ও প্রতিভা উত্তরোত্তর বংশানুক্রমে অত্যন্ত বিকাশ লাভ করিয়াই চলিত।

কিন্তু কোন কোন লেখক বলেন যে, বিশেষ শ্রেণীর জন্তুদের মধ্যে যে বিশেষ নূতন প্রত্যঙ্গের উদ্ভব দেখা যায় তাহা বহুকালের ক্রমশঃ অভ্যাসলাভ না মনে করিলে অন্য কারণ পাওয়া যায় না। যেমন শূক। যে সমস্ত জন্তু মাথা দিয়া ঢুঁ মারিত তাহাদেরই কপালের চামড়া পুরু হইয়াছিল এবং হাড় ঠেলিয়া উঠিয়াছিল; সেই পরিবর্ত্তন সন্তানদের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া অভ্যাসে বৃদ্ধি পাইয়া বিচিত্রাকার শৃঙ্গে পরিণত হইয়াছে।

ওয়ালেস্ বলেন একথার কোন প্রমাণ নাই। ডারুয়িনের গ্রন্থে

দেখা যায় কোন কোন দেশে ঘোড়ার কপালে ক্ষুদ্র শৃঙ্গের মত উচ্চতা দেখা গিয়াছে। কিন্তু ঘোড়ার প্রাচীন বংশের মধ্যে কোন জাতেরই শিং দেখা যায় নাই। যদি শিং থাকিত তবে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের নিয়মানুসারে এমন একটা আত্মরক্ষার অস্ত্র বিলুপ্ত না হইবারই সম্ভাবনা ছিল। অতএব এই ঘোড়ার ছোট শিং নূতন উদ্ভব।

শজারুর কাঁটা, পাখীর পালক এসমস্ত যে, বিশেষ অভ্যাসের দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে এমন বলা যায় না।

পরীক্ষার দ্বারা জানা গিয়াছে আমাদের শরীরের সর্ব্বাংশে স্পর্শশক্তি সমান নহে। আমাদের পিঠের মাঝখানে যে জিনিষ অনুভব করিতে পারি না, আমাদের আঙুলের ডগায় তাহা অনায়াসে অনুভূত হয়। হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সর বলেন ইহার কারণ, প্রধানতঃ অঙ্গুলি দ্বারা আমরা সকল দ্রব্য স্পর্শ করিয়া দেখি বলিয়া অভ্যাসে তাহার স্পর্শশক্তি বাড়িয়া উঠিয়াছে এবং সেই শক্তি বংশানুক্রমে চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু পৃষ্ঠে তাহার বিপরীত।

ওয়ালেস্ বলেন প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ইহার কারণ। স্পর্শশক্তির উপরে আমাদের জীবনরক্ষা অনেকটা নির্ভর করিতেছে। শরীরের যে যে স্থানে আঘাত লাগিলে জীবনের অধিক ক্ষতি করে সেই সেই স্থানে স্পর্শশক্তি সেই পরিমাণে অধিক। চক্ষুর স্পর্শশক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, অথচ এ কথা কেহ বলিতে পারে না যে, চক্ষু দ্বারা দ্রব্যাদি স্পর্শ করা আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা অভ্যস্থ। কিন্তু চক্ষু গেলে জীবনধারণ করা দুরূহ; অতএব যে সকল প্রাণীর চক্ষু অত্যন্ত স্পর্শক্ষম, চক্ষে ভিসমাত্র আঘাত লাগিলে জানিতে পারে ও চক্ষুরক্ষার জন্য তৎক্ষণাৎ সচেষ্ট হইতে

ে তাহারাই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে টিকিয়া যায়। এরূপ আরো নেক দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে।

অতএব ওয়ালেনের মতে অভিব্যক্তির মধ্যে অভ্যাসের কোন র্য্যকারিতা নাই। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনই তাহার প্রধান অঙ্গ। র্থাৎ, যে সন্তানগণ কোন কারণে অন্যদের অপেক্ষা একটা অতি- ক্ত সুবিধা লইয়া জন্মগ্রহণ করে তাহারাই জীবনযুদ্ধে জয়ী য়া টিকিয়া যায়, অন্যেরা তাহাদের সহিত পারিয়া উঠে না, তরাং মারা পড়ে। এইরূপে এই নূতন সুবিধা ও তৎসম্পন্ন ব স্থায়ী হয়। শৃঙ্গহীন হরিণদের মধ্যে যদি নিগূঢ় কারণে কটা শৃঙ্গী হরিণ জন্মগ্রহণ করে তবে তাহার সিংহের জোরে ই বেশি আহার এবং মনোমত হরিণী সংগ্রহ করিতে সক্ষম বে। এবং তাহার বংশে যতই শৃঙ্গী হরিণের জন্ম হইবে ই শৃঙ্গহীন হরিণের ধ্বংশ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িবে।

অতএব বর্ত্তমান অনেক অভিব্যক্তিবাদীদের মতে সহজাত বিধাগুলি জীবরাজ্যে স্থায়ী হয়, অভ্যাসজাত সুবিধাগুলি নহে।

বিক্রমাদিত্য।

বিক্রমাদিত্যের কালনিরূপণ লইয়া য়ুরোপীয় গবেষণা কিছু- ন হইতে প্রাণপণ যত্নে লাগিয়াছে। বিক্রমাদিত্য নিরাপদে খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে রাজত্ব করিতেছিলেন, মধ্য হইতে পাশ্চাত্য অধ্যা- গণ—ফার্গুসন, ম্যাক্সমূলর, বেবর প্রভৃতি মিলিয়া তাঁহাকে ায় ষষ্ঠশতাব্দীতে কালান্তরিত করিয়া দিলেন।

বিক্রমাদিত্যের অপরাধ—কালিদাসকে তিনি সভায় স্থান াছিলেন। এখন সেই কালিদাসের প্রেতাত্মাই তাঁহার ৫৭ খৃঃ-

পূর্ব্বাব্দে অস্তিত্বের বিরুদ্ধে প্রধান সাক্ষী। কালিদাসের সময়ে সংস্কৃতভাষায় অনেক কৃত্রিমতা প্রবেশ লাভ করিয়াছে দেখা যায়—সুতরাং কালিদাস বহুকালের প্রাচীন কবি নহেন। কালও খৃষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দী খৃষ্টপূর্ব্ব শতাব্দীর তুলনায় অনেক আধুনিক। অতএব কালিদাস খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক। এবং বিক্রমাদিত্য কালিদাসের প্রভু হইয়া ৫৭ খৃঃপূর্ব্বাব্দে থাকিতে পারেন না। অতএব সমবেত অধ্যাপকমণ্ডলীর বিচারানুসারে তাঁহাকে খৃষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দীতে বাবজ্জগৎ নির্ব্বাসন দণ্ড দেওয়া গেল।

কিন্তু অধিক দিন না যাইতে যাইতে বিক্রমাদিত্যের পক্ষে দুইজন বড় কৌঁসুলি খাড়া হইয়াছেন। তাঁহারা দেখাইতেছেন যে, সংস্কৃতরচনায় কৃত্রিমতা খৃষ্টজন্মের বহুপূর্ব্ব হইতেই ঢুকিয়াছে। এবং সর্ব্বত্র য়ুরোপীয় অধ্যাপকগণের বিচারের উপর নির্ভর করা সঙ্গত নহে। বিক্রমাদিত্য সম্ভবতঃ ৫৭ খৃঃপূর্ব্বাব্দেই ছিলেন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দীতে নির্ব্বাসন তাঁহার প্রতি নিতান্তই অবিচার। কৌঁসুলি দুইজনেরই পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি আছে—নাম, ডাক্তার বুলার ও ডাক্তার পিটার্সন। অধ্যাপক কিয়েলহর্ণও ডাক্তার বুলারের অনুকূলে সাক্ষ্য দিয়াছেন।

লুধিয়ানার পণ্ডিত জোয়ালা সহায় এই কৌঁসুলিদিগের যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করিয়া সম্প্রতি "এসিয়াটিক কোয়ার্টার্লি রিবিয়ু" পত্রে আরও গুটিকতক দলিল দাখিল করিয়াছেন। সাধনার পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমরা নিম্নে সংক্ষেপে তাহার মর্ম্ম প্রকাশ করিতেছি।

প্রথম দলিল "জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" গ্রন্থ। ইহার রচয়িতা কালিদাস। এবং উক্ত কালিদাস যে রঘুবংশপ্রণেতা কালিদাস হইতে ভিন্ন নহেন পণ্ডিত জোয়ালা সহায় কতকগুলি সংস্কৃত

শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই জ্যোতির্ব্বিদাভরণের একটি শ্লোকেগ্রন্থরচনার কাল লেখা আছে—৩০৬৮ কলিগতাব্দ। বর্ত্তমান সাল কলিগতাব্দ ৪৯৯৩। সুতরাং এই গ্রন্থ ১৯২৫ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হয়। সংস্কৃত অন্যান্য অনেক জ্যোতিষগ্রন্থে বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকাল ৩০৪৫ কলিগতাব্দ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং বিক্রমাদিত্যের রাজত্বের চতুর্ব্বিংশতি বর্ষে জ্যোতির্ব্বিদাভরণ রচিত হইয়াছে। তাহা হইলে বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনারিরোহণ হইতে সম্বৎ গণনা প্রচলন হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। সুতরাং খৃষ্টের পূর্ব্বেই তাঁহার কাল নির্দ্দেশ করিতে হয়।

জৈন সাহিত্য হইতেও পণ্ডিত জোয়ালা সহায় গুটিকতক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। "গুর্জ্জরদেশভূপাবলী" দৃষ্টে উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্যই যে সম্বৎ প্রচলন করেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই বিক্রমাদিত্য শকদিগের বিশেষ শত্রু ছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। এবং ইহাঁর ১৩৫ বৎসর পরবর্ত্তী প্রবলপ্রতাপ শালিবাহনও শকদমন ছিলেন। পণ্ডিত জোয়ালা সহায় দেখাইয়াছেন যে, সম্বৎ এবং শকাব্দ দুইটিই শকদিগের পরাজয় বৃত্তান্তের স্মরণার্থে প্রবর্ত্তিত হয়। এবং জৈন ইতিহাসে সম্বৎ প্রচলনকর্ত্তা শকারি বিক্রমাদিত্য ভিন্ন দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের উল্লেখও নাই।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দীর প্রারম্ভে এদেশে একজন বিখ্যাত নরপতি ছিলেন বটে, তাঁহার নাম ভোজ রাজা। ইংরাজ লেখকেরা ইহাঁরই স্কন্ধে হয় ত বিক্রমাদিত্যকে চাপাইয়াছেন। এরূপ ভ্রম হওয়া বিশেষ আশ্চর্য্য নহে।

টেনিসনের ধর্ম্মবিষয়ক মত।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে অ্যাডিংটন সাইমণ্ড্‌সের সহিত টেনিসনের নানা-বিষয়ে কথাবার্ত্তা হয়। এই কথাবার্ত্তাগুলি বিলাতের "সেঞ্চুরি" পত্রে সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি যে কতকটা অদ্বৈত-বাদী ছিলেন তাহা তাঁহার কথাবার্ত্তায় প্রকাশ পায়। তিনি সাইমণ্ড্‌সের নিকট এই মর্ম্মে বলিয়াছিলেন, "আমি জানিনা, জগৎকে বৃহৎ বলিয়া ভাবিব, কি ক্ষুদ্র বলিয়া ভাবিব। কখনও ইহাকে ক্ষুদ্র, কখনও বা ইহাকে বৃহৎ বলিয়া আমার মনে হয়। জগতের বৃহত্ত্ব কিসে? একটি সূর্য্য বা কতকগুলি সূর্য্য থাকায়, না সমস্ত মিলিয়া?" জগৎ কত প্রকাণ্ড তাহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া জান পাউল রিখ্‌টরের ন্যায় যেন তিনি আকাশ ভেদ করিয়া ক্রমাগত ঊর্দ্ধে যাত্রা করিতেছেন এইরূপ কল্পনা করিলেন; একটা ছায়াপথ ছাড়াইয়া আর একটা ছায়াপথ, এইরূপ অনন্ত আকাশে অনন্ত নক্ষত্রপুঞ্জ প্রসারিত। তাহার পর জড়ের কথা। জড়ের অজ্ঞেয়তা বিষয়ে তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল। "একটা ইঁট যে কি বস্তু তাহার কোনও ধারণা আমার মাথায় আসে না। আমি জানি না, সে জিনিস্‌টা কি। পরমাণু, বিস্তৃতি, বর্ণ, ভার এসব কথা বলায় কোন ফল নাই। ইঁটের মধ্যে আমার বুদ্ধি কিছুতেই প্রবিষ্ট হয় না। কিন্তু তাহা অপেক্ষা ঈশ্বর সম্বন্ধে, প্রেম সম্বন্ধে এবং এইপ্রকার অন্যান্য হৃদয়ের ভাব সম্বন্ধে আমার স্পষ্টতর ধারণা আছে। আমার ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে আমি ঈশ্বরের সহিত হৃদয়ের যোগ স্থাপন করিতে পারি। আমার মনে হয়, কোন না কোন প্রকারে—কি করিয়া তাহা জানি না—আত্মা ও পরমাত্মা সমান—একই। তাহাতেই প্রাণ-

নার এত মূল্যবান প্রার্থনা কি? না, বৃহৎ সমুদ্র ও আমাদের ছোট ছোট খালের মধ্যে যে কল-কব্জা আছে তাহা খুলিয়া দেওয়া।" তাহার পর অনন্তকাল ও সৃষ্টির কথা। "হক্‌স্লি বলেন, আমরা সম্ভবতঃ বানর হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। তাহাতে আমার কিছু আইসে যায় না। যদি ইহাই ঈশ্বরের সৃষ্টিপ্রণালী হয়ত হউক, কিন্তু তিনি সমস্ত অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এক করিয়া দেখিতেছেন।" তাহার পর ধর্ম্মনীতির কথা। "ইহা আমি না ভাবিয়া থাকিতে পারি না, নৈতিক উৎকর্ষই মানবের মাথার মুকুট। কিন্তু অমরত্ব না থাকিলে উহাতে কি ফল? কাল মরিতে হইবে, আজ খাইয়া-দাইয়া লই। যদি জানি, ছয় ঘণ্টার মধ্যে জগৎ বিনাশ পাইবে; তাহা হইলে কি আমি একজন অনাহারী ভিক্ষুককে অর্থদান করি? না; আমি অমর এই বিশ্বাস না থাকিলে আমি করি না। কখনও কখনও আমি ভাবিয়াছি, পাপীরা আপনার অমরত্বকে বিনষ্ট করে। অনন্ত শাস্তির কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। খৃষ্ট যে যুগে জন্মিয়াছিলেন সেই যুগের ভাবের উপযোগী করিয়া এই সকল কথা বলিয়াছিলেন।" ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে আরও এই কথা বলিলেন; "কতকগুলি যুবক আছেন, তাঁহারা ধর্ম্মনীতিকে একেবারে ছাঁটিয়া দিতে চাহেন। তাঁহারা বলেন, আমরা নীতিপরায়ণ হইব না। আমার বোধ হয় কঁৎ ও গ্রোট্-এর মত এই যে, অমরত্বের সহিত ধর্ম্মনীতির কোনও যোগ নাই।" তাহার পর, জড়ের বাধাবিঘ্ন হইতে নৈতিক বাধাবিঘ্নের কথা আসিল। "পৃথিবীতে মশার সৃষ্টি কেন? আমার বোধ হয় ঈশ্বরের সৃষ্টি হইয়া গেলে শয়তানের কাজ আরম্ভ হইল, তিনি আরও কিছু যোগ করিয়া দিলেন।"

ইংরাজের উপর সূর্য্যতাপের প্রভাব।

সম্প্রতি "নাইণ্টীন্থ্ সেঞ্চুরি" নামক বিলাতী পত্রে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সার মর্ম্ম এই যে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ইংরাজবংশধরদিগের ইংরাজচরিত্রের বিশেষ লক্ষণসকল লোপ পাইবে। ইংরাজ, ইংলণ্ডের কুজ্ঝটিকার ফল; তাহাকে নীল আকাশের নীচে রাখিয়া দাও, দেখিবে, রৌদ্রের তাপে তাহার সমস্ত ইংরাজিত্ব ঘুচিয়া যাইবে। এই কথা প্রমাণ করিবার জন্য লেখক কতকগুলি তথ্য আমাদের সম্মুখে আনিয়াছেন। তিনি বলেন, যদিও নব-জীলণ্ডের বৃত্তরেখা ইংলণ্ড অপেক্ষা ইটালিদেশের সমতুল্য, তথাপি ইংলণ্ডের অধিকৃত যত দেশ আছে তন্মধ্যে নব-জীলণ্ড অনেকটা ইংলণ্ডের সদৃশ। যদিও খুব সম্প্রতি এই দেশে ইংরাজের বসতি হইয়াছে এবং পুরাতন দেশ হইতে ক্রমাগত নূতন নূতন ঔপনিবেশিক আসিয়া ইহার লোকসংখ্যা পোষণ করিতেছে, তথাপি ইহারই মধ্যে ইংরাজ অধিবাসীদিগের পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে, ইংরাজচরিত্রের বিশেষ লক্ষণসকল লোপ পাইতেছে। নবজীলণ্ডবাসী ইংরাজ যুবকেরা আকারে দীর্ঘ ও পাংলা, তাহাদিগের ইংরাজি উচ্চারণ অত্যন্ত জড়ত্ব। নবজীলণ্ডের সূর্য্য নবজীলণ্ডবাসীর চরিত্রে ঈষৎ পরিবর্ত্তন আনিয়াছে। সেখানকার অধিবাসীরা বাঁচিবার সুখ অনুভব করে ও সম্পূর্ণরূপে সম্ভোগ করে—তাহারা জীবনের সুখে সুখী। নীল আকাশতলে "তাহাদের জীবন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সমুজ্জ্বল ও সুখময়। এখন আর তাহারা ছট্‌ফটে, অন্ধকার-মুখ, উদ্বিগ্নচিত্ত নহে, পরন্তু দক্ষিণ-য়ুরোপের লোকদিগের ন্যায় প্রফুল্ল ও লঘুহৃদয়।" তা'ছাড়া ইংলণ্ডের ন্যায় সেখানে তত্টা উৎকট্ শীত নাই বলিয়া তাহারা

সহিষ্ণুতা, দূরদর্শিতা, শ্রমশীলতা এবং একপ্রকার রূঢ় অথচ কেজো পাশ্চবতা শিক্ষার অবসর পায় না। সুতরাং "ইহারই মধ্যে নবজীলণ্ডবাসীর প্রবল লক্ষণ এই দেখা যায় যে, উহারা আমোদপ্রিয় ও লঘু-হৃদয়; উহারা চিরপ্রফুল্লভরে এই বিশ্বাস করে যে, একদিন-না-একদিন শীঘ্রই উহাদের গোলযোগ আপনা-আপনি ঠিকঠাক্ হইয়া যাইবে—আপাততঃ কিছুই বিশেষ ভাবিবার নাই। ইংলণ্ডের উৎকট শীতে অমিতব্যয়িতা, হঠকারিতা ও কাজকর্ম্মে উপেক্ষার কি অবশ্যম্ভাবী ফল তাহা ইংলণ্ডের লোকেরা বিলক্ষণ বুঝে, কিন্তু নবজীলণ্ডবাসীদিগের তাহা কিছুই মনে হয় না। সেইজন্য, উহার দরুণ তাহাদের যে শাস্তিভোগ হয় তাহা অপেক্ষাকৃত লঘু। তাহারা সকল অবস্থাতেই প্রফুল্লচিত্ত, উচ্ছ্বসিত-হৃদয়, সুখানুরাগী ও সুখজীবনবাদী।" নবজীলণ্ড ছাড়িয়া লেখক আবার অষ্ট্রেলিয়ার দৃষ্টান্ত আনিয়াছেন। দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ায় শিশুর মৃত্যুসংখ্যা অত্যন্ত অধিক; প্রজাবৃদ্ধির পক্ষেও বাধাবিঘ্ন দেখা যায়। ভিক্টোরিয়াতে বিবাহিতা স্ত্রীলোকেরা মাতৃত্ব-দায় ঘাড়ে লইতে সহসা চাহে না। সেখানে উত্তাপ এত বেশি যে, কাজকর্ম্ম অধিক করা যায় না, এবং সিড্‌নির লোকদিগের আকৃতি অতি শিথিল, অনেকটা বর্ণাডোজের অবনতিগ্রস্ত গৌরাঙ্গদিগের মত দেখিতে। লেখক ফর্টেস্‌কিউ সাহেব মনে করেন, সেখানকার গৌরাঙ্গেরা, বর্ণেতর জাতীয়দিগের সাহায্য ব্যতীত আপনারা স্বয়ং অষ্ট্রেলিয়ার ভূমিকর্ষণে আর নিযুক্ত হইবে না। তাহারা অন্যত্র হইতে কুলির আমদানি করিয়া, বর্ণেতরজাতীয়দিগকে খাটাইয়া, আপনারা বেশ আরাম সুখ উপভোগ করিবে। "এই প্রকারে গৌরাঙ্গজাতি অতি-লালিত ও কোমলপ্রকৃতি হইয়া গিয়া শারীরিক অবনতি প্রাপ্ত

হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। কেন না, ক্রমশই তাহারা অলস হইয়া পড়িবে এবং শারীরিক শ্রমে অনিচ্ছা নিবন্ধন তাহাদের শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে।"

সাংখ্যদর্শন।

ষড়্দর্শনের মধ্যে সাংখ্যের ন্যায় গভীর যুক্তিপূর্ণ মূলতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিচার অন্য কোন দর্শনশাস্ত্রে নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় সাংখ্যের প্রকৃত মত বুঝেন বা বুঝাইতে পারেন এরূপ পণ্ডিত বিরল। বেদান্তের সহিত সাংখ্যের যে বিরোধ তাহা সামঞ্জস্যের অতীত; যিনি বেদান্তের মতে মত দিবেন তিনি সাংখ্যের মতে মত দিতে পারেন না; এবং যিনি সাংখ্যের মতে মত দিবেন তিনি বেদান্তের মতে মত দিতে পারেন না। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়—উভয় মতের বিরোধ না বুঝিয়া অনেকে তাহার সামঞ্জস্য করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন; অনেকে যুগপৎ সাংখ্য ও বৈদান্তিক হইয়া পড়েন। অনেক বড় বড় পণ্ডিতকে বলিতে শুনা যায় সাংখ্যও ঠিক বেদান্তও ঠিক; তাহা যে অসম্ভব তাহা তাঁহারা পরিগ্রহ করিতে পারেন না। ভগবদ্গীতা ও বিষ্ণুপুরাণের ন্যায় গ্রন্থ সাংখ্যের মত অনুসরণ করে কি বেদান্তের মত অনুসরণ করে, অনেক সময়ে নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য। কিন্তু দেখা যায় যাঁহারা বেদান্তের বিশেষ পক্ষপাতী তাঁহারাও সাংখ্যের পরিভাষা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে সাংখ্য-পরিভাষার উৎকর্ষের প্রমাণ পাওয়া যায়। সাংখ্যের মর্য্যাদার

বিস্তারিক আর কি বলিব, ইহাই বলিলে পর্য্যাপ্ত হইবে যে, বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে যে, সপ্তর্ষি কর্ত্তৃক ভূমণ্ডলে বেদ প্রচারের পূর্ব্বে অগ্রে সাংখ্যদর্শন প্রকাশিত হইয়াছিল। পুরাণকর্ত্তার চক্ষে সাংখ্যদর্শন বেদের অপেক্ষা অধিক না হউক বেদের তুল্য সম্মানের সামগ্রী। এক্ষণে আমরা এই সাংখ্যদর্শনের মূলতত্ত্বগুলির সমালোচনায় ব্যাপৃত হইব।

১। বেদ ও দর্শন।

"ধর্ম্ম" ও "ব্রহ্ম" বেদের বিষয়। "ধর্ম্মেন গমনমূর্দ্ধং গমনমধস্তাদধর্ম্মেন"—অর্থাৎ ইহলোকে ধর্ম্ম আচরণ করিলে পরলোকে সদ্গতি, এবং অধর্ম্ম আচরণ করিলে পরলোকে অধোগতি হইবে, এই তত্ত্ব বেদের বিষয়। এই বিশ্বসংসার একজন সচ্চিদানন্দময় বিধাতাপুরুষ কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে এবং পরিরক্ষিত হইতেছে এই তত্ত্বও বেদের বিষয়। কিন্তু এইসকল তত্ত্ব "দর্শন" শাস্ত্রসম্মত প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত হয় না; তজ্জন্যই উক্ত হইয়াছে—"ধর্ম্ম ব্রহ্মণী বেদৈক বেদ্যে ইতি"। দর্শনশাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে "দর্শন" এবং দর্শনমূলক অনুমানের উপরে সংগঠিত; আর বেদের তত্ত্ব ও বিষয় "অদৃষ্ট", অর্থাৎ দর্শনশাস্ত্রের অতীত। যাঁহারা অস্মদ্দেশে বিজ্ঞানশাস্ত্রের মূলপত্তন করিয়াছেন তাঁহারা মানববুদ্ধিগম্য সত্যসকলকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন—একশ্রেণী "দৃষ্ট"—আর এক শ্রেণী "অদৃষ্ট"। যে সকল সত্য "অদৃষ্ট" তাহা বেদের দ্বারা অবগত হওয়া যায়; দর্শনশাস্ত্র কেবল "দৃষ্ট" সত্য লইয়াই ব্যাপৃত।

অতএব দর্শন ও বেদশাস্ত্রের বিষয় একটি পরিষ্কার সীমাচিহ্নে চিহ্নিত। আমরা অনেক সময়ে এই সীমাচিহ্ন ভুলিয়া যাই। অনেক সময়ে ব্রহ্ম ও ধর্ম্মের অলৌকিক অদৃষ্টতত্ত্ব যাহা দর্শন

শাস্ত্রের সীমার সম্পূর্ণ বহির্ভূত তাহাকে দর্শনশাস্ত্রের অন্তর্ভূত করিতে চেষ্টা করি; তাহাতে সত্যের আবিষ্কার না হইয়া আত্মা সংশয়ের কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন হয় মাত্র।

সাংখ্যেরা ত্রিবিধ প্রমাণ অঙ্গীকার করেন, যথা;—প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আপ্তবচন। আপ্তবচন অর্থাৎ বেদ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তৃতীয়বিধ প্রমাণ (আপ্তবচন) দর্শনশাস্ত্রীয় প্রমাণ নহে। যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী সাংখ্য তাঁহারা বলেন বেদের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই; বেদ অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের শিক্ষা দেয়, আমরা কেবল ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়েরই আলোচনা করি। কিন্তু কোনও কোনও সাংখ্য পণ্ডিত আপনাদের মতকে বেদ-সম্মত ও বেদাবিরুদ্ধ বলিয়া প্রমাণ করিতে যত্ন করিয়াছেন। তাহা ভিন্ন কথা। আমরা বিবেচনা করি এরূপ যত্ন ভ্রমাত্মক। বেদের সহিত দর্শনের বিরোধ সম্ভবে না। বেদ যদি দর্শনের সীমায় পদার্পণ করেন সে অনধিকার চর্চ্চা। দর্শনও যদি বেদের সীমায় যাইতে চাহেন তাহাও অনধিকার চর্চ্চা। বেদ ও দর্শনের আলোচনায় ব্যাপৃত হইলে এই কথাটি সম্পূর্ণরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে। দর্শন এবং দর্শনমূলক অনুমানই দর্শনশাস্ত্রের ভিত্তি। বেদান্তদর্শনের মত বেদসম্মত, আর সাংখ্যদর্শনের মত বেদসম্মত নহে, এই কথাটি প্রমাণ করার জন্য শঙ্করাচার্য্য অশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন; সে সমুদায় যত্ন এবং পরিশ্রমই ভস্মাহুতি হইয়াছে। দর্শন ও দর্শনমূলক অনুমান কোন্ মতের পোষকতা করে ইহাই সম্পূর্ণ বিবেচ্য বিষয়।

২॥ নিত্য বস্তু॥

আমরা ইতস্ততঃ যে সকল পদার্থ দর্শন শ্রবণ ইত্যাদি দ্বারা প্রত্যক্ষ করি, দেখিতে পাই তাহারা ঘোরতর পরিবর্ত্তনের

অধীন। শুদ্ধ পরিবর্ত্তন কেন, আপাততঃ অনেক নূতন পদার্থের উৎপত্তি, অনেক বর্ত্তমান পদার্থের ধ্বংসও লক্ষিত হয়। আমরা নিজে জন্মমৃত্যুর অধীন। যতদূর দেখা যায় তাহাতে জন্মের পূর্ব্বে কোন অস্তিত্বই ছিল না—মৃত্যুর পরও কোন অস্তিত্ব থাকে না। তাহাতে কোন কোন দার্শনিক স্থির করিলেন আমরা "অনিত্য" পদার্থ। অন্ততঃ আমাদের দেহ "অনিত্য" পদার্থ। ইহা আজ আছে কাল নাই।

তাহার উত্তরে অপর দার্শনিক বলিলেন, দেখ তোমার দেহ অনিত্য কিরূপে? তোমার দেহ ক্ষিতি অপ্ প্রভৃতি যে উপাদানে গঠিত তাহার ত ধ্বংস দেখি না। তোমার দেহ ধ্বংস না হইয়া কেবল রূপান্তর হয় মাত্র। পঞ্চভূতকে তুমি অনিত্য বলিতে পার না।

প্রত্যুত্তরে অনিত্যবাদী বলিলেন পঞ্চভূতই বা নিত্য কি প্রকারে? ইহাকে আমি রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের বিকারমাত্র বলি। পঞ্চভূতে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ ভিন্ন আর কি আছে? কিছুই নাই। আর রূপরসাদি আমাদের মনের জ্ঞানমাত্র। দেখ দর্পণে তুমি আপন প্রতিবিম্ব দেখিবে, তাহাতে রূপ আছে—তাহা কি অলীক নয়? তাহা কি তোমার জ্ঞানমাত্র নয়? দেখ স্বপ্নে তুমি কতপ্রকার রূপরসাদির সংযমরূপ পদার্থের উপলব্ধি কর তাহারাও কি অলীক নয়? তাহারাও কি তোমার জ্ঞানমাত্র নয়? আরও দেখ জাগ্রৎ অবস্থায় তুমি কিরূপ প্রত্যক্ষ কর। তুমি সূর্য্য দেখিতেছ; যেন একটি থালার মত। প্রাতঃকালে লোহিতবর্ণ আবার মধ্যাহ্নে পীতবর্ণ। উপরিভাগ যেন সমতল। কিন্তু তুমি জ্যোতিষের অনুমানে জানিতে পার সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা অনেক বড়—ইহা বর্ত্তুলাকার। যে পদার্থ

একবার লাল একবার হল্‌দে দেখায় অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে তাহা লালও নয় হল্‌দেও নয়। লোহিতাদি বর্ণজ্ঞান তোমার জ্ঞান বই আর কিছুই নয়। অতএব যে সংসারে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ ভিন্ন আর কিছুই দেখি না, তাহা কেবল আমাদের জ্ঞানের খেলা। আমরা জাগিয়া জাগিয়া একপ্রকার স্বপ্ন দেখিতেছি মাত্র। সংসারে জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নাই। আর জ্ঞান ক্ষণিক। চক্ষু চাহিলাম ত নানাবিধ বর্ণ দেখিলাম, চক্ষু মুদিলায় ত সব অন্তর্ধান। এই হইতেছে এই গেল, ইহাই জ্ঞানের আকার ও প্রকৃতি। অতএব সমগ্র সংসার অলীক ও ক্ষণিক। সংক্ষেপে এই তত্ত্ব এইরূপে প্রকাশিত "যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং।" তুমি যে কিছু পদার্থ আছে বলিয়া বল তাহা কেবল জ্ঞানের বিকার ও ক্ষণিক।

ইহার প্রত্যুত্তরে নিত্যপদার্থবাদী বলেন বেশ, সমুদায় বাহ্য বস্তু তর্কানুরোধে জ্ঞানের বিকার বলিয়া স্বীকার করিলাম, কিন্তু জ্ঞানের আধারস্বরূপ অহংপ্রত্যয়মূলক আত্মার কথা কি? ইহা ত নিত্য বটে? তুমি আত্মাকে ক্ষণিক বলিতে পার না। যে আমি কল্য ছিলাম সে আমি অদ্য রহিয়াছি বলিয়া স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে।

তাহাতে অনিত্যবাদী বলেন অহংপ্রত্যয়ও একপ্রকার জ্ঞান-মাত্র এবং অন্যান্য জ্ঞানের ন্যায় অলীক; তবে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের স্মৃতি আছে অবশ্য স্বীকার করি। কিন্তু ইহাকে আমরা জ্ঞানের ধারাবাহিকতা বলি। জ্ঞান প্রকৃত পক্ষে ক্ষণিক, কিন্তু ইহা স্রোতের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন। একটি অনিত্য জ্ঞান উদয় হইয়া অস্তমিত না হইতে হইতে অপর একটি উদয় হয়। আর ভূরি ভূরি ক্ষণিক জ্ঞান যুগপৎ উদয় হয়। অবিচ্ছেদে এইরূপ

জ্ঞানরাশি জন্মিয়া একটি জ্ঞান অপর জ্ঞানকে এইরূপে অভিভূত করে যে, তাহাতে "অহং" এইরূপ আর একটি মিশ্র ক্ষণিক জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। বস্তুগত্যা আত্মা নামে কোন নিত্য পদার্থের সত্তার কোন প্রমাণ দেখি না।

ইহার নাম বিশুদ্ধ নাস্তিবাদ। ইহা বৈদিক নাস্তিকতা নহে, দার্শনিক নাস্তিকতা। যোগাচার সম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরা এই মতের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন।

নিত্যপদার্থ এই পৃথিবীতে দর্শনশাস্ত্রের প্রমাণ অনুসারে আছে কি নাই—এইটি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের দার্শনিকদের মধ্যে একটি ঘোরতর বিবাদের স্থান। কেহ বলেন আছে—কেহ বলেন নাই। ইহাঁদের মধ্যে বিবাদের সামঞ্জস্য অসম্ভব—"আছে" ও "নাই" ইহার মধ্যে অপর কোন কোটি নাই। হয় আছে, না হয় নাই। এতদ্দ্বারা দার্শনিক সম্প্রদায়কে এইরূপে বিভক্ত করা যায়, যথা—

দর্শনশাস্ত্র

আস্তিক	নাস্তিক
= নিত্য পদার্থ আছে	= নিত্য পদার্থ নাই। (বৌদ্ধ যোগাচার সম্প্রদায়)

প্রথমতঃ বিবেচ্য সাংখ্যদর্শন এই দুইয়ের কোন্ শাখার অন্তর্গত। সাংখ্যেরা নিত্যপদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। অতএব তাঁহারা আস্তিক শাখার অন্তর্গত।

বেদান্তদর্শনেও নিত্যপদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করে। ইহাও আস্তিক শাখার অন্তর্গত। নাস্তিকের সহিত বিবাদে সাংখ্য ও

বেদান্ত উভয়েই একদিকে তখন তাহারা মিত্র। কিন্তু এই উভয় মিত্রের মধ্যে আর একটি নূতন বিবাদ।

স্বীকার করিলাম নিত্য পদার্থ আছে—কিন্তু জ্ঞানের আধার-স্বরূপ যে আত্মা তদ্ভিন্ন আর কিছু নিত্যপদার্থ আছে কি না? বেদান্তদার্শনিক নাস্তিকদের সঙ্গে বলেন যে, জড়জগতে রূপ-রসাদি জ্ঞানের বিকার ভিন্ন আর কিছুই নাই—জড়জগতে সকলই অনিত্য। তবে অধ্যাত্মজগতে জ্ঞান ও জ্ঞানের ধারাবাহিকতা ভিন্ন যে আর কিছুই নাই একথা স্বীকার করি না। "আত্মা" নামক কূটস্থ নিত্যপদার্থকে আমরা সর্ব্বদাই উপলব্ধি দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতেছি—এই আত্মাকে কেবল জ্ঞান নহে সুখদুঃখ ও নানাবিধ প্রবৃত্তির আধারস্বরূপ দেখিতেছি। অতএব অধ্যাত্মজগতে নিত্যপদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করি। নিশ্চয়ই যে আমি কল্য ছিলাম সেই আমি "সোঽহং" অদ্য রহিয়াছি—ইহাতে সন্দেহ নাই। অতএব আমি নিত্য। কেবল আমিই নিত্য—আর সব অনিত্য।

বেদান্তদর্শনের "সোঽহং" এই সূত্রে পরে ভিন্নার্থের যোজনা করা হইয়াছে, কিন্তু মূলে "সোঽহং" এই সূত্র আত্মার নিত্যত্ব প্রতিপাদক। সাংখ্যেরাও বেদান্তবাদীদের ন্যায় আত্মার নিত্যত্ব অঙ্গীকার করেন—কিন্তু তাঁহারা আত্মা ভিন্ন আর যে নিত্যপদার্থ নাই এ কথা স্বীকার করেন না। পক্ষান্তরে বেদান্তে আত্মাকে একজাতীয় পদার্থ না বলিয়া একমাত্র (একমেবাদ্বিতীয়ং) পদার্থ বলা হয়। এটি যুক্তি দ্বারা ঈশ্বর প্রতিপাদনের ফন্দী। যখন নাস্তিকেরা নিত্যপদার্থ নাই, অতএব ঈশ্বর নাই—এইরূপ ঘোষণা করিলেন, তখন বৈদান্তিকেরা আত্মা নামক নিত্যপদার্থ আছে এবং আত্মাই ঈশ্বর এইরূপ প্রতিঘোষণা

উত্থাপন করিলেন।
সৃষ্টি, বৈদান্তিকেরা ব
ক্রিয়া দ্বারা জগতের
তাহা আমারই আত্মা
জগৎ বল তোমার আ
এবং আমার জগতে
তোমার আত্মা ও অ
নায়ক একমাত্র নিত
এই জগৎসংসার স্থ
আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চন
বেদান্তমত।
সাংখ্য বলেন ে
সিদ্ধ, সে যেমন
বলিয়া প্রতিপাদন
প্রত্যক্ষসিদ্ধ কর তাহ
রজ্জুতে সর্প-জ্ঞানের
দর্শন ঠিক তাহা নহে
বিসম্বাদী হইলেও গ্রা
তোমার জগৎ ও আ
ইহাতে তোমার ও
এই তর্কে নিত্যবস্ত
সাংখ্য ও বেদান্তে
"একমেবাদ্বিতীয়ং"
বলিলেই কি কি ও ব
সাংখ্যেরা নিত্যবস্তু

করেন। নিত্যবস্তুর "সংখ্যা" করেন বলিয়া ইহাঁদের নাম "সাংখ্য"।

এক্ষণে দর্শনশাস্ত্রকে এইরূপে বিভাগ করা যাইতে পারে, যথা—

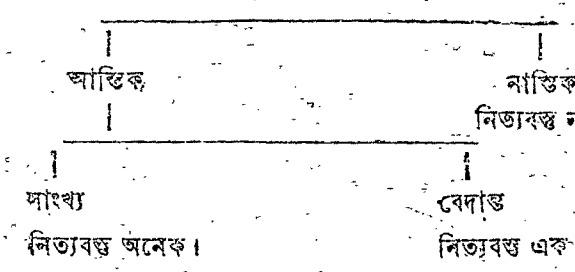

৩। পদার্থের ত্রৈবিধ্য।

বাল্যকালে বোধোদয়ের সময় পূজ্যপাদ ৺বিদ্যাসাগর মহাশয় শিখাইয়াছিলেন "পদার্থ" তিন প্রকার—চেতন, অচেতন উদ্ভিদ্। পাঠকবৃন্দ এই সংস্কার ত্যাগ করিবেন। দর্শনশাস্ত্রের পদার্থ ভিন্ন সামগ্রী। পদ+অর্থ=পদার্থ। পদের অর্থাৎ বাক্যের অর্থ দ্বারা যাহা প্রতিপন্ন হয় তাহার নাম "পদার্থ"। ইংরাজিতে ইহাকে categories of thought বলে। দর্শনশাস্ত্রে পদার্থের লক্ষণ এই—"বাচ্যং জ্ঞেয়ং"। যাহা বাচ্য তাহা জ্ঞেয়। যাহা কিছু আমাদের জ্ঞানগম্য, জ্ঞানের আকারে আকারিত হইলে যাহা বাক্যের আকারে প্রকাশিত হয় তাহার নাম পদার্থ। স্বপ্ন একপ্রকার পদার্থ, কল্পনা একপ্রকার পদার্থ, অভাব একপ্রকার পদার্থ। ফলতঃ সাধারণ পাঠকে "দ্রব্য" ও "পদার্থের" ভেদ বুঝে না। দ্রব্য একপ্রকার পদার্থ। কিন্তু পদার্থ বলিলে দ্রব্য ভিন্ন আরো অনেক সামগ্রী বুঝায়।

আমরা যাহা কিছু মনে মনে চিন্তা করিতে পারি ও কথা দ্বারা ব্যক্ত করিতে পারি, তৎসমুদায়ই পদার্থ। পদার্থের এইরূপ লক্ষণ নিশ্চয় করিয়া পণ্ডিতেরা পদার্থ কয়প্রকার তাহার নানা প্রকার বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। গোতমের ন্যায়শাস্ত্রের অনেক পদার্থ উড়াইয়া দিয়া বৈশেষিক দর্শনে পদার্থ সপ্তপ্রকার এইরূপ নিশ্চিত হইয়াছিল; তাহা এই—

১ দ্রব্য; ২ গুণ; ৩ কর্ম্ম; ৪ জাতি; ৫ বিশেষ; ৬ সমবায় সম্বন্ধ; এবং ৭ অভাব। পরে আবার দ্রব্যের শ্রেণীবিভাগ করিয়া বৈশেষিকেরা বলেন দ্রব্য নানা শ্রেণীর, যথা—ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, কাল, দিক আত্মা ইত্যাদি।

এই মতে ক্ষিতি প্রভৃতি ভূত এবং আত্মা, দ্রব্যনামক পদার্থের অন্তর্গত। ইহাতে ভৌতিক দ্রব্য এবং আত্মাকে একই শ্রেণীতে নিবিষ্ট করিয়া উভয়ের প্রকৃতিগত একটি মৌলিক বৈষম্যকে দুর্লক্ষ্য করা হইয়াছে। এবং ক্ষিত্যাদি ভূতের প্রকৃত ও প্রতীয়মান সত্তার কোন আভাস নাই।

সাংখ্যেরা পদার্থের অন্যপ্রকার একটি সুন্দর শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন; তাঁহাদের মতে সমুদায় পদার্থ এই তিন শ্রেণীতে বিভাজ্য যথা—

১। ব্যক্ত।
২। অব্যক্ত।
৩। জ্ঞ।

তাঁহাদের মত এই যে, এই তিন পদার্থের "বিজ্ঞান" অর্থাৎ পার্থক্যজ্ঞানই দর্শনশাস্ত্রের চরম সিদ্ধান্ত।

কি নাস্তিক, কি বেদান্তী, কি সাংখ্য সকলেই ঐকমত্যে স্বীকার করেন যে, সচরাচর আমরা যাহাকে বাহ্য বা জড়জগৎ বলি

তাহা রূপরসাদি জ্ঞানের বিকার মাত্র। তাহা আমাদের জ্ঞানের খেলা। তাহা অলীক। তাহা ক্ষণিক। ক্ষণে ক্ষণে তাহার আবির্ভাব ও তিরোভাব। তাহা ভোজবাজীর ন্যায় বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী, সূর্য্যচন্দ্র, ঘরদ্বার, পুত্রকন্যা যাহা রূপ-রসাদির আকারে আকারিত, তাহা স্বপ্নেও প্রত্যক্ষ করা যায়, চক্ষু বুজিয়াও মনে মনে স্মরণ করা যায়, অতএব তাহাদের অস্তিত্ব কেবল মনের ভিতর। মনের বাহিরে এই সংসারের কোন অস্তিত্বই নাই। তাই সূর্য্যকে থালার মত দেখায়, তাই রোগে সহজবস্তুকে পীত দেখায়, মনের অবস্থা অনুসারে এই জগতের রূপান্তর হয়। এই অলীক ভোজবাজীর ন্যায় জ্ঞানের খেলাময় জ্ঞানরচিত ইন্দ্রিয়গোচর সংসারকে সাংখ্যেরা "ব্যক্ত" জগৎ বলেন। ইহাই প্রথম শ্রেণীর পদার্থ।

কিন্তু নাস্তিক ও বেদান্তীদের সহিত বিবাদ করিয়া সাংখ্যেরা আরো বলেন যে, এই ব্যক্তের পশ্চাদ্‌ভাগে এক অতীন্দ্রিয় অব্যক্ত জগৎ বিদ্যমান আছে। সূর্য্য দুই প্রকার, ব্যক্ত সূর্য্য, যাহা পৃথিবী অপেক্ষা অনেক প্রকাণ্ড হইয়াও সামান্য থালার মত দেখায়, যাহাকে অবস্থাভেদে কখনও লোহিত কখনও পীত বলিয়া মনে হয়, যাহা পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ না করিলেও ঐরূপে ভ্রমণ করিতেছে বলিয়া মনে হয়; আর অব্যক্ত সূর্য্য যাহা আমাদের মনে ঐরূপ জ্ঞান উৎপত্তির প্রতিকারণ স্বরূপ। এইরূপ [illegible] "জড়"পদার্থকেই "ব্যক্ত" বা "অব্যক্ত" বলিয়া [illegible]। যে জড়পদার্থ জ্ঞানের বহির্ভাগে থাকিয়া [illegible] স্বরূপ, যাহা জ্ঞানের আকারে আকারিত না [illegible] দ্বারা আপন অস্তিত্ব খ্যাপন করে—যাহা অতী- [illegible] "অব্যক্ত"। এই অব্যক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর

পদার্থ ; ব্যক্ত ক্ষণিক ও অনীক ও জ্ঞানের অন্তর্গত পদার্থ। অব্যক্ত নিত্যস্থায়ী এবং জ্ঞানে অপ্রকাশিত।

এই অব্যক্তের অপর নাম "প্রকৃতি" বা "মূলপ্রকৃতি" বা "প্রধান"।

যদি সংসারে কেবল "অব্যক্ত" পদার্থই থাকিত, তাহা হইলে "ব্যক্তের" উৎপত্তি হইত না। যদি অব্যক্তকে দেখিবার শুনিবার ও অনুভব করিবার কোন পদার্থান্তর না থাকিত তাহা হইলে জ্ঞানই অসম্ভব হইত। জ্ঞানের বিকার ব্যক্তজগৎ কোথা হইতে হইবে? অব্যক্ত অচেতন ; যদি অব্যক্ত ভিন্ন আর কিছু সংসারে না থাকিত তাহা হইলে চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি এ সংসারে হইত না। জ্ঞান ও চৈতন্যের সত্তাবশতঃ "জ্ঞ" নামক চেতনপদার্থের অস্তিত্ব মানিতে হয়। তাহা যে কেবল অনুমানসাপেক্ষ তাহা নহে, প্রত্যেক জ্ঞানের ক্রিয়াতে "জ্ঞ" পদার্থকে আমরা সাক্ষাৎকার করিতেছি। বেদান্তীরা যাহাকে আত্মা বলেন ইহাই সাংখ্যদের "জ্ঞ"। ইহার অপর নাম "পুরুষ"। ইহা নিত্য ও চৈতন্যময়।

প্রকৃতি ও পুরুষকে আমরা একটি আশ্চর্য্য সম্বন্ধসূত্রে জড়িত দেখিতে পাই ; তাহারই ফল "ব্যক্ত" সংসার। পুরুষের যে জ্ঞান তাহা প্রায় সম্পূর্ণ প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধজনিত। এই জ্ঞানের ফলে সুখ ও দুঃখের উৎপত্তি। পক্ষান্তরে ঐ সম্বন্ধের ফলে আত্মার ইচ্ছাশক্তির বিকাশ এবং তদ্দ্বারা প্রকৃতিকে চালিত হইতে দেখা যায়। উভয়েই উভয়ের উপর ক্রিয়া উৎপাদন করিতেছে। অতএব সাংখ্যেরা বলেন পদার্থ ত্রিবিধ ; ব্যক্ত অব্যক্ত এবং জ্ঞ। অব্যক্ত এবং জ্ঞ পরস্পর সংযুক্ত হওয়াতে ব্যক্তের সৃষ্টি বা আবির্ভাব হয়। এই সংযোগ কিরূপে সংসাধিত হয় তাহা দর্শনশাস্ত্র জানে না—তাহা "অদৃষ্ট"। বেদে বলে এই

সংযোগ ঈশ্বরের দ্বারা সংসাধিত হইয়াছে, কিন্তু দর্শনশাস্ত্র তাহার কিছুই অবগত নহে। এই প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ বশতঃ সংসার উৎপন্ন হয়। কিরূপে উৎপন্ন হয় তাহাও সাংখ্যেরা বিচার করিয়াছেন। বারান্তরে তাহা আলোচনা করা যাইবে।

আলু।

(কৃষিকথা।)

আলুর চাষ সর্ব্বাপেক্ষা কম শ্রমসাপেক্ষ, অথচ বেশ লাভজনক।

আমাদের দেশে আলু কয়েক শ্রেণীর আছে, যথা;—গোল আলু, লাল আলু, শাঁখ আলু, চুবড়ী আলু এবং খাম আলু। আমরা গোল আলুর চাষের কথা বলিব।

প্রথমতঃ আলুর জমী বাছিয়া লইতে হয়। এই জমী উচ্চ ও অধিক বালুসংযুক্ত হওয়া আবশ্যক। বেলে মাটি ভিন্ন আলু ভাল হয় না। যে মাটি সহজে গুঁড়া হয় ও ফাঁপ ধরে এবং যাহার জল শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায় সেই মাটিতে উত্তম আলু জন্মে। এই জমী পুষ্করিণী বা নদী-নালার নিকটবর্ত্তী হওয়া আবশ্যক।

জমী নির্ব্বাচিত হইলে, উক্ত জমী উত্তমরূপে চষিতে হয়। পাঁচ সাতবার উপর্য্যুপরি চষা আবশ্যক এবং সঙ্গে সঙ্গে মই দ্বারা মাটির চেলা ভাঙ্গিয়া দিয়া মাটি গুঁড়া করার প্রয়োজন। যদি দেখা যায় যে, মাটি তত ভাল নহে, তবে এক বিঘা জমীতে দুই তিন গাড়ি ছাই ছড়াইয়া দিতে হয়, তাহা হইলেই মাটিতে বেশ ফাঁপ ধরিবে। কেহ কেহ আলুর জমীতে চূণ ছড়াইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করেন; দিলে হানি নাই, তবে দেওয়া একান্ত আব-

ঠিক নহে। আলুর জমীর সারের মধ্যে আমাদের দেশে খইলই প্রধান। গবর্ণমেণ্টের বর্দ্ধমানস্থ কৃষিবাগানে এক বিঘা জমীতে চারি মন খইল দিয়া সাতাশ মন আলু উৎপন্ন করা হইয়াছিল। কিন্তু ঐ ফারমে এক বিঘায় ঐ পরিমাণ খইল ও দুই মন অস্থিচূর্ণ সার দিয়া প্রায় চুয়ান্ন মন আলু পাওয়া হইয়াছিল। আমাদের দেশের চাষারা কেবল উত্তমরূপ খইল দিয়া এক বিঘা জমীতে চল্লিশ মনের উপর আলু পাইয়া থাকে।

জমীর মাটি উত্তমরূপ গুঁড়া করা হইলে জমীখণ্ড আখের জমীর ন্যায় বিভাগ করিয়া লইয়া অল্প অল্প গুঁড়া খইল ছড়াইয়া দিয়া সারি সারি আলুর বীজ বসাইয়া মাটি ঢাকা দিতে হয়। আলুর বীজের অঙ্কুর আপনা হইতেই বাহির হয়—উহা বাহির করিবার জন্য কোন বিশেষ উপায় অবলম্বন করিতে হয় না। যে সময়ে আলুর খুব আমদানী হয় সেই সময়ে কতকগুলি ভাল মোটা আলু সংগ্রহ করিয়া ঘরের এক কোণে বালু ছড়াইয়া তদুপরি রাখিয়া দিলেই ভাদ্র আশ্বিন মাসে ঐ সকল আলুর মুখ হইতে আপনা-আপনি অঙ্কুর বাহির হইবে। বীজ বসাইয়া একবার জল ছিটাইয়া দিতে হয়—বেশী জল দিতে হয় না। ক্রমে দুই তিনবার এইরূপ জল ছিটাইয়া দেওয়ার পর যখন প্রত্যেক বীজ হইতে চারা বাহির হয় তখন কোদালের দ্বারা দুই ধারের মাটি কাটিয়া ভেলি করিয়া দেওয়া আবশ্যক হয় এবং চারার গায়ে ঐ মাটি ধরাইয়া দিতে হয়। এইরূপ ভেলি করিয়া দেওয়ার পর জমীখণ্ড একবার নেচিয়া দিতে হইবে। তার পর আর একবার চারার গায়ে মাটি ধরাইয়া দিতে হইবে। এই সময়ে কিছু কিছু খইল প্রত্যেক চারার গোড়ায় দিতে হয়, তৎপরে একবার নেচিয়া দেওয়া আবশ্যক। দুইবার মাটি ধরান ও দুইবার

সেচার পর চারাগুলি যখন বেশ মজবুত হইয়া বাহির হয় এবং সবুজ বর্ণের গাছে যখন ক্ষেতখানি ঘিরিয়া ফেলে তখন সাতদিন অন্তর একবার করিয়া সেচিয়া দিতে হয়। কেহ কেহ আলুর বীজ বসাইয়া চারা বাহির হওয়ার অপেক্ষা না করিয়াই সঙ্গে সঙ্গে ভেলি কাটিয়া সেই ভেলি সেচা জলে পূর্ণ করিয়া দিয়া থাকে। এইরূপ করিলে হঠাৎ বৃষ্টি হইলেও বীজগুলি পচিয়া যাওয়ার আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু তেমনি সেচা জল অধিক পাইয়া অনেক বীজ নষ্ট হইয়া যায়, সেই সকল বীজের স্থানে আবার নূতন বীজ বসাইতে হয়। আকারের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রথম হইতেই ভেলি কাটিয়া দেওয়া উচিত কি না নির্ণয় করিতে হয়। আর সকল অবস্থাতেই কোন বীজ বাহির হইল কি না তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। দূর হইতে অল্প গাছেও ভূমি সবুজবর্ণ দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে না ভুলিয়া বিশেষরূপ নিরীক্ষণ করিয়া দেখা আবশ্যক যে, প্রত্যেক বীজ বাহির হইয়াছে কি না।

সচরাচর কার্ত্তিক হইতে ফাল্গুন মাসের মধ্যেই আলু উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে ঝাঁটি আলু শীঘ্র হয়। আবার যাহারা খুব লাভের প্রত্যাশা করে, তাহারা আশ্বিনের পূর্ব্বে আরম্ভ করিয়া অগ্রহায়ণ মাসে নবান্নের পূর্ব্বে আলু জন্মাইয়া ঐ সময়ে বিক্রয়পূর্ব্বক যথেষ্ট লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু আশ্বিন মাসে আলুর চাষ আরম্ভ করিলে লোকসান হইবার সম্ভাবনা থাকে। কারণ, আশ্বিন মাসে প্রায়ই প্রচুর বৃষ্টি হয়। অধিক পরিমাণে বৃষ্টির জল লাগিলেই আলুর চারা নষ্ট হইয়া যায়। কার্ত্তিক মাসের শেষে বর্ষা শেষ হইয়া গেলে এই চাষে হস্তক্ষেপ করাই যুক্তি-যুক্ত।

আমরা উপরে ভেলি প্রস্তুত প্রভৃতি সম্বন্ধে যাহা বলিলাম তাহা প্রকৃত বুঝিতে হইলে সকল শিক্ষার্থীর এক একবার প্রস্তুত প্রণালী চক্ষে দেখা আবশ্যক। আলুর চাষ যেরূপ সহজ ও অল্প সময় মধ্যে সম্পন্ন হয়, তাহাতে প্রত্যেক গৃহস্থের কিছু কিছু জমীতে আলুর চাষ করা কর্ত্তব্য। তাহাতে আর কিছু না হউক, নিত্য প্রয়োজনীয় তরকারীর খরচটা চলিয়া যায়। সুখের বিষয়, এই সহজের চাষ দিন দিন দেশ মধ্যে ব্যাপ্ত হইতেছে।

বাঙ্গলা দেশে দুর্ভিক্ষ যেরূপ ঘন ঘন দেখা দিতেছে তাহাতে আয়র্লণ্ডের ন্যায় এদেশে আলু প্রধান খাদ্যরূপে গণ্য হইলে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ অনেকটা প্রশমিত হইতে পারে। কারণ, বৃষ্টি অভাবে ধান্য না জন্মিলেই দুর্ভিক্ষ হয়, কিন্তু আলু উৎপাদন করিতে বৃষ্টির জলের প্রয়োজন হয় না; সুতরাং যে বৎসর ধান্য না জন্মে, চেষ্টা করিলে সে বৎসর আলু অনেক পরিমাণে জন্মান যাইতে পারে এবং সেই আলু দ্বারা জীবনরক্ষা হইতে পারে। দেশহিতৈষীর ইহা চিন্তা করিবার বিষয়।

লাল আলু, শাঁখ আলু প্রভৃতি যে কয়েক প্রকার আলুর কথা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার চাষের কোন পারিপাট্য নাই। জমী খুঁড়িয়া ঘাসশূন্য করতঃ ঐ সকল আলুর মূল বসাইয়া মধ্যে মধ্যে জল দিলেই উহা প্রচুর জন্মে।

প্রসঙ্গ-কথা।*

"শিক্ষার হেরফের" নামক প্রবন্ধ যখন লিখিত হয় তখন মনে করি নাই যে, বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রুটি প্রদর্শনে কাহারো হৃদয়ে আঘাত লাগিবে। বিশেষতঃ উক্ত প্রবন্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সম্মুখেই পঠিত হয়। সেখানে রাজসাহী কালেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা কেহ কোন রূপ ক্ষোভ প্রকাশ করেন নাই; বরং যতদূর জানা গিয়াছিল অনেকেই অনুকূলভাবে লেখকের মতের অনুমোদন করিয়াছিলেন।

অবশেষে উক্ত প্রবন্ধ সাধনায় প্রকাশিত হইলে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী পাঠক উহা ইংরাজিতে অনুবাদ

* শিক্ষা সঙ্কট। শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়। ভারতী। জ্যৈষ্ঠ। ১৩শ ভাগ।

করিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন এবং কালেজের অনেক পুরাতন ছাত্রের নিকট উহার ঐকমত শুনা যায়। বঙ্কিম বাবু, গুরুদাস বাবু, এবং আনন্দমোহন বসু মহাশয় তৎসম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাও পাঠকগণ অবগত আছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি যাঁহাদের হৃদয়-নিকুঞ্জে প্রিয়স্থান অধিকার করিয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বহির্ভুক্ত লোকের মুখে তাহার কোনরূপ অমর্য্যাদার কথা শুনিলে তাঁহাদের মধ্যে কাহারও মনক্ষোভ উপস্থিত হইতে পারে সন্দেহ নাই, অতএব বর্ত্তমান আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া আমি আমার পক্ষে দুর্ভাগ্য বিবেচনা করি। কেবল, বিশ্ববিদ্যালয়ের যাঁহারা গৌরবস্থল এমন অনেক মহোদয়ের উৎসাহ বাক্যে আমি নিজের লজ্জা নিবারণে সক্ষম হইতেছি।

তর্কের আরম্ভেই যখন মূল কথা ছাড়িয়া আনুষঙ্গিক কথা লইয়া আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং প্রতিপক্ষকে সমগ্রভাবে বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া তাহার কথাগুলিকে খণ্ড খণ্ড ভাবে আক্রমণ করিবার আয়োজন হয় তখন সেই নিষ্ফল বাক্‌যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করাই সুবুদ্ধিসঙ্গত। সিঁদুরে মেঘ খুব রক্তবর্ণ হইয়া উঠে কিন্তু বারিবর্ষণ করে না, এরূপ তর্কও সেইমত রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করে কিন্তু শীতল শান্তিবারি বর্ষণ না করিয়াই বায়ুবেগে উড়িয়া যায়।

ভাষা একে অসম্পূর্ণ, তাহাতে তাহাকে স্বস্থানচ্যুত করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে দেখিলে তাহার প্রকৃত অর্থ উদ্ধার করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। পাঠক সাধারণেরও পূর্ব্বাপর সিলাইয়া দেখিবার অবসর নাই, সেই কারণে প্রতিবাদমাত্রেই তাঁহাদের চিত্তবিক্ষিপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং "শিক্ষা সঙ্কট" প্রবন্ধে আমাদের যে সকল কথার যথার্থ অর্থ নির্ণয় হয় নাই তাহার পুনরবতারণা করিতে বাধ্য হইলাম।

উক্ত প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে "আমাদের শিক্ষাপ্রণালী মনকে অত্যাবশ্যক বিষয়ে নিবদ্ধ রাখে এ কথা ভিত্তিহীন। সাধনায় প্রকাশিত প্রবন্ধে পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে কেন বর্ত্তমান শিক্ষার ঘাড়ে এই দোষ চাপাইয়াছেন বলিতে পারি না।"

দোষ যে কে কাহার ঘাড়ে কেন চাপায় বোঝা শক্ত; অবশেষে অদৃষ্টকেই দোষী করিতে হয়। আমি যে ঠিক পূর্ব্বোক্ত ভাবে কথা বলিয়াছি এ দোষ আমার ঘাড়েই বা কেন চাপান হইল তাহা কে বলিতে পারে?

আমি কেবল বলিয়াছিলাম আমাদের দেশে শিশুদের স্বেচ্ছাপাঠ্য গ্রন্থ নাই। ইংরাজের ছেলে কেবল যে ভূগোল এবং জ্যামিতির সূত্র কণ্ঠস্থ করিয়া মরে তাহা নহে, বিবিধ আমোদজনক কৌতুকজনক গল্পের বই, ভ্রমণবৃত্তান্ত, বীরকাহিনী, সুখপাঠ্য বিজ্ঞান ইতিহাস পড়িতে পায়। বিশেষতঃ তাহারা স্বভাষায় শিক্ষা লাভ করে বলিয়া পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে যতটুকু সাহিত্যরস থাকে তাহা অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু আমাদের ছেলেরা কায়ক্লেশে কেবলই শিক্ষণীয় বিষয়ের শুষ্ক অংশটুকু মুখস্থ করিয়া যায়।

এ স্থলে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে কোন কথাই বলি নাই।

মনে আছে আমরা বাল্যকালে কেবলমাত্র বাঙ্গালাভাষায় শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলাম, বিদেশী ভাষার পীড়ন মাত্র ছিল না। আমরা পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট পাঠ সমাপন করিয়া কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশিরাম দাসের মহাভারত পড়িতে বসিতাম। রামচন্দ্র ও পাণ্ডবদিগের বিপদে কত অশ্রুপাত ও সৌভাগ্যে কি নিরতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছি তাহা আজিও ভুলি নাই। কিন্তু আজকাল আমার জ্ঞানে আমি একটি ছেলেকেও ঐ দুই গ্রন্থ পড়িতে দেখি নাই। অতি বাল্যকালেই ইংরাজির সহিত মিশাইয়া বাঙ্গলা তাহাদের তেমন সুচারুরূপে অভ্যস্ত হয় না এবং

অনভ্যস্ত ভাষায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গ্রন্থ পাঠ করিতে স্বভাবতই তাহারা বিমুখ হয়, এবং ইংরাজিতেও শিশুবোধ্য বহি পড়া তাহাদের পক্ষে অসাধ্য, সতএব দায়ে পড়িয়া আমাদের ছেলেদের পড়াশুনা কেবল মাত্র কঠিন শুষ্ক অত্যাবশ্যক পাঠ্য পুস্তকেই নিবদ্ধ থাকে; এবং তাহাদের চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তি বহুকাল পর্য্যন্ত খাদ্যাভাবে অপুষ্ট অপরিণত থাকিয়া যায়।

আমি বলিয়াছিলাম ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সৌধবুদ্বুদ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে; লোকপ্রবাহের গভীর তলদেশে তাহার মূল নাই। বলা বাহুল্য, এরূপ কথা তুলনাসাপেক্ষ। যে সকল কথা কাব্যে পুরাণে প্রচলিত, যে সকল কথা দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে মুখে সর্ব্বদা প্রবাহিত, যে সকল কথা সহজে স্বাভাবিক নিয়মে অনুক্ষণ কার্য্যে পরিণত হইয়া উঠিতেছে, তাহাই জাতীয় জীবনের মূলে গিয়া সঞ্চিত হইতেছে, তাহাই চিরস্থায়ী। অতএব কোন শিক্ষাকে স্থায়ী করিতে হইলে, গভীর করিতে হইলে, ব্যাপক করিতে হইলে তাহাকে চিরপরিচিত মাতৃভাষায় বিগলিত করিয়া দিতে হয়; যে ভাষা দেশের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত, অন্তঃপুরের অসূর্য্যম্পশ্যকক্ষেও যাহার নিষেধ নাই, যাহাতে সমস্ত জাতির মানসিক নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিষ্পন্ন হইতেছে, শিক্ষাকে সেই ভাষার মধ্যে মিশ্রিত করিলে তবে সে সমস্ত জাতির রক্তকে বিশুদ্ধ করিতে পারে, সমস্ত জাতির জীবনক্রিয়ার সহিত তাহার যোগ সাধন হয়। বুদ্ধ সেইজন্য পালিভাষায় ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন, চৈতন্য বঙ্গভাষায় তাঁহার প্রেমাবেগ সর্ব্বসাধারণের অন্তরে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন। অতএব আমি যখন বলিয়াছিলাম ভাবিয়া দেখিলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সৌধবুদ্বুদ বলিয়া প্রতীত হইবে তাহার অর্থ এমন নহে, যে, বিশ্ববিদ্যালয় কোন কাজ বা অকাজ করিতেছে না এবং ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের কোন রূপ উপকার বা অপকার হয় নাই। আমার কথার অর্থ এই ছিল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের জাতীয় জীবনের অন্তরে কোন প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। বিদেশ যদি ইংরাজি দেশ হইতে

চলিয়া যায় তবে ঐ বড় বড় সৌধগুলি কোথাও দাঁড়াইবার স্থান পায় না।

ইংরাজি শিক্ষার সুফলের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস আছে বলিয়াই যাহাতে সেই শিক্ষা মাতৃভাষা অবলম্বন করিয়া গভীর ও স্থায়ী-রূপে দেশের অন্তরের মধ্যে ব্যাপ্ত হইতে পারে এই ইচ্ছা যাঁহারা প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে উদাহরণের দ্বারা বলা বাহুল্য যে, পূর্ব্বে "বাসুকির গাত্রকণ্ডু অপনোদনেচ্ছা ভূমিকম্পের হেতু" এইরূপ বিশ্বাস ছিল, এক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূমিকম্পের অন্য কারণ প্রচার করিতেছে। আমাদের অভিপ্রায় এই যে, ভূমিকম্পের কাল্পনিক হেতুনির্ণয়ের মূলচ্ছেদন করিতে হইলে ইংরাজি শিক্ষাকে সহজ স্বাভাবিক ও সাধারণের আয়ত্তগম্য করিতে হইবে যাহাতে শিশুকাল হইতে তাহার সার গ্রহণ করিতে পারি, যাহাতে বহু-ব্যয়ে ও সাংঘাতিক চেষ্টায় তাহাকে ক্রয় করিতে না হয়, যাহাতে অন্তঃপুরেও তাহার প্রবেশ সুলভ হয়। নতুবা শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও বাসুকির গাত্রকণ্ডু ভূমিকম্পের কারণরূপে ফিরিয়া দেখা দেয় এমন উদাহরণের অভাব নাই।

"ইংরাজি শিক্ষায় কৃতবিদ্য শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত" ইংরাজি শিক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন "শিক্ষা সঙ্কট" প্রবন্ধে তাহার উচিত অর্থ গ্রহণ হয় নাই আমার এই বিশ্বাস। শিক্ষাটা কতদূর হয় বা না হয় ইহাই তাঁহার আলোচ্য বিষয় ছিল। তাঁহার সমস্ত প্রবন্ধে কোথাও তিনি বলেন নাই যে, পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে লোক ঘুষ অধিক লইতেছে অথবা জাল করিতে অধিকতর পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে। তিনি কেবল এই বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান প্রণালীতে ছাত্রেরা কেবল যে ভাল শেখে না তাহা নহে পরন্তু ভুল শেখে! কিন্তু প্রতিবাদক সমস্ত প্রবন্ধের সহিত ভাব না মিলাইয়া একটিমাত্র বিচ্ছিন্ন পদ অবলম্বন করিয়া সবিস্তারে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, পুরাকালে লোকে ঘুষ লইত, জালিয়াৎকে আশ্রয় দিত, এবং বাসুকির গাত্রকণ্ডু অপ-নোদনেচ্ছা ভূমিকম্পের হেতু বলিয়া বিশ্বাস করিত।

লেখক আমার সম্বন্ধে বলিয়াছেন "যাঁহার মত এক্ষণে আলোচিত হইল তিনি ত ইংরাজি শিক্ষা নিষ্ফল-এই মাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত।"—যদি সত্যই আমি এইমাত্র বলিতাম তবে কোথায় গিয়া ক্ষান্ত হইতাম বলা শক্ত; তবে এখনকার ছেলেরা আমাকে ঢিল ছুঁড়িয়া মারিত; এবং বঙ্কিম বাবু, গুরুদাস বাবু ও আনন্দ মোহন বসু মহাশয় কখনই আমার লেখার তিলমাত্র অনুমোদন করিতেন না।

লেখক সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন,"আলোচ্য প্রবন্ধগুলি পড়িয়া আর একটি ভাব মনে উদয় হয়—সন্দেহ উঠে যে, লেখকগণ হয় ত অনেক সময় ভুলিয়া যান যে, এদেশে ধান জন্মে আর বিলাতে জন্মায় ওক—এটা ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড নয়।"

আমরা ঠিক সেই কথাটাই ভুলি না। আমরাই বারম্বার বলিতেছি—এদেশে ধান জন্মে আর বিলাতে জন্মায় ওক। এখানকার দেশী ভাষা বাঙ্গলা, ইংরাজি নহে। যদি কর্ষণ করিয়া সম্যক ফল লাভ করিবার ইচ্ছা হয় তবে বাঙ্গলায় করিতে হইবে, নতুবা ঠিক "কাল্‌চার" হইবে না।

আমরা একথা স্বপ্নেও ভুলি না যে, এদেশে ধান জন্মে আর বিলাতে জন্মায় ওক্। এই জন্যই আমরা বাঙ্গলায় যাহা পাই তাহাকেই বহুমান্য করি; ইংরাজির সহিত তুলনা করিয়া তাহাকে হতাদর করিবার চেষ্টা করি না। এই জন্যই আমরা বাঙ্গালীর শিক্ষা সাধনের ভার কতক পরিমাণে বাঙ্গলার প্রতিও অর্পণ করিতে ইচ্ছা করি। এই জন্যই আমরা মনে করি ইংরাজি শিক্ষা বাঙ্গলা ভাষার মধ্যে যে পরিমাণে অঙ্কুরিত হইয়া উঠে সেই পরিমাণেই তাহার ফলবান হইবার সম্ভাবনা।

বাঙ্গলার শস্য, বাঙ্গলার ভাষা, বাঙ্গলার সাহিত্যের প্রতি আমাদের কৃপাদৃষ্টি নাই, তাহার প্রতি আমাদের অন্তরের প্রীতি এবং একান্ত বিশ্বাস আছে একথায় যাঁহাদের "সন্দেহ" হয়

তাঁহারা পুনর্ব্বার ধীরভাবে আলোচ্য প্রবন্ধ গুলির যথার্থ মর্ম্মগ্রহণ করিয়া পড়িয়া দেখিবেন। এবং যদি কোথাও দৈবক্রমে কোন একটি বা দুটি কথায় কোন ত্রুটি বা কোন অলঙ্কারদোষ ঘটিয়া থাকে তবে তাহা অনুগ্রহপূর্ব্বক মার্জ্জনা করিবেন; কারণ আমরা তর্কের ইন্ধন সংগ্রহ করিবার জন্য প্রবন্ধগুলি লিখি নাই, যথার্থই আবশ্যক এবং বেদনা অনুভব করিয়া লিখিয়াছি।

প্রশ্নোত্তর।

বাঙ্গলা ভাষায় "এবং" "ও" এই দুই সংযোজক অব্যয় শব্দের প্রয়োগের কোন পার্থক্য আছে এমন বোধ হয় না। প্রচলিত কথোপকথনে "ও" অব্যয় শব্দ আমরা সংযোজক রূপে ব্যবহার করিই না, সেরূপ স্থলে "আর" শব্দটাই প্রয়োগ হইয়া থাকে। আমার বোধ হয় বাঙ্গলা "ও" সংস্কৃত "চ" শব্দের অপভ্রংশ এবং তৎপরিবর্ত্তেই ব্যবহৃত। ইংরাজিতে "and" শব্দ যেরূপ সংযোজক সংস্কৃত "চ" সেরূপ নহে; উহা কেবল আতিরিক্ত্য বাচক। প্রচলিত বাঙ্গলায় "ও" শব্দও সেই রূপ, যথা, তুমি গিয়াছিলে আমিও গিয়াছিলাম। "ইংরাজিতে" "too" শব্দের এইরূপ ব্যবহার দেখা যায়। "তুমি ও আমি" কখনো বলি না, বরং "তুমি আর আমি" বলিয়া থাকি। গদ্য-সাহিত্য বাঙ্গলায় প্রকাশিত হইবার সময় এই "ও" অব্যয় শব্দের অযথা প্রয়োগ প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। একজন বাঙ্গলা ভাষাভিজ্ঞ য়ুরোপীয় পণ্ডিত একবার আমার কাছে বলিয়াছিলেন যে, দুই শব্দ যোজনা করিবার সময় "ও", এবং দুই পদ যোজনা করিবার সময় "এবং" ব্যবহার করিলে এই দুই শব্দের পার্থক্য রক্ষিত হয়— যথা, "পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে এবং চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে।"

যাহা হউক ইহা নিঃসন্দেহ, বাঙ্গলা লিখিত ভাষায় "এবং" ও "ও" শব্দের কোন পার্থক্য রক্ষিত হয় না।

শ্রী —

সাধনা।

শান্তি।

দুখিরাম রুই এবং ছিদাম রুই দুই ভাই সকালে যখন দা হাতে লইয়া জন খাটিতে বাহির হইল তখন তাহাদের দুই স্ত্রীর মধ্যে মহা বকাঝকি চেঁচামেচি চলিতেছে। কিন্তু প্রকৃতির অন্যান্য নানাবিধ নিত্য কলরবের ন্যায় এই কলহ কোলাহলও পাড়া-সুদ্ধ লোকের অভ্যাস হইয়া গেছে। তীব্র কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র লোকে পরস্পরকে বলে "ঐ রে বাধিয়া গিয়াছে," অর্থাৎ যেমনটি আশা করা যায় ঠিক তেম্‌নিটি ঘটিয়াছে, আজও স্বভাবের নিয়মের কোনরূপ ব্যত্যয় হয় নাই। প্রভাতে পূর্ব্বদিকে সূর্য্য উঠিলে যেমন কেহ তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করে না তেমনি এই কুরিদের বাড়িতে দুই যায়ের মধ্যে যখন একটা হৈ হৈ পড়িয়া যায় তখন তাহার কারণ নির্ণয়ের জন্য কাহারো কোনরূপ কৌতূহলের উদ্রেক হয় না।

অবশ্য এই কোন্দল আন্দোলন প্রতিবেশিদের অপেক্ষা দুই স্বামীকে বেশি স্পর্শ করিত সন্দেহ নাই কিন্তু সেটা তাহারা কোনরূপ অসুবিধার মধ্যে গণ্য করিত না। তাহারা দুই ভাই যেন দীর্ঘ সংসারপথ একটা এক্কা গাড়িতে করিয়া চলিয়াছে, দুই দিকের দুই শ্রিংবিহীন চাকার অবিশ্রাম ছড়্‌ ছড়্‌ খড়্‌ খড়্‌ শব্দটাকে জীবনরথযাত্রার একটা বিধিবিহিত নিয়মের মধ্যেই ধরিয়া লইয়াছে।

বরঞ্চ ঘরে যেদিন একটা শব্দমাত্র নাই, সমস্ত থম্‌থম্‌ ছম্‌ছম্‌ করিতেছে, সেদিন একটা আসন্ন অনৈসর্গিক উপদ্রবের আশঙ্কা জন্মিত, সেদিন যে কখন কি হইবে তাহা কেহ হিসাব করিয়া বলিতে পারিত না।

আমাদের গল্পের ঘটনা যেদিন আরম্ভ হইল সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে দুই ভাই যখন জল খাটিয়া শ্রান্তদেহে ঘরে ফিরিয়া আসিল তখন দেখিল শুদ্ধ গৃহ গম্‌গম্‌ করিতেছে।

বাহিরেও অত্যন্ত গুমট্‌। দুই প্রহরের সময় খুব একপস্‌লা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এখনো চারিদিকে মেঘ জমিয়া আছে। বাতাসের লেশমাত্র নাই। বর্ষায় ঘরের চারিদিকে জঙ্গল এবং আগাছাগুলা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে, সেখান হইতে এবং জলমগ্ন পাটের ক্ষেত হইতে সিক্ত উদ্ভিজ্জের ঘন গন্ধবাষ্প চতুর্দিকে একটি নিশ্চল প্রাচীরের মত জমাট হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। গোয়ালের পশ্চাদ্বর্তী ডোবার মধ্য হইতে ভেক ডাকিতেছে এবং ঝিল্লিরবে সন্ধ্যার নিস্তব্ধ আকাশ একেবারে পরিপূর্ণ।

অদূরে বর্ষার পদ্মা নবমেঘচ্ছায়ায় বড় স্থির ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করিয়া চলিয়াছে। শস্যক্ষেত্রের অধিকাংশই ভাঙ্গিয়া লোকালয়ের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। এমন কি, ভাঙ্গনের ধারে দুই চারিটা আম কাঁঠাল গাছের শিকড় বাহির হইয়া দেখা দিয়াছে, যেন তাহাদের নিরুপায় মুষ্টির প্রসারিত অঙ্গুলিগুলি শূন্যে একটা কিছু অন্তিম অবলম্বন আঁকড়িয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছে।

দুখিরাম এবং ছিদাম সে দিন জমিদারের কাছারি-ঘরে কাজ করিতে গিয়াছিল। ওপরের চরে জলিধান পাকিয়াছে। বর্ষার

হয় ভাসিয়া যাইবার পূর্ব্বেই ধান কাটিয়া লইবার জন্য দেশের দরিদ্র লোকমাত্রেই কেহ বা নিজের ক্ষেতে কেহ বা পাট কাটিতে নিযুক্ত হইয়াছে; কেবল, কাছারি হইতে পেয়াদা আসিয়া এই দুই ভাইকে জবরদস্তি করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল। কাছারি-ঘরে চাল ভেদ করিয়া স্থানে স্থানে জল পড়িতেছিল তাহাই সারিয়া দিতে এবং গোটাকতক ঝাঁপ নির্ম্মাণ করিতে তাহারা সমস্ত দিন খাটিয়াছে। বাড়ি আসিতে পায় নাই, কাছারি হইতেই কিঞ্চিৎ জলপান খাইয়াছে। মধ্যে মধ্যে বৃষ্টিতেও ভিজিতে হইয়াছে,—উচিতমত পাওনা মজুরি পায় নাই, এবং তাহার পরিবর্ত্তে যে সকল অন্যায় কটু কথা শুনিতে হইয়াছে সে তাহাদের পাওনার অনেক অতিরিক্ত।

পথের কাদা এবং জল ভাঙ্গিয়া সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দুই ভাই দেখিল, ছোট বা চন্দরা ভূমিতে অঞ্চল পাতিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া আছে;—আজিকার এই মেঘলা দিনের মত সেও মধ্যাহ্নে প্রচুর অশ্রুবর্ষণপূর্ব্বক সায়াহ্নের কাছাকাছি কান্না দিয়া অত্যন্ত গুমট্ করিয়া আছে; আর বড় যা রাধা মুখটা মস্ত করিয়া দাওয়ায় বসিয়া ছিল—তাহার দেড় বৎসরের ছোট ছেলেটি কাঁদিতেছিল, দুই ভাই যখন প্রবেশ করিল, দেখিল উলঙ্গ শিশু প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে চীৎ হইয়া পড়িয়া ঘুমাইয়া আছে।

ক্ষুধিত দুখিরাম আর কালবিলম্ব না করিয়া বলিল "ভাত দে"।

বড় বৌ বারুদের বস্তায় স্ফুলিঙ্গপাতের মত একমুহূর্ত্তেই তীব্র কণ্ঠস্বর আকাশ পরিমাণ করিয়া বলিয়া উঠিল "ভাত কোথায় যে ভাত দিব? তুই কি চাল দিয়া গিয়াছিলি? আমি কি নিজে রোজগার করিয়া আনিব?"

সারাদিনের শ্রান্তি ও লাঞ্ছনার পর অন্নহীন নিরানন্দ অন্ধকার ঘরে প্রজ্জ্বলিত ক্ষুধানলে গৃহিণীর রুক্ষবচন, বিশেষতঃ শেষ কথাটার গোপন কুৎসিৎ শ্লেষ দুখিরামের হঠাৎ কেমন একেবারেই অসহ্য হইয়া উঠিল। ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় রুদ্ধ গম্ভীর গর্জ্জনে বলিয়া উঠিল "কি বল্লি!" বলিয়া, মুহূর্ত্তের মধ্যে দা লইয়া কিছু না ভাবিয়া একেবারে স্ত্রীর মাথায় বসাইয়া দিল। রাধা তাহার ছোট বাপের কোলের কাছে পড়িয়া গেল এবং মৃত্যু হইতে মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইল না।

চন্দরা রক্তসিক্ত বস্ত্রে "কি হল গো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। ছিদাম তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। দুখিরাম দা ফেলিয়া মুখে হাত দিয়া হতবুদ্ধির মত ভূমিতে বসিয়া পড়িল। ছেলেটা জাগিয়া উঠিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বাহিরে তখন পরিপূর্ণ শান্তি। রাখালবালক গরু লইয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিতেছে। পরপারের চরে যাহারা নূতনপক্ক ধান কাটিতে গিয়াছিল, তাহারা পাঁচ সাতজনে এক একটি ছোট নৌকায় এপারে ফিরিয়া পরিশ্রমের পুরস্কার দুই চারি আঁটি ধান মাথায় লইয়া প্রায় সকলেই নিজ নিজ ঘরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

চক্রবর্ত্তীদের বাড়ির রামলোচন খুড়ো গ্রামের ডাকঘরে চিঠি দিয়া ঘরে ফিরিয়া নিশ্চিন্ত মনে চুপচাপ তামাক খাইতেছিলেন। হঠাৎ মনে পড়িল, তাঁহার কোর্ফা প্রজা দুখির অনেক টাকা খাজনা বাকি; আজ কিয়দংশ শোধ করিবে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। এতক্ষণে তাহারা বাড়ি ফিরিয়াছে স্থির করিয়া চাদরটা কাঁধে ফেলিয়া ছাতা লইয়া বাহির হইলেন।

কুরীদের বাড়িতে ঢুকিয়া তাঁহার গা হম্‌ছম্ করিয়া উঠিল।

দেখিলেন, ঘরে প্রদীপ জ্বালা হয় নাই। অন্ধকার দাওয়ায় দুই চারিটা অন্ধকার মূর্ত্তি অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। রহিয়া রহিয়া দাওয়ার এক কোণ হইতে একটা অস্ফুট রোদন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে—এবং ছেলেটা যত মা মা করিয়া কাঁদিয়া উঠিতে চেষ্টা করিতেছে ছিদাম তাহার মুখ চাপিয়া ধরিতেছে।

রামলোচন কিছু ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "দুখি, আছিস্ না কি!"

দুখি এতক্ষণ প্রস্তরমূর্ত্তির মত নিশ্চল হইয়া বসিয়া ছিল, তাহার নাম ধরিয়া ডাকিবা মাত্র একেবারে অবোধ বালকের মত উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ছিদাম তাড়াতাড়ি দাওয়া হইতে অঙ্গনে নামিয়া চক্রবর্ত্তীর নিকটে আসিল। চক্রবর্ত্তী জিজ্ঞাসা করিলেন "গাগীরা বুঝি ঝগড়া করিয়া বসিয়া আছে? আজ ত সমস্ত দিনই চীৎকার শুনিয়াছি।"

এতক্ষণ ছিদাম কিংকর্ত্তব্য কিছুই ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই। নানা অসম্ভব গল্প তাহার মাথায় উঠিতেছিল। আপাততঃ স্থির করিয়াছিল রাত্রি কিঞ্চিৎ অধিক হইলে মৃতদেহ কোথাও সরাইয়া ফেলিবে। ইতিমধ্যে যে চক্রবর্ত্তী আসিয়া উপস্থিত হইবে এ সে মনেও করে নাই। ফস্ করিয়া কোন উত্তর যোগাইল না। বলিয়া ফেলিল, "হাঁ, আজ খুব ঝগড়া হইয়া গিয়াছে।"

চক্রবর্ত্তী দাওয়ার দিকে অগ্রসর হইবার উপক্রম করিয়া বলিল, "কিন্তু সে জন্য দুখি কাঁদে কেন রে!"

ছিদাম দেখিল আর রক্ষা হয় না, হঠাৎ বলিয়া ফেলিল—"ঝগড়া করিয়া ছোট বৌ বড় বৌয়ের মাথায় এক দায়ের কোপ বসাইয়া দিয়াছে।"

উপস্থিত বিপদ ছাড়া যে আর কোন বিপদ থাকিতে পারে এ কথা সহজে মনে হয় না। ছিদাম তখন ভাবিতেছিল, ভীষণ সত্যের হাত হইতে কি করিয়া রক্ষা পাইব? মিথ্যা যে তদপেক্ষা ভীষণ হইতে পারে তাহা তাহার জ্ঞান হইল না। রামলোচনের প্রশ্ন শুনিবামাত্র তাহার মাথায় তৎক্ষণাৎ একটা উত্তর যোগাইল এবং তৎক্ষণাৎ বলিয়া ফেলিল।

রামলোচন চমকিয়া উঠিয়া কহিল "অ্যাঁ! বলিস্ কি! মরে নাই ত!"

ছিদাম কহিল "মরিয়াছে!" বলিয়া চক্রবর্ত্তীর পা জড়াইয়া ধরিল।

চক্রবর্ত্তী পালাইবার পথ পায় না। ভাবিল, রাম রাম, সন্ধ্যাবেলায় এ কি বিপদেই পড়িলাম! আদালতে সাক্ষ্য দিতে দিতেই প্রাণ বাহির হইয়া পড়িবে। ছিদাম কিছুতে তাঁহার পা ছাড়িল না, কহিল "দাদা ঠাকুর, এখন আমার বৌকে বাঁচাইবার কি উপায় করি!"

মাম্‌লা মোকদ্দমার পরামর্শে রামলোচন সমস্ত গ্রামের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি একটু ভাবিয়া বলিলেন, দেখ্, ইহার এক উপায় আছে। তুই এখনি থানায় ছুটিয়া যা—বল্‌গে, তোর বড় ভাই দুখি সন্ধ্যাবেলায় ঘরে আসিয়া ভাত চাহিয়াছিল; ভাত প্রস্তুত ছিল না বলিয়া স্ত্রীর মাথায় দা বসাইয়া দিয়াছে। আমি নিশ্চয় বলিতেছি এ কথা বলিলে ছুঁড়িটা বাঁচিয়া যাইবে।

ছিদামের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিল; উঠিয়া কহিল, ঠাকুর, বৌ গেলে বৌ পাইব; কিন্তু আমার ভাই ফাঁসি গেলে আর ত ভাই পাইব না। কিন্তু যখন নিজের স্ত্রীর নামে দোষারোপ করিয়াছিল

তখন এ সকল কথা ভাবে নাই। তাড়াতাড়িতে একটা কাণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে, এখন অলক্ষিতভাবে মন আপনার পক্ষে যুক্তি এবং প্রবোধ সঞ্চয় করিতেছে।

চক্রবর্ত্তীও কথাটা যুক্তিসঙ্গত বোধ করিলেন, কহিলেন, তবে যেমনটি ঘটিয়াছে তাই বলিস্, সকল দিক্ রক্ষা করা অসম্ভব।

বলিয়া রামলোচন অবিলম্বে প্রস্থান করিল এবং দেখিতে দেখিতে গ্রামে রাষ্ট্র হইল যে, কুরীদের বাড়ির চন্দরা রাগারাগি করিয়া তাহার বড় যায়ের মাথায় দা বসাইয়া দিয়াছে।

বাঁধ ভাঙ্গিলে যেমন জল আসে গ্রামের মধ্যে তেমনি হুহুঃ শব্দে পুলিস আসিয়া পড়িল; অপরাধী এবং নিরপরাধী সকলেই বিষম উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ছিদাম ভাবিল, যে পথ কাটিয়া ফেলিয়াছে সেই পথেই চলিতে হইবে। সে চক্রবর্ত্তীর কাছে নিজ মুখে এক কথা বলিয়া ফেলিয়াছে সে কথা গাঁসুদ্ধ রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছে, এখন আবার আর একটা কিছু প্রকাশ হইয়া পড়িলে কি জানি কি হইতে কি হইয়া পড়িবে, সে নিজেই কিছু ভাবিয়া পাইল না; মনে করিল কোন মতে সেই কথাটা রক্ষা করিয়া তাহার সহিত আর পাঁচটা গল্প জুড়িয়া স্ত্রীকে রক্ষা করা ছাড়া আর কোন পথ নাই।

ছিদাম তাহার স্ত্রী চন্দরাকে অপরাধ নিজ স্কন্ধে লইবার জন্য অনুরোধ করিল। সে ত একেবারে বজ্রাহত হইয়া গেল। ছিদাম তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল, যাহা বলিতেছি তাই

কর্, তোর কোন ভয় নাই, আমরা তোকে বাঁচাইয়া দিব।—আশ্বাস দিল বটে কিন্তু গলা শুকাইল, মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল।

চন্দ্রার বয়স সতেরো আঠারোর অধিক হইবে না। মুখখানি হৃষ্টপুষ্ট গোলগাল—শরীরটি অনতিদীর্ঘ, আঁটসাঁট, সুস্থ সবল; অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে এমনি একটি সৌষ্ঠব আছে যে, চলিতে ফিরিতে নড়িতে চড়িতে দেহের কোথাও যেন কিছু বাধে না। একখানি নূতন-তৈরি নৌকার মত; বেশ ছোট এবং সুডৌল, অত্যন্ত সহজে সরে এবং তাহার কোথাও কোন গ্রন্থি শিথিল হইয়া যায় নাই। পৃথিবীর সকল বিষয়েই তাহার একটা কৌতুক এবং কৌতূহল আছে; পাড়ায় গল্প করিতে যাইতে ভালবাসে; এবং কুম্ভকক্ষে ঘাটে যাইতে আসিতে দুই অঙ্গুলি দিয়া ঘোমটা ঈষৎ ফাঁক করিয়া উজ্জ্বল চঞ্চল ঘনকৃষ্ণ চোখ দুটি দিয়া পথের মধ্যে দর্শনযোগ্য যাহা কিছু সমস্তই দেখিয়া লয়।

বড়বৌ ছিল ঠিক ইহার উল্টা; অত্যন্ত এলোমেলো ঢিলে-ঢালা অগোছালো। মাথার কাপড়, কোলের শিশু, ঘরকন্নার কাজ কিছুই সে সাম্‌লাইতে পারিত না। হাতে বিশেষ একটা কিছু কাজও নাই অথচ কোন কালে যেন সে অবসর করিয়া উঠিতে পারে না। ছোটমা তাহাকে অধিক কিছু কথা বলিত না, মৃদুস্বরে দুই একটা তীক্ষ্ণ দংশন করিত, আর সে হাউ হাউ দাউ দাউ করিয়া রাগিয়া মাগিয়া বকিয়া ঝকিয়া সারা হইত এবং পাড়াসুদ্ধ অস্থির করিয়া তুলিত।

এই দুই যুড়ি স্বামী স্ত্রীর মধ্যেও একটা আশ্চর্য্য স্বভাবের ঐক্য ছিল। দুখিরাম মানুষটা কিন্তু বৃহদায়তনের—হাড়গুলা খুব চওড়া—নাসিকা খর্ব্ব—দুটি চক্ষু এই দৃশ্যমান সংসারকে যেন ভাল করিয়া বোঝে না, অথচ ইহাকে কোনরূপ গ্রাহ্য করিতেও

চায় না। এমন নিরীহ অথচ ভীষণ, এমন সবল অথচ নিরুপায় মানুষ অতি দুর্লভ।

আর ছিদামকে একখানি চক্‌চকে কালো পাথরে কে যেন যত্নযত্নে কুঁদিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। লেশমাত্র বাহুল্যবর্জ্জিত এবং কোথাও যেন কিছু টোল খায় নাই। প্রত্যেক অঙ্গটি বলের সহিত নৈপুণ্যের সহিত মিশিয়া অত্যন্ত সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। নদীর উচ্চপাড় হইতে নিম্নে লাফাইয়া পড়ুক, জলে দিয়া নৌকা ঠেলুক, বাঁশগাছে চড়িয়া বাছিয়া বাছিয়া কঞ্চী কাটিয়া আনুক, সকল কাজেই তাহার একটি পরিমিত পারিপাট্য, একটি অবলীলা-কৃত শোভা প্রকাশ পায়। বড় বড় কালো চুল তেল দিয়া কপাল হইতে যত্নে আঁচড়াইয়া তুলিয়া কাঁধে আনিয়া ফেলিয়াছে—বেশভূষা সাজ-সজ্জায় বিলক্ষণ একটু যত্ন আছে।

অপরাপর গ্রামবধূদিগের সৌন্দর্য্যের প্রতি যদিও তাহার উদাসীন দৃষ্টি ছিল না, এবং তাহাদের চক্ষে আপনাকে মনোরম করিয়া তুলিবার ইচ্ছাও তাহার যথেষ্ট ছিল—তবু ছিদাম তাহার যুবতী স্ত্রীকে একটু বিশেষ ভালবাসিত। উভয়ের ঝগড়াও হইত, ভাবও হইত, কেহ কাহাকে পরাস্ত করিতে পারিত না। আর একটি কারণে উভয়ের মধ্যে বন্ধন কিছু সুদৃঢ় ছিল। ছিদাম মনে করিত চন্দরা যেরূপ চটুল চঞ্চল প্রকৃতির স্ত্রীলোক তাহাকে যথেষ্ট বিশ্বাস নাই, আর চন্দরা মনে করিত, আমার স্বামীটির চতুর্দ্দিকেই দৃষ্টি, তাঁহাকে কিছু কষাকষি করিয়া না বাঁধিলে কোন্ দিন হাতছাড়া হইতে আটক নাই।

উপস্থিত ঘটনা ঘটিবার কিছুকাল পূর্ব্বে হইতে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে ভারি একটা গোলযোগ চলিতেছিল। চন্দরা দেখিয়াছিল

তাহার স্বামী কাজের ওজর করিয়া মাঝে মাঝে দূরে চলিয়া যায়, এমন কি, দুই একদিন অতীত করিয়া আসে, অথচ কিছু উপার্জ্জন করিয়া আনে না। লক্ষণ মন্দ দেখিয়া সেও কিছু বাড়াবাড়ি দেখাইতে লাগিল। যখন তখন ঘাটে যাইতে আরম্ভ করিল এবং পাড়া পর্য্যটন করিয়া আসিয়া কাশী মজুমদারদের মেজ ছেলেটির প্রচুর ব্যাখ্যা করিতে লাগিল।

ছিদামের দিন এবং রাত্রিগুলির মধ্যে কে যেন বিষ মিশাইয়া দিল। কাজে কর্ম্মে কোথাও একদণ্ড গিয়া সুস্থির হইতে পারে না। একদিন তাজকে আসিয়া তাহার ভৎর্সনা করিল। সে হাত নাড়িয়া ঝঙ্কার দিয়া অনুপস্থিত মৃত পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—ও মেয়ে ঝড়ের আগে ছোটে উহাকে আমি সামলাইব! আমি জানি ও কোন্ দিন কি সর্ব্বনাশ করিয়া বসিবে!

চন্দরা পাশের ঘর হইতে আসিয়া আস্তে আস্তে কহিল "কেন দিদি তোমার এত ভয় কিসের!" এই তাহাদের মধ্যে বিষম দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল।

ছিদাম চোখ পাকাইয়া বলিল, এবার যদি কখনো শুনি তুই একলা ঘাটে গিয়াছিস্ তোর হাড় গুঁড়াইয়া দিব।

চন্দরা বলিল—তাহা হইলে ত হাড় যুড়ায়!—বলিয়া তৎক্ষণাৎ বাহিরে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল।

ছিদাম একলম্ফে তাহার চুল ধরিয়া টানিয়া ঘরে পুরিয়া বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

কর্ম্মস্থান হইতে সন্ধ্যাবেলায় ফিরিয়া আসিয়া দেখে ঘর খোলা, ঘরে কেহ নাই। চন্দরা তিনটে গ্রাম ছাড়াইয়া একেবারে তাহার মামার বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

ছিদাম সেখান হইতে বহুকষ্টে অনেক সাধ্যসাধনায় তাহাকে

ঘরে ফিরাইয়া আনিল, কিন্তু এবার পরাস্ত মানিল। দেখিল, এক অঞ্জলি পারদকে মুষ্টির মধ্যে শক্ত করিয়া ধরা যেমন দুঃসাধ্য এই মুষ্টিমেয় স্ত্রীটুকুকেও কঠিন করিয়া ধরিয়া রাখা তেমনি অসম্ভব—ও যেন দশ আঙুলের ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া পড়ে!

আর কোন জবরদস্তি করিল না, কিন্তু বড় অশান্তিতে বাস করিতে লাগিল। তাহার এই চঞ্চলা যুবতী স্ত্রীর প্রতি সদাশঙ্কিত ভালবাসা উগ্র একটা বেদনার মত বিষম টন্‌টনে হইয়া উঠিল। এমন কি, এক একবার মনে হইত এ যদি মরিয়া যায় তবে আমি নিশ্চিন্ত হইয়া একটুখানি শান্তিলাভ করিতে পারি!—মানুষের উপরে মানুষের যতটা ঈর্ষ্যা হয় যমের উপরে এতটা নহে!

এমন সময়ে ঘরে সেই বিপদ ঘটিল।

চন্দরাকে যখন তাহার স্বামী খুন স্বীকার করিয়া লইতে কহিল, সে স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া রহিল। তাহার কালো দুটি চক্ষু কালো অগ্নির ন্যায় নীরবে তাহার স্বামীকে দগ্ধ করিতে লাগিল। তাহার সমস্ত শরীর মন যেন ক্রমেই সঙ্কুচিত হইয়া এই স্বামী-রাক্ষসের হাত হইতে বাহির হইয়া আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা একান্ত বিমুখ হইয়া দাঁড়াইল।

ছিদাম আশ্বাস দিল তোমার কিছু ভয় নাই।—বলিয়া পুলিসের কাছে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে কি বলিতে হইবে বারবার শিখাইয়া দিল। চন্দরা সে সমস্ত দীর্ঘ কাহিনী কিছুই শুনিল না, কাঠের মূর্ত্তি হইয়া বসিয়া রহিল।

সমস্ত কাজেই ছিদামের উপর দুখিরামের একমাত্র নির্ভর। ছিদাম যখন চন্দরার উপর সমস্ত দোষারোপ করিতে বলিল, দুখি কহিল, তাহা হইলে বৌমার কি হইবে। ছিদাম কহিল, উহাকে আমি বাঁচাইয়া দিব। বৃহৎকায় দুখিরাম নিশ্চিন্ত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ছিদাম তাহার স্ত্রীকে শিখাইয়া দিয়াছিল যে, তুই বলিস্ বড় মা আমাকে বঁটি লইয়া মারিতে আসিয়াছিল, আমি তাহাকে দা লইয়া ঠেকাইতে গিয়া হঠাৎ কেমন করিয়া লাগিয়া গিয়াছে। এ সমস্তই রামলোচনের রচিত। ইহার অনুকূলে যে যে অলঙ্কার এবং প্রমাণ প্রয়োগের আবশ্যক তাহাও সে বিস্তারিত ভাবে ছিদামকে শিখাইয়াছিল।

পুলিস আসিয়া তদন্ত করিতে লাগিল। চন্দরাই যে তাহার বড় মাকে খুন করিয়াছে গ্রামের সকল লোকেরই মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। সকল সাক্ষীর দ্বারাই সেইরূপ প্রমাণ হইল। পুলিস যখন চন্দরাকে প্রশ্ন করিল, চন্দরা কহিল, হাঁ, আমি খুন করিয়াছি।

কেন খুন করিয়াছ?

আমি তাহাকে দেখিতে পারিতাম না।

কোন বচসা হইয়াছিল?

না।

সে তোমাকে প্রথমে মারিতে আসিয়াছিল?

না।

তোমার প্রতি কোন অত্যাচার করিয়াছিল?

না।

এইরূপ উত্তর শুনিয়া সকলে অবাক্ হইয়া গেল।

ছিদাম ত একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল। কহিল, উনি ঠিক কথা বলিতেছেন না। বড় মা প্রথমে—

দারোগা খুব এক তাড়া দিয়া তাহাকে থামাইয়া দিল। অব-

শেষে তাহাকে বিধিমতে জেরা করিয়া বারবার সেই একই উত্তর পাইল—বড় বৌয়ের দিক্ হইতে কোনরূপ আক্রমণ চন্দরা কিছুতেই স্বীকার করিল না।

এমন একগুঁয়ে মেয়েও ত দেখা যায় না। একেবারে প্রাণপণে ফাঁসিকাষ্ঠের দিকে ঝুঁকিয়াছে, কিছুতেই তাহাকে টানিয়া রাখা যায় না। এ কি নিদারুণ অভিমান মনে মনে স্বামীকে বলিতেছে, তুমি আমাকে বাঁচাইতে চাও? আমি বাঁচিব না! তুমি আমাকে আজ খুনি বলিয়া ফেলিয়া দিয়া আবার কাল ফিরাইয়া পাইতে চাও? আমি ফিরিব না! আমার পরে তোমার কানাকড়ির শ্রদ্ধা নাই অথচ লোভ আছে? আমি কোন মতেই আমাকে তোমার হাতে দিব না! আমি তোমাকে ছাড়িয়া আমার এই নবযৌবন লইয়া ফাঁসিকাঠকে বরণ করিলাম—আমার ইহজন্মের শেষবন্ধন তাহার সহিত।

বন্দিনী হইয়া চন্দরা, একটি নিরীহ ক্ষুদ্র চঞ্চল কৌতুকপ্রিয় গ্রামবধূ, চিরপরিচিত গ্রামের পথ দিয়া, রথের তলা দিয়া, হাটের মধ্য দিয়া, ঘাটের প্রান্ত দিয়া, মজুমদারদের বাড়ির সম্মুখ দিয়া, পোষ্টআফিস এবং ইস্কুল-ঘরের পার্শ্ব দিয়া সমস্ত পরিচিত লোকের চক্ষের উপর দিয়া কলঙ্কের ছাপ লইয়া চিরকালের মত গৃহ ছাড়িয়া গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গেল। একপাল ছেলে পিছন পিছন চলিল এবং গ্রামের মেয়েরা তাহার সইসাঙ্গাৎরা কেহ ঘোমটার ফাঁক দিয়া, কেহ দ্বারের প্রান্ত হইতে, কেহ বা গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া পুলিস-চালিত চন্দরাকে দেখিয়া ঘৃণায় লজ্জায় ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছেও চন্দরা দোষ স্বীকার করিল; এবং খুনের সময় বড় বৌ যে, তাহার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিয়াছিল তাহার কথায় তাহা প্রকাশ হইল না।

কিন্তু সেদিন ছিদাম সাক্ষ্যস্থলে আসিয়াই একেবারে কাঁদিয়া যোড়হস্তে কহিল, দোহাই হজুর আমার স্ত্রীর কোন দোষ নাই। হাকিম ধমক দিয়া তাহার উচ্ছ্বাস নিবারণ করিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, সে একে একে সত্য ঘটনা সমস্ত প্রকাশ করিল।

হাকিম তাহার কথা বিশ্বাস করিলেন না। কারণ, প্রধান বিশ্বস্ত ভদ্রসাক্ষী রামলোচন কহিল, খুনের অনতিবিলম্বেই আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলাম। সাক্ষী ছিদাম আমার নিকট সমস্ত স্বীকার করিয়া আমার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, বৌকে কি করিয়া উদ্ধার করিব আমাকে যুক্তি দিন। আমি ভাল মন্দ কিছুই বলিলাম না। সাক্ষী আমাকে বলিল, আমি যদি বলি আমার বড় ভাই ভাত চাহিয়া ভাত পায় নাই বলিয়া রাগের মাথায় স্ত্রীকে মারিয়াছে, তাহা হইলে কি সে রক্ষা পাইবে? আমি কহিলাম, খবরদার হারামজাদা, আদালতে এক বর্ণ মিথ্যা বলিস্ না—এতবড় মহাপাপ আর নাই—ইত্যাদি।

রামলোচন প্রথমে চন্দরাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশে অনেকগুলা গল্প বানাইয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু যখন দেখিল চন্দরা নিজে বাঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন ভাবিল, ওরে বাপ্‌রে, শেষকালে কি মিথ্যা-সাক্ষীর দায়ে পড়িব! যেটুকু জানি সেইটুকু বলা ভাল। এই মনে করিয়া রামলোচন যাহা জানে তাহাই বলিল। বরঞ্চ তাহার চেয়েও কিছু বেশি বলিতে ছাড়িল না।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট সেশনে চালান দিলেন।

ইতিমধ্যে চাষবাস হাটবাজার হাসিকান্না পৃথিবীর সমস্ত কাজ চলিতে লাগিল। এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের মত নবীন ধান্যক্ষেত্রে শ্রাবণের অবিরল বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইতে লাগিল।

পুলিস আসামী এবং সাক্ষী লইয়া আদালতে হাজির। সম্মুখবর্ত্তী মুন্সেফের কোর্টে বিস্তর লোক নিজ নিজ মকদ্দমার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। রন্ধনশালার পশ্চাদ্বর্ত্তী একটি ডোবার অংশ বিভাগ লইয়া কলিকাতা হইতে এক উকীল আসিয়াছে এবং তদুপলক্ষে বাদীর পক্ষে ঊনচল্লিশ জন সাক্ষী উপস্থিত আছে। কতশত লোক আপন আপন কড়াগণ্ডা হিসাবের চুলচেরা মীমাংসা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া আসিয়াছে, জগতে আপাততঃ তদপেক্ষা গুরুতর আর কিছুই উপস্থিত নাই এইরূপ তাহাদের ধারণা। ছিদাম বাতায়ন হইতে এই অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত প্রতিদিনের পৃথিবীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে, সমস্তই স্বপ্নের মত বোধ হইতেছে। কম্পাউণ্ডের বৃহৎ বটগাছ হইতে একটি কোকিল ডাকিতেছে—তাহাদের কোনরূপ আইন আদালত নাই।

চন্দরা জজের কাছে কহিল, ওগো সাহেব, এক কথা আর বারবার কতবার করিয়া বলিব!

জজসাহেব তাহাকে বুঝাইয়া কহিলেন, তুমি যে অপরাধ স্বীকার করিতেছ তাহার শাস্তি কি জান?

চন্দরা কহিল, না।

জজসাহেব কহিলেন—তাহার শাস্তি ফাঁসি।

চন্দরা কহিল—ওগো তোমার পায়ে পড়ি,তাই দাও না সাহেব! তোমাদের যাহা খুসি কর—আমার ত আর সহ্য হয় না!

যখন ছিদামকে আদালতে উপস্থিত করিল—চন্দরা মুখ ফিরাইল। জজ কহিলেন—সাক্ষীর দিকে চাহিয়া বল এ তোমার কে হয়।

চন্দরা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কহিল, ও আমার স্বামী হয়।

প্রশ্ন হইল—ও তোমাকে ভালবাসে না?

উত্তর—উঃ! ভারি ভালবাসে।

প্রশ্ন। তুমি উহাকে ভালবাস না?

উত্তর। খুব ভালবাসি!

ছিদামকে যখন প্রশ্ন হইল, ছিদাম কহিল, আমি খুন করিয়াছি।

প্রশ্ন। কেন?

ছিদাম। ভাত চাহিয়াছিলাম বড় বৌ ভাত দেয় নাই।

দুখিরাম সাক্ষ্য দিতে আসিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। মূর্চ্ছা-ভঙ্গের পর উত্তর করিল—সাহেব খুন আমি করিয়াছি।

কেন?

ভাত চাহিয়াছিলাম ভাত দেয় নাই।

বিস্তর জেরা করিয়া এবং অন্যান্য সাক্ষ্য শুনিয়া জজ সাহেব স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন—ঘরের স্ত্রীলোককে ফাঁসির অপমান হইতে বাঁচাইবার জন্য ইহারা দুই ভাই অপরাধ স্বীকার করিতেছে। কিন্তু চন্দরা পুলিস হইতে সেশন আদালত পর্য্যন্ত বরাবর এক কথা বলিয়া আসিতেছে, তাহার কথার তিলমাত্র নড়চড় হয় নাই। দুই জন উকীল স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে প্রাণদণ্ড হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু অবশেষে তাহার নিকট পরাস্ত মানিয়াছে।

ফাঁসি হইতে বাঁচিয়া ত ঐ স্বামীর কাছে ফিরিতে হইবে? আবার আমৃত্যুকাল উহাকেই ত দেহ মন জীবন যৌবন সমর্পণ করিতে হইবে! স্ত্রীলোকের আর ত কোন গতি নাই? জগতে আর কোথাও ত ঠাঁই নাই? আমার ফাঁসি ভাল!—যেদিন একরত্তি বয়সে একটি কালোকোলো ছোটখাটো মেয়ে তাহার গোলগাল মুখটি লইয়া খেলার পুতুল ফেলিয়া বাপের ঘর হইতে শ্বশুরঘরে আসিল, সেদিন রাত্রে শুভলগ্নের সময় আজিকার

দিনের কথা কে কল্পনা করিতে পারিত! তাহার বাপ মরিবার সময় এই বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল যে, যাহা হউক আমার মেয়েটির একটি সদ্‌গতি করিয়া গেলাম।

জেলখানায় ফাঁসির পূর্ব্বে দয়ালু সিভিল সার্জ্জন চন্দরাকে জিজ্ঞাসা করিল, কাহাকেও দেখিতে ইচ্ছা কর?

চন্দরা কহিল, একবার আমার মাকে দেখিতে চাই।

ডাক্তার কহিল—তোমার স্বামী তোমাকে দেখিতে চায়, তাহাকে কি ডাকিয়া আনিব?

চন্দরা কহিল—মরণ!—

ভারতবর্ষে।

৪

ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রের মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদ।

ফরাসী লেখক আন্দ্রে লেভ্রিয়েঁ ভারতের মায়াবাদ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাংশে আমাদের মতের সহিত ঐক্য না হউক, তাহার মূলে যে অনেকটা সত্য আছে এ কথা অস্বীকার করা যায় না। বৈদিক যুগ হইতে মায়াবাদের সূত্রপাত হইয়া কি করিয়া ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিয়াছে এবং তাহার বিষময় ফল আমাদের সমাজের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে তাহা তিনি বিশদরূপে দেখাইয়া দিয়াছেন। একজন বৈদেশিক কিছুকালের জন্য এদেশে ভ্রমণ করিতে আসিয়া আমাদের শাস্ত্রের মর্ম্ম যে যথার্থরূপে গ্রহণ করিতে পারিবেন ইহা প্রত্যাশা

করা যায় না। তবু কতকটা যে তিনি পারিয়াছেন, ইহাই আশ্চর্য্য। তিনি দুই একটা কঠোর কথা বলিয়াছেন; তাহা আমাদের শোনা ভাল। তাহাতে উপকার ভিন্ন অপকার নাই। অনেক সময় আমাদের নিজের দোষ গুণ নিজে বুঝিতে পারি না; তাহা বাহিরের লোকের চোখে পড়ে। যাহা হউক, তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে একটু নূতনত্ব আছে। তিনি বলেন, "এই অদ্বৈতবাদ যাহা ভারতবর্ষে দুই হাজার বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে, ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের মত নহে। সমস্ত হিন্দুজাতি সাধারণতঃ জগৎকে যে ভাবে দর্শন করে, তাহাই দার্শনিক ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে মাত্র। ইহা ভাল করিয়া যদি বুঝিতে চাও আর কোন জাতির আভ্যন্তরিক ভাব আলোচনা করিয়া দেখ; ব্রাহ্মণদিগের পুরাতন দার্শনিক কবিতা সকল পাশাপাশি রাখিয়া, বাইব্‌ল্ গ্রন্থখানি একবার পাঠ করিয়া দেখ। তাহাতে কি দেখিতে পাও? আর কিছুই নহে, কতকগুলি গীতিকবিতা মাত্র; রোষ, দ্বেষ, নিরাশা, উৎসাহ, উচ্ছ্বাস, মনের প্রচণ্ড ভাবসমূহ, আত্মার সমস্ত কম্পন ও আন্দোলন রূঢ় উপমার দ্বারা ও জ্বলন্ত কল্পনা সহকারে ব্যক্ত হইয়াছে মাত্র; তাহার লিখনধারাও বিচ্ছিন্ন ও আকস্মিক এবং ভাষাও অতি সরল ও অস্ফুট; সে ভাষায় দার্শনিক চিন্তার তরঙ্গলহরী অনুসরণ করা সুকঠিন—তাহাতে কেবল অস্ফুট কণ্ঠে মানব-আত্মার আবেগ প্রকাশ করা যায় মাত্র। মনের আবেগ স্থায়ী ও প্রচণ্ড হইলে তাহার ফল কি হয়?—না, মানুষ আপনার উপর ফিরিয়া আইসে। যখন সে যন্ত্রণা ভোগ করে, যখন সে কাহারো প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করে, তখন সে আপনাকে অতিক্রম করিতে পারে না। যে বহির্জগতের সহিত তাহার সংঘর্ষণ উপস্থিত হয়, সে

বহির্জগৎকে সে পৃথক্ ভাবে দর্শন করে। যে আত্মা আবেগ-পূর্ণ তাহাতে আমিত্ব দৃঢ়রূপে সংলগ্ন থাকে ও পৃথক্‌ভাবে অবস্থান করে; এই অবস্থাতে সে যখন জগতের মূল তলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করে, তখন সে সেই মূলকে স্বতন্ত্র ও সর্ব্বশক্তিমান আত্মা বলিয়া কল্পনা করে।

"কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের মনের গতি ভিন্নরূপ হওয়ায় তাহাতে ভিন্নরূপ ফল উৎপন্ন হইয়াছে। বেদে কি দেখিতে পাওয়া যায়? তাহাতে কেবল প্রকৃতিবর্ণনামূলক কবিতা,—অরুণ, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি, আকাশ, বায়ু, পৃথিবী ইহাদেরই স্তুতিগান। উহা বহির্মুখী, অন্তর্মুখী নহে। উহাতে ব্যক্তিগত হৃদয়ের ভাব কিছুই নাই। উহাতে আত্মা স্বতন্ত্র বলিয়া উপলব্ধি হয় না, কেবল প্রকৃতির প্রতিবিম্ব—পরিবর্ত্তনশীল ঘটনাবলীর পরিবর্ত্তনশীল ছায়ামাত্র বলিয়া মনে হয়। প্রকৃতিতে যেমন যেমন পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইতেছে, আত্মাও উপস্থিতমত তাহারই ক্ষণস্থায়ী আকার ধারণ করিতেছে। কখনও মেঘরূপে নীল আকাশে ভাসমান, কখনও সূর্য্যরূপে দিগন্তে সমুদিত। এই আত্মাতে কোন আবেগ স্থায়ী-রূপে থাকিতে চায় না, অন্তরে ঘনীভূত হইতে পারে না, পরিপুষ্ট হইতে পারে না; তাহার উপর দিয়া দ্রুতভাবে চলিয়া যায় মাত্র। আত্মা আপনাকে বাহিরে প্রক্ষিপ্ত করে; আপনার চঞ্চল ক্ষণস্থায়ী ভাবসমূহ বহির্জগতে আরোপ করে। যদি আনন্দ হইল, তবে সে আনন্দ অগ্নির—যিনি দ্রাক্ষালতার মধ্যে দীপ্তি পাইতেছেন; যদি লজ্জা ভয়ের উদ্রেক হইল, তবে সে লজ্জা ভয় উষার; লজ্জারক্তিম-কপোল বালিকার ন্যায় উষা যেন মেঘের অন্তরালে লুকাইতেছে। অর্থাৎ, একটি অখণ্ড পদার্থের মধ্যে কেন্দ্রীভূত না হইয়া, যে 'আমি' ইচ্ছা করিতেছে, কাজ করিতেছে, সুখ-

দুঃখ ভোগ করিতেছে সেই আমির মধ্যে বদ্ধ না থাকিয়া বৈদিক কবি আপনাকে বিশ্বময় ছড়াইয়াছেন। তিনি সমস্ত পদার্থে পরিব্যাপ্ত; প্রকৃতির আকার, প্রকৃতির শব্দ, প্রকৃতির বর্ণ এই সমস্তের স্থানে তাঁহার আত্মা অধিকার করিতেছে এবং প্রকৃতিও তাঁহার চিন্তায় তাঁহার কল্পনায় সজীব হইয়া উঠিতেছে।

"বৈদিক কবি প্রকৃতির জীবন্ত ও দেবোপম শক্তিগুলির পূজা করেন বটে, কিন্তু তাঁহার এই অদ্বৈতধর্ম্ম একটু বিশেষ ধরণের। ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, সূর্য্য এই সকল দেবাত্মা বটে, কিন্তু ইহাদের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য তেমন সুস্পষ্ট নহে—ইহাদের পরস্পরের মধ্যে আকার-বিনিময় ও পরিবর্ত্তন চলিতেছে। এই উষাই সূর্য্য, এই সূর্য্যই অগ্নি, এই অগ্নিই বিদ্যুৎ, এই বিদ্যুৎই ঝটিকা এবং এই ঝটিকাই বৃষ্টি; সকলই পরস্পরের মধ্যে যুক্ত, মিশ্রিত এবং ওতপ্রোত। ইহার মধ্যে কিছুই স্থায়ী নহে। মনুষ্যের মধ্যেও স্থায়ী ব্যক্তিত্বের ভাব নাই—বাহ্যজগতেও কেবলি পরিবর্ত্তন। এই ভাবটি বেদেতে যাহা বীজরূপে অবস্থিত, তাহা ব্রাহ্মণদিগের পুরাতন দার্শনিক কাব্যসমূহে বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়া ক্রমশঃ বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিলে দেখা যায়, যে আমিত্বের ভাব য়ুরোপীয়দিগের চিন্তা ও ধারণার মধ্যে বদ্ধমূল, সেই আমিত্ব উহাতে নাই। মনের এই অবস্থা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, আমাদের জীবনের কোন বিশেষ মুহূর্ত্তকে স্মরণ করিয়া দেখিতে হয়। কখন কখন আমাদের জীবনে এক-প্রকার স্বপ্নবৎ অবস্থা হয়, তখন যেন আমাদের আমিত্বটা শিথিল হইয়া আসে, তখন আপনার নাম উচ্চারণ করিলেও যেন কোন ব্যক্তির ভাব মনে আইসে না, যেন অর্থহীন শব্দমাত্র বলিয়া উপলব্ধি হয়; তখন কষ্টের সহিত আমরা প্রশ্ন করি, 'আমি কি

আছি?' এই 'আমি'র অর্থ কি? এই অদ্ভুত অনুভব যাহা আমাদের মধ্যে ক্ষণিক তাহা হিন্দুদিগের অন্তরে স্থায়ীভাবে অবস্থিত। তাহারা আত্মাকে এইভাবে দেখে, যেন উহা একটি ক্ষেত্র যাহার উপর দিয়া বিবিধ স্বপ্ন ক্রমাগত গতিবিধি করিতেছে; অন্তর মধ্যে এমন কিছুই দেখিতে পায় না যাহা স্থায়ী। 'চলৎ চিত্তং চলৎ বিত্তং চলৎ জীবন-যৌবনং।' এই বিশ্বের অনিত্য-বাদ হিন্দুদিগের মধ্যে শাস্ত্রাকারে পরিণত হইয়াছে। 'আমাদের দেহ অন্ন হইতে অর্থাৎ পৃথিবী হইতে উৎপন্ন; বহির্জগৎ হইতে পঞ্চভূত আহরণ করিয়া আনিতেছে, আবার উহা ত্যাগ করিতেছে, আবার নূতন উপকরণ গ্রহণ করিতেছে; এই-প্রকারে দেহ বর্দ্ধিত হইয়া জীবিত রহিয়াছে; আমাদের জীবন কতকগুলি পরিবর্ত্তন ভিন্ন আর কিছুই নহে। ক্ষিতি, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, পশুপক্ষী, বৃক্ষ, উদ্ভিজ্জ, চিন্তা, মন, চতুর্ব্বেদ সকলই এই বিশ্বব্যাপী চঞ্চল ক্ষণস্থায়ী আবর্ত্তের অন্তর্ভূত। সূর্য্য, সমুদ্র, জীবজন্তু, উদ্ভিজ্জ হইতে যে বাষ্পরাশি নিঃশ্বসিত হইতেছে এবং যাহা সূর্য্য, জীবজন্তু, উদ্ভিজ্জ-দেহের অংশীভূত হইয়া ছিল, সেই বাষ্পরাশি উত্থিত হইয়া সম্মিলিত হইতেছে, দীপ্তি পাইতেছে, আকাশময় ধাবিত হইতেছে, শীতল হইয়া পুনর্ব্বার ধরাতলে পতিত হইতেছে, আবার অবস্থাবিশেষে, সূর্য্য, সমুদ্র, জীবজন্তু, বৃক্ষলতার আকার ধারণ করিতেছে। এইপ্রকারে যাহা আমরা স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া বিশ্বাস করি, তাহা অনবরত পরস্পরের মধ্যে মিশ্রিত হইতেছে, এবং পরস্পর হইতে বিযুক্ত হইতেছে। যজ্ঞের হোতা যিনি, তিনি বায়ু হইয়া ধূম হইয়া যাইতেছেন; ধূম হইয়া গিয়া বাষ্প হইয়া যাইতেছেন; বাষ্প হইয়া গিয়া মেঘ হইয়া যাইতেছেন, এবং মেঘ হইয়া অব-

শেষে বৃষ্টিরূপে পতিত হইতেছেন; পরে আবার প্রাণরূপে শস্যাকারে, উদ্ভিজ্জাকারে, বৃক্ষাকারে, সর্পাকারে পরিণত হইতেছেন।'

"উপরে যেরূপ বর্ণিত হইল, তাহার সহিত অদ্বৈতবাদের অতি অল্পই প্রভেদ; এবং দুইটি পথ দিয়া এই অদ্বৈতবাদে উপনীত হওয়া যায়। যেহেতু, সর্ব্বপ্রকার আকৃতি একবার যাইতেছে আবার আসিতেছে, উহারা মায়াময়; উহাদের গুণ, উৎপত্তির পদ্ধতি, উহাদিগের হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া লও, তাহা হইলে অবশিষ্ট কি থাকে? কিছুই থাকে না, বৌদ্ধেরা বলে নাস্তি অবশিষ্ট থাকে; জগতের কোন অস্তিত্ব নাই—নাস্তিত্ব ভিন্ন আর কিছুই নাই। ব্রাহ্মণেরা বলেন, 'যাহা আছে তাহাই আছে—তৎসৎ—তাহা ভিন্ন আর কিছুই নাই। সেই তৎসৎ সর্ব্বগুণ-বিরহিত; যাহা "নেতি নেতি"—যাহা কারণও নহে, কার্য্যও নহে; এক কথায় তিনি ব্রহ্ম; এই ব্রহ্ম ক্লীবলিঙ্গ শব্দবাচক, অনির্দ্দেশ্য ও পরিণাম-শূন্য। ইনি চিন্তা করেন না, ইচ্ছা করেন না, দর্শন করেন না, জানেন না', ইনি শুদ্ধ ও নির্গুণস্বরূপ। বিশুদ্ধ চিন্তার দ্বারা এই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই ক্লীবলিঙ্গ ব্রহ্মের উপরিভাগে পুংলিঙ্গ ব্রহ্ম অবস্থিত। এই ব্রহ্ম জীবন্ত, স্পৃশ্য ও সবর্ণ। ইহার অর্থ এই, এই চঞ্চল ক্ষণস্থায়ী আবর্ত্তের অন্তস্তলে যেরূপ একমাত্র স্থায়ী পদার্থ প্রচ্ছন্ন আছে সেইরূপ এই আবর্ত্ত সংগঠন ও সংরক্ষণের জন্যও একটি শক্তি থাকা চাই। যে হেতু জগতে কেবলি গতি, সুতরাং এমন একটি শক্তি চাই যে এই গতিকে নিয়মিত করিতে পারে। যে হেতু, এই জগৎ প্রস্তরের ন্যায় অচল নহে, পরন্তু বৃক্ষের ন্যায় প্রাণ-বিশিষ্ট, সুতরাং ইহা সংরক্ষণ ও পরিপোষণের জন্য একটি আত্মার আবশ্যক। এই

আত্মাই ব্রহ্ম, ইনি বিশ্বের বীজস্বরূপ, ইনি 'জীবন্ত অশরীরী আত্মা'। ইনি জীবন্ত, সুতরাং সগুণ, ইনি নির্গুণ ব্রহ্মের আদিম আবির্ভাব, প্রথম বিকাশমাত্র—নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রহ্ম এক নহে। ব্রহ্মা, ব্রহ্ম বটে, কিন্তু মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন, কালের অধীন। 'ব্রহ্মের দুই রূপ; এক, যিনি কালকে জানেন, আর এক, যিনি কালকে জানেন না। যিনি কালকে জানেন তাঁহার অংশ আছে। এক মহান্ জীবন্ত আত্মার অভ্যন্তরে কাল সকল জীবকে বর্দ্ধিত করিতেছে ও বিনষ্ট করিতেছে, কিন্তু যিনি জানেন স্বয়ং কাল কাহার মধ্যে বিলীন হইয়া যায়, তিনিই বেদজ্ঞ।'

"কল্পনা করা যাউক, এক পূর্ণ সত্তা, বিশুদ্ধ ও নির্গুণ সকলের আদিতে ও সকলের মূলে বর্ত্তমান; 'তিনি সকল আকার ও সকল বীজের আধার।' বাহিরে আপনাকে প্রকাশ করিয়া, তিনি মায়ার অধীন হইয়াছেন; 'নিজ দেহের উপকরণ হইতে ঊর্ণবায় যেরূপ তন্তু আহরণ করিয়া আপনাকে আচ্ছাদন করে, সেইরূপ তিনি নিজস্বরূপনিঃসৃত গুণের দ্বারা আপনি আচ্ছন্ন হইয়া আছেন'; তাঁহার প্রথম নিসর্গ সগুণ জীবন্ত ব্রহ্ম, সেই সূক্ষ্ম সার্ব্বভৌমিক আত্মা 'যিনি জগতের মধ্যে থাকিয়া, জগতের বিচিত্রতা সম্পাদন করিতেছেন, সেই আত্মা পুরুষও নহে, স্ত্রীও নহে এবং ক্লীবও নহে।' সেই আত্মা যিনি কোটি কোটি আকার ধারণ করিতেছেন, যাঁহা হইতে সকল পদার্থ নিঃসৃত হইয়া আবার তাঁহাতেই গমন করে, যিনি নিজে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় অস্থায়ী, যিনি কোটি কোটি যুগের পর—যাহা তাঁহার এক দিন—'অচ্ছায়, অদেহ, অবর্ণ' নির্গুণ পরব্রহ্মে পুনর্ব্বার লয় প্রাপ্ত হন। এই জগৎ এক প্রকাণ্ড বৃক্ষের ন্যায় শাখাপল্লব বিস্তার করিয়া আছে; ইহার মূলে যে বীজ ছিল, তাহাই সমস্ত বৃক্ষে

সঞ্চালিত হইয়া, তমসাবৃত মূল হইতে সুকোমল পুষ্প পর্য্যন্ত সর্ব্বাংশে প্রাণ সঞ্চার করিতেছে। বৃক্ষের ত্বক্, পুষ্প, পল্লব, কোষাণু, সমস্ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, মরিয়া যাইতেছে, আবার নূতন হইয়া জন্মিতেছে। যে মূল শক্তি বৃক্ষকে উৎপাদন করিয়াছিল, যাহা বৃক্ষবিশেষের জন্মমৃত্যুর মধ্যে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান, সেই শক্তিই ক্ষণস্থায়ী ভৌতিক উপকরণ সকলকে বিশেষ বিশেষ আকার ও শৃঙ্খলা প্রদান করিতেছে। জগতের প্রাণ, জীবন্ত ব্রহ্মরূপ যে এই শক্তি, ইহা কোথা হইতে নিঃসৃত হইতেছে? ভূমি হইতে। ভূমিই আদিম ব্রহ্মের প্রতিরূপ। তাহা হইতে সমস্ত উৎপন্ন হইতেছে, তাহাতেই সমস্ত প্রতিগমন করিতেছে; যুগযুগান্তের পর যখন এই শক্তি, যাহা বৃক্ষকে পোষণ করিতেছিল, ক্ষয় হইবে, তখন পরিবর্ত্তনের শেষ হইবে, বৃদ্ধির অবসান হইবে, বৃক্ষ পৃথিবীতে প্রতিগমন করিবে এবং সমস্তই নিশ্চেষ্টতার মধ্যে মগ্ন হইবে। 'আপাততঃ, তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি শিশু, তুমি যুবতী, তুমি যষ্টিধারী বৃদ্ধ, তুমি নীল ভ্রমর, তুমি হরিৎপক্ষ ও লোহিত-নেত্র শুকপক্ষী, তুমি লোকমধ্যে বজ্র, তুমি ষড়ঋতু, তুমি সমুদ্র। তুমি অনাদি, কেন না, তুমি অনন্ত, তোমা হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু যেমন এই প্রবহমান নদীসকল সমুদ্রে গিয়া বিলীন হইয়া যায়, তাহাদের নাম ও আকার বিলুপ্ত হইয়া যায়, সেইরূপ, সূর্য্য, চন্দ্র, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, মক্ষিকা, ভ্রমর, পক্ষী, দেবগণ, বিষ্ণু, শিব এবং স্বয়ং কাল যাহাতে দ্বিতীয় ব্রহ্ম বাস করেন, এই সমস্ত সেই অচিন্ত্য পুরুষে বিলীন হইয়া যাইবে, তাহাদের নাম ও আকার কিছুই থাকিবে না'; এখনও দৃশ্যমান জগতে যাহা দেখা যায় তাহা কিছুই বাস্তব নহে, তাহা আবির্ভাবমাত্র। ব্রহ্ম কাল-দর্পণে, মায়া-দর্পণে আপনাকে বহুধা ও বিচিত্র ভাবে

দেখিতেছেন কিন্তু বস্তুতঃ, যাহা আছে তাহাই আছে, তৎসৎ ভিন্ন আর কিছুই নাই।

এই অদ্বৈতবাদ, কল্পনার খেলা মাত্র নহে, সম্প্রদায় বিশেষের মত মাত্র নহে, পরন্তু ইহা একটি গভীর বিশ্বাস যাহা ব্যবহারে পরিণত হইয়াছে, যাহা বিজন চিন্তা ও একাগ্র ধ্যানের সুপরিণত ফল। একমাত্র আপনাতে বদ্ধ হইয়া স্বপ্নমধ্যে মগ্ন থাকিয়া, ব্রাহ্মণ বাস্তব ও স্বপ্নের মধ্যে আর প্রভেদ দেখিতে পান না, জগৎকে বাষ্পবৎ মনে করেন। জগতের সহিত তাঁহার যে বন্ধন ছিল, সে বন্ধন আর অনুভব করেন না। যাহাকে তিনি অবাস্তব বলিয়া জানিতেছেন তাহাকে কি করিয়া ভালবাসিবেন? যাহা আমাদের হাতের মধ্য দিয়া গলিয়া যাইতেছে, তাহাকে কেমন করিয়া ধরিয়া রাখিবেন?

"'হে মুনিপুঙ্গব! এই জঘন্য ক্ষণভঙ্গুর, রক্ত-মাংস-অস্থি-মূত্র-পুরীষময় দেহ ধারণ করিয়া কিরূপে সুখের আশা করিব? যে দেহ, লোভ দ্বেষ, মোহ মাৎসর্য্য, অসূয়া, বিচ্ছেদ, ভয়, দুঃখ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, জরামৃত্যু, রোগশোক দ্বারা আক্রান্ত সে দেহ লইয়া কি-রূপে সুখের আশা করিব? আমরা দেখিতেছি সকলই নশ্বর। যাহারা আর নাই তাহাদের দিকে ফিরিয়া দেখ, যাহারা এখনও হয় নাই তাহাদের দিকে একবার চাহিয়া দেখ। শস্যের ন্যায় মনুষ্য পরিপক্ক হইতেছে, শস্যের ন্যায় ভূলুণ্ঠিত হইতেছে, আবার মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উত্থান করিতেছে'..... হৃদয় হইতে বাসনা নির্ম্মূল করিয়া বনে গমন করিয়া বৃহদ্রথ এইরূপ বিশ্বাস করিয়াছিলেন। ঊর্দ্ধবাহু হইয়া, সূর্য্যের দিকে নেত্র স্থির রাখিয়া তিনি সহস্র বৎসর বিজন অরণ্যে শান্ত সমাহিত হইয়া বাস করিয়াছিলেন। কারণ, শান্তচিত্ততা, নিশ্চেষ্টতাই সকল হিন্দুশাস্ত্রের

ব্যবহারিক সিদ্ধান্ত। সকলই মায়াময় এই সিদ্ধান্তে যদি একবার উপনীত হওয়া যায়, তবে সেই মায়াজাল হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার চেষ্টাও স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। যদি এই মায়াময় জগতের ক্ষণস্থায়ী বাসনা, অনুভব, ইচ্ছা প্রভৃতিকে নির্ম্মূল করা যায় তবেই মুক্তিলাভ হইতে পারে, নচেৎ মুক্তিলাভের আশা নাই। এইরূপ কল্পনা-জড়িত চিন্তাপ্রভাবে হিন্দুর অন্তর একেবারে শূন্য হইয়া পড়িল; কাজ করিবার আর কোন উদ্দেশ্য রহিল না—যখন নিজেরই অস্তিত্ব নাই, তখন কাজ করিয়া কি ফল? সুতরাং আসন-বদ্ধ হইয়া হিন্দু ধ্যানে মগ্ন হইল। স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। কাহার স্বপ্ন? কাহার ধ্যান? ব্রহ্মের ধ্যান। ব্রহ্মের ধ্যানই মুক্তি। আমিই ব্রহ্ম—ব্রহ্ম মায়ায় বদ্ধ হইয়াই আপনাকে বহুধা করিয়া দেখেন—এই মায়া-দর্পণ হইতে বিমুখ হইলেই, ব্রহ্ম স্বস্বরূপে ফিরিয়া আইসেন, তখন ব্রহ্মের সহিত আমিও যুক্ত হই। অতএব 'সোঽহং ব্রহ্ম' এই মন্ত্র উচ্চারণ কর। 'কারণ, যিনি আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানেন, তিনি ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যান'। এস আমরা, এই কুজ্ঝটিকা-সমাচ্ছন্ন আবির্ভাবসমূহের মধ্য হইতে, সেই 'তৎসৎ'কে ধরিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আমাদের সীমাবদ্ধ জীবনের সকল প্রতিবন্ধক দূর হইবে, আমরা পুনর্ব্বার অনাদি অনন্তস্বরূপে পরিণত হইব—যেখান হইতে আমরা আসিয়াছিলাম, সেইখানে আবার ফিরিয়া যাইব। এ বড় অদ্ভুত ব্যাপার, তুমি কি এ কথা শুনা যায় না যে, কর্ম্মে মুক্তি নাই, বিশ্বাসে মুক্তি নাই, ভাবে মুক্তি নাই, ক্রিয়াকলাপে মুক্তি নাই, পরন্তু জ্ঞানেই মুক্তি। 'যাহাদিগের চরিত্র বিশুদ্ধ, যাহারা বেদ পাঠ করে, যজ্ঞানুষ্ঠান করে, মৃত্যুর পরে তাহারা দেব-লোকে গমন করে, কিন্তু তাহাদিগের সহিত

পুণ্যের শেষ হইয়া আসিলে, তাহারা আবার ইহলোকে ফিরিয়া আইসে, কারণ, তাহারা সত্যকে জানে না। তাহারা নূতন আকারে জন্মগ্রহণ করে, তাহারা আবার কামনা করে, ইচ্ছা করে, কর্ম্ম করে, অনুভব করে, পুনর্ব্বার জীবনধারণ করে।... যে ব্যক্তি ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে প্রভেদ দেখে, সে পরিবর্ত্তন হইতে পরিবর্ত্তনে, মৃত্যু হইতে মৃত্যুতে উপনীত হয়।' অর্থাৎ তাহাদিগের পুনঃপুনঃ জন্ম হয়। চিরশান্তি লাভ করিতে চাও ত নিশ্বাসকে রুদ্ধ কর, চিত্তকে একাগ্র কর, ইন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহ কর—বাক্যকে স্তম্ভিত কর। তালুদেশে জিহ্বাগ্র চাপিয়া রাখ, ধীরে ধীরে শ্বাস ত্যাগ কর, আকাশে কোন বিন্দুর উপর লক্ষ্য স্থির কর; তাহা হইলে চিন্তা রহিত হইবে, চেতনা বিলুপ্ত হইবে, আনিম্ন ঘুচিয়া যাইবে। 'সুখদুঃখ আর অনুভব হইবে না, পরে প্রশান্তি ও কৈবল্যে উপনীত হইবে।' আত্মা যখন পরমাত্মাকে চিনিতে পারিবে তখন আর তাহার আকাশ থাকিবে না, কাল থাকিবে না, সংখ্যা থাকিবে না, সীমা থাকিবে না, গুণ থাকিবে না। 'লূতাতন্তু যেরূপ আপনার তন্তু অবলম্বন করিয়া মুক্ত আকাশে উত্থিত হয়, সেইরূপ যে ওঁকার অবলম্বন করিয়া ধ্যান করে সে মুক্তি লাভ করে।' 'যিনি মনহীন, অথচ মনের অভ্যন্তরে অবস্থিত, যিনি প্রচ্ছন্ন অথচ সকলের মূলে বিরাজমান, তাঁহাতে চিত্ত নিমগ্ন কর, আত্মার সকল গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যাইবে।' মন ও ইচ্ছা ধ্বংস হইলেই মায়ার সমস্ত ইন্দ্রজাল তিরোহিত হয়। 'তখন আমরা ধূম-হীন অগ্নির ন্যায় প্রতীয়মান হইব, আরোহী রথকে পরিত্যাগ করিয়া যেরূপ রথের চক্রঘূর্ণন নিরীক্ষণ করে আমরা তখন সেইরূপ হইব'—'দুঃখ আমাদের অন্তরে আর থাকিতে চাহিবে না; যে ব্রহ্মকে জানে, সে চিরশান্তি প্রাপ্ত হয়।' যখন

আমরা জানিলাম, আমরা সেই পূর্ণ জ্যোতিঃস্বরূপের স্ফুলিঙ্গ, তখন আর কে আমাদিগকে দুঃখ দিতে পারে? তখন আর একথা বলি না, 'এই শরীরই আমি কিম্বা আমি অমুক,' কিন্তু বলি, 'আমিই ব্রহ্ম, আমিই জগৎ।' তখন আর আমরা 'গুণ-তরঙ্গে' নীয়মান বা বিচলিত হই না। ... ...

"অতি সূক্ষ্ম আলোচনার প্রভাবে ব্রাহ্মণের মস্তিষ্ক দার্শনিক ঘূর্ণিরোগে আক্রান্ত; চিন্তার দ্বারা চিন্তার উচ্ছেদ—ইচ্ছার ধ্বংস সাধন, ইহা ত ব্রাহ্মণ্য দর্শনের প্রত্যক্ষ ফল। এই মায়াবাদের প্রবণতা সেই আদিম বৈদিক যুগে আরম্ভ হইয়া তাহার ফল এতদূর পর্য্যন্ত গড়াইয়াছে। এই পরিণাম অবশ্যম্ভাবী। অন্যত্রও ইহার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। একটি সমস্ত জাতি মায়াবাদে দীক্ষিত, ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোথাও এরূপ দেখা যায় না বটে, কিন্তু য়ুরোপে এমন ব্যক্তিবিশেষ মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা হিন্দু ভাবে অনুপ্রাণিত। ফ্রান্সে, আমাদের একজন বড় কবি, জাঁ লাহর, তিনি অজ্ঞাতসারে হিন্দু; তাঁহার 'মায়া' ও 'নাস্তি' বিষয়ক গ্রন্থে হিন্দুশাস্ত্রের ভাব জীবন্ত ভাবে লক্ষিত হয়। ইংলণ্ড, যেখানকার লোকেরা এমন সাহসী, এমন উদ্যমশীল, যেখানে আমিত্ব ভাব এমন স্থায়ী ও বলবৎ, যেখানকার ধর্ম্ম হিব্রুধরণের একেশ্বরবাদ, সেখানেও হিন্দু-প্রাণ 'শেলি' উদিত হইয়াছেন। সমালোচকেরা স্পষ্টই দেখাইয়াছেন, শেলির অনেকটা বৈদিক ধরণের কল্পনা ছিল। ..... তিনিও, বৈদিক কবির ন্যায়, আপনাকে বহির্জগতে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন; তাঁহার কবিতা, সচল প্রকৃতির সচল প্রতিবিম্ব; যাহাতে ব্যক্তিত্বের অধিষ্ঠান উপলব্ধি হয় এরূপ হৃদয়-ভাব শেলির কবিতাতে বিরল; 'আমি' বলিয়া যে একটী অনুভাব

যে চিন্তা করে, পূর্ণস্বরূপে যে মনোনিবেশ করে, আগন্তুক ক্ষুদ্র বিষয় সকল কেমন করিয়া তাহার ভাল লাগিবে? যদি জগৎ মায়াই হইল তবে এরূপ জগতে ভাল স্থান অনুসন্ধান করিবার আবশ্যকতা কি? যদি দৃশ্যমান বাস্তব জগতে আমার কোন আস্থা না থাকে, দৃশ্যমান বাস্তব জগৎও আমাকে আর স্থান দেয় না। ভারতবর্ষে ত ইহার ফল প্রত্যক্ষ দেখা যায়। দর্শন ও জ্যোতিষ-শাস্ত্র ব্যতীত হিন্দুদিগের আর কোন বিজ্ঞান নাই। প্রকৃতির নিয়ম ও তথ্য অনুসন্ধানে গ্রীকদিগের ন্যায় হিন্দুদিগের কোন কৌতূহল ছিল না; কতকগুলি উপনিষদ্ মনে হয়, বাতুলের লেখা, বালকের লেখা। তাহাতে কুকুরেরা ও পক্ষীরা তর্কবিতর্ক করিতেছে, দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিতেছে, ইতিহাস আদৌ নাই। এই বৃহদায়তন সাহিত্য কেবল স্বপ্ন ও দর্শনের জটিলতায় পূর্ণ। কোন একটি ঘটনার তারিখ, কোন গম্ভীর বিষয়ের উপাখ্যান বা কোন বংশাবলীর কথা ইহাতে কিছুই নাই। আসিয়ার বড় বড় ধর্ম্মমূলক ঘটনার বিষয় যাহা কিছু জানা যায় তাহা প্রায়ই চীন পরিব্রাজকদিগের নিকট হইতে। বৌদ্ধধর্ম্ম কখন ভারতে আরম্ভ হইল, কখনই বা ভারত হইতে অন্তর্হিত হইল কিছুই জানিতে পারা যায় না। সত্যই যদি সমাজ ও সমাজের সভ্যতা—(যেমন আমিয়েল বলেন, আত্মার মূর্ত্তিমান স্বপ্নমাত্র), ব্রহ্মসাগরে উৎক্ষিপ্ত ক্ষণস্থায়ী তরঙ্গমাত্র, তবে কে এমন বাতুল আছে যে, সভ্যতার ইতিহাস, সমাজের ইতিহাস লইয়া মস্তিষ্ক আলোড়ন করিবে?

"..... ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম যদি একবার প্রতিষ্ঠিত হইল, দার্শনিক স্বপ্নের প্রচার যদি আরম্ভ হইল, তাহা হইলে বহিঃশত্রুর আক্রমণ আর কিরূপে প্রতিরুদ্ধ হইবে? প্রাচীন ভারতের নাগরিক

ব্যবস্থা-বন্ধন; সামরিক ব্যবস্থা-বন্ধন, রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা-বন্ধন সকলই অসম্পূর্ণ, কিছুরই নির্দ্দিষ্ট আকার নাই, সমস্ত হিন্দুজাতি জেলির ন্যায় থল্‌থলে, অস্পষ্ট, অসম্বদ্ধ, দুর্ব্বল; কাজেই মুসলমান ইংরাজ যে কেহ প্রথম আসিয়া আক্রমণ করিল, সেই অনায়াসে জয়লাভ করিল। হিন্দুর তাহাতে কি আসে যায়? যাহা প্রকৃত সত্য, যাহার ধ্যানে ভববন্ত্রণা হইতে মুক্ত হওয়া যায় তাহারই স্বপ্নে মগ্ন হইতে দাও, তাহাকে ধ্যান করিতে দাও, তাহা হইলেই হইল—শান্তিদায়ী ওঁকারের আবৃত্তি করিতে করিতে সেই পরমাত্মার ধ্যানে মত্ত হইতে দাও, তাহা হইলে হিন্দু আর কিছুই চাহে না।"

উকীলের কাহিনী।

ছেলেবেলা স্কুলে যাইবার সময় দেখিতাম উকীল বাবু শামলা মাথায় চেন্ আঁটিয়া গাড়ি চড়িয়া আদালত চলিয়াছে। মনে মনে প্রার্থনা করিতাম, "ঠাকুর, আমিও যেন উকীল হই!"

সে প্রার্থনা যে দিন পূর্ণ হইল তাহার অব্যবহিত পরেই এক-বার শ্বশুরবাটী গিয়াছিলাম। সে অঞ্চলে এখনও উকীল বড় একটা জন্মগ্রহণ করে নাই। সুতরাং দৈত্যকুলের প্রহ্লাদের মত সেখানে,—বিশেষ মেয়ে-মহলে, আমি একটা অভূতপূর্ব্ব, জীব হইয়া পড়িলাম। মেয়ের দল ঝাঁকে ঝাঁকে জামাই দেখিতে আসিলেন, একজন মুরুব্বি পক্ষ শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "পাঁচটা পাশ-করা জজের উকীল জামাই পাওয়া কি কম ভাগ্যির কথা, সার্থক শিবপুজো তোমার

তাহা তাঁহার কবিতাতে অতি অল্পমাত্রায় লক্ষিত হয়। সকল সময়েই, তাঁহার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস, বহিঃপ্রকৃতির হৃদয়ের উচ্ছ্বাস। তাঁহার আত্মা প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র নহে, পরন্তু প্রকৃতিতে ছড়াইয়া আছে। সুতরাং প্রকৃতির সকল পদার্থই তাঁহার নিকট প্রাণবিশিষ্ট, জীবন্ত, বোধবান, গতিশীল, ও বিচিত্র রূপধারী। জগতের মূলে তিনি এমন এক আত্মা দেখিতে পান, আমরা যাহার চিন্তাস্বরূপ; যে আত্মা কীটের মধ্যে স্পন্দিত হইতেছে ও তারকার মধ্যে দীপ্তি পাইতেছে; এমন একটি আত্মা, প্রকৃতি যাহার রহস্যময় পরিচ্ছদ; যাহা সমস্ত দৃশ্যমান পদার্থের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে বর্ত্তমান, এবং যাহাকে কখন কখন, কোনও বিরল মুহূর্ত্তে, স্বচ্ছ আবরণ-মধ্যবর্ত্তী ম্লান দীপশিখার ন্যায় সুন্দর আকৃতির ভিতর দিয়া আমরা দেখিতে পাই। তাঁহার কবিতা 'শৃঙ্খলামুক্ত প্রমথ' পাঠ করিয়া দেখ, যেখানে সমস্ত আত্মা সমস্ত জীব একতানে সম্মিলিত হইয়াছে, বিশেষতঃ যেখানে পৃথিবীর সহিত চন্দ্রের কথাবার্ত্তা চলিতেছে; তাহা পাঠ করিয়া কে না সেই বিশ্ব-প্রাণের অনন্ত উচ্ছ্বাসে উন্মত্ত হইয়া উঠিবে, যে প্রাণ সকল পদার্থের মধ্য দিয়া প্রবাহিত; বিচিত্র শব্দ, বিচিত্র গন্ধ, বিচিত্র বর্ণ যাহা আমরা বাহিরে দেখি সমস্তই ব্রহ্মের মায়া, এই মায়া-মোহে কে না আচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে? কিন্তু শেলি ইহার অধিক যান নাই; শান্ত, নির্গুণ ব্রহ্মকে তিনি দেখিতে পান নাই। হিন্দু বুদ্ধি ও কল্পনার দুই ধাপের মধ্যে একটি ধাপে তিনি পৌঁছিয়াছেন। সেটি প্রথম ধাপ। তিনি বৈদিক কবির স্বপ্নোচ্ছ্বাস, আনন্দোচ্ছ্বাস পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছেন, কিন্তু হিন্দু দার্শনিকের লয়তত্ত্বে পৌঁছান নাই। তাঁহার অদ্বৈতবাদে বিশ্ব-প্রাণের উচ্ছ্বাস আছে, নির্ব্বাণ নাই। তাঁহার অদ্বৈতবাদ সুস্থ ও সবল।

"'আমিয়েল' আর একটি অপেক্ষাকৃত পূর্ণাবয়ব দৃষ্টান্ত। ইনি সগুণ জীবন্ত ব্রহ্মকে ভেদ করিয়া আরও একটু ভিতরে তলাইয়াছেন। ইনি ব্রহ্মের শান্তস্বরূপে প্রবেশ করিয়া নিস্পন্দ অসাড় হইয়া পড়িয়াছেন; মুক্ত হইয়াছেন। ... হিন্দুর নিশ্চেষ্টতা, হিন্দুর বৈরাগ্য, হিন্দুর মায়াবাদ, ইচ্ছা ভাব ও বুদ্ধির এই যে তিন ধাপ, ইনি এই তিন ধাপই মাড়াইয়া আসিয়াছেন। ইনি আপনাকে ব্রাহ্মণদিগের ভ্রাতা বলিয়া স্বীকার করেন। 'ভারতবর্ষীয় যোগীর ন্যায় আমার আত্মা মায়ার দোলায় আন্দোলিত; আমার নিকট সকলই, এমন কি, আমার নিজের জীবন পর্য্যন্ত, ধূম, বিভ্রম, বাষ্পবৎ। এই সকল বিষয়রাশি আলোকের ন্যায় আমার উপর দিয়া চলিয়া যায়, কোন পদচিহ্ন রাখিয়া যায় না—তাহার উপর আমার অল্পই আস্থা। চিন্তা অহিফেনের স্থান অধিকার করিয়াছে; চিন্তা সকলকে উন্মত্ত করিতে পারে, সকল পদার্থকে, এমন কি পর্ব্বতকেও অন্তর্ভেদী স্বচ্ছতা প্রদান করিতে পারে।' ..... 'প্রত্যেক সভ্যতা, যুগযুগান্তের স্বপ্নস্বরূপ; ইহাতে আকাশ, পৃথিবী, প্রকৃতি ইতিহাস একপ্রকার অদ্ভুত বিচিত্র আলোকে প্রকাশ পায় এবং বিভ্রম-অভিভূত আত্মার প্রলাপ-নাটকের অভিনয় হইয়া থাকে।'.....'উপছায়াকে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, ধরিতে পারা যায় না, আমি সেইরূপ উপছায়ার ন্যায় তরল পদার্থ।.....মরিয়াও আমি প্রেতের ন্যায়। অন্য সকলে আমার নিকট স্বপ্নের ন্যায়, আমিও অন্যের নিকট স্বপ্নবৎ।' এই সেই অদ্ভুত অনুভাব যাহা বংশপরম্পরায় চলিয়া আসিয়া, শুদ্ধ ব্রাহ্মণ্য-দর্শন কেন, ব্রাহ্মণ্য-সভ্যতার কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ উৎপাদন করিয়াছে। আমিয়েলের 'আত্ম-প্রকাশ' গ্রন্থে ব্যবহারিক জীবনের একটি কথাও নাই। বিশ্ব-আত্মাকে

মেয়ের!" সেই প্রবীণার যুবতী কন্যাও তাঁর সঙ্গে আসিয়াছিলেন, মার এই কথায়, কন্যারত্নের একটু ভাবান্তর দেখিলাম; তাঁর মুখ দেখিয়া মনে হইল, যেন তিনি ভাবিতেছেন,

"কেন না হইলে তুমি জজের উকীল
হে প্রাণবল্লভ!"

দ্রৌপদী শিবের বরে পঞ্চ পাণ্ডব স্বামী লাভ করিয়াছিলেন; বোধ হয় শিবপূজার জোরেই, আমার স্ত্রীর কপালে এমন "পঞ্চপাণ্ডবালা" স্বামী জুটিয়াছিল! জামাতার পদগর্ব্বে শাণ্ডড়ী ঠাকুরাণীকেও যখন এতাধিক গর্ব্বিতা করিয়া তুলিয়াছিল, তখন সেজন্য শাণ্ডড়ীনন্দিনী স্বয়ং যে কিঞ্চিৎ গর্ব্বরসাপ্লুতা হইবেন না ইহা সম্ভব নহে। বলিকা নিশ্চয়ই একটু দেমাকে পা ফেলিয়াছিল, তার মলের আওয়াজটাও যেন 'ঝুমঝুমি' না বলিয়া 'ঝম্‌ঝমে' বাজিয়াছিল; এইরূপে আমার যশ-দুন্দুভি প্রথমেই আমার গৃহিণীর চরণযুগল আশ্রয় করিয়া ঘোষিত হইল।

আশায় উৎসাহে আমি আবার কলিকাতায় ফিরিলাম। এখন আমার প্র্যাক্‌টিসের পালা। একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি, বি-এ পাশ করার পরই, আমি হাইকোর্টের উকীল * * * বাবুর আর্টিকেল ক্লার্ক হইয়াছিলাম। কাজেই "জজের উকীল" না হইয়াই আমি একবারে হাইকোর্টের উকীল হইলাম। নূতন শামলা আঁটিয়া, চেন ঝুলাইয়া আমি রীতিমত কোর্টে যাইতে লাগিলাম। মনে মনে জানি, এখন আর আমি বড় যে-সে নই! জষ্টিস্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ, এবং আমি এক শ্রেণীরই লোক! তবে তাঁহারা একটু অগ্রসর হইয়াছেন, এই যা! কিন্তু চাই কি দুদিন পরে, সে প্রভেদটুকু না থাকিতে পারে!

শুনিয়াছিলাম, হাইকোর্টের কোন কোন প্রধান উকীল মক্কেলের সহিত তেমন সদ্ব্যবহার করেন না। একটীর স্থলে দুটী প্রশ্ন করিলে নথিপত্র ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেন। কিন্তু মক্কেলরা তবু তাঁহাদের নিকটে যাইতে ছাড়ে না। প্রথমে ভাবিলাম, তবে বুঝি মক্কেলের সহিত এইরূপ ব্যবহার করিলেই ভাল উকীল বলিয়া বিখ্যাত হওয়া যায়! পসার বৃদ্ধির সোপান ভাবিয়া আমি প্রথমতঃ এই নজির অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিলাম। একদিন কোন মক্কেল আমার এরূপ ব্যবহারে একটু হাসিয়া একটি ব্যাঙ্ হস্তীর অনুকরণ করিতে গিয়া শতধা বিদীর্ণ হইয়া কিরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিল তাহাই গল্প করিল। এই চতুষ্পদ প্রাণীর গল্প শুনিয়া একবার মনে হইয়াছিল, এটা বুঝি শ্লেষ! কিন্তু শেষে বুঝিলাম, ইহাতে বরং আমার পদবৃদ্ধিই হইল! যাই হোক্, এইরূপ নজিরে আর বেশী দিন চলিলাম না, একেবারে শান্তমূর্ত্তি ধরিলাম। মক্কেল আসিলেই মহা সমাদর করিয়া অতি যত্নে কাগজপত্র দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু ইহাতেও বড় সুফল ফলিল না। আমার কাগজপত্র দেখাইয়া গিয়া মোকদ্দমার সময় তারা অন্য উকীল নিযুক্ত করিতে লাগিল। প্রথম প্রথম ব্যাপার বুঝিতে পারিতাম না, শেষ শুনিলাম আমার কাছ হইতে বাহিরে গিয়াই তারা বলাবলি করিত, "উকীলটা নিশ্চয়ই নিতান্ত রোতো, ভাল উকীল হ'লে কি আর এমন খাতির যত্ন করে!" এইরূপ বিশ্বাসেই তারা আর আমাকে মোকদ্দমা দিতে সাহস করিত না। আমি কিন্তু এদিকে মহা মুস্কিলেই পড়িলাম, তবে আর মক্কেলের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিব? এখন আমার অবস্থাটা দাঁড়াইল ;—

"সীতার হরণে যেন মারীচ কুরঙ্গ।
উপরে রাজার ভয়, পাতালে ভুজঙ্গ॥"

এইরূপে দিনে দিনে আমার দশা বাস্তবিকই বড় শোচনীয় হইতে লাগিল। ছমাস ছমাস যায়, কিন্তু মক্কেলের আর নাম-গন্ধ নাই! কোর্টে গিয়া, বারলাইব্রেরির বারাণ্ডায় ঘন ঘন পদ-চারণা করিতাম, আশা, যদি কোন মক্কেল জুটে! সেখানে পাঁচটা লোকের ভিড়, তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়া উঁকি মারিতাম, ভরসা, ইহার মধ্যে যদি কেহ শস্তা উকীলের খর্দ্দের থাকে! শিকারী যেমন শিকার অনুসন্ধানে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাইয়া ছুটিয়া বেড়ায়, আমিও তেমনি মক্কেলের সন্ধানে অধীর হইয়া বেড়াইতাম। শেষ ক্লান্ত হইয়া আবার লাইব্রেরিতে গিয়া বসিতাম। এইরূপে বাসক-সজ্জায় বেলা এগারটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত কোর্টে কাটাই-তাম, কিন্তু মক্কেল জুটিত না! তখন মনে হইত—

"কাঁদি আমি তার তরে,
তবু সে চাহে না ফিরে,
মক্কেল নিষ্ঠুর!"

এইরূপে আমার দিন কাটিতে লাগিল—পতিবিরহে যুবতীর দিন যেমন বৃথায় কাটে, তেমনি কাটিতে লাগিল। শনিবার রবি-বার আসিলেই হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিতাম, কেন না, সে দুদিনে ট্রাম-ভাড়ার চারি আনা বাঁচিয়া যাইত। এখন সেইটাই আমার উপা-র্জ্জন! তোমরা কাহাকেও বলিও না, আমি গোপনে গোপনে মাত্রে একটী "টিউশনি" করিতাম। নহিলে "মেসে"র খরচ চলে না। পূজার পূর্ব্বে কোর্ট বন্ধ হইলে, উকীলগণ, কেহ বোম্বাই কেহ দার্জ্জিলিংএ বেড়াইতে গেলেন। আমাকে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছুটীতে কোথায় যাবেন?" আমি গম্ভীরভাবে উত্তর

করিলাম "পশ্চিমে।" বাস্তবিকই আমি পশ্চিমে রওনা হইলাম। হাবড়ায় ট্রেণে চাপিয়া বর্দ্ধমানে নামিলাম। পশ্চিম বটে! আমি কিন্তু সেখানে বেড়াইতে যাই নাই, আমার উদ্দেশ্য অন্য। হাই-কোর্টের ভাব ত দেখিলাম, এখন যদি জেলা-কোর্টে কিছু হয় তাই আমার বর্দ্ধমানে আগমন। বর্দ্ধমানে আগমন শুনিয়া পাঠক-বর্গ যেন আর কিছু মনে না করেন। কেন না, আমি বিদ্যালাভ কলিকাতাতেই করিয়াছি, এখানে আসা কেবল অর্থলাভের জন্য।

কিন্তু এখানেও যে আমার মত ডজন দেড়েক বেকার উকীল! তবে বর্দ্ধমানের প্রধান উকীল বাবুটী আমাদের দেশীয় এবং স্বজাতি। বিশেষ আমি তাঁর এক আত্মীয়ের নিকট হইতে এক-খানি সুপারিস-পত্রও লইয়া গিয়াছিলাম এই যা ভরসা। উকীল বাবুটী কিছু সাহসও দিলেন; আমি সেই আশায় বুক বাঁধিয়া, পূজার ছুটীর পর হইতে বর্দ্ধমানেই "প্র্যাকটিস" আরম্ভ করিলাম। সেই মুরুব্বি উকীল বাবুটীর বাসায় দুটী বেলায় হাজিরা দিতাম, তাঁর ছেলেদের পড়াশুনার খবরও লইতাম, মাঝে মাঝে তাহাদের সে বিষয়ে সাহায্যও করিতাম, আর তাঁর ছোট ছেলেটীকে লইয়া আদর করিতেও ত্রুটী করিতাম না। হায় হায়! আমিই না এক দিন আমাতে ও হাইকোর্টের জজে বড় একটা প্রভেদ নাই ভাবিয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করিয়াছিলাম! সেই আমি আজ কি না একজন জজ-কোর্টের উকীলের চাটুকার! তাঁর একটী কৃপা-কটাক্ষের আশায় আজ আমি লালায়িত! একেই বলে,

"পুরুষের দশা দশা
কখনও মশা কখনও হাতি।
যখন যেমন, তখন তেমন
(এখন) পেটের দায়ে চিড়ে কুটি।"

যে যা হোক, এখন উকীল বাবুটীর কৃপায় কিছু কিছু পাইতে লাগিলাম। তাঁর দুই পাঁচটী মক্কেলদের বলিয়া কহিয়া আমার নামটাও তিনি 'ওকালতনামায়' লেখাইয়া দিতেন। আমিও এ সুবিধা ছাড়িবার পাত্র নহি। এই সুযোগে কিসে গসার করিয়া লইব, বিধিমতে সে চেষ্টা পাইতাম। কোন দিন যখন উকীল বাবু জজের সম্মুখে দীর্ঘ বক্তৃতা করিতে ব্যস্ত তখন আমি একবার তাঁর পাশে দাঁড়াইয়া গম্ভীর ভাবে কানে কানে বলিতাম, "একটু জল খাবেন কি?" উকীল বাবু ব্যাপার বুঝিয়া একটু হাসিতেন, মক্কেলরাও ভাবিত, না জানি কি পরামর্শই বা আমি দিলাম! এইরূপে নানা ফন্দীতে মক্কেলের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করিতাম, চেষ্টাটা নিতান্ত নিষ্ফলও হয় নাই। তিন চারি মাসের মধ্যেই আমার টাকা পঁচিশ বাঁধা আয় দাঁড়াইল, ক্রমে আরও কিছু বাড়িল। কিন্তু তাহাতেও টানাটানিটা ঘুচিল না, কেন না, এখানে ভিন্ন বাসা করিতে হইয়াছিল। নহিলে মান থাকে না। আবার বাটীতেও কিছু কিছু পাঠাইবার দরকার। যাই হোক, ভবিষ্যতে উন্নতি হইবে, এ বিশ্বাস জন্মিল। মনে করিলাম, টাকা পঞ্চাশ আয় হইলেই পরিবার কাছে আনিব, কিন্তু সে আয় আর হইল না। সে আশা আর পূরিল না! কপালগুণে উন্নতির পথে কাঁটা পড়িল; আমার সেই উকীল বাবুর জামাতা 'ল' পাস করিয়া এখানে প্র্যাক্‌টিস করিতে আসিলেন। উকীল বাবু আর আমার উন্নতির জন্য মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না, পূর্ব্বের মক্কেল যাহা পাঁচটা পাইয়াছিলাম তাও একে একে কমিতে লাগিল। তখন বুঝিলাম, শুধু উকীল হইলেই চলে না, উকীল শ্বশুর থাকাও চাই। ছেলেবেলায় এটা জানিতাম না, জানিলে ঠাকুর দেবতাদের কাছে সে প্রার্থনাটাও করিয়া রাখিতাম।

আর একটা কথা, আমার স্ত্রী যখন জিজ্ঞাসা করিত, উকীল হলে কিছু টাকা কই, তখন তাকে বুঝাইতাম "পাণ্ডবের মত এখন এটা আমাদেরও অজ্ঞাতবাস। অতএব ধৈর্য্য ধর, কিছু-দিন কষ্টের পর শীঘ্রই রাজত্ব মিলিবে।" কিন্তু মাস গেল বর্ষ গেল, রাজত্বও মিলিল না; তবে এখন আর তাকে কি বলিয়া প্রবোধ দিব? তাঁর সইয়ের কেরাণী স্বামী, সেওত দু'দশ টাকা আনে, আর আমি পিত্তলের কাটারী, তার কোন কাজেই আসিলাম না! তোমরা কেহ বলিতে পার কতদিনে আমার এই অজ্ঞাতবাস ঘুচিবে?

গ্রহমণ্ডলী।

বিজ্ঞান-সমুদ্রের উপর যাঁহারা ভাসিয়া বেড়াইতে ভাল-বাসেন, তলাইবার বড় একটা সুবিধা ঘটে না, তাঁহাদের পক্ষে জ্যোতির্বিজ্ঞানই অধিক প্রীতিজনক বলিয়া বোধ হয়। বিষয়ের মধ্যে অল্প দূর প্রবেশ করিতে না করিতেই কল্পনা ছুটাইবার কত নূতন নূতন পথ প্রকাশ পায়। গ্রহতারাগুলিকে কেবলমাত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোক-কণা হিসাবে দেখিলে সৌন্দর্য্যের কোন ক্ষতি হয় না বটে, তবে দেখিয়া মুগ্ধ হওয়া ছাড়া আর বড় কিছু করি-বার থাকে না; কিন্তু যখনি জানিতে পারা যায় যে, নক্ষত্র ও গ্রহ-গুলি আমাদেরই চিরপরিচিত সূর্য্য ও পৃথিবীর ন্যায়, তখন কত অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-রাজ্যের দ্বার খুলিয়া গিয়া কল্পনার বিহারভূমি সহস্রগুণ প্রশস্ত করিয়া দেয়।

চন্দ্র সূর্য্য লইয়া পৃথিবী সমস্ত বিশ্ব জুড়িয়া রহিয়াছে এবং তারাগুলি এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পৃথিবীর মনুষ্যেরই মনোরঞ্জন বা মনুষ্যের কর্ম্মফলের হিসাব কষিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, এইরূপ ধারণা কি পর্য্যন্ত তুচ্ছ ও অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়, যখন বুঝা যায় যে, প্রত্যেক নক্ষত্র এইরূপ এক একটি শোভাসৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ পরমাশ্চর্য্য জগৎমণ্ডলের কেন্দ্রস্বরূপ। কোনটির বা সৌরজগতের ন্যায় গঠন কোনটির বা সম্পূর্ণ ভিন্ন। স্থানে স্থানে পরস্পরের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণকারী দুইটি, তিনটি বা চারিটি নক্ষত্রকে একত্রে বিচরণ করিতে দেখা যায়। উহাদের গ্রহনিবাসীদের নিত্য দিবা-রাত্রি, আলো-ছায়ার কত প্রকার বৈচিত্র্য প্রকাশ পায় তাহা আমাদের পক্ষে কল্পনা করাই কঠিন। নূতন সৌন্দর্য্য খুঁজিবার উদ্দেশ্যে কল্পনাকে অতদূর পাঠাইবারও আবশ্যক নাই। আমাদের পৃথিবীর সহচর গ্রহদের প্রতি দৃক্‌পাত করিলেই যথেষ্ট নূতনত্ব পাওয়া যাইবে। সম্প্রতি আমাদের পৃথিবীর দুইদিনের বর্ষাতেই বিরক্ত হইতে হইয়াছে—শাদা কালো মেঘের একঘেয়ে দৃশ্য কয়-দিনই বা সহ্য হইবে—কিন্তু যদি বৃহস্পতি গ্রহে গিয়া পড়িতে পারিতাম তাহা হইলে তথাকার বিবিধ রঙীন চিরপরিবর্ত্তনশীল তরঙ্গায়িত মেঘরাশি দেখিয়া কি কখনো বিরক্ত ধরিত? আমাদের এখানে ত থাকিবার মধ্যে একটিমাত্র চন্দ্র আছে, তাহাকে লইয়া কাব্যরসাসক্ত ব্যক্তিরা এত নাড়া-চাড়া করিয়াছেন যে, যাহাদের উক্ত রস কিছু কম পরিমাণে আছে তাহাদের যথেষ্ট হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতে আরম্ভ হইয়াছে—কিন্তু শনি গ্রহের অষ্ট চন্দ্র ও তিন উজ্জ্বল চক্রের গুণগান কি করিয়া সহজে ফুরাইতে পারিতেন? একই সময়ে তিন চারিটি করিয়া চন্দ্র দেখা দিতেছে—কোনটি পূর্ণিমার পূর্ণ জ্যোতিতে জাজ্বল্যমান, কোনটি ক্ষীণ চতুর্থীর বেশে

ম্লান, কোনটি বা অমাবস্যার অন্ধকারে লুক্কায়িত। চক্র তিনটি একস্থান হইতে দেখিলে আকাশের গায়ে ক্ষীণ আলোকরেখা মাত্র, অপর স্থান হইতে দেখিলে শুভ্র প্রশস্ত রামধনু আকারে গগন ছাইয়া থাকে। এত বৈচিত্র্যের মধ্যে অরসিকেরও বিরক্তি জন্মাইবার সম্ভাবনা থাকে না। ভীষণ দৃশ্যেরও অভাব নাই। কিছু দিন হইল আমরা পৃথিবীর ঝড়ের প্রতাপ অনুভব করিয়াছি, কিন্তু বৃহস্পতির ঝড়ের সহিত ইহার কোন তুলনাই হয় না। তথাকার বায়ু ইহার শতগুণ বেগে প্রবাহিত হয় এবং দুই চারি ঘণ্টার মধ্যে সমুদ্রের জল একস্থান হইতে আর এক স্থানে নিক্ষেপ করিয়া দেশের চেহারাই বদলাইয়া ফেলে। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রখর উত্তাপে আমরা উঃ আঃ করিবার কিছু ত্রুটি করি নাই, কিন্তু বুধ গ্রহে শীতকালে গিয়া পড়িলেও পশ্চিমের "লু"কেও নিতান্ত শীতল সমীরণ বোধ হইবে।

এই সব দেখিয়া শুনিয়া মনের সঙ্কীর্ণতা একবার ঘুচিয়া গেলে জানিবার ইচ্ছা আরও প্রবল হইয়া উঠে। অন্যান্য প্রশ্নের মধ্যে এইটি প্রধানতঃ মনে উপস্থিত হয় যে, এই অনন্ত বিস্তৃত বিশ্বে আমরাই কি একমাত্র জ্ঞানবিশিষ্ট সচেতন জীব? পৃথিবী ছাড়া বাকি শত সহস্র বৃহত্তর সুন্দরতর লোকের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার কি কেহই নাই? এ কথা মন কিছুতেই স্বীকার করিতে চাহে না—তবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রমাণ ব্যতীত মনেরও হাত পা বাঁধা। এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য মানবজাতির এখনো কিছু কাল অপেক্ষা করিতে হইবে। আপাততঃ কত দূর অগ্রসর হইতে পারা গিয়াছে সে বিষয়ে আলোচনা করিয়া কান্ত থাকা যাক্।

ইংরাজি 'পপ্যুলর' পুস্তকের উপর নির্ভর করিতে গেলে অনেক

সময়ে ঠকিতে হয়। প্রায়ই দেখা যায় যে, বিজ্ঞানতত্ত্ব যাহা জানা গিয়াছে এবং যন্ত্রসকলের বর্ত্তমান অবস্থায় যাহা জানা যাইতে পারে, সে বিষয়ে বেশী কথা না বলিয়া পাঠকদিগের মনোরঞ্জনার্থ কি হইলে কি হইতে পারিত তাহা লইয়াই লেখক কল্পনাশক্তি চালনা করিতে ব্যস্ত থাকেন—গল্প হিসাবে পড়িতে বেশ সন্দেহ নাই, কিন্তু দোষ হয় এই যে, যখন সত্যকার বৈজ্ঞানিক পুস্তকে প্রকৃত বিবরণ পাঠ করা যায় তখন কিছুই যথেষ্ট মনে হয় না। মনে হয় যে, এইটুকুর জন্য কি এতগুলি বড় বড় জ্যোতিষী যন্ত্র বড় দূরবীক্ষণ লইয়া খাটিয়া মরিয়াছে? ভুলিয়া যাইতে হয় যে, কত কল্পনাতীত দূরত্ব লইয়া আমাদের কারবার করিতে হইতেছে, তাহাতে যতটুক জানা গিয়াছে তাহাই মানবের পরম লাভ।

প্রথমতঃ সৌরজগতের প্রান্তবর্ত্তী য়ুর্য়ানস ও নেপ্‌ট্যুন গ্রহসম্বন্ধে কোন অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়াই বৃথা—অনেক কষ্টে অনেক যুক্তি ও অঙ্কের দ্বারা চক্ষুকে সাহায্য করিয়া তবে ইহাদের অস্তিত্বমাত্র অনুভব করিতে পারা গিয়াছে।

বৃহস্পতি ও শনিকে শুধু চোখে দেখা যায় বটে, কিন্তু সে কেবল উহাদের নিতান্ত বৃহৎ আয়তনের গুণে। কিন্তু উহারাও সূর্য্য এবং পৃথিবী উভয় হইতেই এত অধিক দূরে অবস্থিতি করিতেছে যে, উহাদের সংলগ্ন চন্দ্র ও চক্র ও উপরিস্থিত রাশি রাশি মেঘ ও বৃহৎ সমুদ্র ছাড়া সূক্ষ্মতর পদার্থের কোন চিহ্ন দেখা যায় না।

সূর্য্যের খুব নিকটে গেলেও বড় সুবিধা নাই—বুধগ্রহ যথেষ্ট উজ্জ্বল বটে, কিন্তু তাহাকে দেখিবার চেষ্টা করিলে সূর্য্যের প্রবল-তর রশ্মিতে চোখ ঝল্‌সিয়া যায়।

বাদসাদ দিয়া বাকি রহিল শুক্র ও মঙ্গল। প্রথম বিবেচনায়

মনে হইতে পারে যে, শুক্রের উপরিতল অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট দেখা যাইবে, কারণ, মঙ্গলের তুলনায় উহা পৃথিবী ও সূর্য্য উভয়েরই নিকটবর্ত্তী এবং উহা অপেক্ষা আয়তনেও বৃহৎ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার বিপরীতই ঘটিয়াছে। যে অধিক রশ্মিবশতঃ শুক্র সন্ধ্যা-তারা হিসাবে জনসাধারণের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া থাকে, সেই রশ্মির আধিক্যই বৈজ্ঞানিকদিগের পক্ষে অসুবিধাজনক; উহার প্রভাবে শুক্রের উপরিস্থিত বস্তুসকলের আকার পৃথক্ করিয়া বুঝা কঠিন, সব মিলাইয়া এক হইয়া যায়। ইহা একমাত্র অসুবিধা নহে। পৃথিবী এবং শুক্র স্বস্ব পথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে এক সময়ে পরস্পরের খুব নিকটে আসে, আবার আর এক সময়ে খুবই তফাৎ হইয়া পড়ে। আমাদের দায়ে পড়িয়া সব চেয়ে অধিক দূরত্বের সময়ে শুক্রকে দেখিতে হয়, কারণ, নিকট-তম অবস্থায় সূর্য্য শুক্রের পশ্চাৎ হইতে আমাদের চোখে আসিয়া লাগে, শুক্রের যে অংশটা আমরা দেখিতেছি তাহার উপর আলো পড়ে না। এই সব বিঘ্ন থাকাতে শুক্র সম্বন্ধে অল্পই জানা গিয়াছে—আমাদের পৃথিবীর ন্যায় উহার জল ও বায়ু যথেষ্ট পরিমাণে আছে—এক এক সময়ে ভূভাগের চিহ্ন দেখা যায় এবং কখনো কখনো বৃহৎ পর্ব্বতেরও আভাস পাওয়া যায়—এইটুকু বলিলেই সব কথা বলা হইল। ইহাতে কেবল কৌতূহল বাড়িয়া উঠে, মনে হয় যে, নিকটের অবস্থায় দেখিতে পাইলে কত-কি-না আবিষ্কার হইত। মঙ্গলকে নিরীক্ষণ করিবার ইহা অপেক্ষা সুবিধা ঢের বেশী। উহার নিকটতম অবস্থাতেই পৃথিবীর পশ্চাৎ হইতে সূর্য্য উহার মুখের উপর আলো ফেলাতে দেখিবার যতদূর সুবিধা হইবার তাহা হয়—এইজন্য মঙ্গলের প্রতি অনেক দিন হইতে জ্যোতিষীদের বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে।

মঙ্গলের আলোক সম্বন্ধে সুবিধার অবস্থা ৭৮০ দিনে একবার করিয়া ঘটিয়া থাকে, কিন্তু উহার নিকটতম অবস্থায় আলোকের সুবিধা হওয়া অনেক দিন অন্তর ঘটে। ১৮৭৭ সালে এইরূপ দুই সুবিধা একত্রে হইয়াছিল, সেই সময়ে জ্যোতির্বীরা একবার খুব ভাল করিয়া দেখিয়া সব বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার পর গত বৎসরের পূর্ব্বে আর এইরূপ সুবিধা উপস্থিত হয় নাই।

ইতিমধ্যে সাধারণের কিরূপ বিশ্বাস দাঁড়াইয়া গেল যে, মঙ্গল সম্বন্ধে সবই জানা হইয়া গিয়াছে, উহাতে মনুষ্যের, অন্ততঃ জ্ঞান-বিশিষ্ট জীবের, অস্তিত্ব সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে, এখন কোন গতিকে একটা যাইবার উপায় করিয়া দিলেই হয়। শুধু যে বিশ্বাস হইয়াছিল তাহা নহে, অনেকে এ বিশ্বাস অনুসারে কার্য্য করিবার উদ্যোগ করিতে চাহিয়াছিল। একদল বলিল যে, এখন যাওয়া যাক্ না যাক্, মঙ্গলনিবাসীদের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইবার কোন বন্দোবস্ত করিতে হইবে—প্রস্তাব হইল যে, সাহারার মত কোন প্রশস্ত সমতল ভূমিতে জ্যামিতির কোন একটা আকারে কাষ্ঠখণ্ড সাজাইয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিলে মঙ্গলনিবাসীরা নিশ্চয়ই তাহা দেখিতে পাইবে এবং (যেহেতু উহারা আমাদের অপেক্ষা উন্নত জাতি এবং বড় বড় দূরবীণ লইয়া ক্রমাগত পৃথিবীর দিকে চাহিয়া রহিয়াছে) বুঝিয়া অনুরূপ উপায়ে উত্তর দিবে—এই উপায়ে ক্রমে একটা ভাষা গজাইয়া উঠিবে। দুই এক ক্ষিপ্ত মস্তিষ্কের মধ্যে ইহা আবদ্ধ থাকিলে শোভা পাইত, কিন্তু অনেক বড় বড় সংবাদপত্রকে এই বিষয়ে গম্ভীর ভাবে আলোচনা করিতে দেখা গিয়াছে। এই সকল বিশ্বাস কতদূর সমূলক তাহা এই বিবেচনা করিলেই বুঝা যাইবে যে, মঙ্গলের উপর লণ্ডন সহরের আয়তনের স্থান আমাদের সর্ব্ব-

শ্রেষ্ঠ দূরবীক্ষণে একটি বিন্দুর মত দেখা যায় এবং কলিকাতার মত স্থান মোটেই দেখা যায় না

যাহা হউক, গত বৎসরে যখন মঙ্গলকে নিরীক্ষণ করিবার সুবিধা পুনর্ব্বার আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন জ্যোতিষীগণ আবার বিশেষ মনোযোগ সহকারে সকল কথা যাচাইয়া লইলেন। যাহা প্রকাশ হইল তাহা আমরা নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

জল ও বায়ু পৃথিবী অপেক্ষা কম পরিমাণে থাকিলেও মঙ্গল গ্রহে উহাদের কোন অভাব নাই—সেখানে আকাশে মেঘ ভাসিতে দেখা যায় এবং মেরুর নিকট শীত ও গ্রীষ্মে বরফের নিয়মিত হ্রাসবৃদ্ধি বুঝা যায়। পাহাড়ের বড় চিহ্ন পাওয়া যায় না এবং সবগুদ্ধ স্থল অপেক্ষা জলের অংশই বেশী। মহাদেশগুলি ঈষৎ লাল আভাবিশিষ্ট—কল্পনার সাহায্য লইয়া ইহা হইতে মঙ্গলে রক্তবর্ণ উদ্ভিদের অস্তিত্ব অনুমান করা যাইতে পারে। আর কোন প্রকার উঁচুদরের জ্ঞানবিশিষ্ট প্রাণীর আভাসমাত্র পাওয়া যায় নাই, বরং দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয় যে, না থাকিবারই সম্ভাবনা। স্থানে স্থানে দেখা যায় যে, সমুদ্র হইতে লম্বা লম্বা খাল ভূখণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে; কোন কোন খাল একেবারে মহাদেশের একপার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত গিয়া দুই সমুদ্র যোগ করিয়া দিয়াছে। একজন জ্যোতিষী বলেন যে, তিনি ১৮৭৭ সালে যতগুলি খাল গণনা করিয়াছিলেন এইবার তাহা অপেক্ষা বেশী দেখিতে পাইতেছেন। ভূভাগের প্রতি সমুদ্রের এইরূপ আক্রমণ করিবার অর্থ কি?

পৃথিবীতে দেখা যায় যে, বৃষ্টির জল পাহাড়ের উপর পড়িয়া ঝরণা এবং নদীর আকারে সমুদ্রে গিয়া পড়ে এবং সেই সঙ্গে পাহাড়কে ক্ষয় করিয়া, তাহার মৃত্তিকা লইয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ

করিয়া সমুদ্রের গহ্বর ক্রমে পূরাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। এই চেষ্টা এত যুগযুগান্তর হইতে চলিয়া আসিতেছে যে, এতদিনে পৃথিবীর সমতল হইয়া যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু না হইবার কারণ এই যে, অপর পক্ষে পৃথিবীর অন্তরস্থিত তপ্ত গলিত ধাতুসকল টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতেছে এবং মাঝে মাঝে কোন এক স্থানকে ঠেলিয়া তুলিয়া সমুদ্রের গ্রাস হইতে রক্ষা করিতেছে। মঙ্গলের আয়তন পৃথিবী হইতে অনেকটা কম হওয়াতে ইতিপূর্ব্বেই উহার অন্তরের উত্তাপ এতই ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে যে, উহার উপরিস্থিত কঠিন অংশকে আর ঠেলিয়া তুলিবার সামর্থ্য নাই। সেইজন্য উহা শীঘ্রই একেবারে সমতল হইয়া আসিবে এবং উহার চতুর্দ্দিকে এক স্তর জল উহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিবে। এই অবস্থায় প্রাণী থাকিবার বড় সম্ভাবনা নাই, নিদান, আমরা পৃথিবীতে যেরূপ প্রাণী দেখিতে পাই তাহারা ত এইরূপ অবস্থা ঘটিবার বহুপূর্ব্বেই লোপ পাইত। তবে পৃথিবীর সহিত মঙ্গলের যেরূপ সাদৃশ্য আছে এবং উহার বায়ুর উপাদানগুলি যেরূপ অনুমান করা যাইতে পারে, তাহাতে ভরসা করিয়া বলা যায় যে, এখন না থাক্‌, পূর্ব্বকালে যখন উহার অন্তরের উত্তাপ অধিক ছিল তখন উহার উপর নানা জাতীয় জীব নিম্নতমশ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া, উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া, অবশেষে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

উপসংহারে কোন্‌ গ্রহে বায়ুর কিরূপ উপাদান হইবার সম্ভাবনা তাহা অনুমান করিবার একটি নূতন উপায়ের কথা বলিয়া শেষ করা যাক্‌। ইহা বুঝিতে গেলে প্রথমে দেখিতে হইবে যে, কোন পদার্থের কঠিন, দ্রব ও বাষ্পাবস্থার মধ্যে প্রভেদ কি। একদল লোক যদি অপেক্ষাকৃত স্থির ভাবে পরস্পরের কাছাকাছি দাঁড়াইয়া থাকে, তাহা হইলে অনেকটা অল্প স্থান অধিকার

করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু উহারা যদি হাতধরাধরি করিয়া ক্রমাগত এপাশ-ওপাশ করিতে থাকে তাহা হইলে একটু অধিক স্থান আবশ্যক হইয়া পড়ে; আবার যদি পরস্পরের সহিত সম্পর্ক ছাড়িয়া দিয়া লক্ষ্যহীন ভাবে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করিতে থাকে তাহা হইলে উহাদিগকে একদলের মধ্যে ফেলাই কঠিন হইয়া উঠে—যত বড় স্থান হউক না কেন, ইহারা অধিকার করিয়া থাকিতে পারে। কঠিন, তরল ও বাষ্পাবস্থার মধ্যে এইরূপ গতির তারতম্যই প্রভেদের কারণ। বাষ্পের প্রত্যেক পরমাণু উত্তাপ-জনিত গতির প্রভাবে চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে—একদিকে কিছু দূর যাইতে না যাইতেই অন্য পরমাণুর সহিত ঠেকাঠেকি হইয়া অপর দিকে চলিয়া যায়। এইরূপ ক্রমাগত ঠেকা-ঠেকি হওয়াতে ক্রমাগত এদিক-ওদিক করিতে থাকে। আমাদের বায়ুর প্রত্যেক পরমাণুর এইরূপ অবস্থা—তবে যেগুলি একেবারে বায়ুস্তরের উপরিভাগে গিয়া পড়িয়াছে তাহাদের গতি যখন ঘটনাক্রমে ঊর্দ্ধমুখী হয় তখন বাধা দিবার অন্য কোন পরমাণু থাকে না। সে অবস্থায় পৃথিবীর আকর্ষণ যদি না থাকিত তাহা হইলে উক্ত পরমাণু বন্ধনমুক্ত হইয়া একেবারে অনন্ত আকাশে উড়িয়া যাইত—আমরা আর তাহাকে ফিরাইয়া পাইতাম না।

কিন্তু পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তির যথেষ্ট বল থাকিলেও উহারও সীমা আছে। চিত্রে পৃথিবীর এক অংশ—তাহার উপর একটি পর্ব্বত এবং পর্ব্বতের চূড়ার উপর একটি

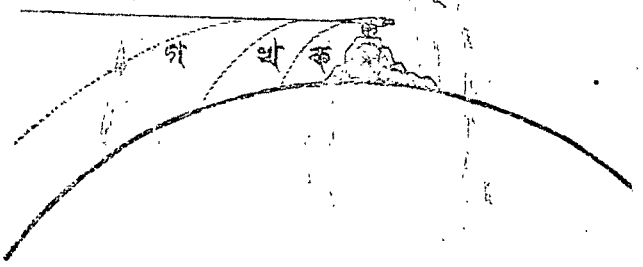

কামান দেখা যাইতেছে। প্রথমে মনে করা যাক্ যে, উক্ত কামানে অল্প বারুদ দিয়া একটি গোলক নিক্ষেপ করা হইল।

গোলক 'ক'-চিহ্নিত পথ অবলম্বন করিয়া একস্থানে পৃথিবীতে আসিয়া পড়িবে। পৃথিবীর যদি আকর্ষণ না থাকিত তাহা হইলে উহা কামানের মুখ হইতে সরলরেখা ধরিয়া বরাবর চলিয়া যাইত। পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বারুদ দিলে, সুতরাং গোলকের বেগ অধিক হইলে, উহা "খ"-চিহ্নিত পথ অবলম্বন করিবে। যত বেগ বাড়িবে গোলক ততই দূরতর সম্মুখের দিকে গিয়া পড়িবে। এইরূপে বারুদের মাত্রা বাড়াইয়া চলিলে এক সময়ে এমন হইবে গোলক পৃথিবীতে না পড়িয়া পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতে থাকিবে। পৃথিবীর দিকে পতনের নিয়ম কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হইবে না—কিন্তু "গ"-চিহ্নিত রেখা দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, সরল রেখা হইতে যদিও গোলক ক্রমেই নামিয়া আসিতেছে তথাপি উহা পৃথিবীতে পড়িতে পাইতেছে না। এ অবস্থায় অন্য কোন বাধা না পাইলে উহা চিরকাল পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকিবে।

যে বেগ প্রাপ্ত হইলে দ্রব্যমাত্রই পৃথিবী হইতে একেবারে বিক্ষিপ্ত হইয়া সীধা চলিয়া যাইতে পারে সে বেগের পরিমাণ এক সেকেণ্ডে ৬ মাইলের অধিক। জ্যোতিষ্কের আয়তন অনুসারে ন্যূনাধিক বেগ আবশ্যক হয়। ছোট জ্যোতিষ্কের আকর্ষণ অতিক্রম করিতে অল্প বেগ আবশ্যক এবং বৃহতের অধিক। হাইড্রোজেনের পরমাণুর বেগ সচরাচর সেকেণ্ডে ১ মাইল থাকে—কিন্তু অনেক সময় ৬।৭ মাইল হইতেও দেখা যায়, সুতরাং এই বাষ্প, পৃথিবীর বায়ুর মধ্যে অন্য কোন বাষ্পের সহিত অমিশ্রিতভাবে কখনো থাকিতে পারে না, যেমন এদিক-ওদিক করিতে করিতে বায়ুস্তরের উপরিতলে গিয়া পড়ে অমনি পৃথিবী ছাড়িয়া উড়িয়া যাইবার সুবিধা পায়। মঙ্গলগ্রহের আকর্ষণ অতিক্রম করিতে সেকেণ্ডে তিন মাইল বেগ বই দরকার করে না;

সেইজন্য উহাতে হাইড্রোজেন থাকিবার কোনই সম্ভাবনা নাই; কিন্তু অক্সিজেনের বেগ হাইড্রোজেনের এক চতুর্থাংশ মাত্র, সেইজন্য মঙ্গল উহাকে ধরিয়া রাখিতে সক্ষম। জলের বাষ্পের বেগ খুব বেশী হইলেও মুহূর্ত্তে ২। ২॥০ মাইলের অধিক হয় না, তাই মঙ্গল জলকেও ধারণ করিয়া রাখিতে পারে—কিন্তু ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, উহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র কোন জ্যোতিষ্কে জল বা অক্সিজেন থাকিতে পারে না। চন্দ্রের পক্ষে সেকেণ্ডে ১মাইল বেগই যথেষ্ট, সেইজন্য উহাতে জল বায়ু কিছুরই অস্তিত্ব দেখা যায় না। এই কারণেই উহা আমাদের এত হাতের কাছে হইলেও উহাতে কোনপ্রকার প্রাণীর চিহ্ন খুঁজিতে যাওয়া বৃথা।

পিয়ের লোটি ও ইস্তাম্বুল।

সাহিত্যভক্ত ব্যক্তি অনেকেই পিয়ের লোটির নাম শুনিয়া থাকিবেন। তিনি গত দশ বৎসরের মধ্যে খ্যাতনামা লেখক হইয়া উঠিয়াছেন, এবং দুই বৎসর আগে ফরাসী অ্যাকাডেমীতে স্থান পাইয়াছেন। তাঁহার জন্ম স্যাঁটজেঁ এবং আসল নাম মসিও ভিঁয়া। মাওরি ভাষায় লোটি কোন বিশেষ ফুলের নাম, গলিলিসিয়া হইতে তিনি এই নামটি শিখিয়া আসিয়াছেন। শিশুকাল হইতেই লোটির মন সুদূর দেশভ্রমণের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, এবং খুব অল্প বয়সে তিনি নৌবিদ্যা শিক্ষার ইস্কুলে ভর্ত্তি হন। তাহার পর হইতে এই ত্রিশ বৎসর তাঁহাকে কার্য্যগতিকে ক্রমাগত সমুদ্রযানে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াইতে হইয়াছে। এই উপলক্ষে তিনি চীন, জাপান, তুরস্ক, মরক্কো,

গ্রিসিয়ানিয়া প্রভৃতি দেশ দেশান্তরে গমন ও বাস করিয়াছেন এবং এই সকল দেশের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, প্রাকৃতিক শোভা ও মনুষ্যচরিত্র এমন সূক্ষ্ম, সুন্দর ও সহৃদয়ভাবে বর্ণনা করিয়া পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন যে, সেগুলি পড়িলে মনে হয় নিজে সেখানে গিয়াছি। তিনি যেখানে যান সেখানকার লোকদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া থাকেন, ইউরোপীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলেন না, সেইজন্য ইহাঁর কাছ থেকে বিদেশী লোকের যেরূপ অন্তরঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়, সেরূপ অন্যান্য ভ্রমণ-পুস্তকে দুর্লভ। যে পুস্তকখানি আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়, তাহা লোটির একটি সর্ব্বপ্রথম রচনা—নাম "আজিয়াদে।" ইহা ১৮৭৬।৭৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার তুরস্কদেশে বাসকালে লিখিত একটি ডায়ারির মত। ইহাতে তাঁহার নিজের জীবনীর অংশ যে সর্ব্বতোভাবে সত্য তা বোধ হয় না, কারণ উপসংহারে লোটির যুদ্ধে মৃত্যুর কথা লেখা আছে, অথচ তিনি যে এখনও জীবিত তাহা নিশ্চিত। কিন্তু তুরস্ক দেশ এবং দেশবাসীর কাল্পনিক বর্ণনার কোন মূল্য নাই, এ বিষয়ে লোটি যাহা বলিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহ সত্য-মূলক, এবং তাহা হইতে এই অপরিচিত দেশ সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায় বলিয়া সেইরূপ কতকগুলি অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

১৬ই মে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার এই ডায়ারি আরম্ভ। এই বৎসরে তুরস্কদেশে যে রাজনৈতিক বিপ্লব হয়, তাহার সূত্রপাতে তুর্কীগণ ফ্রান্স ও জর্ম্মাণি প্রেরিত কন্সলদিগকে হত্যা করে, ইহাতে ইউরোপে মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়, এবং সমস্ত ইউরোপীয় জাতি সালনিকার বন্দরে বড় বড় যুদ্ধের জাহাজ প্রেরণ করেন। ইংলণ্ড এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা তৎপর হইয়াছিলেন, এবং পিয়ের লোটি তখন ইংরাজি নৌবিভাগে কর্ম্ম করিতেন বলিয়া এই উপ-

সঙ্গে তুরস্কদেশে পদার্পণ করেন। ২৯শে জুলাই তিনি সালনিকা ত্যাগ করিয়া বস্‌ফরস্ বা ডার্ডানেলিসস্থিত "ষ্টেয়রহাউণ্ড" নামক ইংরাজি জাহাজে যাইবার হুকুম পাইলেন এবং পরদিনই সেই অনুসারে কাজ করিলেন। কনষ্টাণ্টিনোপলে পৌঁছিয়া শুনিলেন তাঁহার জাহাজ মর্ম্মরা সমুদ্রে ঘুরিতেছে, তাহার আগমন অপেক্ষায় লোটি পেরা নামক কনষ্টাণ্টিনোপলের ইংরাজটোলায় একটি হোটেলে বাস করিতে লাগিলেন। এই দেশ সম্বন্ধে তাঁহার প্রথম মন্তব্য এইরূপ :—

"পেরার উচ্চ জমীর উপর ট্যাক্সিমের অশান্ত পাড়া, ইউরোপীয় গাড়িঘোড়া ও সাজসজ্জার সঙ্গে প্রাচ্যদেশীয় গাড়িঘোড়া ও সাজসজ্জার ঘেঁষাঘেঁষি; অত্যন্ত গরম এবং অত্যন্ত রৌদ্র; গরম বাতাসে ধূলা এবং শরৎকালের পাকাপাতা ওড়া; হেনার গন্ধ; ফলবিক্রেতাদের হট্টগোল, এবং রাস্তাময় কিস্‌মিস্ ও তরমুজ ..... কনষ্টাণ্টিনোপ্‌ল্ বাসের প্রথম কয় মুহূর্ত্তে এই সব দৃশ্য আমার স্মৃতিপটে অঙ্কিত হয়েছে।

ট্যাক্সিমের এই রাস্তার ধারে গাছের তলায় খোলা বাতাসে বসে' আমি দুফুরবেলা কাটাতুম,—সকলেরই কাছে অপরিচিত। এইমাত্র যে সময় অতীত হ'য়ে গেল তারই কথা ভাবতে ভাবতে অলস দৃষ্টিতে আমার সামনের সার্ব্বভৌমিক জনস্রোত দেখতুম।**

এই পাড়াতেই একজন আরমানী পুরোহিতের সঙ্গে আমার আলাপ হয়, সে আমাকে তুরস্ক ভাষার প্রথম শিক্ষা দিলে। আমি এদেশ পরে যেমন ভালবাসলুম, তখনো তেমন বাসিনি; তখন আমি পর্য্যটক হিসেবে তাকে দেখছিলুম; এবং ইস্তাম্বুল আমার কাছে প্রায় অজানা ছিল, সেখানে খৃষ্টানরা যেতে ভয় করত।***

আমার বাড়ি পেরার একটি নিভৃত স্থানে স্থাপিত ছিল,

সেখানে উপর থেকে 'স্বর্ণশৃঙ্গ'হ্রদ ও তুরস্ক সহরের সুদূর দৃশ্যটি দেখা যেত; গ্রীষ্মকালের মহিমা এই বাসস্থানকে মনোহর করে' তুলেছিল। বড় খোলা জানালার সামনে বসে' ইস্‌লামের ভাষা অধ্যয়ন করতে করতে আমার দৃষ্টি রৌদ্রস্নাত পুরাতন ইস্তাম্বুলের উপর প্রসারিত হ'ত। অতি দূরে, একটি সাইপ্রেস্‌বনের মধ্যে আয়ুব দেখা যেত।

অগষ্টের শেষ ও সেপ্টেম্বরের কিয়দংশ আমি বন্‌করমে বেড়িয়ে বেড়িয়ে কাটালুম। তখন দিনগুলি খুব সুন্দর ও গরম ছিল। সুনীল শান্ত জলে ছায়াময় তীর ও প্রাসাদ প্রতিবিম্বিত হ'ত ও সোণালী 'কারীক' নৌকা ভেসে যেত।

ইস্তাম্বুলে সুলতান মুরাদের সিংহাসনচ্যুতি ও আবদুল হামিদের অভিষেকের উদ্যোগ চল্‌ছিল।

কনষ্টাণ্টিনোপ্‌। ৩০ শে অগষ্ট।

রাত্রি দ্বিপ্রহর! তুরস্ক ঘড়িতে পঞ্চম ঘটিকা; প্রহরীগণ তাদের লৌহমণ্ডিত ভারি লাঠি দিয়ে মাটির উপর আঘাত কর্‌ছে; 'গালাটা' অঞ্চলের কুকুরগুলো বিদ্রোহী হ'য়ে উঠে আর্ত্তস্বরে মহা চীৎকার করছে। আমার পাড়ার কুকুররা নিরপেক্ষভাব অবলম্বন করেছে, এবং সে জন্যে আমি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট; তারা স্তূপাকৃত হ'য়ে আমার দরজার সামনে ঘুমোচ্ছে। আমার চারদিকে সকলি অতি শান্তিময়; এই যে তিন দীর্ঘ রাত্রি আমার খোলা জানালার সামনে শুয়ে কাটিয়েছি, তার মধ্যে আলোগুলি একে একে নিভে গেছে।

আমার পদতলে পুরাতন আরমানী বাড়িগুলি নিদ্রাভিভূত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন; আমার দৃষ্টি একটি সুগভীর গিরিগহ্বরের উপর প্রসারিত, তার তলায় সহস্রবর্ষীয় সাইপ্রেস্‌বন এক নিবিড়

কৃষ্ণবর্ণ স্তূপ রচনা করেছে; এই বিষাদবহ গাছগুলির ছায়ায় বহুপুরাতন মুসলমান গোরস্তম্ভ বিরাজমান; রাত্রে সেগুলি থেকে ধূপের মত সুগন্ধ উঠছে। বিশাল দিগন্ত প্রশান্ত ও পরিষ্কার; আমি উপর থেকে এই সমস্ত প্রদেশ দেখতে পাচ্ছি। সাইপ্রেস্ গাছের উপরে একটি ঝিক্‌ঝিকে পাত, সেটি 'স্বর্ণ-শৃঙ্গ'; আরও উপরে, অতি উচ্চে, একটি প্রাচ্য সহরের চিত্ররেখা, সেটি ইস্তাম্বুল। একটি ক্ষীণ চন্দ্রলেখাশোভিত ঘনতারকা-খচিত আকাশের গায়ে মিনার ও মস্‌জিদের উচ্চ স্তম্ভগুলি আঁকা রয়েছে; নৈশ গগনের পাণ্ডুপটের উপর নীলাভ লঘু রেখায় চিত্রিত বুরুজ ও মিনারে যেন আকাশসীমান্তে একেবারে একটি ঝালর ঝুলানো হয়েছে। মস্‌জিদের প্রকাণ্ড গম্বুজসকল একটির উপর আরেকটি উঠে যেন অস্পষ্ট বর্ণ ধারণ করে' চাঁদ পর্য্যন্ত পৌঁচেছে, ও মনে মহানতার ভাব এনে দিচ্ছে।

ঐখানে, সেরাস্কিয়েরা নামক একটি প্রাসাদের মধ্যে, এই সময়ে এক গম্ভীর নাটক অভিনয় হচ্ছে; বড় বড় পাশাগণ সুলতান মুরাদকে সিংহাসনচ্যুত করবার জন্য সেখানে একত্র হয়েছেন; কাল, আবদুল হামিদ তাঁর স্থান অধিকার করবেন। যে সুলতানের আগমন উপলক্ষে তিন মাস আগে আমরা এত উৎসব করেছিলুম, এবং এ পর্য্যন্ত যাঁকে সকলে দেবতার মত সেবা করে' এসেছে আজ রাত্রে হয় ত অন্তঃপুরের কোন এক কোণে তাঁর শ্বাসরোধ করা হচ্ছে।

কনষ্টাণ্টিনোপলে কিন্তু সবই নিস্তব্ধ। এগারোটার সময় বোড়সওয়ার ও গোলন্দাজগণ এখান দিয়ে ইস্তাম্বুলের দিকে ছুটে গিয়েছে; তারপরে ব্যাটারির গুরু গুরু শব্দ দূরে মিলিয়ে গেছে, সকলি আবার নীরব হ'য়েছে। * * *

এই শান্তির মধ্যে অতীতের স্মৃতি আমার মনে সুস্পষ্টরূপে জেগে উঠছে, যা কিছু ভেঙ্গে গেছে, চলে' গেছে, আর ফিরে আসবে না, তারই স্মৃতি।

আমি মনে করেছিলুম বেচারা সামুয়েল আজ সন্ধ্যেবেলা আমার কাছে ফিরে আসবে, কিন্তু নিশ্চয়ই আর কখনো তাকে দেখতে পাব না। তার জন্য আমার মন কেমন করছে, আমার নির্জ্জনতা অসহ্য বোধ হচ্ছে। আজ আট দিন হ'ল, কিছু টাকা উপার্জ্জন করবার জন্য আমি তাকে সালনিকাগামী একটি জাহাজে যেতে দিয়েছিলুম। যে তিন জাহাজে সে ফিরতে পারত, সবগুল তাকে না নিয়ে ফিরেছে। আজ সন্ধ্যাবেলা তৃতীয়টি এসে পৌঁছল, কোন যাত্রীই তার কথা শোনেনি।——

চন্দ্রলেখাটি ধীরে ধীরে ইস্তাম্বুলের পিছনে, সুলইমানের গম্বুজ-অন্তরালে নেমে যাচ্ছে। এই বৃহৎ সহরে আমি বিদেশী ও অপরিচিত। বেচারা সামুয়েলই এখানে একমাত্র লোক যে আমার নাম ও অস্তিত্ব জানে, এবং তাকে আমি সত্য সত্য ভালবাসতে আরম্ভ করেছি।

সেও কি আমাকে পরিত্যাগ করেছে, না তার কিছু অনিষ্ট ঘটেছে ?"

উপরে সামুয়েল বলিয়া যাহার উল্লেখ আছে, সে একটি গরীব পথের ছেলে, সালনিকায় লোটির প্রথম তাহার সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহার পরে পরস্পরের মধ্যে কিরূপে সখ্যবন্ধন স্থাপিত হওয়াতে, সামুয়েল কনষ্টান্টিনোপ্‌ল্ পর্য্যন্ত লোটিকে অনুসরণ করিয়াছিল। একদিন লোটি সালনিকার একটি তুরস্ক কাফিশালায় গিয়া বসিয়াছিলেন, তিনি বলেন :—

"তৎক্ষণাৎ আমার চারদিকে এক দল লোক এসে জমল; যারা মাঝি বা মুটের কাজে সালনিকার সমুদ্রতীরে খোলা বাতাসে জীবন যাপন করে, এরা সেই দলভুক্ত, জানতে চায় কেন আমি এই জায়গায় বসে' অপেক্ষা করছি, মনে আশা আছে যে, হয়ত তাদের দ্বারা আমার কোন কাজ হ'তে পারে।

সেই মাসেডোনিয়ানদের দলের মধ্যে আমি একটি লোককে লক্ষ্য করলুম, তার বেশ মজার রকম দাড়ি ছিল, এ দেশের বহু পুরাতন প্রস্তরমূর্ত্তির মত ছোট ছোট কুঞ্চিত গুচ্ছে বিভক্ত; সে আমার সামনে মাটির উপর বসে' ছিল, এবং অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে আমাকে নিরীক্ষণ করছিল; আমার পরিচ্ছদ, এবং বিশেষতঃ আমার জুতা, যেন প্রবলভাবে তার মনোযোগ আকর্ষণ করছিল। সে একরকম আদুরে ভাবে, একটা বড় আঙ্গরা বিড়ালের মত আলস্য ত্যাগ করছিল, এবং হাই তোলবার সময় তার ছোট ছোট মুক্তার মত ঝক্‌ঝকে দুপাটি দাঁত দেখা যাচ্ছিল। তা' ছাড়া তার মাথাটি বড় সুন্দর, চোখ অতি মধুর ভাবাপন্ন এবং সরলতা ও বুদ্ধিতে দীপ্যমান। তার পরণে কেবল জীর্ণ বস্ত্র, পা খালি, কামিজ ছেঁড়া, কিন্তু বিড়ালের মত পরিষ্কার।

এই লোকটি সামুয়েল।

সামুয়েল ও তার জাত সম্বন্ধে খবর, সে ঘটনাচক্রে তুরস্ক, ধর্ম্মে ইহুদী, ও বংশানুক্রমে স্পানিয়ার্ড। সালনিকায় সে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে মাঝি ও মুটেগিরি করত। সেখানকার মত এখানেও সে সমুদ্রের ধারে তার জীবিকা নির্ব্বাহ করে; অন্যদের অপেক্ষা তার মুখশ্রী ভাল বলে' সে অনেক কাজ পায়, ও কখনো কখনো

বেশ লাভ করে; সন্ধ্যাবেলা সে একখণ্ড রুটি ও একটি আঙুরে আহার সমাপ্ত করে, তার পরে ঘরে ফিরে আসে, বেঁচে থাকাই তার সুখ। * * * মামুয়েল কাজ করতে বসার সময় দুটো ছেঁড়া ইজের পরে, একটার উপর আর একটা; ছিদ্রগুলি যে ঠিক একটির পর একটি পড়ে তা' সে মনে করে না, এবং নিজেকে এই বেশে বেশ ভব্যযুক্ত বিবেচনা করে।

রোজ সন্ধ্যাবেলা সকলে দেখতে পায় আমরা দুই জনে খাঁটি প্রাচ্যদেশজের ন্যায় কোন তুরস্ক কাফিশালার প্লেন বৃক্ষতলায় বসে' নারগিলে টানছি। কিম্বা কখনো কখনো থিয়েটারে গিয়ে তুরস্ক পুতুলনাচ দেখে' মুগ্ধ হই। আমরা সকল প্রকার আন্দোলনের বাহিরে থাকি, আমাদের কাছে রাজনীতির অস্তিত্ব নেই।

এদিকে কনষ্টান্টিনোপলের খৃষ্টানদের মধ্যে আতঙ্ক উপস্থিত হয়েছে, এবং পেরার লোকদের পক্ষে ইস্তাম্বুল ভয়ঙ্কর স্থান হ'য়ে উঠেছে, তারা নিষ্কম্প দেহে সাঁকো পার হ'তে পারে না।

আয়ুবের মস্‌জিদ, 'স্বর্ণ-শৃঙ্গের' প্রান্তে, আয়ুব নামক প্রেরিত পুরুষসখার গোরস্থানে, দ্বিতীয় মহম্মদ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়েছিল।

খৃষ্টানদের চিরকালই সেখানে প্রবেশ নিষেধ, এবং চতুর্কিলের রাস্তাও তাদের পক্ষে নিরাপদ নয়।

এই স্মৃতিমন্দিরটি শাদা মার্ব্বল পাথরে নির্ম্মিত; ইহা একটি নির্জ্জন স্থানে, সহরের বাহিরে স্থাপিত, এবং চারিদিকে গোরস্থানবেষ্টিত। প্রকাণ্ড প্লেনবৃক্ষ ও সহস্রবর্ষীয় সাইপ্রেসবৃক্ষের শ্যামল আবরণের মধ্য থেকে তার গম্বুজ ও মিনারগুলি অল্প অল্প দেখা যায়।

এই গোরস্থানের রাস্তাগুলি অত্যন্ত ছায়াবিত ও অন্ধকার,

পাথর বা মার্ব্বল-বসানো, এবং অধিকাংশই নীচু। দুইধারে মার্ব্বলনির্ম্মিত বহুপুরাতন অট্টালিকার পাড়, তার ধব্‌ধবে শাদা রঙ্ সাইপ্রেস্‌গাছের ঘোর বর্ণের গায়ে সুস্পষ্ট রেখাঙ্কিত হচ্ছে।

শত শত সোণালী, পুষ্পভূষিত গৌরস্তম্ভ এই পথগুলির ছায়ায় সমবেত; এ সকল স্তম্ভ প্রাচীন পাশা ও বড় বড় মুসলমান ওমরাহ প্রভৃতি শ্রদ্ধেয় মৃতব্যক্তির জন্য নির্ম্মিত। ইহারই মধ্যে কোন এক নিরানন্দ পথে সেখ-উল-ইস্‌লামগণের সমাধিমন্দির অবস্থিত।

সুলতানগণ আয়ুবের মস্‌জিদে অভিষিক্ত হন।

৬ই সেপ্টেম্বর, সকাল ছটার সময়, আমি আয়ুবের মসজিদের দ্বিতীয় অন্তর্প্রাঙ্গণে প্রবেশ লাভ করতে পেরেছিলুম।

প্রাচীন স্মৃতিমন্দিরটি জনশূন্য ও নিস্তব্ধ ছিল; দুজন দর্ব্বিশ আমার সঙ্গে ছিল,—এই কার্য্যের দুঃসাহসিকতায় তারা কম্পিত-কলেবর। আমরা বাক্যমাত্র ব্যয় না করে' মারবলের উপর দিয়ে চলতে লাগলুম। এই প্রাতঃসময়ে মস্‌জিদটি বরফের মত শাদা দেখাচ্ছিল; নির্জ্জন প্রাঙ্গণে শত শত পায়রা উড়ছিল ও খাদ্য সংগ্রহ করে' বেড়াচ্ছিল।

সেই দুই চটের কাপড়পরা দর্ব্বিশ পবিত্র নিকেতনের সম্মুখীন চামড়ার পরদা তুলে' ধরলে, এবং যে স্থান ইস্তাম্বুলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুণ্য, যে স্থান ইতিপূর্ব্বে কোন খৃষ্টান চক্ষে দেখতে পায়নি, সেই অতি শ্রদ্ধেয় স্থানে আমার দৃষ্টি নিহিত হ'ল।

সে দিন সুলতান আবদুল হামিদের অভিষেকের পূর্ব্ব দিবস।

আমার মনে আছে যেদিন নূতন সুলতান মহা সমারোহে রাজপ্রাসাদ দখল করতে আসেন। তুরস্কদেশে সিংহাসন-উত্তরাধিকারীদের যে প্রাচীন সেরালিওর অন্ধকার নিভৃত স্থানে

আবদ্ধ রাখা হয়, সেখান থেকে তিনি যখন বাহির হন আমি তাঁর একজন সর্ব্বপ্রথম দর্শক ছিলুম; অনেক উৎসববেশে সজ্জিত বড় বড় "কায়ীক" তাঁকে আনতে গিয়েছিল, এবং আমার কায়ীকটি তাঁর ঠিক লাগাও ছিল।

এই কয়দিনের রাজত্বেই সুলতানকে এরই মধ্যে বৃদ্ধ করে' ফেলেছে; তখন তাঁর মুখে একটি তেজস্বিতা ও যৌবনের ভাব ছিল এখন আর তা' নেই। তাঁকে সহসা যে প্রাচ্য বিলাসিতা দ্বারা ঘিরে ফেলা হয়েছিল তার সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত সাদাসিধে বেশ বৈষম্য সাধন করছিল। এই যে মনুষ্যকে অপেক্ষাকৃত সামান্য অবস্থা থেকে উদ্ধার করে' অপ্রতিহত ক্ষমতাশিখরে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য নিয়ে যাচ্ছিল তিনি যেন গভীর দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন; তাঁকে তখন শীর্ণ, পাংশু, বিষণ্ণচিত্ত দেখতে ছিল, এবং তাঁর বড় বড় চক্ষু কালিমাবেষ্টিত, ও মুখাবয়ব উন্নত ও বুদ্ধিব্যঞ্জক।

সুলতানের প্রত্যেক কায়ীক ছাব্বিশ জন দাঁড়ী দ্বারা চালিত। কায়ীকের গঠনে প্রাচ্যদেশের স্বকল্পিত সুচারু শ্রী লক্ষিত হয়; সেগুলি অতি জমকালো, সর্ব্বাঙ্গখোদিত ও স্বর্ণমণ্ডিত, ও সম্মুখে একটি স্বর্ণমুণ্ডশোভিত। প্রাসাদের ভৃত্যদের বেশ সবুজ ও কমলানেবুর রঙের, তার উপর জরির কাজ। সুলতানের সিংহাসন অনেক সূর্য্যমূর্ত্তি দ্বারা ভূষিত এবং একটি লাল ও সোণালী মঞ্চের উপর স্থাপিত।

আজ, ৭ই সেপ্টেম্বর, একজন সুলতানের অভিষেকরূপ বৃহৎ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হ'ল।

দেখে শুনে মনে হয় যে, আবদুল হামিদ খলিফদের মত প্রতিপত্তি লাভ করবার জন্য ব্যস্ত; হ'তে পারে যে, তাঁর আগমনে

ইস্লামে এক নূতন যুগের উদয় হবে, এবং তুরস্কদেশে এখনও কিঞ্চিৎ গৌরব ও শেষ সমৃদ্ধিরশ্মি দেখা যাবে।

আবদুল হামিদ মহা সমারোহে অটমানের তলোয়ার কটিবদ্ধ করবার জন্য আয়ুবের পুণ্য মস্‌জিদে গিয়েছিলেন।

তারপরে, দীর্ঘ অমকালো অনুচরশ্রেণীর অগ্রবর্ত্তী হ'য়ে, তুরস্কের যথারীতি সপ্তম সব মস্‌জিদ ও সমাধিমন্দিরে থেমে নমাজ পড়তে পড়তে গ্রীচীন সেরালিওর প্রাসাদ অভিমুখে সম্রাট ইত্যাদি অতিবাহিত করলেন।

প্রথমে সঙ্গীনধারীগণ যেতে লাগল, তাদের মাথায় লম্বা লম্বা সবুজ পালকের গুচ্ছ, গায়ে লাল জরির কাপড়।

তাদের মধ্যে আবদুল হামিদ ঘোড়ায় চড়ে' অগ্রসর হ'তে লাগলেন। তাঁর ঘোড়ার গাত্রবস্ত্র জরিজহরৎখচিত, রঙ্ ধব্‌ধবে সাদা, এবং চাল ধীর ও গম্ভীর।

সবুজ জোব্বাপরা সেখ-উল-ইসলামগণ, কাশ্মীরের শালের পাগড়িপরা আমীরগণ, সাদা জরির পাগড়িপরা উলেমাগণ, মহা মহা পাশা ও ওমরাহগণ সকলে জরিতে ঝলমলায়মান অশ্বপৃষ্ঠে অনুগামী হলেন,—এই গম্ভীর ও অফুরাণ জনস্রোতে যে কত্তরকমই অসাধারণ মুখাবয়ব চোখে পড়ছিল!—কোন কোন উলেমার বয়স আশী বৎসর, শান্ত ঘোড়ার উপর ভৃত্যগণ তাদের ধরে' রেখেছে, তাদের প্রেতসদৃশ এবং ধর্ম্মোন্মত্ত অন্ধকার দৃষ্টি সকলে দেখতে পাচ্ছিল।

এই যাত্রীদলের চারদিকে অসংখ্য লোক ঝুঁকে পড়েছিল, সে তুরস্ক জনতার তুলনায় পাশ্চাত্য শোভনতম জনতাও শ্রীহীন ও ম্লান মনে হয়। বহুযোজনব্যাপী মহা কৌতূহলাকৃষ্ট লোক তাতে খবমত, তাতে ইউরোপ ও আমিরীর সকলপ্রকার পরিচ্ছদ দেখিতে হয়েছিল।

আয়ুবের উচ্চ জমির উপর তুরস্ক মেয়েদের চমৎকার সমাগম দেখা যাচ্ছিল। সকলেরই পা পর্য্যন্ত উজ্জ্বল রঙের রেশমী কাপড়ে ঢাকা, মাথায় মাঘাক্কের পাতা ঘোমটা দেওয়া, তার মধ্যে থেকে কালো কালো চোখ দেখা যাচ্ছে; এই সকল নারীদের লাইপ্রেমের তলায় রঙ্-করা চিত্রিত গোরস্তুদের সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। সবসুদ্ধ এমন রঙীন্ ও অদ্ভুত দেখাচ্ছিল যে, এটা কোন বাস্তব দৃশ্য, বা কোন স্বপ্নাবিষ্ট প্রাচ্যদেশীয় লোকের খেয়ালী কল্পনা তা বোঝা যাচ্ছিল না।

সামুয়েল ফিরে আসাতে আমার নিরানন্দ গৃহে একটু আমোদের সঞ্চার হয়েছে। পেরার জুয়াখেলায় আমার প্রতি ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্ন, এবং প্রাচ্যদেশে শরৎকাল চমৎকার। আমি পৃথিবীর একটি সুন্দরতম প্রদেশে বাস করছি, এবং আমার স্বাধীনতা সীমাহীন। আমি ইচ্ছামত য়ুরোপ বা আসিয়ার তীরস্থ গ্রাম, পাহাড় ও বনে বনে ঘুরে বেড়াতে পারি, এবং আমার একটি দিনের ঘটনা ও ভাবতরঙ্গে অনেক হতভাগ্য লোকে এক বৎসর কাটিয়ে দিতে পারত।

সুলতান আবদুল হামিদকে আল্লা দীর্ঘজীবী করুন, তিনি ইস্‌লামের বড় বড় ধর্ম্মোৎসব এবং মহান্ অনুষ্ঠানের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করছেন; রোজ সন্ধ্যাবেলায় ইস্তাম্বুল দীপশোভিত, বসফরস্ রঙ্-মশালে আলোকিত, মুমূর্ষু প্রাচ্যদেশের অস্তিম রশ্মিরেখা, এরকম অলৌকিক মহাসুন্দর দৃশ্য নিশ্চয়ই আর কখনো দেখা যাবে না। আমার রাজনৈতিক ঔদাসীন্য সত্ত্বেও, এই যে সুন্দর দেশকে কলের চিমনীর চেষ্টা চলছে, সে দেশের সঙ্গে আমার মহানুভূতি আছে, এবং আমি অজ্ঞাতসারে ক্রমে ক্রমে তুর্কী হ'য়ে পড়ছি।

ইজেদিন আলির বাড়ি যাবার অভিপ্রায়ে আমি কাল সন্ধ্যা-বেলা ইস্তাম্বুল পার হচ্ছিলুম। তখন বায়রামের মহোৎসব চলছিল, অলৌকিক সুন্দর মহান্ প্রাচ্য দৃশ্য, রামজানের শেষ ছবি: সব মস্‌জিদ দীপালোকিত; মিনারগুলি চূড়ান্ত পর্য্যন্ত দেদীপ্যমান; কোরাণের শ্লোক জলন্ত অক্ষরে আকাশে ঝুলানো; শত সহস্র লোকমুখে, একই সময়ে, বজ্রনিনাদে, আল্লার পূজনীয় নামোচ্চারণ; উৎসববেশে এক বৃহৎ জনতার অসংখ্য লণ্ঠন ও মশাল রাস্তায় রাস্তায় আস্ফালন; স্বর্ণ রৌপ্য ও রেশমী বস্ত্রে সজ্জিত ঘোমটাচ্ছন্ন রমণীর দলে দলে পরিভ্রমণ। * *

পেরায় থেকে থেকে আমার বিরক্তি ধরে' গেছে, এখান থেকে গৃহস্থালী তুলে' ফেলচি; আমি পুরাতন ইস্তাম্বুলে বাস করতে যাচ্ছি, ইস্তাম্বুলেরও বাহিরে, অযুবের পবিত্র সহরতলিতে।

সেখানে নিজেকে আরিফ এফেন্দি নামে পরিচয় দিয়েছি; আমার নাম ও অবস্থা সেখানে অজানিত। আমার জাত সম্বন্ধে প্রতিবেশী মুসলমানগণের তিলমাত্র সন্দেহ নেই; কিন্তু তাতে তাদের কিছু আসে যায় না, আমারও না।

এখানে আমি ডীয়রহাউণ্ড থেকে দুঘণ্টার পথ দূরে, গ্রাম্য পল্লিগ্রামে, নিজস্ব একটি বাড়িতে আছি। এই পাড়াটি তুরস্ক, ও যতদূর ছবির মত হ'তে পারে; একটি গ্রাম্য রাস্তা, সেখানে দিনের বেলা নূতন ধরণের জীবনের খেলা দেখতে পাওয়া যায়; বাজার, কফিশালা ও তাম্বু, এবং বাদাম গাছতলায় বসে' বসে' গম্ভীর দর্ব্বিশদের নারগিলেতে তামাক খাওয়া।

একটি স্তম্ভাকার, শাদা মার্ব্বলের পুরাতন ফোয়ারাশোভিত ক্ষেত্র আছে, মধ্যদেশ থেকে জিপ্‌সি, বাজিকর, ভাল্লুকনাচ,

যা কিছু আসে, এখানে তার সঙ্গমস্থান। এই ক্ষেত্রের উপর একটি নিঃসঙ্গ বাড়ি, সেটি আমাদের।

একতলায় একটি লম্বা, চূণকামকরা বরফের মত শাদা ঘর, সেটা খালি। (সেখানে কেউ এসে লুকিয়ে রয়েছে কি না দেখবার জন্য আমরা কেবল রাত্রে শুতে যাবার আগে একবার সেটা খুলে দেখি। সামুয়েলের বিশ্বাস ঘরটা ভূতুড়ে।) দোতলায় আমার ঘর, তার তিনটে জানলা থেকে উল্লিখিত ক্ষেত্র দেখা যায়; এবং সামুয়েলের ছোট ঘর, ও 'হারে মলিখ,' তার পূর্ব্বদিক থেকে 'স্বর্ণশৃঙ্গ' দ্রষ্টব্য। আর একতলা উপরে উঠলে ছাদে গিয়ে পড়তে হয়, সেটা আরবী ছাদের মত সমান; একটি আঙুরের লতা সেখানে ছায়া দান করে, কিন্তু নবেম্বরের বাতাসে সেটা এরই মধ্যে অনেকটা শুখিয়ে এসেছে। আমার বাড়ির ঠিক পাশেই, একটি পুরাতন গ্রাম্য মস্‌জিদ আছে। তার মোল্লা আমার বন্ধু, যখন সে তার মিনারে চড়ে তখন আমার ছাদের সমান উঁচু হয়, ও নমাজ পড়বার আগে আমাকে বন্ধুভাবে এক সেলাম করে।

উপর থেকে দৃশ্যটি সুন্দর। 'স্বর্ণশৃঙ্গের' প্রান্তে আয়ুবের বিষণ্ণ প্রাকৃতিক চিত্র; বহু প্রাচীন বৃক্ষের এক রহস্যময় ভিত্তির মধ্যে থেকে তার পবিত্র মর্ম্মরধবল মন্দিরের শির উত্তোলন; তারপরে ঘোর রঙের নিরানন্দ পাহাড়শ্রেণী, তার মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মর্ম্মর স্তম্ভ ও প্রকাণ্ড গোরস্থান, যেন প্রকৃত মৃত্যুর রাজ্য।

ডানদিকে, সহস্র সোণালী কাম্রীককর্বিত 'স্বর্ণশৃঙ্গ', ও অয়ের মধ্যে সমগ্র ইস্তাম্বুল, মস্‌জিদগুলি পরস্পর সংলগ্ন, গম্বুজ ও মিনারে মিনারে মিশে গেছে।

ঐ ওখানে, অতি দূরে, শাদা বাড়ি রোপিত একটি পাহাড়; মোটা পেরা, খৃষ্টানদের নহর, এবং তারই অন্তরালে 'ডীয়র-হাউণ্ড' অবস্থিত। ৯ ৯

আয়ুবের এই পাড়ায় আমি অতকটা আদুরে ছেলের মত হয়ে পড়েছি, এবং সামুয়েলও এখানে খুব সমাদৃত হয়।

আমার প্রতিবেশীরা প্রথমে একটু সন্দিগ্ধভাব ধারণ করেছিল, কিন্তু এই যে অমায়িক অপরিচিত লোকটিকে আল্লা তাদের কাছে পাঠিয়েছেন, যার সম্পর্কীয় সকলি ওদের পক্ষে রহস্যময়, তাঁকে এখন তারা সৌজন্যে অভিভূত করে' ফেলে।

দর্বিশ হাসান এফেন্দি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে দ্বন্দ্বটা বাক্যালাপান্তে এইরূপে তাঁর সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করলেন :—

'তুমি এক অদ্ভুতরকমের লোক, তুমি যা কর সকলি আশ্চর্য্য। তোমার খুব অল্প বয়স, নিদেন দেখে ত তাই মনে হয়, অথচ তুমি এমন সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন কর যা' বয়স্ক লোকেরও সব সময়ে আয়ত্তাধীন নয়। আমরা জানিনে তুমি কোথা থেকে এসেছ, এবং তোমার জীবিকা নির্ব্বাহের কোন প্রত্যক্ষ উপায় দেখচিনে। এরই মধ্যে তুমি পৃথিবীর পঞ্চভাগের সকল স্থানে ভ্রমণ করেছ; তোমার জ্ঞানের পরিমাণ আমাদের উলেমাগণ অপেক্ষা বেশী; তুমি সব জান এবং সব দেখেছ। তোমার বয়স কুড়ি বৎসর, বাইশ হয়ত কিন্তু তোমার রহস্যের অতীত জীবন ধারণ করবার জন্য একটি সম্পূর্ণ মনুষ্য-পরমায়ুও যথেষ্ট হয় না। পেরার ইয়ুরোপীয় সমাজের প্রথম শ্রেণীতে তোমার স্থান হ'ত, অথচ তুমি এতদেশ থাকতে একটি ইহুদী পথের ছেলেকে বন্ধুত্বে বরণ করে' আয়ুবে থাকতে এসেছ।

তুমি এক অদ্ভুত লোক; কিন্তু আমি তোমাকে দেখে সুখী হলুম, এবং আমাদের মধ্যে থাকতে এসেছ শুনে পরমানন্দ লাভ কর-লুম।'"

রোপণীর গান।

বাঙ্গলায় বারমাসে তের পার্ব্বণ, কিন্তু বেহারে বোধ করি তার চেয়ে ঢের বেশী। ইহার কারণ বেহারের লোকের আমোদ-প্রিয়তা। বাঙ্গালীর তুলনায় বেহারীর ঘরে ভাত নাই বলিলেও চলে—বাস্তবিক সাধারণতঃ বেহারবাসীর এমনি দারিদ্র্য—কিন্তু আনন্দের ওড়নাতে সচরাচর তাহারা দুঃখদারিদ্র্যের জীর্ণ কন্থা, শীর্ণ দেহ আবৃত করিয়া রাখিয়া দেয়। নানা কারণে বাঙ্গালী অকালপক্ক—জ্যেঠামি কথাটা বঙ্গভাষার নিজস্বসম্পত্তি এবং বাঙ্গালীর নিজের জাতীয় বিশেষণ। বেহারী কিন্তু এখনও কিশোর বালক—হাসিতে খেলিতে তার সরম হানি হয় না। বাঙ্গলার ম্যালেরিয়া ধীরে ধীরে বেহারে প্রবেশ করিতেছে, বাঙ্গালীর জ্যেঠামীর পদার্থ বিলম্বিত হউক!

এই আমোদ-প্রিয়তা বেহার-সমাজের উচ্চ নীচ সকল স্তরেই প্রায় সমান প্রবল এবং ইহা বোধ করি মুসলমান সভ্যতার অতিরিক্ত অনুকরণের ফল। বঙ্গের ন্যায় বেহার ইদানীন্তন অনেক দিন ধরিয়া ব্রাহ্মণ-নেতৃত্বে পরিচালিত নহে—বেহার সমাজের শাসনদণ্ড "লালা ভাইয়ারা" কত দিন হইতে কাড়িয়া লইয়াছেন, সেটা ঠিক করিয়া বলিতে আসিবার দরকার হয় না।

ফলতঃ বেহারী কায়েতেরা আচার ব্যবহারে মুসলমানদের খুব কাছাকাছি যান—তাঁহাদের টোপি হইতে পায়জামা পর্যন্ত সকল তাতেই সহস্রীর মুন্সী-আনা। এই কায়স্থ-চালিত সমাজ সহজেই কিছু আমোদপ্রিয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

লালাভাইদের কথা যদি উঠিল, তবে একটা উদাহরণ দিয়া তাঁহাদের বিলাসিতা এবং তাহার অনিবার্য্য ফলস্বরূপ অপরিণামদর্শিতা কত, বুঝাইয়া দিই। মুন্সী প্যারীলাল কায়েতদের বিবাহ-ব্যয় সঙ্কোচের জন্য যখন জীবন উৎসর্গ করিতেছিলেন, এ ঘটনা তাহার প্রায় সমসাময়িক। এক বড়মানুষ কুলীন কায়েত আর এক বড়মানুষের কন্যার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিবেন—পণ প্রায় সর্ব্বস্ব। কেন না, "বরিয়াতে" যে রকম ধূমধাম করা হইল, তাহা বরের পিতার অবস্থার সহস্রগুণ অতিরিক্ত। রাজা মহারাজার পক্ষেও ততটা বাড়াবাড়ি শোভা পায় না। পাত্রপক্ষ আপনার ধনগৌরবে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া সমাগত নিমন্ত্রিতদের জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আর কিছুর অভাব আছে কি না? নিমন্ত্রিতদের ভিতর একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তিনি একটু স্পষ্টবাদী এবং কুটুম্বের অতিরিক্ত আড়ম্বরিতে কিছু চটিয়া গিয়াছিলেন। আর কেহ কিছু বলে না দেখিয়া তিনি পাত্রের পিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"অতার আর কিছুরই নাই—কেবল একটী চয়কার। পুত্র এবং পুত্রবধূর গুজরাণের উপায় তা' ছাড়া আর কি রহিবে!"

পর্দ্দার নিয়ম বড় কড়াকড়ি, অতএব হাবিলীতে আমোদ-স্রোত কতটা প্রবল ঠিক্ বলা যায় না। কিন্তু ছোটলোকের মেয়েছেলেরা যে বড় আমোদপ্রিয়, বেহারে যে কেহ কিছুদিন বাস করিয়াছেন, তিনিই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন; নিম্নশ্রেণীর

স্ত্রীলোকেরা আপন আপন সংসারের বিস্তর কাজ করিয়া থাকে, না করিলে তাহাদের চলে না। কাজগুলোকে এক একটা আনন্দের আবরণ দিয়া তারা বেশ আমোদজনক করিয়া তোলে। "রোপণীর গান" এই রকম একটা কেজো আমোদের ব্যাপার।

নূতন বর্ষা সমাগমে মাঠে জল দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ধান্য "বীচ্" রোপণের এই সময়। বপনের ক্ষেত হইতে রোপণের ক্ষেত্রে রাশি রাশি বীচের "আটি" আসিয়া স্তূপীকৃত হইতেছে। জলে কাদায় মাখামাখি হইয়া সুন্দরীগণ মহোল্লাসে তাহা রোপণ করিতে বসিয়া গিয়াছেন, আর সমস্বরে গলা ছাড়িয়া গান ধরিয়াছেন। ইহাই রোপণীর গান। এক এক ক্ষেত্রে বিশ ত্রিশ চাই কি এক শত রোপণী—অধিকাংশই যুবতী, সঙ্গমে তাঁহাদের স্বরলহরী উঠিয়া দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। অদূরে ক্ষুদ্র শৈলমালার নবীন হরিৎশোভা আবৃত করিয়া নবঘন মেঘের সারি নামিতেছে—শৈলপ্রান্তে কোথাও ময়ূরের কেকারব বর্ষার উৎসব ঘোষণা করিতেছে, শৈলপাদমূলে বিস্তৃত কোমল তৃণের মাঠে হরিণযূথ চরিয়া বেড়াইতেছে। গানের আনন্দের সময় বটে। রোপণীর গানের বাস্তবিক উপযোগিতা আছে।

গানগুলো সবই যে ছন্দোবদ্ধ কবিতাত্মক তা' নয়। কখন কখন রোপণের জন্য রচিত পুরাতন গান গীত হয় বটে, কিন্তু অধিকাংশ গান রোপণীরা নিজে মুখে মুখে রচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ গাইয়া থাকে। তাহার বিষয় বলা বাহুল্য নারীজাতির চির-পদানত গরিব পুরুষের দল। সে পথে পুরুষ গেলে সুরসংযুক্ত বাক্যবাণে তাঁহাকে ক্ষত বিক্ষত হইয়া আসিতেই হইবে। প্রবন্ধ লেখক একবার হস্তীপৃষ্ঠে যাইতে যাইতে এই রকম বিপদে পড়িয়াছিলেন। প্রায় ত্রিসপ্ত সুন্দরীর কোমল কণ্ঠ দূর

হইতে সপ্তমে উঠিতেছিল, গানের সবটা বুঝিতে পারিলাম বলিলে বড়াই করা হয়। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, মন্দগামী হাতী আর তাহার অঞ্চল পোষাক-আঁটা সওয়ারের বর্ণনায় যুবতীরা ভারি আমোদ উপভোগ করিতেছিলেন।

রোপণীর গানের একটা নমুনা দিতেছি। তার একটা অনুবাদও করিয়া দিলাম। কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলিয়া রাখি ইতর-জাতীয় স্ত্রীদের হিন্দী তেমন সহজে বোধগম্য নহে। হিন্দী-নবীশ ক্ষমা করিবেন।

গান।

পত্‌লিহে আম্‌কে ভাল, ডগার বীচে ক্যাওরে-খাড়ি।
কিয়া তোরা নইহর দূর, কিয়া তুকে শাশু লড়ি॥
না মোরা নইহার দূর, নাহি মুঝে শাশু লড়ি।
স্বামী গিয়া পরদেশ, হাম বাট্ যোহোঁ॥
ছোড়দে বিদেশীয়াকে আশ, মতি মাঙ্গে ভরো॥
আগি লাগো মতিমাঙ্গ, বজরা খসো তোরা সুরৎ।
মোর পিয়া লওটে বণিজার, মতি বরদে লদি॥
স্বামী গিয়া পরদেশ, সদা সুখ দেরে গেয়ি।
আঙ্গনা চুনোয়াকে গাছ, হেঁড়োলওয়া লাগারে গেয়ি॥
লালি লাল চুনরী রাঙ্গায়ি গিয়া॥
স্বামী গিয়া পরদেশ, সদা দুখ দেরে গিয়া।
ছাতিয়া হি বজরা কেওয়াড়া জাঙ্গিরে পেয়ারে দেরে গেয়ি॥
শোয়ে রহি মুঝে রাত্ একেলে, স্বামী ইয়াদ্ পড়া।
কাহে লাগি লাগে ঘনি বাগ, কাহে আঁখি নিঁদ নেহি॥
কাহে বিনু শুনা আঙ্গানোয়া, ওকাহে বিনু শুনা শেজা।
কৈছে প্রাণ বোধব, ও কাহে বিনু শুনা অযোধা॥
শাশু বিনা শুনা আঙ্গানোয়া, স্বামী বিনু শুনা শেজা।
বালক বিনু শুনা অযোধা, কৈছে প্রাণ বোধব॥

গাছেয়া রহে পুরবৈয়া গে ননদি।
সীতো না ডোলে গে ননদি তোরা ভাইয়া বিনু॥
কোও না রাঙ্গা মুঙ্গুয়া, কোও না রাঙ্গা মতিয়া।
কোও না রাঙ্গা হ্যায় ননদি তোরা ভাইয়া॥
লাল রঙ্গা মুঙ্গয়া, ও জরদ রঙ্গা মতিয়া।
ও শামর রাঙ্গা হ্যায় মোরা ভইয়া গে ভোজি॥
ফাটল চাদরি, পুরাণ ধোতিয়া।
ভাইয়া লাজ নে আবেগা গে ভোজি॥
বেরিবারে জলু ননদি তোর ভাইয়া।
বাৎ না শুনে গে ননদিয়া, তোরা ভাইয়া॥
শাশু মোরে আঁধারি, ননদ হে নৈদান।
কাহে স্বামী গেইলে পুরবি বণিজিয়া গে ননদিয়া॥
বেরি বারে জলু সৈঁয়া মাৎ যাউ পুরবি বণিজিয়া।
পুরবাকে পানি খারাব।
নান্‌হে উমার স্বামা, সাধালে তামাকুয়া জরি জৈতো কমলা করেঙ্গ॥
গাড়ী যো আটকা আহলা চাহাল মে।
ও দুমু নয়না বাণারস আটকি॥
আগিয়ো না শুলগে হামারা গে ননদি তোরা ভাইয়া বিনু॥

অনুবাদ।

"কে তুমি পথের মাঝে, দাঁড়ায়ে রয়েছ ধনি,
কোমল চূতশাখা প্রায়,
পিতার ভবন তব, দূর কি এখান হতে—
শাশুড়ী কি বকেছে তোমায়?"
"নইহার * নহে দূর, কলহ করিনি আমি
পরবাসী স্বামী পথ চাই।"

* নইহার—বাপের বাড়ী।

"ও ধনি ছাড়িয়া দেহ, বিদেশীর প্রেম আশা,
মতিহারে সিঁতি ভরি দেই।"
"পুড়ে যাক্ সিঁতিশোভা, শিরে বাজ হানি তোর,
স্বামী মোর ফিরিবেন যবে।
বলদের পিঠে ভরি বাণিজ্যের লব্ধধন
মতিরাশি আনিবেন তবে॥
কুমারী বয়সে মোর, পিতা গেলে পরবাস,
দুখে কাটিত জীবন।
অঙ্গনে চন্দন-তরু রোপিয়া, ঝুলনা তায়
করেছিলা যতনে বন্ধন॥
পতি গেল পরদেশ, দুখে কাটে নিশিদিন,
শিলা যেন চাপে হিয়া মাঝ।
দ্বারেতে শিকলি আঁটি, গৃহে একা রাখি মোরে
গেলা প্রভু, এই তাঁর কাজ!
নিশীথে শয়নে রই, নিনিদ্র নয়নে চাহি,
ঘনঘোর লাগে চারিধার,
শূন্য মন্দির মাঝে শূন্য হৃদয় মম
পিয়া বিনু আঁধার সংসার॥
কি ভাবে পরাণ রাখি, শূন্য প্রাণ, শূন্য ক্রোড়,
নাহি শিশু জুড়াতে জীবন।
পূরবে পশ্চিমে বায়ু, তবু প্রাণ পুড়ে যায়
ও ননদি বিরহ এমন॥
ননদি গো ভুলে গেছি, ভাইয়ের মূরতি তোর
—প্রবালের লোহিতাভা তাঁর।
মতির মতন সে কি লালে ঢল ঢল শোভা,
—বল্ সখি কাহিনী তাঁহার॥"
ননদি হাসিয়া কয়, "ভাই মোর শ্যামরায়
নহে লাল সোণার বরণ।

দীনবেশে তোর পাশে, আসিতে সে লাজ বাসে,
তাই বউ বিরহ বেদন ॥"
বধূ বলে "ও ননদি, করি মানা বারবার
তবু পিয় না বুঝে মরম।
অন্ধ শাশুড়ী মোর, নৈদান * ননদিনী
কিসে রহে কুলের ভরম ॥
পুরবে বাণিজ্য তরে, গিয়াছে বঁধুয়া মোর
হাওয়া পানি খারাব সেথায়।
তাম্রকুট ধূমপানে বালকের দশা সম,
জ্বলি যাবে কোমল হৃদয় ॥
কর্দ্দমে শকট প্রায় প্রভুর নয়ন দুটি
আট্‌কি গিয়াছে কোন্ দেশে।
ননদিলো প্রেমতৃষা, ধীকি ধীকি জ্বলে মোর
বল্ প্রাণ ধরি কোন্ আশে ॥"

শ্রীগীতচিন্তামণি।

আমরা কোন বন্ধুর নিকট হইতে "শ্রীগীতচিন্তামণি" নামক একখানি হস্তলিখিত কীটদষ্ট প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছি। "পদকল্পতরু" ও "পদকল্পলতিকা" প্রভৃতির ন্যায় এখানিও বৈষ্ণব মহাজনগণের পদাবলীর সংগ্রহ-পুস্তক। কিন্তু ইহার সংগ্রহকার কে, এবং কতদিন হইল ইহা সংগৃহীত হইয়াছে জানিবার উপায় নাই। যে পুঁথিখানি আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহা ১৬৮৬ শকাব্দে প্রতিলিপীকৃত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষে এইরূপ লিখিত আছে—"স্বাক্ষর শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ দাস

* নৈদান—নির্ব্বোধ।

শকাব্দা ১৬৮৬॥ সন ১১৭১॥ তারিখ ২৭ আষাঢ় ..... শুক্লপক্ষে দশম্যাম্ভিথৌ ..... নব দণ্ড মধ্যে মোকাম কাপসাগ্রামে গ্রন্থ সম্পূর্ণ॥ .....যথাদৃষ্টং তথালিখিতং॥ ... ইতি॥" আমরা অনুসন্ধানে অবগত হইলাম, এই কাপসাগ্রাম কাটোয়া উপবিভাগের নিকটবর্ত্তী।

উক্ত গোবিন্দপ্রসাদ দাস এই গ্রন্থ নকল করিবার সময় অতিশয় পুরাতন জীর্ণদশাগ্রস্ত পুস্তকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন বোধ হয়। কোন কোন কবিতার কিয়দংশ তিনি প্রতিলিপি করিতে অসমর্থ হইয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। এবং অনেকগুলি কবিতা পরে অন্য কোন কীর্ত্তনজ্ঞ বৈষ্ণব কর্ত্তৃক সংশোধিত হইয়াছে। এই কারণে অনুমান হয়, অন্ততঃ আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের আর এক নাম "কণদা"। প্রতি পরিচ্ছেদের শেষে প্রথম দ্বিতীয় ইত্যাদিক্রমে "কণদা," এই শব্দ লিখিত আছে। সাধারণতঃ "কণদা" নামেই এই গ্রন্থ পরিচিত।

শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ব্ববর্ত্তী জয়দেব ও বিদ্যাপতি এবং তাঁহার পরবর্ত্তী গোবিন্দ দাস, বলরাম দাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি প্রায় ত্রিশ জন কবির পদাবলী এই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে বিদ্যাপতি, গোবিন্দ দাস, হরিবল্লভ, জ্ঞানদাস, নরোত্তম দাস প্রভৃতি কয়েক জনের কবিতা বা গীতাবলীই অধিক। জয়দেব, সনাতন গোস্বামী ও রায় রামানন্দের রচিত কতকগুলি সংস্কৃত গানও ইহাতে পরিবেশিত হইয়াছে। এই পুস্তকের অধিকাংশই রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা-সম্পর্কিত সঙ্গীতাবলীতে পরিপূর্ণ, গৌরাঙ্গবিষয়ক পদাবলী কুড়ি পঁচিশটার বেশী নহে। এই গ্রন্থে চণ্ডীদাসের কবিতা একটীও দেখিতে পাইলাম না। তবে কয়েকটী

কবিতার ভণিতা নাই, তাহা কাহার রচিত বলা যায় না। এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে কি অদ্যাপি হস্তলিখিত পুঁথির আকারেই আছে, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই।

গ্রন্থের আরম্ভে সংগ্রহকার মঙ্গলাচরণ স্বরূপ শ্রীচৈতন্যের বন্দনাসূচক এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"নিজপ্রণয়িতা সুধামুদয়মাপ্নুবন্ যঃ ক্ষিতৌ
কিরত্যলমুরীকৃতদ্বিজকুলাধিরাজস্থিতিঃ।
স লুম্পিততমস্ততির্ম্মম শচীসুতাখ্যঃ শশী
বশীকৃত জগন্মনাঃ কিমপি শর্ম্ম বিন্যস্যতু।"*

এই পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় বিদ্যাপতির এই পদটী আছে,—

"ধনি গো আজহু দেখলি বালা।
যব মন্দির বাহির ভেলা।
নবজলধরে বিজুরি রেখা দ্বন্দ্ব বাঢ়াইয়া গেলা।
সে যে অলপ বয়স বালা।
জনু গাথল পুহপ মালা॥
থোরি দরশনে আশ না পুরল বাঢ়ল মদন জ্বালা॥
গোরি কলেবর লোনা।
জনু আচরে উজোর সোণা॥
কেশরী জিনিয়া মাঝারি খিনা জুলহ লোচন কোণা॥
সাহ হুসেন অনুমানে।
পঞ্চ গৌড়েশ্বর জানে॥
চিরজীবী হউ পঞ্চ গৌড়েশ্বর কবি বিদ্যাপতি ভাণে॥"

* এই শ্লোকটী শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী বিরচিত "ললিতমাধব নাটক" হইতে গৃহীত। ইহার বঙ্গানুবাদ এই—যিনি ক্ষিতিতলে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় প্রেমরসামৃত বহুল পরিমাণে বিস্তৃত করিয়াছেন, এবং যিনি "দ্বিজকুলাধিরাজ" এই খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, যিনি অজ্ঞানতারূপ অন্ধকার সমূহ বিনাশ করিতেছেন, সেই জগন্মনোহারী শচীনন্দনশশী আমার অনির্ব্বচনীয় সুখবিধান করুন।

এই প্রথম পৃষ্ঠাতেই আবার নিম্নলিখিত রূপ ইহার পাঠান্তরও লিখিত আছে—

"গোধূলি পেখলুঁ বালা।
যব মন্দির বাহির ভেলা॥
থোরি দরশনে আশ না পূরল বাঢ়ল মদন জ্বালা।
সে যে গোরি কলেবর লোনা।
জনু আচরে উজর সোণা॥
কেশরী জিনিঞা মাঝারি ছিনা দুলহ লোচন কোণা॥
সে যে অলপ বয়েসে বালা।
জনু গাথল পুহপ মালা॥
নব জলধরে বিজুরি রেহা দ্বন্দ্ব বাঢ়াইয়া গেলা॥
সে যে নশিরা সাহ সে জানে।
যারে হানল মদন বাণে॥
চিরিঞীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর কবি বিদ্যাপতি ভাণে॥"

এই দুইটী কবিতার শেষে সাহ হুসেন ও নশিরা সাহের নাম রহিয়াছে। ইহার কারণ কি?

বিদ্যাপতি মিথিলাধিপতি মহারাজ শিবসিংহের সভাসদ্ ছিলেন। তৎসময়ে গৌড় বা বঙ্গদেশ বারেন্দ্র, বাগড়ি, বঙ্গ, রাঢ়, ও মিথিলা, এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল। বিদ্যাপতি স্বীয় প্রভু শিবসিংহের গৌরববর্দ্ধনের জন্য তাঁহাকে "পঞ্চ গৌড়েশ্বর" বলিয়া বর্ণনা করিবেন, ইহা অসম্ভব নহে; * কিন্তু সাহ হুসেনের সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ? আর ইনিই বা কে? ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়, সৈয়দ হুসেন সাহ নামা কোন উচ্চকুলো-

* বিদ্যাপতির আর একটী কবিতার শেষ চরণ এই—
"চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর কবি বিদ্যাপতি ভাণে।
রাজা শিবসিংহ রূপ নারায়ণ লছিমা দেই পরমাণে॥"

ভূত মুসলমান ১৪৮৯ খৃঃ অঃ হইতে ১৫১৯ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের তাৎকালিক রাজধানী গৌড়নগরের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। চৈতন্য ১৪৮৫ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যাপতি চৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী। বিদ্যাপতি অতিশয় বৃদ্ধাবস্থায় মিথিলারাজ নরসিংহদেবের রাজত্বকালে ১৩৯৫ হইতে ১৪০১ শকাব্দ (১৪৭৯ খৃঃ অঃ) মধ্যে "দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী" রচনা করিয়াছিলেন। * হুসেন সাহার রাজত্বকাল পর্য্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন কি না বলা যায় না। সাধারণতঃ চৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াই ইনি পরিচিত। আর জীবিত থাকিলেই বা স্বীয় কবিতার মধ্যে বিদ্যাপতি যবনরাজের নাম সংযোজিত করিবেন কেন? কেহ কেহ হয় ত এইরূপ মনে করিতে পারেন যে, হুসেন সাহ বঙ্গবিহারের মহাপ্রতাপশালী অধিপতি ছিলেন, তাঁহার সন্তোষ সাধনের জন্য বিদ্যাপতি এরূপ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের অনুমান অন্যরূপ।

হুসেন সাহ চৈতন্যদেবকে বিশেষ সম্মান করিতেন। মুসলমান রাজগণের মধ্যে ইনি অপেক্ষাকৃত ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। ইনি হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন না। শ্রীচৈতন্যের প্রধান শিষ্য শ্রীমৎ রূপ ও সনাতন গোস্বামী পূর্ব্বে ইহাঁরই প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। এই সকল কারণে তৎকালীন বৈষ্ণবগণের সহিত ইহাঁর বিশেষ সদ্ভাব ছিল। বোধ হয় এইজন্য পরবর্ত্তীকালের বৈষ্ণব অথবা কীর্ত্তন-গায়কেরা বিদ্যাপতির কবিতার মধ্যে ইহাঁর নাম সংযুক্ত করিয়া দিয়া থাকিবেন।

দ্বিতীয় কবিতাটীতে নশিরা সাহের নাম আছে। হুসেন সাহের পুত্রের নাম নশিরৎ সাহ। ইনি ১৫২০ খৃঃ অব্দে পিতৃ-

* বঙ্গদর্শন ১২৮২, জ্যৈষ্ঠ।

সিংহাসন অধিকার করেন। কীর্ত্তন-গী
বিদ্যাপতির রচনার মধ্যে ইহাঁর নাম স
এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত ন
অভিজ্ঞ কেহ যদি এবিষয়ের প্রকৃততত্ত্ব ম
আমরা আপ্যায়িত হইব।

আমরা এই হস্তলিখিত পুঁথি হইতে
দাসের দুইটী কবিতা অবিকল উদ্ধৃত
সংহার করিতেছি।

১

"শুনিয়া দেখিনু দেখিয়া ভুলিনু
ভুলিয়া পিরীতি কইনু।
পিরীতি বিচ্ছেদে মরয়ে জীবন
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মইনু॥
সই পিরীতি দোসর ধাতা।
বিধির বিধান সবে করে আন
না শুনে ধরম কথা॥
সভাই কহেন পিরীতি কাহিনী
কে বোলে পিরীতি ভাল।
কানুর পিরীতি ভাবিতে ভাবিতে
পাঁজর ধসিয়া গেল॥
পিরীতি পিরীতি তুলে তোলায়ন
পিরীতি গুরুয়া ভার।
পিরীতি বেয়াধি যাহার উপজল
সে বুঝে না বুঝে আর॥
কেনে হেন সই পিরীতি করিনু
দেখিয়া কদমতলে।
জ্ঞানদাস কহে এমন পিরীতি

।ক ছার কপালের ফুল ঘুচাক পাকাড় ॥
ছি ছি শরদের চান্দ ভিতরে কালিমা।
কি দিয়া করিম তোমার মুখের উপমা ॥
তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি।
না জানি কিবা দিয়া তোমা নিরমিল বিধি ॥
ধ্রু।
যতনে আনিয়া বিধি ছাকিয়া বিজুরি।
অমিয়ার সাচে যদি করএ পুতলি ॥
রসের সায়রে যদি করায়ে সিনান।
তভুত না হয় তোমার নিছনি সমান ॥
হিয়ার ভিতর থুইয়া নহে পরতীত।
দেখিবারে কান্দে আঁখি বড়ই অস্থিত ॥
মথিয়া সুধার সিন্ধু লইয়া তার সারে।
মোর হিয়ার পুতলি বিধি গঠিল তোমারে ॥
হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈলে বাহির।
তেই বলরামের পহুর মন নহে থির ॥"

সাময়িক সারসংগ্রহ।

লোকসংখ্যাবৃদ্ধি ও আহার্য্যসংস্থ

আপাততঃ অবস্থা ভাল বৈ মন্দ নহে। গ্রেটব্রিটনের লোকসংখ্যা অর্দ্ধ শতাব্দীরও কম সময়ে দেড় কোটি হইতে তিন কোটিতে পরিণত হইয়াছে; কিন্তু স্ট্যাটিষ্টিক্‌স্ অনুসন্ধানে জানা যায় যে, পূর্ব্বে লোকসংখ্যা অর্দ্ধেক থাকিতে প্রত্যেক ব্যক্তির আহারের পরিমাণ যাহা ছিল, এখন লোকসংখ্যা দ্বিগুণ হইলেও আহারের পরিমাণ তদপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিদেশী আমদানি খাদ্যসামগ্রীর ফর্দ্দ দেখিলে বুঝা যায় যে, পূর্ব্বে যেখানে প্রতি জনে ৪২ পৌণ্ড গম লাগিত, এখন সেখানে মাথাপিছু ২২০ পৌণ্ড করিয়া লাগে; শূকরমাংস পূর্ব্বে আমদানি ছিল না বলিলেই হয়, এখন জনহিসাবে গড়ে ১৪ পৌণ্ড করিয়া আসে; পনির ১ পৌণ্ড হইতে ৬ পৌণ্ডে উঠিয়াছে; ডিম ৪০০০০০০ হইতে ২২০০০০০০-এ দাঁড়াইয়াছে; ইহা ভিন্ন, চা চিনি মাখন চাউল প্রভৃতির আমদানিও কম নহে এবং য়ুনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্, কানাডা, আর্জেণ্টাইন রিপবলিক, নিউজিলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়া হইতে বরফে জমাইয়া মাংস চালান আসে।

এদিকে খাদ্যসামগ্রীর মূল্য যেমন হ্রাস হইয়াছে, লোকের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা স্বচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে। শ্রমজীবী শ্রেণীর বেতন এখন পূর্ব্বের দ্বিগুণ; সেবিংস্ ব্যাঙ্কে জমা পূর্ব্বের পাঁচ গুণেরও অধিক।

আমেরিকায়ও লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত লোকের আহার্য্য-সংস্থান প্রচুর বৃদ্ধি পাইয়াছে। এক শতাব্দীতে সেখানে ষাট লক্ষ অধিবাসীর স্থলে ছয় কোটি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এবং আহারবিষয়ে পৃথিবীর কোন জাতিই ইহাদের সমকক্ষ নহে। উদ্বৃত্ত যাহা থাকে তাহাতেই প্রায় দুই কোটী বিদেশীর নিয়মিত ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হয়।

কিন্তু লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত এরূপ স্বচ্ছলতা কোথা হইতে আসে? কারণ স্পষ্টই পড়িয়া আছে। দৈনন্দিন আবশ্যকীয়ে বিজ্ঞানের প্রয়োগ করিতে শিখিয়া অবধি মানুষ প্রকৃতির নিকট হইতে আদায় অধিক করিতেছে, এবং বাষ্পীয় পোতের কল্যাণে এক দেশের অভাব দেশান্তরের উদ্বৃত্ত হইতে সহজেই মিটান যায়। চিকাগো প্রদেশ হইতে ইংলণ্ডের বাজারে যে সফল গোমেষাদি প্রেরিত হয়, স্কটলণ্ড হইতে আনীত গোমেষাদি অপেক্ষা তাহার মূল্য অধিক নহে। আর, ভারতবর্ষ, নিউজিলণ্ড, কালিফর্ণিয়া, আরজেণ্টাইন্ রিপবলিক সকলে মিলিয়া ধনধান্য দিয়া ইংলণ্ডের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা নিবৃত্ত করিতেছে। সুতরাং বিজ্ঞানের উদ্ভাবনী শক্তির কল্যাণে খোরাকের বিষয় অনেকটা নিশ্চিন্ত।

কিন্তু যতই ষ্টীম-লাঙ্গল উদ্ভাবিত হউক্ অথবা ষ্টীমারের গতি বৃদ্ধি হউক্ না কেন, জমির অভাব হইলে শুদ্ধমাত্র কলের মধ্য হইতে ফসল বাহির হইবে না। পৃথিবীতে যদি এখনও অনেকখানি আবাদোপযোগী পতিত জমি থাকে তবেই ভরসা। কিন্তু তাহা আছে কি?

য়ুনাইটেড্ ষ্টেট্সের ৯৩০০০০০০০ একর জমির মধ্যে কিছুদিন পূর্ব্বে ২৬০০০০০০০ একর মাত্র পতিত ছিল। এখনই ইহার কতক অংশে চাষ আবাদ আরম্ভ হইয়াছে। আর কিছুদিন পরে জমি পাওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। লোকসংখ্যা যেরূপ দ্রুতবেগে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে সেখানে অধিবাসীর সংখ্যা ১২০০০০০০০ হইবার কথা। তখন আমেরিকার জমি হইতে বিদেশের ভরণ-কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন হইবে। আমেরিকার আহার যোগাইতে পারিলেই যথেষ্ট।

এদিকে এসিয়াখণ্ডে জমি দুষ্প্রাপ্য। লোকের ভীড় ক্রমেই বাড়িতেছে, জমি সেইই আছে, এসিয়াবাসীদের নিজেদেরই চলে না। আফ্রিকারও আবাদোপযোগী অনেক জমিই য়ুরোপীয়দিগের দখলে আসিয়াছে। মধ্য আফ্রিকার যে উচ্চ জমিটুকু আছে সেখানে দেশীয় অধিবাসী নিতান্ত কম নহে।—মধ্য এসিয়ার এবং আফ্রিকার অনেক স্থানে যে সকল মরুভূমি আছে তাহাতে চাষাবাদের সুবিধা নাই। সুতরাং সে জমি নিষ্ফল।

য়ুরোপে দানিয়ুব প্রদেশে যে পতিত জমিটুকু আছে, তাহাও প্রায় আবাদ হইতে চলিল। সেই জমিটুকুর উপর স্থানীয় বর্দ্ধনশীল অধিবাসীদের অনেকটা নির্ভর।

আমেরিকার ব্রেজিল, দক্ষিণ কালিফর্ণিয়া, ফ্লরিডা প্রভৃতি প্রদেশে কাফি, আঙ্গুর, পীচ, কমলালেবু এই সকল উৎপন্ন হয়। গম না হইলে এ সকল ফল মূল লইয়া ত আর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা চলে না। অষ্ট্রেলিয়ারও যে সকল প্রদেশে গম উৎপন্ন হয়, সেই প্রদেশগুলিই এখনও কিছুকাল য়ুরোপের খোরাক যোগাইতে পারে; সকল প্রদেশে ত আর গম জন্মে না।

কানাডায় এখনও অনেকটা পতিত জমি আছে। তাহার দ্বারাও কিছুকাল য়ুরোপের দুর্ভিক্ষ নিবারণ হইতে পারে। কিন্তু য়ুরোপ হইতে আমেরিকায় যেরূপ লোকপ্রবাহ প্রবেশ করিতেছে তাহাতে খুব বেশীদিন সে সকল জমি যে য়ুরোপের কাজে লাগিবে এমন সম্ভাবনা অল্প। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত আহার্য্যোৎপাদন কি অনুপাতে বর্দ্ধিত হইতেছে লেং সাহেব প্রদত্ত নিম্নলিখিত তালিকা দৃষ্টে তাহা বুঝা যাইবে।

লোকসংখ্যা ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২, ৬৪, ১২৮।

আহার্য্য ২, ১২, ২২, ৩২, ৪২, ৫২, ৬২।

প্রথম পাঁচটি অবস্থা গড়ে মন্দ নহে; কিন্তু লোকসংখ্যা-বৃদ্ধিতে বাধা দিতে না পারিলে ষষ্ঠাবস্থায় নিত্য দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য।

প্রতীকারেরও কোনও সহজ পথ নাই। এক যদি প্রকৃতি দেবী মড়কে দেশের লোকসংখ্যা হ্রাস করিয়া দেন, কিংবা অন্য কোন উপায়ে অনেকগুলা লোককে একেবারে লোকান্তরে উপনীত করা যায়! কিন্তু সে সম্বন্ধে কিছু বলা চলে না। এই পর্য্যন্ত বুঝা যায় যে, অন্নচিন্তা ভবিষ্যতের এক মহা সমস্যা।

বর্ম্মার ডাকাত।

ব্রহ্মবীর জেনেরাল সার হেন্‌রী প্রেণ্ডার্গষ্টের নাম বঙ্গীয় পাঠকসমাজে নিতান্ত অপরিচিত নহে। জেনেরাল সাহেব সম্প্রতি "এসিয়াটিক কোয়ার্টার্লি রিবিয়ু" পত্রে বর্ম্মার ডাকাইতী সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সাধনার পাঠকবর্গের জন্য নিম্নে তাহার সার মর্ম্ম প্রকাশিত হইল।

এংলো-ইণ্ডিয়ান সম্বাদপত্রে বর্ম্মার প্রায় নিত্যনিয়মিত ডাকাইতীর কথা শুনিতে পাওয়া যায়। আজ দুইশত ডাকাইতের সহিত ইংরাজ সেনার ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, কাল তিনশত ডাকাইত ধরা পড়িয়াছে, ইত্যাদি ইত্যাদি;—সেন ডাকাত ভিন্ন বর্ম্মায় আর কিছুই নাই।

প্রেণ্ডার্গষ্ট সাহেব কিন্তু এই সকল ডাকাতদিগের প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি ইহাদিগকে ডাকাত না বলিয়া দেশানুরাগী সদাশয় বলিয়া গণ্য করেন। বলেন, দোষ যতই থাক্ না কেন, ইহাদিগের গুণও অনেক আছে। উত্তেজিত হইলে ইহারা

অনেক সময় নিষ্ঠুর আচরণ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু এদিকে সামান্যতম জীবের প্রতিও ইহাদের করুণার অভাব নাই। ইহারা সাধারণতঃ অলস এবং সকল বিষয়ে নিরুদ্যম, কিন্তু আবশ্যককালে ইহারা পরিশ্রম করিতেও কাতর নহে। কথা বাড়াইয়া বলে, বটে, তাই বলিয়া অনর্গল মিথ্যা কথা বলে না। ইংরাজেরা ভারতবাসীদিগের অপেক্ষা ইহাদিগের প্রতি সদয়। মগদিগকে যত্নে সত্নে ইংরাজ একটুকু অনুগ্রহ করেন।

বর্ম্মানেরা সদা-প্রফুল্ল লঘু-হৃদয়, কোনও হাঙ্গামায় থাকিতে চাহে না। তাহাদের ডাকাইতীও কিছু অদ্ভুত রকমের। রাম শ্যাম স্থির করিল, যদুর ঘরে ডাকাইতী করিতে হইবে, আর দুই চারিজন সঙ্গী জুটাইয়া যদুর ঘরে গিয়া হাজির হইল। যদু ঘটি বাটী ফেলিয়া পলায়ন করিল। রাম শ্যাম তাহার যথাসর্ব্বস্ব লইয়া গেল। প্রতিবেশীরা যদুকে কেহ একটা বলদ দিল, কেহ বা একটি ঘটি দিল; এমনি করিয়া যদুরও ক্ষতিপূরণ হইল। তখন যদু আবার মধুর সাহায্যে রামের ঘরে ডাকাতী করিল। রাম পলায়ন করিল। যদু যাহা পাইল লইয়া গেল। রক্তপাত বড় একটা হয় না। কেবল ইংরাজের ঘরে ডাকাইতী হইলেই রক্তপাত ঘটে। ইংরাজ ছাড়ে না—ডাকাতকে চাপিয়া ধরে; তখন অগত্যা তাহার দা বাহির হয়।

কুচ কাওয়াজ এ সকল কার্য্য বর্ম্মানের অত্যন্ত বিরক্তিজনক। ইংরাজের সহিত যুদ্ধে বর্ম্মানদিগের সম্মুখযুদ্ধও বড় একটা হয় না; বর্ম্মানেরা লুটপাট করিয়া আসিয়া পড়ে, লুটপাট করিয়া চলিয়া যায়। য়ুরোপীয় রণশিক্ষা ত আর তাহারা পায় নাই। এবং দা ও গোটাকতক জীর্ণ বন্দুকের সাহায্যে ইংরাজের কামান বন্দুক অস্ত্রশস্ত্রের সহিত পাল্লা দেওয়াও চলে না।

গ্রেণ্ডার্গষ্ট সাহেব বলেন, অস্ত্রশস্ত্রের অভাবেই বর্ম্মানেরা যুদ্ধক্ষেত্রে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে বাধ্য হয়। নহিলে, য়ুরোপীয় প্রণালী অনুসারে সুশিক্ষিত ও সসজ্জ করিলে এই বর্ম্মান সৈন্য বর্ম্মাপ্রান্তে কোনও যুদ্ধ বাধিলে ইংরাজের অনেক কাজে লাগিতে পারে।

হৃদয়-যমুনা।

যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ, এস ওগো এস, মোর
হৃদয়-নীরে!
ছল ছল ছল ছল
কাঁদিবে গভীর জল
ওই দুটি সুকোমল
চরণ ঘিরে।
আজি বর্ষা গাঢ়তম;
নিবিড় কুন্তল সম
মেঘ নামিয়াছে মম
দুইটি তীরে।
ওই যে শবদ চিনি,
নূপুর রিনিকিঝিনি,
কে গো তুমি একাকিনী
আসিছ ধীরে!
যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ, এস ওগো এস, মোর
হৃদয়-নীরে!
যদি কলস ভাসায়ে জলে নমিয়া থাকিতে চাও
আপনা ভুলে;

হেথা শ্যাম দুর্ব্বাদল,
সুনীল নভস্তল,
বিকসিত বনস্থল
বিকচ ফুলে।
দুটি কালো আঁখি দিয়া
মন যাবে বাহিরিয়া,
অঞ্চল খসিয়া গিয়া
পড়িবে খুলে,
চাহিয়া বঞ্জুল বনে
কি জানি পড়িবে মনে,
বসি কুঞ্জে তৃণাসনে
শ্যামল কূলে।
যদি কলস ভাসায়ে জলে বসিয়া থাকিতে চাও
আপনা ভুলে!

যদি গাহন করিতে চাহ, এস নেমে এস, হেথা
গহন-তলে!
নীলাম্বরে কিবা কাজ,
তীরে ফেলে এস আজ,
ঢেকে দিবে সব লাজ
সুনীল জলে।
সোহাগ-তরঙ্গরাশি
অঙ্গখানি দিবে গ্রাসি,
উচ্ছ্বসি পড়িবে আসি
উরসে গলে।

ঘুরে ফিরে চারিপাশে
কভু কাঁদে কভু হাসে,
কুলুকুলু কলভাষে
কত কি ছলে!
যদি গাহন করিতে চাহ, এস নেমে এস হেথা
গহন-তলে!

যদি মরণ লভিতে চাও, এস তবে ঝাঁপ দাও
সলিল মাঝে!
স্নিগ্ধ, শান্ত, সুগভীর,
নাহি তল, নাহি তীর,
মৃত্যুসম নীল নীর
স্থির বিরাজে!
নাহি রাত্রি, দিনমান,
আদি অন্ত পরিমাণ,
সে অতলে গীত গান
কিছু না বাজে!
যাও সব যাও ভুলে,
নিখিল বন্ধন খুলে
ফেলে দিয়ে এস কূলে
সকল কাজে!
যদি মরণ লভিতে চাও, এস তবে ঝাঁপ দাও
সলিল মাঝে!

পাঞ্চভৌতিক ডায়ারি।

দীপ্তি কহিল, সত্য কথা বলিতেছি আমার ত মনে হয় আজ-কাল প্রকৃতির স্তব লইয়া তোমরা সকলে কিছু বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছ।

আমি কহিলাম, দেবি, আর কাহারো স্তব বুঝি তোমাদের গায়ে সহে না।

দীপ্তি কহিল, যখন স্তব ছাড়া আর বেশী কিছু পাওয়া যায় না তখন ওটার অপব্যয় দেখিতে পারি না।

সমীরণ অত্যন্ত বিনম্রমনোহর হাস্যে গ্রীবা আনমিত করিয়া কহিল, ভগবতি, প্রকৃতির স্তব এবং তোমাদের স্তবে বড় একটা প্রভেদ নাই। ইহা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া থাকিবে, যাহারা প্রকৃতির স্তব গান রচনা করিয়া থাকে তাহারা তোমাদেরই মন্দিরের প্রধান পূজারি।

দীপ্তি অভিমানভরে কহিল, অর্থাৎ যাহারা জড়ের উপাসনা করে তাহারাই আমাদের ভক্ত।

সমীরণ কহিল, এতবড় ভুলটা বুঝিলে কাজেই একটা সুদীর্ঘ কৈফিয়ত দিতে হয়। আমাদের ভূত-সভার বর্ত্তমান সভাপতি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ভূতনাথ বাবু তাঁর ডায়ারিতে মন নামক একটা দুরন্ত পদার্থের উপদ্রবের কথা বর্ণনা করিয়া যে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, সে তোমরা সকলেই পাঠ করিয়াছ। আমি তাহার নিচেই গুটিকতক কথা লিখিয়া রাখিয়াছি, যদি সভ্যগণ অনুমতি করেন তবে পাঠ করি—আমার মনের ভাবটা তাহাতে পরিষ্কার হইবে।

ক্ষিতি করযোড়ে কহিল, দেখ ভাই সমীরণ, লেখক এবং পাঠকে যে সম্পর্ক সেইটেই স্বাভাবিক সম্পর্ক—তুমি ইচ্ছা করিয়া লিখিলে আমি ইচ্ছা করিয়া পড়িলাম, কোন পক্ষে কিছু বলিবার রহিল না! যেন খাপের সহিত তরবারী মিলিয়া গেল। কিন্তু তরবারী যদি অনিচ্ছুক অস্থিচর্ম্মের মধ্যে সেই প্রকার সুগভীর আত্মীয়তা স্থাপনে প্রবৃত্ত হয় তবে সেটা তেমন বেশ স্বাভাবিক

এবং মনোহর রূপে সম্পন্ন হয় না। লেখক এবং শ্রোতার সম্পর্কটাও সেইরূপ অস্বাভাবিক অসদৃশ। হে চতুরানন, পাপের যেমন শাস্তিই বিধান কর যেন আরজন্মে ডাক্তারের ঘোড়া, মাতালের স্ত্রী এবং প্রবন্ধলেখকের বন্ধু হইয়া জন্মগ্রহণ না করি!

ব্যোম একটা পরিহাস করিতে চেষ্টা করিল, কহিল, একে ত বন্ধু অর্থেই বন্ধন তাহার উপরে প্রবন্ধ-বন্ধন হইলে ফাঁসের উপর ফাঁস হয় গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকং।

দীপ্তি কহিল, হাসিবার জন্য দুইটি বৎসর সময় প্রার্থনা করি; ইতিমধ্যে পাণিনি, অমরকোষ এবং ধাতুপাঠ আয়ত্ত করিয়া লইতে হইবে।

শুনিয়া ব্যোম অত্যন্ত কৌতুক লাভ করিল। হাসিতে হাসিতে কহিল, বড় চমৎকার বলিয়াছ; আমার একটা গল্প মনে পড়িতেছে;—

স্রোতস্বিনী কহিল, তোমরা সমীরণের লেখাটা আজ আর শুনিতে দিবে না দেখিতেছি। সমীরণ, তুমি পড়, উহাদের কথায় কর্ণপাত করিও না!

স্রোতস্বিনীর আদেশের বিরুদ্ধে কেহ আর আপত্তি করিল না। এমন কি, স্বয়ং ক্ষিতি শেলফের উপর হইতে ডায়ারির খাতাটি পাড়িয়া আনিল এবং নিতান্ত নিরীহ নিরুপায়ের মত মুখ করিয়া সংযত হইয়া বসিয়া রহিল।

সমীরণ পড়িতে লাগিল—মানুষকে বাধ্য হইয়া পদে পদে মনের সাহায্য লইতে হয়, এইজন্য ভিতরে ভিতরে আমরা সেটাকে দেখিতে পারি না। মন আমাদের অনেক উপকার করে কিন্তু তাহার স্বভাব এমনই যে, আমাদের সঙ্গে কিছুতেই সে সম্পূর্ণ মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারে না। সর্ব্বদা খিট্‌খিট্ করে, পরামর্শ দেয়, উপদেশ দিতে আসে, সকল কাজেই হস্তক্ষেপ করে। সে যেন একজন বাহিরের লোক ঘরের হইয়া পড়িয়াছে—তাহাকে ত্যাগ করাও কঠিন, তাহাকে ভালবাসাও দুঃসাধ্য।

সে যেন অনেকটা বাঙ্গালির দেশে ইংরাজের গবর্ণমেণ্টের মত। আমাদের সরল দিশি রকমের ভাব, আর তাহার জটিল বিদেশী রকমের আইন। উপকার করে কিন্তু আত্মীয় মনে

করে না। সেও আমাদের বুঝিতে পারে না, আমরাও তাহাকে বুঝিতে পারি না। আমাদের যে সকল স্বাভাবিক সহজ ক্ষমতা-গুলি ছিল তাহার শিক্ষায় সে গুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এখন উঠিতে বসিতে তাহার সাহায্য ব্যতীত আর চলে না।

ইংরাজের সহিত আমাদের মনের আরও কতকগুলি মিল আছে। এতকাল সে আমাদের মধ্যে বাস করিতেছে তবু সে বাসন্দা হইল না, তবু সে সর্ব্বদা উড়ু-উড়ু করে। যেন কোন সুযোগে একটা ফর্লো পাইলেই মহাসমুদ্রপারে তাহার জন্ম-ভূমিতে পাড়ি দিতে পারিলেই বাঁচে। সব চেয়ে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য এই যে, তুমি যতই তাহার কাছে নরম হইবে, যতই "যো হুজুর খোদাবন্দ" বলিয়া হাত-যোড় করিবে ততই তাহার প্রতাপ বাড়িয়া উঠিবে, আর তুমি যদি ফস্ করিয়া হাতের আস্তিন গুটাইয়া ঘুষি উঁচাইতে পার, খৃষ্টান শাস্ত্রের অনুশাসন অগ্রাহ্য করিয়া চড়টির পরিবর্ত্তে চাপড়টি প্রয়োগ করিতে পার তবে সে জল হইয়া যাইবে।

মানুষের আভ্যন্তরিক রাজনৈতিক আন্দোলনের সর্ব্বাপেক্ষা সনাতন আলোচ্য বিষয় এই যে, এই বিজাতীয় মনটাকে বশ করা যায় কি করিয়া। অনেক সভা বসিয়াছে, অনেক তর্ক হইয়াছে, অনেক রেজোল্যুশনও পাশ হইয়া গিয়াছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ভাল রকমে কৃতকার্য্য হওয়া গেল না। উল্টা, সে আমাদের নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইয়া বেড়াইতেছে এবং মাথার উপর মাথা-ধরার মত চাপিয়া বসিয়া কপালের শিরের মধ্যে সর্ব্বদা টিক্‌টিক্ করিতেছে।

মনের উপর আমাদের বিদ্বেষ এতই সুগভীর যে, যে কাজে তাহার হাত কম দেখা যায় তাহাকেই আমরা সব চেয়ে অধিক প্রশংসা করি। নীতিগ্রন্থে হঠকারিতার নিন্দা আছে বটে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহার প্রতি আমাদের আন্তরিক অনুরাগ দেখিতে পাই। যে ব্যক্তি অত্যন্ত বিবেচনাপূর্ব্বক অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া অতি সতর্কভাবে কাজ করে, তাহাকে আমরা ভালবাসি না কিন্তু যে ব্যক্তি সর্ব্বদা নিশ্চিন্ত, অম্লান বদনে বেফাঁস কথা বলিয়া বসে এবং অবলীলাক্রমে বেফাঁস কাজ করিয়া বসে

লোকে তাহাকে ভালবাসে। যে ব্যক্তি ভবিষ্যতের হিসাব করিয়া বড় সাবধানে অর্থসঞ্চয় করে, লোকে ঋণের আবশ্যক হইলে তাহার নিকট গমন করে এবং তাহাকে মনে মনে আশীর্বাদ করে, আর, যে নির্ব্বোধ নিজের ও পরিবারের ভবিষ্যৎ ভালমন্দ গণনা মাত্র না করিয়া যাহা পায় তৎক্ষণাৎ মুক্তহস্তে ব্যয় করিয়া বসে, লোকে অগ্রসর হইয়া তাহাকে ঋণদান করে এবং নগদ সময় পরিশোধের প্রত্যাশা রাখে না। অনেক সময় অবিবেচনা অর্থাৎ মনোবিহীনতাকেই আমরা উদারতা বলি এবং যে মনটা হিতাহিত জ্ঞানের অনুদেশক্রমে মুক্তির লণ্ঠন হাতে লইয়া অত্যন্ত কঠিন সংকল্পের সহিত নিয়মের চুলচেরা পথ ধরিয়া চলে তাহাকে লোকে হিসাবী, বিষয়ী, সঙ্কীর্ণমনা প্রভৃতি অপবাদসূচক কথা বলিয়া থাকে।

মনটা যে আছে এইটুকু যে ভুলাইতে পারে তাহাকেই বলি মনোহর। মনের বোঝাটা যে অবস্থায় অনুভব করি না, সেই অবস্থাটাকে বলি আনন্দ। নেশা করিয়া বরং পশুর মত হইয়া যাই, নিজের সর্ব্বনাশ করি সেও স্বীকার তবু কিছু ক্ষণের জন্যে ঐ যে মনটার হাত হইতে লাগাম এবং চাবুক খসিয়া পড়ে, খানার মধ্যে পড়িয়াও সে উল্লাস সম্বরণ করিতে পারি না। মন যদি যথার্থ আমাদের আত্মীয় হইত এবং আত্মীয়ের মত ব্যবহার করিত তবে কি এমন উপকারী লোকটার প্রতি এতটা দূর অকৃতজ্ঞতার উদয় হইত?

বুদ্ধির অপেক্ষা প্রতিভাকে আমরা উচ্চাসন কেন দিই? বুদ্ধি প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদের সহস্র কাজ করিয়া দিতেছে, সে না হইলে আমাদের জীবন রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইত, আর প্রতিভা কালেভদ্রে আমাদের কাজে আসে এবং অনেক সময় অকাজেও আসে। কিন্তু বুদ্ধিটা হইল মনের, তাহাকে পদক্ষেপ গণনা করিয়া চলিতে হয়, আর প্রতিভা মনের নিয়মাবলী রক্ষা না করিয়া হাওয়ার মত আসে, কাহারো আহ্বানও মানে না, কাহাকেও অগ্রাহ্য করে।

প্রকৃতির মধ্যে সেই মন নাই এইজন্য প্রকৃতি আমাদের কাছে এমন মনোহর। প্রকৃতিতে একটার ভিতরে আর-একটা

নাই। আর সোনার স্কন্ধে কাঁচপোকা বসিয়া তাহাকে শুষিয়া খাইতেছে না। মৃত্তিকা হইতে আর ঐ জ্যোতিঃসিঞ্চিত আকাশ পর্য্যন্ত তাহার এই প্রকাণ্ড ঘরকন্নার মধ্যে একটা ভিন্নদেশী পরের ছেলে প্রবেশ লাভ করিয়া দৌরাত্ম্য করিতেছে না।

সে একাকী, অখণ্ডসম্পূর্ণ, নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বিগ্ন। তাহার অসীম-নীল ললাটে বুদ্ধির রেখামাত্র নাই, কেবল প্রতিভার জ্যোতি চিরদীপ্যমান। যেমন অনায়াসে একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী পুষ্পমঞ্জরী বিকশিত হইয়া উঠিতেছে তেমনি অবহেলে একটা দুর্দ্দান্ত ঝড় আসিয়া সুখস্বপ্নের মত সমস্ত ভাঙ্গিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছে। সকলি যেন ইচ্ছায় হইতেছে, চেষ্টায় হইতেছে না। সে ইচ্ছা কখনও আদর করে, কখনও আঘাত করে। কখনো প্রেয়সী অপ্সরীর মত গান করে, কখনো ক্ষুধিত রাক্ষসীর ন্যায় গর্জ্জন করে।

চিন্তাপীড়িত সংশয়াপন্ন মানুষের কাছে এই দ্বিধাশূন্য অব্যবহিত ইচ্ছাশক্তির বড় একটা প্রচণ্ড আকর্ষণ আছে। রাজভক্তি প্রভুভক্তি তাহার একটা নিদর্শন। যে রাজা ইচ্ছা করিলেই প্রাণ দিতে এবং প্রাণ লইতে পারে তাহার জন্য যত লোক ইচ্ছা করিয়া প্রাণ দিয়াছে, বর্ত্তমান যুগের নিয়মপাশবদ্ধ রাজার জন্য এত লোক স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আত্মবিসর্জ্জনে উদ্যত হয় না।

যাহারা মনুষ্যজাতির নেতা হইয়া জন্মিয়াছে তাহাদের মন দেখা যায় না। তাহারা কেন, কি ভাবিয়া, কি যুক্তি অনুসারে কি কাজ করিতেছে তৎক্ষণাৎ তাহা কিছুই বুঝা যায় না এবং মানুষ নিজের সংশয়-তিমিরাচ্ছন্ন ক্ষুদ্র গহ্বর হইতে বাহির হইয়া পতঙ্গের মত ঝাঁকে ঝাঁকে তাহাদের মহত্ত্বশিখার মধ্যে আত্মঘাতী হইয়া ঝাঁপ দেয়।

রমণীও প্রকৃতির মত। মন আসিয়া তাহাকে মাঝখান হইতে দুই ভাগ করিয়া যায় নাই। সে পুষ্পের মত আগাগোড়া এক খানি। এইজন্য তাহার গতিবিধি আচারব্যবহার এমন সহজ-সম্পূর্ণ। এইজন্য দ্বিধান্দোলিত পুরুষের পক্ষে রমণী "মনো-ভবং"।

পুরুষ যেন একটা প্রকাণ্ড বিপর্য্যয় পাথরের মত [illegible]

আমে,খানিকটা মাটিতে খানিকটা শূন্যে, অনিশ্চিতভাবে রহিয়াছে, আর নিম্নে ফলশস্যশ্যামলা সুকোমলা ভূমি নিশ্চিন্ত প্রসন্নমুখে স্থির অথণ্ড পর্য্যাপ্তভাবে বিরাজ করিতেছে—ঐ অর্দ্ধ আশ্রয়বিহীন বিপুলভারগ্রস্ত পাথরখানা এই ধ্রুব আকর্ষণ কতক্ষণ অতিক্রম করিতে পারে?

প্রকৃতির ন্যায় রমণীরও কেবল ইচ্ছাশক্তি—তাহার মধ্যে যুক্তিতর্ক বিচার আলোচনা কেন-কি-বৃত্তান্ত নাই। কখনো সে চারিহস্তে অন্ন বিতরণ করে, কখনো সে প্রলয়মূর্ত্তিতে সংহার করিতে উদ্যত হয়। ভক্তেরা করযোড়ে বলে, তুমি মহামায়া, তুমি ইচ্ছাময়ী, তুমি প্রকৃতি, তুমি শক্তি।

সমীরণ হাঁপ ছাড়িবার জন্য একটু থামিবামাত্র নিতি গম্ভীর মুখ করিয়া কহিল—বাঃ চমৎকার! কিন্তু তোমার গা ছুঁইয়া বলিতেছি এক বর্ণ যদি বুঝিয়া থাকি! বোধ করি তুমি যাহাকে মন ও বুদ্ধি বলিতেছ প্রকৃতির মত আমার মধ্যেও সে জিনিষটার অভাব আছে কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে খুব বেশী প্রতিভার জন্যও কাহারও নিকট হইতে প্রশংসা পাই নাই এবং আকর্ষণশক্তিও যে অধিক আছে তাহার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

দীপ্তি সমীরণকে কহিল,তুমি যে মুনলমানের মত কথা কহিলে, তাহাদের শাস্ত্রেই ত বলে মেয়েদের আত্মা নাই।

স্রোতস্বিনী চিন্তান্বিতভাবে কহিল, মন এবং বুদ্ধি শব্দটা যদি তুমি একই অর্থে ব্যবহার কর আর যদি বল আমরা তাহা হইতে বঞ্চিত, তবে তোমার সহিত আমার মতের মিল হইল না।

সমীরণ কহিল—আমি যে কথাটা বলিয়াছি তাহা রীতিমত তর্কের যোগ্য নহে। প্রথম বর্ষার পদ্মা যে চরটা গড়িয়া দিয়া গেল তাহা বালি, তাহার উপরে লাঙ্গল লইয়া পড়িয়া তাহাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিলে কোন ফল পাওয়া যায় না; ক্রমে ক্রমে দুই তিন বর্ষায় স্তরে স্তরে যখন তাহার উপর মাটি পড়িবে তখন সে ফসল সহিবে। আমিও তেমনি চলিতে চলিতে স্রোতোবেগে একটা কণাকে কেবল প্রথম দাঁড় করাইলাম মাত্র। হয় ত দ্বিতীয় স্রোতে একেবারে ভাঙ্গিয়াও পড়িবে অথবা পলি পড়িয়া

উর্ব্বরা হইতেও আটক নাই। যাহা হউক আসামীর সমস্ত কথাটা শুনিয়া তার পর বিচার করা হউক।

মানুষের মধ্যে দুই অংশ আছে। একটা অচেতন বৃহৎ গুপ্ত এবং নিশ্চেষ্ট, আর একটা সচেতন সক্রিয় চঞ্চল পরিবর্ত্তনশীল। যেমন মহাদেশ এবং সমুদ্র। সমুদ্র চঞ্চলভাবে যাহা কিছু সঞ্চয় করিতেছে ত্যাগ করিতেছে গোপনতলদেশে তাহাই দৃঢ় নিশ্চল আকারে উত্তরোত্তর রাশীকৃত হইয়া উঠিতেছে। সেইরূপ আমাদের চেতনা প্রতিদিন যাহা কিছু আনিতেছে ফেলিতেছে সেই সমস্ত ক্রমে সংস্কার স্মৃতি অভ্যাস আকারে একটি বৃহৎ গোপন আধারে অচেতনভাবে সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। তাহাই আমাদের জীবনের ও চরিত্রের স্থায়ী ভিত্তি। সম্পূর্ণ তলাইয়া তাহার সমস্ত স্তরপর্য্যায় কেহ আবিষ্কার করিতে পারে না। উপর হইতে যতটা দৃশ্যমান হইয়া উঠে, অথবা আকস্মিক ভূমিকম্পবেগে যে নিগূঢ় অংশ ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয় তাহাই আমরা দেখিতে পাই।

এই মহাদেশেই শস্য পুষ্প ফল, সৌন্দর্য্য ও জীবন অতি সহজে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠে। ইহা দৃশ্যতঃ স্থির ও নিষ্ক্রিয়, কিন্তু ইহার ভিতরে একটি অনায়াসনৈপুণ্য একটি গোপন জীবনীশক্তি নিগূঢ়ভাবে কাজ করিতেছে। সমুদ্র কেবল ফুলিতেছে এবং দুলিতেছে, বাণিজ্যতরী ভাসাইতেছে এবং ডুবাইতেছে, অনেক আহরণ এবং সংহরণ করিতেছে, তাহার বলের সীমা নাই, কিন্তু তাহার মধ্যে জীবনীশক্তি ও ধারণীশক্তি নাই, সে কিছুই জন্ম দিতে ও পালন করিতে পারে না।

রূপকে যদি কাহারো আপত্তি না থাকে তবে আমি বলি আমাদের এই চঞ্চল বহিরংশ পুরুষ, এবং এই বৃহৎ গোপন অচেতন অন্তরংশ নারী।

এই স্থিতি এবং গতি সমাজে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে ভাগ হইয়া গিয়াছে। সমাজের সমস্ত আহরণ উপার্জ্জন, জ্ঞান ও শিক্ষা স্ত্রীলোকের মধ্যে গিয়া নিশ্চল স্থিতি লাভ করিতেছে। এইজন্য তাহার এমন সহজ বুদ্ধি সহজ শোভা অশিক্ষিত পটুতা। মনুষ্য

সমাজে স্ত্রীলোক বহুকালের রচিত; এইজন্য তাহার সংস্কারগুলি এমন দৃঢ় ও পুরাতন, তাহার সকল কর্ত্তব্য এমন চিরাভ্যস্ত সহজ-সাধ্যের মত হইয়া চলিতেছে; পুরুষ উপস্থিত আবশ্যকের সন্ধানে সময়স্রোতে অনুক্ষণ পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিতেছে; কিন্তু সেই সমুদয় চঞ্চল প্রাচীন পরিবর্ত্তনের ইতিহাস স্ত্রীলোকের মনে স্তরে স্তরে নিত্যভাবে সঞ্চিত হইতেছে—প্রকাণ্ড বিশেষত্বগুলিকে তাহারা সমগ্রভাবে ধারণ করে না, কিন্তু একটা মোটামুটি ছাপ আদায় করিয়া লয়।

পুরুষ আংশিক, বিচ্ছিন্ন, সামঞ্জস্যবিহীন। আর স্ত্রীলোক এমন একটি সঙ্গীত যাহা মনে আসিয়া সুন্দর সুগোলভাবে সম্পূর্ণ হইতেছে; তাহাতে উত্তরোত্তর যতই পদ সংযোগ ও নব নব তান যোজনা কর না কেন, সেই সমটি আসিয়া সমস্তটিকে একটি সুগোল সম্পূর্ণ গণ্ডী দিয়া ঘিরিয়া লয়। মাঝখানে একটি স্থির কেন্দ্র অবলম্বন করিয়া আবর্ত্ত আপনার পরিধিবিস্তার করে, সেই-জন্য হাতের কাছে যাহা আসে তাহা সে এমন সুনিপুণ সুন্দর-ভাবে টানিয়া আপনার করিয়া লইতে পারে।

এই যে কেন্দ্রটি ইহা বুদ্ধি নহে, মন নহে, ইহা একটি সহজ আকর্ষণ-শক্তি। ইহা একটি ঐক্যবিন্দু। মনঃপদার্থটি যেখানে আসিয়া উঁকি মারেন সেখানে এই সুন্দর ঐক্য শতধা বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়।

ব্যোম অধীরের মত হইয়া হঠাৎ আরম্ভ করিয়া দিল—তুমি যাহাকে ঐক্য বলিতেছ আমি তাহাকে আত্মা বলি; তাহার ধর্ম্মই এই, সে পাঁচটা বস্তুকে আপনার চারিদিকে টানিয়া আনিয়া একটা গঠন দিয়া গড়িয়া তোলে; আর যাহাকে মন বলিতেছ সে পাঁচটা বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া আপনাকে এবং তাহাদিগকে ভাঙ্গিয়া ভাসিয়া ফেলে। সেইজন্য আত্মযোগের প্রধান সোপান হইতেছে মনটাকে অবরুদ্ধ করা।

ইংরাজের সহিত সমীরণ মনের যে তুলনা করিয়াছেন এখানেও সে ইংরাজ সকল জিনিষকেই অগ্রসর হইয়া তাড়াইয়া বেড়ায়। তাহার "আশাবধিঃ কো গতঃ," শুনিয়াছি সূর্য্য-মণ্ডলকে তিনি তাড়া করিয়া উত্যক্ত হইয়া এপর্য্যন্ত অস্ত

হইতে পারিলেন না। আর আমরা আত্মার ন্যায় কেন্দ্রগত হইয়া আছি, কিছু হরণ করিতে চাহি না, চতুর্দ্দিকে যাহা আছে তাহাকে ঘনিষ্ঠভাবে আকৃষ্ট করিয়া গঠন করিয়া তুলিতে চাই। এইজন্য আমাদের সমাজের মধ্যে গৃহের মধ্যে ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার মধ্যে এমন একটা রচনার নিবিড়তা দেখিতে পাওয়া যায়। আহরণ করে মন, আর সৃজন করে আত্মা।

যোগের সকল তথ্য জানি না, কিন্তু শুনা যায় যোগবলে যোগীরা সৃষ্টি করিতে পারিতেন। প্রতিভার সৃষ্টিও সেইরূপ। করিয়া সহজ ক্ষমতাবলে মনটাকে নিরস্ত করিয়া দিয়া অর্দ্ধ অচেতনভাবে যেন একটা আত্মার আকর্ষণে ভাব-রস-দৃশ্য-বর্ণ-ধ্বনি কেমন করিয়া সঞ্চিত করিয়া পুঞ্জিত করিয়া জীবনে সুগঠনে মণ্ডিত করিয়া খাড়া করিয়া তুলেন।

বড় বড় লোকরা যে বড় বড় কাজ করেন সেও এই ভাবে। যেখানিকার বোটি সে যেন একটি দেবশক্তি প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া রেখায় রেখায় বর্ণে বর্ণে মিলিয়া যায়, একটি সুসম্পন্ন সুসম্পূর্ণ কার্য্যরূপে দাঁড়াইয়া যায়। প্রকৃতির সর্ব্বকনিষ্ঠজাত মন নামক দুরন্ত বালকটি যে একেবারে তিরস্কৃত বহিষ্কৃত হয় তাহা নহে, কিন্তু সে তদপেক্ষা উচ্চতর মহত্তর প্রতিভার অমোঘ মায়ামন্ত্রবলে মুগ্ধের মত কাজ করিয়া যায়, মনে হয় সমস্তই যেন যাদুতে হইতেছে, যেন সমস্ত ঘটনা, যেন বাহ্য অবস্থাগুলিও যোগবলে যথেচ্ছামত যথাস্থানে বিন্যস্ত হইয়া যাইতেছে। গারিবাল্ডি এমনি করিয়া ভাঙ্গাচোরা ইটালিকে নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠা করেন, ওয়াশিংটন অরণ্যপর্ব্বতবিক্ষিপ্ত অ্যামেরিকাকে আপনার চারিদিকে টানিয়া আনিয়া একটি সাম্রাজ্যরূপে গড়িয়া দিয়া যান।

এই সমস্ত কার্য্য এক একটি যোগসাধন।

কবি যেমন কাব্য গঠন করেন, তানসেন যেমন তাল লয় ছন্দে এক একটি গান সৃষ্টি করিতেন, রমণী তেমনি আপনার জীবনটি রচনা করিয়া তোলে। তেমনি অচেতনভাবে, তেমনি আপনার মনে। পিতা পুত্র ভ্রাতা ভগ্নী অতিথি অভ্যাগতকে সুন্দর বন্ধনে বাঁধিয়া সে আপনার চারিদিকে গঠিত সজ্জিত করিয়া তোলে :— শিল্পীর উপাদান লইয়া বড় সুনিপুণ হস্তে একখানি ঘর নির্ম্মাণ

করে ; কেবল গৃহ কেন, রমণী যেখানে যায় আপনার চারিদিককে একটি সৌন্দর্য্যসংযমে বাঁধিয়া আনে। নিজের চলাফেরা বেশ-ভূষা কথাবার্ত্তা আকার ইঙ্গিতকে একটি অনির্ব্বচনীয় গঠন দান করে। তাহাকে বলে শ্রী। ইহা ত বুদ্ধির কাজ নহে, অনির্দ্দেশ্য প্রতিভার কাজ, মনের শক্তি নহে, আত্মার অভ্রান্ত নিগূঢ় শক্তি। এই যে ঠিক সুরটি ঠিক্ জায়গায় গিয়া লাগে, ঠিক কথাটি ঠিক জায়গায় আসিয়া বসে, ঠিক কাজটি ঠিক সময়ে নিষ্পন্ন হয়, ইহা একটি মহারহস্যময় নিখিল জগৎকেন্দ্রভূমি হইতে স্বাভাবিক স্ফটিক-ধারার ন্যায় উচ্ছ্বসিত উৎস। সেই কেন্দ্রভূমিটিকে অচেতন না বলিয়া অতিচেতন নাম দেওয়া উচিত।

প্রকৃতিতে যাহা সৌন্দর্য্য, মহৎ ও গুণী লোকে তাহাই প্রতিভা, এবং নারীতে তাহাই শ্রী, তাহাই নারীত্ব। ইহা কেবল পাত্রভেদে ভিন্ন বিকাশ।

অতঃপর ব্যোম সমীরণের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল ; তার পরে ? তোমার লেখাটা শেষ করিয়া ফেল।

সমীরণ কহিল, আর আবশ্যক কি ? আমি যাহা আরম্ভ করিয়াছি তুমি ত তাহার একপ্রকার উপসংহার করিয়া দিয়াছ।

ক্ষিতি কহিল, কবিরাজ মহাশয় সুরু করিয়াছিলেন, ডাক্তার মহাশয় সাঙ্গ করিয়া গেলেন, এখন আমরা হরি হরি বলিয়া বিদায় হই। মন কি, বুদ্ধি কি, আত্মা কি, সৌন্দর্য্য কি এবং প্রতিভাই বা কাহাকে বলে, এ সকল তত্ত্ব কস্মিন্‌কালে বুঝি নাই, কিন্তু বুঝিবার আশা ছিল, আজ সেটুকুও জলাঞ্জলি দিয়া গেলাম।

পশমের গুটিতে জটা পাকাইয়া গেলে যেমন নতমুখে সতর্ক অঙ্গুলিতে ধীরে ধীরে খুলিতে হয়, স্রোতস্বিনী চুপ করিয়া বসিয়া যেন তেম্‌নি ভাবে মনে মনে কথাগুলিকে বহুযত্নে ছাড়াইতে লাগিল।

দীপ্তিও মৌনভাবে ছিল ; সমীরণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কি ভাবিতেছ ?

দীপ্তি কহিল, বাঙ্গালীর মেয়েদের প্রতিভাবলে বাঙ্গালীর লেখকের মত এমন অপরূপ সৃষ্টি কি করিয়া হইল তাই ভাবি তেছি।

আমি কহিলাম মাটির গুণে সকল সময়ে শিব গড়িতে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না, কিন্তু তবু নিরাশ হইয়ো না।

সাংখ্যদর্শন।

৪॥ সাংখ্য বৈদান্তিক ও লৌকিক আত্মা ॥

সাধারণ লোকে আত্মাকে কিরূপ বলিয়া জানে তাহা নিরাকরণ করা নিতান্ত সহজ নহে। দেহ ছাড়িয়া দিলে আত্মার কি থাকে?—সচরাচর দেখা যায় জীবন্ত ও মৃত দেহের একটি প্রধান ভেদ আছে; মৃত দেহে জ্ঞান নাই, জীবন্ত দেহে তাহা আছে। অতএব যদি দেহ ছাড়িয়া আত্মা আছে বলিয়া স্বীকার করা যায় তবে আত্মা এইরূপ এক পদার্থ যাহার জ্ঞান স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। এই যুক্তির অনুসরণ করিলে আত্মার আরও কতকগুলি ধর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যায়। মৃত দেহের যেমন জ্ঞান নাই, তেমনি সুখদুঃখের অনুভব নাই, ইচ্ছাশক্তি নাই, কোনপ্রকার অভিলাষ, আশা ভরসা, ভয় ক্রোধ, অনুরাগ কারুণ্যাদি প্রবৃত্তিও নাই; কিন্তু জীবন্ত দেহে তৎসমুদায়ই আছে; এই সকল পদার্থকে যদি দেহের ধর্ম্ম বলিয়া অঙ্গীকার না করা যায়, তবে তাহারা আত্মার ধর্ম্ম হয়। অতএব সাধারণ বিবেচনায় এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে, জ্ঞান সুখদুঃখ ইচ্ছা কামনা আশা অভিমান ভয়ক্রোধাদি প্রবৃত্তিনিচয়—এই সকল আধেয়ের আধারস্বরূপ, অথবা এই সকল ধর্ম্মযুক্ত যে পদার্থ, তাহারই নাম আত্মা। এই আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন, কেন না মৃত দেহে তাহার অভাব; অথচ এই আত্মা দেহের সীমার সীমাবদ্ধ। ইহা দেহকে ব্যাপিয়া আছে, অথবা দেহের মধ্যে কোন সঙ্কীর্ণ স্থানে অধিষ্ঠিত আছে, কিন্তু দেহের বাহিরে ইহার সত্তা নাই। দেহ আত্মার আবরণস্বরূপ। এই আবরণে আচ্ছাদিত না হইলে আত্মার জ্ঞানাদির স্ফূর্ত্তি হয় না এবং অন্য কোন পদার্থ ইহাকে অভিভূত করিতে পারে না। দেহই আত্মার ইন্দ্রিয়, দেহই আত্মার বিহারস্থান। এইরূপ এক একটি দেহে আবদ্ধ অসংখ্য আত্মা পৃথিবীতে নীল খেনায় ব্যাপ্ত [illegible]

মোটামুটি ইহাই লৌকিক বিবেচনাসঙ্গত আত্মার বিষয় বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এক্ষণে দার্শনিক পণ্ডিত অগ্রসর হইয়া পূর্ব্বপক্ষ করেন,—দেহের মধ্যে আত্মা, না আত্মার মধ্যে দেহ? কথাটি বাস্তবিকই চিন্তার বিষয়। হঠাৎ শুনিলে প্রশ্নটি বিস্ময়কর বোধ হয়। আত্মা দেহের মধ্যগত না হইয়া দেহ যে আত্মার মধ্যগত হইতে পারে ইহা ত অনেকের স্বপ্নের অগোচর। কিন্তু কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, যদি আত্মা নামক দেহ ভিন্ন কোনও পদার্থ থাকে তবে তাহা দৈর্ঘ্য-বিস্তার-বিশিষ্ট সীমাবদ্ধ কোন পদার্থের অন্তর্গত হইতে পারে না। কেন না, তাহা হইলে আত্মাও দৈর্ঘ্য-বিস্তার-বিশিষ্ট হয়। সেই দৈর্ঘ্য বিস্তার সূক্ষ্ম হউক বা স্থূল হউক, বালুকণার লক্ষাংশের একাংশ স্বরূপ হউক অথবা কমলালেবুর মত পরিমাণ বিশিষ্টই হউক তাহাতে আসিয়া যায় না—তাহার প্রত্যক্ষযোগ্য অথবা অনুমেয় দৈর্ঘ্য বিস্তার অঙ্গীকার করিতেই হইবে। সুতরাং দেহের মধ্যবর্ত্তী হইলে আত্মা দেহের একটি অংশমাত্র; দেহ হইতে তাহাকে অভিন্ন বলা যায় না। অতএব দেহ ভিন্ন যদি কোনও স্বতন্ত্র পদার্থ আত্মা নামক থাকে—তাহা কদাচ দেহের অন্তর্গত হইতে পারে না।

সাংখ্য ও বেদান্তী উভয়েই বলেন, আত্মা দেহের মধ্যে নহে, দেহই আত্মার মধ্যে। বেদান্তী আরো বলেন "সর্ব্বম্ আত্মন্যবস্থিতম্"—শুদ্ধ দেহ কেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই আত্মার মধ্যে অবস্থিত! এস্থলে সাংখ্যের সহিত বেদান্তের বিবাদ; সাংখ্য বলেন "ব্যক্ত" দেহ আত্মার মধ্যে বটে, "অব্যক্ত" দেহ আত্মার মধ্যে নয়। "ব্যক্ত" ব্রহ্মাণ্ড আত্মার মধ্যে বটে, কিন্তু "অব্যক্ত" ব্রহ্মাণ্ড আত্মার মধ্যে নয়। তবে কিরূপে সর্ব্বম্ আত্মন্যবস্থিতম্ এ কথা স্বীকার করা যায়?

এই বিচারস্থলে পাঠকবৃন্দ "মধ্য" শব্দের বিশিষ্ট অর্থের প্রতি প্রণিধান করিবেন। একটি দ্রব্যের মধ্যে আর একটি বলিলে আপাততঃ একটিকে বড় অপরটিকে ছোট বলিয়া মনে হয়—দুইটিই দৈর্ঘ্য-বিস্তার-বিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আত্মার দৈর্ঘ্য বিস্তার কেহই স্বীকার করেন না; সুতরাং আত্মার "মধ্যে"

ইহার তাৎপর্য্য কি? আত্মা ঘটপটাদির মত আয়ত না হউক আকাশের মত আয়ত কি? বেদান্তীদের কথার ভাবে অনেক স্থলে বোধ হয় তাঁহারা যেন আত্মাকে আকাশের মত একটি সামগ্রী বলিয়া মনে করেন। পরমাত্মাকে তাঁহারা কখনও "পরম ব্যোম" বলিয়া উল্লেখ করেন; কিন্তু সাংখ্যেরা ঈদৃশ কল্পনায় যোগ দেন না। সাংখ্যমতে "মধ্য" শব্দের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে জ্ঞানের আকারে আকারিত এই মাত্র বুঝিতে হইবে। যেমন স্বপ্ন বা কল্পনা বা স্মৃতি; তাহা শুদ্ধ জ্ঞানের আকারে আকারিত। মুকুরে যখন তুমি আপনার প্রতিবিম্ব দেখ, তখন সেই প্রতিবিম্বকে তোমার আত্মার "মধ্যে" বলিয়া সহজেই বুঝিতে পারিবে। তাহা বাহিরে বলিয়া প্রতীয়মান হয় কিন্তু বাস্তবিক বাহিরে কিছুই নাই। উহা তোমার জ্ঞানের আকারে আকারিত আত্মার অভ্যন্তরীণ সামগ্রী।

লৌকিক বিশ্বাসানুসারে যাহা আত্মার অধিষ্ঠানভূত দেহ বা শরীর বলিয়া গণ্য হয়, সাংখ্য ও বেদান্ত উভয়েই তাহাকে একটি জ্ঞানের আকারে আকারিত পদার্থ বলিয়া গ্রহণ করে; সুতরাং তাহা আত্মার বহির্ভূত নহে। এইরূপ চক্ষে দেখিলে দেহ একটি অলীক জ্ঞানময় সামগ্রী হইয়া দাঁড়ায় কি না? বেদান্ত বলে হাঁ; সাংখ্য হেঁয়ালীর মত বলে হাঁও বটে নাও বটে! তাৎপর্য্য এই যে, বাস্তবিক লৌকিক ভাষায় একশব্দে দুইটি পদার্থ যুগপৎ বুঝায়। ব্যক্ত দেহ ও অব্যক্ত দেহ দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ; একটি লিঙ্গ, অপরটি লিঙ্গী। লিঙ্গ অর্থাৎ পরিচায়ক চিহ্ন; লিঙ্গী অর্থাৎ চিহ্ন দ্বারা যাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেটি লিঙ্গ সেটি জ্ঞানের আকারে আকারিত পদার্থ; যেটি লিঙ্গী সেটি তাদৃশ জ্ঞান পরিণামের উত্তেজক কারণ। লিঙ্গী জ্ঞানের আকারে আকারিত নয়—তাই তাহাকে অব্যক্ত বলা যায়। কিন্তু যদিও তাহা জ্ঞানের আকারে আকারিত হয় না, আমাদের আত্মা নিরন্তর তাহার স্বাধীন সত্তা অনুভব করিতেছে। যেই আত্মার জ্ঞান পরিণামের সহিত অবস্থান্তর উৎপন্ন হয় অমনি "ঐ একটা কি?" বলিয়া স্বাধীন ভিন্ন পদার্থের উপলব্ধি হয়। দেহ সম্বন্ধে, অর্থাৎ অব্যক্ত দেহ সম্বন্ধে

নিরন্তর অবিশ্রান্ত ঐরূপ উপলব্ধি হইতে থাকায়, এবং সেই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে অশেষ বিশেষ আধ্যাত্মিক ভাবের সংশ্রব থাকায়—আমাদের আত্মা সর্ব্বদাই সেই অব্যক্ত সত্তায় স্ব-ভাব ও কার্য্যকারণ ভাবের আন্দোলন করিতে বাধ্য হয়। এইরূপ আন্দোলনকালে যে জ্ঞান-পরিণাম অব্যক্তের কার্য্য, তাহাকেই তাহার লিঙ্গ বা চিহ্নস্বরূপ ধরিয়া লওয়া হয়। অবশেষে নিরন্তর অভ্যাসবশতঃ আর লিঙ্গ ও লিঙ্গীর ভেদ বিশেষ যত্ন ও চিন্তা ব্যতিরেকে পরিগ্রহ হয় না; লিঙ্গীর স্বাধীন সত্তা আছে বলিয়া, যখন লিঙ্গ লিঙ্গীতে অভিন্ন হইয়া পড়ে—তখন লিঙ্গীর ন্যায় লিঙ্গেরও স্বাধীন সত্তা আছে বলিয়া মনে হয়, বস্তুতঃ তাহা ভ্রম। যে দেহ লিঙ্গী, তাহার স্বাধীন সত্তা আমাদের আত্মা সাক্ষাৎকার নামক প্রতীতি দ্বারা উপলব্ধি করে; অতএব তাহার স্বাধীন সত্তা স্বতঃসিদ্ধ। আর যে দেহ লিঙ্গ (জ্ঞানময়) তাহার স্বাধীন সত্তা নাই। ইহাই হইল সাংখ্য মত।

এই অব্যক্ত দেহ প্রকৃতি নামক পদার্থশ্রেণীর অন্তর্গত; তাহার সহিত পার্থক্য বুঝাইবার জন্য ব্যক্ত দেহকে বিকৃতি বলা যায়।

এস্থলে প্রসঙ্গতঃ বলা উচিত সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতিকে অনেকে যেন একটিমাত্র পদার্থ বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা ভুল। সাংখ্যেরা সত্ত্ব রজস্ ও তমস্ নামক তিন গুণের উল্লেখ করেন; অনেকে ন্যায়দর্শনের গুণের সহিত সাংখ্যদর্শনের গুণের গোলমাল করিয়া বসেন। প্রকৃত পক্ষে সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি একটি জাতিবাচক শব্দ। প্রকৃতি এক শ্রেণীর পদার্থ; যে সকল লিঙ্গের দ্বারা প্রকৃতির সত্তা উপলব্ধি করা যায়, তদ্দ্বারা প্রকৃতি নামক পদার্থশ্রেণীর বৈচিত্র্যও অনুমিত হয়। তদ্ধেতু সাংখ্যেরা প্রকৃতি নামক মুখ্য বা মুখ্যজাতিকে ভিন্ন অবান্তর বা গৌণ জাতিতে বিভক্ত করেন; গৌণ বলিয়া ইহাদিগকে গুণ বলা যায়। এই তিন গৌণ জাতি বা গুণের নাম সত্ত্ব, রজস্ এবং তমস্। সাংখ্যেরা এই তিন অবান্তর জাতীয় পদার্থের এইরূপ বর্ণনা করেন, যথা

(১)। সত্ত্ব—"সত্ত্বং লঘু প্রকাশকম্।"

(৩)—তমস্——"গুরু বরণকামব তমঃ।"

যাহা লঘু এবং প্রকাশক তাহা সত্ত্ব; যাহা চঞ্চল এবং অবষ্টম্ভক তাহা রজস্; যাহা গুরু এবং আবরণকারী তাহা তমস্। এই শ্রেণীবিভাগ আমার বিবেচনায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নহে—কিন্তু এতদ্দ্বারা একটি কথা স্পষ্ট হইতেছে, সত্ত্ব রজস্ বা তমসের সাংখ্যেরা ভিন্ন ভিন্ন "গুণ" ব্যাখ্যা করেন, অর্থাৎ ন্যায় বা বৈশেষিক দর্শনে যাহাকে গুণ বলে তাদৃশ গুণ ব্যাখ্যা করেন; কিন্তু গুণের আবার গুণ কি? বিচক্ষণ সাংখ্য পণ্ডিতগণ স্বীয় শাস্ত্রের গুণকে গৌণ জাতি বলিয়াই জানেন।—অবিবেকী পাঠকে ভ্রমে পতিত হয়।

ইহাতে সাংখ্যের মত এ ইরূপ দাঁড়াইয়াছে। লোকে যাহাকে জড়পদার্থ বলে তাহা ব্যক্ত ও অব্যক্তভেদে দ্বিবিধ। ব্যক্তের অসংখ্যতার ত কথাই নাই,—অব্যক্তও অসংখ্য; ভাগ করিলে তাহারা সত্ত্ব রজস্ ও তমস্ এই তিন গৌণ বা গুণশ্রেণীর অন্তর্ভূত হয়। এই সত্ত্ব রজস্ ও তমস্ শ্রেণীভুক্ত অব্যক্ত নামক পদার্থপুঞ্জ পরস্পর মিথুনের ন্যায় সংযত হইয়া অবস্থান করে; কখনও একটি অপরকে অভিভূত করে, কখনও একটি অপরকে প্রকাশিত করে, কখনও একটি অপরকে আশ্রয় করিয়া থাকে। তাই উক্ত হইয়াছে;—

"অন্যোন্যাভিভবাশ্রয়জননমিথুনবৃত্তয়শ্চ গুণাঃ।"

এইরূপে পিণ্ডীকৃত ও পুঞ্জীভূত হইয়া পরস্পরকে আশ্রয় অভিব্যক্ত বা অভিভূত করিয়া অব্যক্ত নামক পদার্থরাশি সংসারে বিদ্যমান রহিয়াছে।

সেই পদার্থরাশির একদেশের সহিত "জ্ঞ" শ্রেণীভুক্ত কোন একটি পদার্থের সংযোগের নাম সাংখ্যমতে "দেহ"। সংযোগ বলিলে যেন পরিমাণবিশিষ্ট অবয়বের আভাস পাওয়া যায়; কিন্তু বাস্তবিক সাংখ্যেরা "জ্ঞ" শ্রেণীভুক্ত পদার্থের তাদৃশ অবয়ব থাকা স্বীকার করেন না। সংযোগ শব্দে এস্থলে তাঁহারা একটি "জ্ঞ-জ্ঞেয়" নামক সাক্ষাৎ সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা বুঝেন। আত্মার সহিত অব্যক্তের তাদৃশ সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ হইয়াছে বলা যায়। সংসার অর্থাৎ ব্যক্ত অব্যক্তের

আবির্ভাব এইরূপ সংযোগ বা সম্বন্ধস্থাপনের ফল। কিরূপে এই সংযোগ সিদ্ধ হয় দর্শনশাস্ত্র তাহা জানে না।

সাধারণ লোকে বিবেচনা করে আত্মা দেহের মধ্যে বাস করে। সাংখ্যেরা প্রথমে বিচার করিয়া বলেন—দেহ দুই প্রকার, ব্যক্ত ও অব্যক্ত। ব্যক্ত দেহের স্বাধীন সত্তা তাঁহারা স্বীকার করেন না; এবং উহা কেবল জ্ঞানের আকারে আকারিত পদার্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তাদৃশ দেহ আত্মারই মধ্যগত। আর যাহা অব্যক্ত দেহ বা প্রকৃতি নামক পদার্থ-শ্রেণীর একদেশ, আমরা কেবল তাহার সত্তামাত্র অবগত আছি; তদতিরিক্ত তাহা কেমন, তাহা "অব্যক্ত"; অর্থাৎ কেবল বিবিধ জ্ঞানের কারণস্বরূপ বলিয়া তাহা আমাদের নিকট পরিচিত।

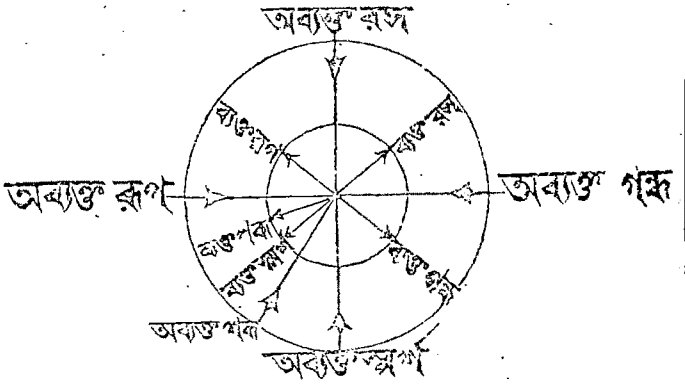

এই কথাটি একটি চিত্রের দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। বৃহত্তর চক্রটিকে অব্যক্ত বা প্রকৃতি বলিয়া মনে কর, এবং আত্মা বা পুরুষ যেন তাহার নাভি মনে কর। পুরুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগ বা "জ্ঞ-জ্ঞেয়" নামক সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ঘটিত হইলে, যে ব্যক্ত রূপরসাদির আবির্ভাব হয়, সেইটিকে ক্ষুদ্রতর চক্র বলিয়া মনে কর। এই ক্ষুদ্রতর চক্রটি প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সীমা—কিন্তু প্রকৃতি তাহার বহিঃসীমায় অবস্থিত, তাহার অস্তিত্বের প্রতীতি ভিন্ন অধিক আর কিছু জানিবার উপায় নাই। যাহাকে আমরা ব্যক্তরূপ বলিয়া

জানি তাহা আমাদের একপ্রকার জ্ঞান; এইরূপ জ্ঞান আবির্ভাবের একটি কারণ আছে তাহা অনুমেয়, চিত্রে তাহা অব্যক্ত-রূপ বলিয়া প্রদর্শিত হইল। কিন্তু তাহা আমাদের জ্ঞানের আকারে আকারিত হইবার নহে। এক্ষণে এই চক্রদ্বয়ের একটি ডমরুর দুই প্রান্ত এবং আত্মাকে মধ্যস্থল বলিয়া কল্পনা কর। নিম্নের চক্রটি "অব্যক্ত" চক্র এবং উপরের চক্রটি "ব্যক্ত" চক্র। আত্মা কেবল উপরের দিকেই রূপরসাদির উপলব্ধি করিতেছে, কিন্তু তাহাদের কারণ অধোদেশ হইতে আসিয়া আত্মার প্রতিঘাত করিতেছে। এস্থলে উপরের চক্রটিকে নিম্নের চক্র বলিয়া মনে করিলে যে ভ্রম হয়, ব্যক্ত দেহকে অব্যক্ত দেহ বলিয়া মনে করিলেও তাদৃশ ভ্রম হইবে।

সংক্ষেপে সাংখ্যেরা যে পদার্থের ত্রৈবিধ্য স্বীকার করেন তাহা ব্যক্তাব্যক্ত-জ্ঞ না বলিয়া জ্ঞ জ্ঞেয়-জ্ঞান বলিলেও বলা যায়, যথা,—

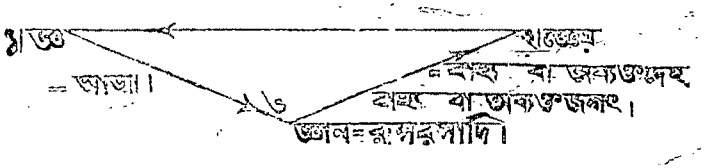

সাধারণ লোকে ২ এবং ৩ কে অভিন্ন মনে করে এবং ৩ যদিও আধ্যাত্মিক পদার্থ, তাহাকে বাহ্যিক বলিয়া মনে করে। বেদান্তীরা ৩এর অস্তিত্বই স্বীকার করেন না।

বেদান্তীরা আরো মনে করেন সংসারে কেবল একটি মাত্র আত্মা আছে; সাংখ্যেরা অসংখ্য আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এদিকে যেমন আত্মা অসংখ্য, জ্ঞেয় পদার্থও তেমনি অসংখ্য মনে করেন; অন্যথা জ্ঞানের বৈচিত্র্যের কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

সাংখ্যদর্শনে আর একটি বড় সুন্দর এবং গভীর তত্ত্বের আবিষ্কার দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। সাংখ্যেরা সকল পদার্থের গণনা করেন বলিয়া সংসারে যাঁহাদের নাম হইয়াছে সাংখ্য। তাঁহারা প্রশ্ন করেন, জ্ঞান কতিবিধ?

প্রথমতঃ পদার্থ-মাত্রই হয় নিত্য বা অনিত্য। নিত্যের আদি অন্ত নাই, অনিত্যের আদি অন্ত আছে। অনিত্য উৎপন্ন হয় বিনষ্ট হয়—আবির্ভূত বা তিরোহিত হয়। উৎপন্ন হয় বলিয়া অনিত্যের নাম "ভূত"। ভূধাতুর উত্তর "ক্ত" প্রত্যয়। সংসারে জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই উৎপন্ন হয় না। সুতরাং জ্ঞানের দর্শনশাস্ত্রসম্মত একটি পারিভাষিক নাম "ভূত"।

জ্ঞান বা "ভূত" কতিবিধ?—সাধারণতঃ লোকে বলে পাঁচ-প্রকার যথা, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ। কিন্তু সাংখ্য তাহাতেও ক্ষান্ত নহেন, তাঁহার কৌতূহলের অবসান নাই, তিনি আবার বলেন, রূপ কতিবিধ? রস কতিবিধ?

প্রশ্নের সিদ্ধান্ত এই, রূপরসাদি প্রত্যেক প্রকারের জ্ঞান বা ভূত দ্বিবিধ, (১) সূক্ষ্মভূত (২) স্থূলভূত। সূক্ষ্মভূতের আর এক নাম "তন্মাত্র"।

বোধ করি অপর কোন ভাষায় তন্মাত্র এইরূপ শব্দ নাই। তৎ+মাত্র=তন্মাত্র, অর্থাৎ কেবল তাই। অর্থাৎ কেবল জ্ঞান মাত্র। দেখা যায় সাধারণ লোকে রূপাদিকে বাহ্যবস্তু বলিয়া মনে করে। মনে কর তোমার পুত্র তোমার সম্মুখে, তুমি তোমার পুত্রের রূপ দেখিতেছ, তোমার কি মনে হয় যে, সেই রূপ তোমার জ্ঞান ভিন্ন আর কিছু নয়?—কদাচ নহে। তোমার বর্ত্তমান অবস্থায় তোমার পুত্রের রূপকে তোমার বহির্ভূত বলিয়া মনে কর। শাস্ত্রদৃষ্টিতে তুমি স্বীকার করিতে বাধ্য হও যে, তোমার পুত্রের রূপ তোমার মনের ভিতর, কিন্তু তোমার মন তাহা মানিতে চাহে না। না মানিতে চাহারও একটি বড় নিগূঢ় কারণ আছে। একটি চিত্রের দ্বারা তাহা প্রকাশ করা যাইতে পারে।

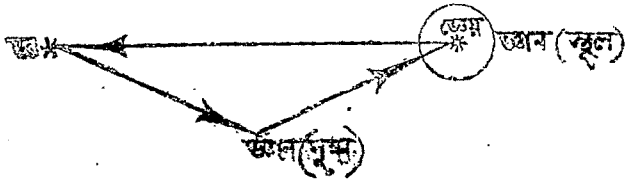

অর্থাৎ মনে কর ক এবং জ্ঞেয় পদার্থটি তাহার সাক্ষাৎকার

নামক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। "জ্ঞ" এর উপর জ্ঞেয়ের ক্রিয়া-বশতঃ জ্ঞানের উৎপত্তি হইল। জ্ঞানের এই প্রথম অবস্থার নাম তন্মাত্র বা জ্ঞানমাত্র; কেবল জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু এই জ্ঞান অবশেষে জ্ঞেয়ের উপরে আরোপিত হয়। পূর্ব্বে যাহা আমার (জ্ঞ পদার্থের) জ্ঞান মাত্র ছিল, তাহা নানা কারণে জ্ঞেয়ের রূপ বা রস প্রভৃতি বলিয়া পরিগৃহীত হয়। যখন জ্ঞেয়ের সহিত জ্ঞান এইরূপে জড়িত হয়, তখন আর তাহাকে "তন্মাত্র" বলা যায় না, তাহাতে যেন কিছু অন্য পদার্থ মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহা যেন জ্ঞেয়কে বেরিয়া অবস্থিত হইয়াছে। জ্ঞানের এই পরিণামের নাম স্থূলভূত।

তুমি যাহা এক্ষণে দ্রব্যের রূপরসাদি বলিয়া মনে কর, মাতৃ-গর্ভে অবস্থানের সময়, হয় ত গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার পরেও বহু-কাল, তাহা কেবল তোমার জ্ঞান-মাত্র (তন্মাত্র) বলিয়া জানিতে। একটি নবজাত শিশুর চক্ষুর নিকট অঙ্গুলি লইয়া যাও, সে আদৌ চক্ষু মুদিবে না; আর আমি তোমার চক্ষুর কাছে অঙ্গুলি লইয়া যাই দেখি—তুমি একবারে চক্ষু মুদিয়া ফেল; ইহার বোধ হয় কারণ এই বালকের আদৌ বাহ্যবস্তুর জ্ঞান এ-পর্য্যন্ত বদ্ধমূল হয় নাই—সে এখনও সকল পদার্থকেই আপনার জ্ঞানমাত্র (তন্মাত্র) বলিয়া জানে।

সাংখ্যেরা জ্ঞানের এইরূপ স্থূল ও সূক্ষ্ম নামক শ্রেণীবিভাগ করিয়া বিজ্ঞান-শাস্ত্রের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। কিন্তু বৈদেশিক পণ্ডিত সমাজে এই বার্ত্তা এ পর্য্যন্ত সুপরিজ্ঞাত ও প্রচারিত হয় নাই।

ভ্রমসংশোধন।

গত মাসের সাধনায় "জগতের অস্তিত্ব" নামক প্রবন্ধের ১৫৯ পৃষ্ঠা ৪ লাইনে "না ভোলাই ভাল"র পরিবর্ত্তে "না তোলাই ভাল" হইবে।

সাধনা।

সুষমা।

রায়েদের গিন্নির মৃত্যুতে ছোট বড় সবাই দুঃখিত। কিন্তু সুষমার মত দুঃখিনী কে? শাশুড়ীর স্নেহেই সে এতদিন সকল দুঃখ ভুলিয়াছিল!

বিধবা হওয়ার পরই সুষমা সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলে; কিন্তু শাশুড়ীর বিশেষ অনুরোধে হাতে কেবল চুড়ি কয়গাছি রাখিয়াছিল। ছেলেমানুষ বলিয়া কেহ তাহাকে থান পরিতে দিত না, সেও অভ্যাসবশতঃ এ পর্য্যন্ত পেড়ে কাপড়ই পরিত।

গিন্নির জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচরণ বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে অনেক সময় বিদেশে থাকিতেন। মাতার মৃত্যুসংবাদে সম্প্রতি তিনি দেশে আসিয়াছেন। শিবচরণ পরম হিন্দু, বিধবা ভ্রাতৃবধূর এরূপ বেশ-ভূষা তাঁহার চক্ষে নিতান্তই ধর্ম্ম ও আচারবিরুদ্ধ মনে হইল; দুই এক দিন ইতস্ততঃ করিয়া শেষ পত্নী জয়কালীকে উত্তেজিত করিয়া ভ্রাতৃবধূর সমক্ষে শিবচরণ বলিলেন, "আমাদের দেশে বিধবাদের যে ভাবে থাকার নিয়ম আছে সেইরূপ থাকাই উচিত।" শুনিয়া লজ্জায় সুষমা যেন মরিয়া গেল! সেই দিবস হইতেই হাত ধুইয়া সে থান ব্যবহার আরম্ভ করিল। পরদিন আহার করিতে করিতে জয়কালী সুষমাকে বলিল, "তোমার ভাশুর বলিছিলো দুধ ঘি কি আর কিছু ভাল সামগ্রী খেলে বিধবার ধর্ম্ম থাকে না।"

তারপর হইতে সুষমার আহারাদির সম্বন্ধেও বিশেষ বন্দোবস্ত হইল। মধ্যাহ্নে গব্যঘৃত-বিহীন হবিষ্যান্ন আর রাত্রে কিঞ্চিৎ জল-পান। এরূপ ব্যবস্থার কথা লোকপরম্পরায় যেদিন সুষমার দেবর সুদর্শনের কানে উঠে, সেদিন সে জয়কালীকে বলিয়াছিল, "মেজোবউঠাকুরণ ত নিতান্ত ছেলেমানুষ, তাঁর এসব বিড়ম্বনা কেন, এত কড়াকড়ী কল্লে শেষ যে মারা যাবেন!" কিন্তু হিতে বিপরীত হইল, জয়কালী ভেংচে বেওণে উলিয়া উঠিল। "ওমা এমন ঘর-ভাঙ্গা বেহায়া মেয়ে বাপের কালেও ত দেখিনি লো" বলিতে বলিতে গিন্নি একেবারে ক্ষিপ্রপদে কর্ত্তার নিকট উপস্থিত হইলেন। শিবচরণ অতিমাত্র বিস্ময়র সহিত গৃহিণীর কথাগুলি শুনিলেন। হিন্দুবধূ, বিশেষতঃ বিধবা, যে, এরূপ লজ্জাহীনা হইয়া নিজের আহারের বিষয়ে পরপুরুষকে বলিতে পারে, ইহা শিবচরণের বুদ্ধির অগোচর ছিল। তিনি এই ঘটনার ভিতর দিয়া অনেক দূর দেখিলেন। শেষ গৃহিণীকে বলিয়া দিলেন, "বৌমার উপর একটু চোখ রেখো।" কথাটা যদি উঠিল তবে সুষমার কাণে না উঠিবে কেন? সুষমা ইহার কিছুই জানে না, সে ত একেবারে আকাশ হইতে পড়িল, কিন্তু কি আর সে করিবে! নির্জ্জনে নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিল।

... ...

কালেজের ছুটি ফুরাইলে সুদর্শন চলিয়া গেল। যে কারণেই হোক্, সুদর্শন বাটিতে থাকিতে জয়কালীর গৃহিণীপনাটা যেন কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ ছিল। জয়কালীর তিন চারিটি সন্তান, বিশেষতঃ কোলের ছেলেটিকে লইয়া সে সদাই ব্যস্ত। তাই সাংসারিক সমস্ত পরিশ্রমের কাজ সুষমার ঘাড়ে চাপিল। জয়কালী ভাল রাঁধিতে পারে না, বিশেষ আগুনের তাপ গেলেই তার হিষ্টিরিয়া

বৃদ্ধি পায়, কাজেই দুই বেলাই সুষমাকে রাঁধিতে হইত; আঁশ হেঁসেলের রান্না শেষ করিয়া, ছেলেদের খাওয়াইয়া তবে আবার সে নিজের হবিষ্যান্ন রাঁধিত। কিন্তু জয়কালী একেবারে বিবেচনাশূন্যা নহে, সে একাদশীর দিন রাত্রে সুষমাকে হেঁসেলে যাইতে দিত না, কষ্ট স্বীকার করিয়াও সে বেলা সে কোনরূপে চালাইয়া লইত। আর সুষমাকে উল্লেখ করিয়া বলিত, "আহা ছেলেমানুষ এত কি পারে!"

জয়কালী সুষমাকে পাড়া-প্রতিবেশী কোন স্ত্রীলোকের সহিত মিশিতে দিতে ভালবাসিত না। এমন কি, কেহ যদি দুদণ্ড সুষমার নিকট বসিয়া গল্প করিত তাতেও সে বিরক্ত হইত। মুখে বলিত "চেটো বিধবার কি যার তার সঙ্গে মিশিতে আছে?" লোকে কিন্তু জয়কালীর মহৎ উদ্দেশ্য বুঝিত না, তারা বলিত, পাছে সুষমা জয়কালীর কোন নিন্দা করে, এই তার মহা ভয়।

আহারান্তে মধ্যাহ্নে প্রত্যহই সুষমা আপনার ঘরটিতে গিয়া বসিত। সে ঘরে বসিতে বুঝি তার বড় ভাল লাগিত। সেই ঘরে বসিয়া বসিয়া সে পড়াশুনা করিত, কোন দিন বা মাকে কোন দিন বা সমবয়সীদের কখন বা দেবরকে পত্র লিখিত। সে সময়, সে বড় বেশী নয়, সে সংসারের কোন কাজকর্ম্ম করিত না, বুঝি পারিতও না। জয়কালী ইহাতে একটু খিট্‌খিট্ করিত; এসময়টা যদি সুষমা কোলের ছেলেটিকে দুদণ্ড ধরে তবে জয়কালী তাহার "মনের কথা"র সহিত দুটো সুখদুঃখের গল্প একটু আরামের সহিত করিতে পারে; ছেলেগুলার জন্য দুপুরবেলা একটু বেড়াতে গিয়েও তার শোয়াস্তি নাই।

জয়কালী একদিন দুপুরবেলা নূতন আয়দানি অনন্ত ও চুড়ী

পরিয়া প্রতিবেশিনী মহলে বেড়াইতে গিয়াছেন। সেদিন দু' পাঁচ মিনিটের জন্য সকল প্রতিবেশীরই বাড়ী গিয়া খোঁজ লইতেছিলেন। কাহাকে দিদি কাহাকে মাসি কাহাকেও গোলাপ সম্বোধন করিয়া বলিতেছিলেন, "যে সংসার, তা' ফেলে কি আর দুদণ্ড বেরোবার যো আছে, আজ একটু সময় পেলাম তাই বলি কে কেমন আছে একবার দেখে আসি, তোমরা ত মনে করে' ওদিকে যাওনা, আমার মন যেই কাঁদে তাই" ইত্যাদি।

এইরূপে আপ্যায়িত করিয়া গৃহে ফিরিতে জয়কালীর একটু বিলম্ব হইয়া গেল। বাড়ী আসিয়া দেখে, সর্ব্বনাশ, ঘরে কুকুর ঢুকিয়া দুধটুকু একেবারে নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছে। বেড়াইতে বাহিবার সময় তাড়াতাড়িতে জয়কালী কপাটের শিকল তুলিয়া দিতে ভুলিয়াছিল; এটা যে তাহার দোষ তাহা মনে হইল না, ঝোঁকটা পড়িল সুষমার উপর। তখন স্বরলহরী সপ্তমে তুলিয়া জয়কালী বলিতে লাগিল, "বলি, মেজবউ, বাড়ীতে যে আছ, তা কি ছাই কিছুই দেখ্‌তে নেই! কি বাবুই হয়েছ মাইরি!" এই মিষ্ট সম্বোধন সুষমার কানে গেল, সে কোথায় পত্র লিখিতেছিল, তাড়াতাড়ি সেই অর্দ্ধ-সমাপ্ত পত্র হাতে লইয়াই বাহিরে আসিয়া বলিল, "কি হয়েছে দিদি!" জয়কালী বিকট মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, "হবে আর কি! আমার মাথা আর মুণ্ডু হয়েছে! দুধটুকু সব কুকুরকে খাইয়ে বসে' আছ, এখন ছেলেদেরই বা কি খাওয়াই আর ওকেই বা কি পাঁশ দি!" রসজ্ঞ পাঠককে বলিতে হইবে না "ও" সর্ব্বনামের কর্ত্তা এবং জয়কালীর কর্ত্তা একই। সুষমা এ দুধ নষ্ট হওয়ার কিছুই জানে না, সে একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কই দিদি, আমার ঘরে ত দুধ ছিল না!" এই উত্তরে দলিতা ফণিনীর মত জয়কালী গর্জ্জিয়া উঠিল, "কি

ভায়াদেই শিখেছ আর কি! তোমায় ঘরে রাখিনি বলেই কুকুর দিয়ে দুধ খাওয়াতে হবে, কেমন? ঢের ঢের মেয়ে দেখেছি যাহোক, তোমার মত এমন দজ্জাল মেয়ে কিন্তু কখনও দেখিনি; কথার ছিরিখানা দেখ একবার, তবু যদি কপাল না পুড়ত!" বলিতে বলিতে সুষমার হস্তস্থিত পত্রের দিকে জয়-কালীর নজর পড়িল। আর যাবে কোথা! "কি লেখাপড়াই শিখেছিলে, রোজ রোজ অত চিঠি লেখ কাকে? দেখ্‌চি কোন দিন বা তুমি কি করে' বস! বাবু যে বলেন—(জয়কালী কিছু দিন কলিকাতায় থাকিয়া কিছু কিছু সহরে ধরণধারণ শিখিয়া-ছিল, তবে সব সময় এটী ঠিক রাখিতে পারিত না।) লেখাপড়া শিখ্‌লেই মেয়েরা নষ্ট হয়ে যায় সে কথা মিছে নয়!" আমাদের বোধ হয় এই ভয়েই জয়কালী লেখাপড়া শিখে নাই। জয়কালীর এইরূপ বাক্যে, বাণবিদ্ধা হরিণীর মত সুষমা জর্জ্জরিত হইল, কিছু উত্তর না করিয়া সে আপনার বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল! হায়, রোদন ভিন্ন এ অনাথার আর কি উপায় আছে!

এ ঘটনা কিন্তু এইখানেই শেষ হইল না। নব-অলঙ্কার-বিভূষিতা অলঙ্কারপ্রিয়া জয়কালী নানা অলঙ্কারের সহিত ব্যাপারটী স্বামীসদনে পেশ করিলেন। শিবচরণ স্ত্রীর সকল কথায় বিশ্বাস করেন কি না জানি না, কিন্তু এ সকল বিষয়ে তিনি স্ত্রীকে কখনও অবিশ্বাস করেন না। বিশেষ আহারের সময় সম্মুখে দুধের বাটী না দেখিয়া কথাগুলির সত্যতার উপর তাঁর আর কোনই সন্দেহ রহিল না। শিবচরণ দেখিতে দেখিতে অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তখন সম্বন্ধ ভুলিয়া (রাগিলে শিব-রামের জ্ঞান থাকে না) ভ্রাতৃবধূকে যা' তা' বলিয়া অযথা ভৎর্সনা করিলেন—চিঠি-লেখা ও পড়াশুনার কথা তুলিয়া বেশ

দু কথা শুনাইতেও কসুর করিলেন না। তার পর হইতে এরূপ ভৎর্সনা সুষমার কপালে প্রায়ই ঘটিত।

... ...

সুষমা এখন আর ভ্রমেও পড়াশুনার কি পত্র-লেখার দিকে যায় না। কিন্তু একটী অভ্যাস সে ত্যাগ করিতে পারে নাই। গভীর নিশীথে যখন গৃহে গৃহে ঘুমাইয়া পড়িত, তখন সুষমা, আপনার ঘরে বসিয়া, যেন কত কত ভয়ে ভয়ে কতকগুলি চিঠি পড়িত, চিঠিগুলি সংখ্যায় বড় বেশী নয়, একটুকুরা জীর্ণ ফিতায় বাঁধা; বার বার ব্যবহারে, হাতে হাতে চিঠিগুলি কিঞ্চিৎ বিবর্ণ, অতি যত্নে রক্ষিত তাই বুঝি এত মলিন! সুষমার স্বামী প্রবাসে বসিয়া, এই পত্র কয়খানি লিখিয়াছিলেন। সধবা অবস্থায় যে দিনগুলি সুষমার বড় দুঃখে কাটিয়াছিল, এ চিঠি-গুলি সেই কদিনের; সুখের দিনের কোন স্মৃতি নাই, কিন্তু সেই দুঃখের দিনগুলি, আজ এই দুঃখের দিনে, একটু সুখের স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছে। গভীর নিশীথে গৃহের এক কোণে, একটী ভাঙ্গা পিলসুজের পাশে বসিয়া, ক্ষীণালোকে সুষমা সেই তাড়াবাঁধা চিঠিগুলি পড়িত। যেগুলিতে প্রিয় সম্বোধন একটু অধিক, সেখানিতে আদরের কথা দুটা বেশী, যাহাতে একটা বিশেষ সুখের স্মৃতি, সুষমা সেই সব চিঠি বারবার পড়িত! সধবা অবস্থায় এ পত্রগুলি পড়িতে পড়িতে কতবার ধরা পড়িবার ভয়ে সে কখনও বুকের কাপড়ে, কখনও খোঁপায়, কখনও বালিসের তলায় লুকাইত! আজও সে পত্রে, তার নিজের মাথায় তেলের ও গায়ের একটা সৌরভ মাখা আছে! পত্র পড়িতে পড়িতে সুষমার সব মনে পড়িত, তার পর এক-ফোঁটা চোখের জল ফেলিয়া পত্রগুলি অতি যত্নে ভাঁজ করিয়া

তুলিয়া রাখিত—শেষে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শুইতে যাইত।

জয়কালীর জ্যেষ্ঠা কন্যা ইন্দুমতী সুষমার কিছু অধুগত। তার বয়স এমন বেশী নয়, বছর বারো হইবে; সে কিন্তু তার খুড়িমার ব্যথা কতক কতক বুঝিত। মাঝে মাঝে খুড়িমার জন্য সে মার সহিত বকাবকিও করিত। ইন্দু যেদিন "ঘর বসতে" শ্বশুরবাটী যায়, সে দিন যাত্রা করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সে একবার তার খুড়িমার সহিত দেখা করিতে আসিতেছিল, জয়কালী তাহাতে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "যাত্রা কর্‌লে' আর সে বিধবার মুখ দেখ্‌তে হবে না," সেই সময়, সুষমাও ইন্দুকে দেখিতে বাহিরে আসিতেছিল, দূর হইতে কথাটা তার কানে গেল, আর পা উঠিল না! কি জানি, সত্যই যদি এসময় তাকে দেখিলে ইন্দুর কোন অমঙ্গল হয়! কিন্তু তবু অজ্ঞাতে এক ফোঁটা জল, কোথা হইতে সুষমার অপাঙ্গে দেখা দিল! ইন্দু শ্বশুরবাটী গেলে সুষমা যেন দমিয়া পড়িল। এই কারাগারে ইন্দুই তাহার একমাত্র সঙ্গিনী ও সহায় ছিল।

... ...

অনবরত পরিশ্রমে সুষমার শরীর ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল, হঠাৎ একদিন জ্বর দেখা দিল, সে জ্বর বড় সহজ নহে, কিন্তু বিধবাকে ত ডাক্তারী ঔষধ খাইতে নাই, তাই শিবচরণ, ডাক্তারী চিকিৎসা করাইলেন না। গ্রামে একটা হাতুড়ে বৈদ্য ছিল, তাহারই ঔষধ ভরসা করিয়া, অনেক দিন কষ্ট পাইয়া, সুষমা এইটু আরোগ্য লাভ করিল। অল্পদিন পরেই আবার পরিশ্রম আরম্ভ হইল, কিন্তু ভাঙ্গাশরীরে আর তত পরিশ্রম সহিবে কেন! সুষমা আবার জ্বরে পড়িল। এইরূপে

উঠিতে পড়িতে জ্বর ক্রমে পুরাতনে দাঁড়াইল। কিন্তু সুষমা জ্বরে পড়িয়া থাকিলে সংসার চলে কই বল? কাজেই কখনও কুইনাইনে কখনও উপবাসে জ্বর চাপা দিয়া সুষমা সংসারের কাজ করিত। শেষ এমন হইল, প্রতিরাত্রেই সুষমা জ্বর অনুভব করিত। শরীর ক্রমেই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল। মনে হইত যেন শরীরে বলের লেশমাত্রও নাই। দু' একদিন সে মুখ ফুটিয়া জয়কালীকে একথা বলিয়াছিল, কিন্তু জয়কালী তাতে বড় কান দেয় নাই। মুখে বলিত, "ওটুকু খেতে মাখতেই সেরে যাবে!" মনে জানিত, এ কেবল বাপের বাড়ী যাবার ছল, স্বামীকেও সে এইরূপ বুঝাইয়াছিল।

ইতিপূর্ব্বে সুষমার মা সুষমাকে লইয়া যাইবার জন্য কতবার আকিঞ্চন করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। সুষমাকে লইবার কথা কেহ বলিতে আসিলেই শিবচরণ গম্ভীর ভাবে বলিতেন, "মাউইমা কেমন করে' এ অবস্থায় সেখানে বৌমাকে নিয়ে যেতে চান! আমি কি এখন তাঁকে সেখানে রাখতে পারি! পুরুষ অভিভাবক কেউ থাকলেও যা' হয় হত!" সত্যই সুষমার মার আর কেহই অভিভাবক ছিল না। সুষমা এতদিন বিশেষ কিছু বলে নাই, কিন্তু যখন শরীর একবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল তখন মার নিকট যাইবার জন্য সে বড় ব্যস্ত হইল; কিন্তু তার কথা কে শুনে! সেই একই ওজর! কিন্তু আসল কথা কি, বধূমাতাকে কি বধূমাতার গহনা ও টাকাগুলিকে অরক্ষিত অবস্থায় ছাড়িয়া দিতে শিবচরণের এ সাবধানিতা তা' ঠিক জানা যায় না। আর জয়কালী সে জানিত, সুষমা হাত-ছাড়া হইলে কাজকর্ম্ম কে চালাইবে! লোকমুখে সুষমার মা কন্যার এই অবস্থা জানিতে পারিলেন, কাঁদিয়া কাটিয়া শেষ

স্থির করিলেন তিনি নিজে গিয়াই কন্যাকে লইয়া আসিবেন।

* * * * *

এদিকে সুষমার শরীরে আর সহিল না। একদিন একাদশীর দিনে সুষমার ভয়ানক জ্বর আসিল, তখনও তার রান্না শেষ হয় নাই। তাড়াতাড়ি করিয়া রান্না শেষ করিয়া, হাত পা ধুইয়া সে নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। এমন জ্বর সুষমার আর কখনও হয় নাই। মনে হইল কে যেন অগ্নিশলাকায় তাহার দেহ বিঁধিতেছে! তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিতেছিল, কিন্তু আজ যে একাদশী! যত বেলা পড়িতে লাগিল সুষমার দেহ তত অবশ হইতে আরম্ভ হইল। অসহ্য যন্ত্রণায় সে ছটফট করিতেছে, মুখে শুধু "মা" আর "মা"! জয়কালী দুই চারিবার উঁকি মারিয়া "কেমন আছ" বলিয়া চলিয়া গেল। অন্যদিন ছোট মেয়েটীকে রাত্রে সুষমার কাছে শুইতে দিত, কিন্তু সেদিন রোগীর বিছানায় শুইতে দিল না! সমস্ত রাত্রি ভয়ানক যন্ত্রণার পর প্রত্যূষে সুষমা স্বপ্ন দেখিল যেন সে মার বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছে। সহসা ঘরের দরজা ঠেলিয়া ধীরে ধীরে কে সুষমার ঘরে প্রবেশ করিল। জ্বরের ঘোরে সুষমা রাত্রে আর কপাট বন্ধ করিতে পারে নাই। সুষমার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, দেখিল সম্মুখে স্নেহময়ী মা! তবে এওকি স্বপ্ন? না, সত্যই যে মা কাঁদিতে কাঁদিতে তার নিকটে গিয়া বসিলেন! সুষমা মার দিকে চাহিয়া চাহিয়া একবার "মা" বলিয়া ডাকিল, সেই এক "মা" সম্বোধনে মার বুক বিদীর্ণ হইয়া গেল! বুঝি দুঃখিনী জনকনন্দিনীর দুঃখে ধরণীর বুক এমনি করিয়া বিদীর্ণ হইয়াছিল! তখন সেই জন্মদুঃখিনী, জনকনন্দিনীর মত, চিরদিনের জন্য মার কোলে লুকাইল।

কণারক।

(উড়িষ্যার সূর্য্যমন্দির।)

কণারকে এখন কিছুই নাই, ধূধূ প্রান্তরমধ্যে শুধু একটি অতীতের সমাধিমন্দির—শৈবালাচ্ছন্ন পরিত্যক্ত জীর্ণ দেবালয় এবং তাহারই বিজন বক্ষের মধ্যে পুরাতন দিনের একটি বিপুল কাহিনী। সেই পুরাতন দিন—যখন এই মন্দিরদ্বারে দাঁড়াইয়া লক্ষ লক্ষ শুভ্রকান্তি ব্রাহ্মণ যাজক যজ্ঞোপবীতজড়িতহস্তে সাগরগর্ভ হইতে প্রথম সূর্য্যোদয় অবলোকন করিতেন; নীল জল শুভ্র আননে তাঁহাদের পদতলে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত এবং নীল আকাশ অবারিত প্রীতিভরে অরুণিম আশীর্ব্বাদধারা বর্ষণ করিত। তাম্রলিপ্তির বন্দর হইতে সিংহলে, চীনে এবং অন্যান্য নানা দূরদেশে পণ্য ও যাত্রী লইয়া নিত্য যে সকল বৃহৎ অর্ণবযান যাতায়াত করিত, তাহাদের নাবিকেরা এই কোণার্কমন্দিরের মধুর ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া বহুদিন সন্ধ্যাকালে দূর হইতে দেবতাকে সসম্ভ্রম প্রণিপাত জানাইত; এবং দেবতার যথাযোগ্যায় তরণীর সুনির্ম্মিত চীনাংশুককেতু উড্ডীয়মান হইত। মন্দিরের বহিঃপ্রাঙ্গণে, দ্বারের সম্মুখে, সিদ্ধগন্ধর্ব্বসেবিত প্রাচীন কল্পবটমূলে শত সহস্র যাত্রী—কত দুরারোগ্য রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে আসিয়াছে! একবার যদি সূর্য্যদেবের অনুগ্রহ হয়, একবার যদি মহাদ্যুতি আপন কনক কিরণে সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণা হরণ করিয়া লয়েন!

এখন এ অর্কক্ষেত্রে যাত্রীর পদধূলি আর পড়ে না। পুরী হইতে দশ ক্রোশ পথ বালু ভাঙ্গিয়া একটা ভগ্নমন্দির দেখিতে কে যাইবে? মন্দিরের সমস্তই পড়িয়া গিয়াছে—শুধু জগমোহন

টুকু বিচিত্র শৃঙ্গার-ভাস্কর্য্যে ও অনুপশিল্প নীলাক্ত প্রস্তরনির্ম্মিত দ্বারদেশে দৈবাগত পথিকজনের মুগ্ধ নয়ন আকর্ষণ করে। এবং পুরাতত্ত্ববিৎ এই মন্দিরের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখেন, পাষাণে প্রাচীন ভারতবর্ষ আপনাকে কি সুন্দররূপেই মুদ্রিত করিয়াছে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জীবজন্তুদিগের মূর্ত্তিগুলিই কি সুন্দর! এমন সুগ্রীব তেজে-ভরা অশ্ব, এমন সুন্দর সুঠাম করিবর! কেবল সিংহ দুইটি প্রকৃতির অনুরূপ নহে—কিন্তু তাহাও উড়িষ্যার অন্যান্য মন্দিরের সিংহের সহিত তুলনায় কতকটা সিংহের মত বটে। আর সেই অতুল্য শিল্প—নবগ্রহ; উজ্জ্বল কৃষ্ণ পাষাণখণ্ডে মুদ্রিত কয়টি বুদ্ধদৃপ্ত প্রশান্ত হাস্যবদন, হস্তে কাহারও জপমালা, কাঁহারও বা অর্দ্ধচন্দ্র, কাহারও বা পূর্ণঘট। এখন এই নবগ্রহমূর্ত্তি মন্দির হইতে প্রায় চারিশত হস্ত দূরে ইংরাজের লৌহরথোপরি শায়িত—কলিকাতায় আনিতে আনিতে আনা হয় নাই; পথিকেরা তাহার গায়ে সিন্দূর লেপন পূর্ব্বক ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া যায়; কিন্তু এই নূতনলব্ধ ভক্তি এবং প্রীতি লাভ করিয়াও আর কিছুকাল পড়িয়া থাকিলে এই অক্ষুণ্ণ প্রাচীন কীর্ত্তি শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে।

উড়িষ্যার দ্বাদশবর্ষের রাজস্ব সমুদ্রের বালুতটে এই একমাত্র পাষাণমন্দিরে নিঃশেষিত হইয়াছে। মন্দিরটি ত সামান্য নহে। গত শতাব্দীতেও মহারাষ্ট্রীয়েরা ইহারই পাথর খসাইয়া খসাইয়া জগন্নাথের গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছেন। এবং জগন্নাথের সিংহদ্বারের সম্মুখে যে সমুচ্চ অরুণস্তম্ভ দেখা যায় তাহাও এই কণারকেরই গৌরবের ভগ্নাবশেষ।

বিলাসকলার তখন ত্রুটি ছিল না। মন্দিরের সমস্ত ভিত্তি পূর্ণ করিয়া নগ্ন নারীমূর্ত্তি—বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী ও সুডৌল গঠন অনেক

স্থলে শিল্পীর অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচায়ক এবং অধিকাংশ স্থলেই অত্যন্ত কুৎসিৎ কল্পনায় শিল্পগৌরব সঙ্কুচিত।—হয়ত বাহিরেও যেমন ভিতরেও সেইরূপ ছিল। নর্ত্তকীর লাস্যলীলা দেবতার মনোরঞ্জন করিত এবং ভোগবিলাসেই দেবচরিত্রের সমস্ত গৌরব স্থাপিত ছিল। উড়িষ্যার দেবমন্দিরে নর্ত্তকীর প্রাধান্য এখনও বড় কম নহে। জগন্নাথের পবিত্র নিকেতনে এখনও নিত্য রাসলীলা অনুষ্ঠিত হয় এবং পাণ্ডাবর্গের পুণ্যসঞ্চয়ের তাহাতে কোনও ব্যাঘাত ঘটে না।

এই বিলাসখচিত মন্দিরের দ্বারে কত লোকে কত দিন অন্তরের দারুণ নির্ব্বেদ লইয়া আসিয়াছে! সংসার পাছে কামনার উদ্রেক করে, পাছে কোন দিন স্ত্রীর মুখ দেখিয়া মোহ উপস্থিত হয়, সন্তানের মায়া কাটান না যায়, বৃদ্ধ পিতামাতার অশ্রুজল বন্ধন-চ্ছেদনে বাধা দেয়, গৃহ স্ত্রী পুত্র পিতামাতা সমস্ত পরিজন পরিত্যাগ করিয়া লোকে দেবদ্বারে আসিয়া হত্যা দিয়া পড়িয়াছে—হে দেবতা, রক্ষা কর, মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া দাও, আমি তোমার দ্বারে চিরদিন সন্ন্যাসী হইয়া রহিব। হায়, জড়দেবতা, সে যদি বুঝিত তুমি কি অন্ধকার মোহরাশিতে গঠিত। ক্ষীণ দীপালোকে তুমি ভক্তহৃদয়ের বৈরাগ্য অনুমোদন কর; এবং শত দীপালোকে তোমারই সম্মুখ-প্রাঙ্গণে নিত্য মদনবিলাসের এক এক অঙ্ক অভিনীত হয়!

তবে এ কি মায়া? এ কি এই সংসারখেলার একটা রূপক? বুঝান' যে, চারিদিকে মদন মন যৌবন লইয়া নিত্য যে আন্দোলন উঠিতেছে তাহারই মধ্যে অন্তর কিরূপে অবিচলিত শান্তভাব অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারে? তাই বুঝি কবিহৃদয় তোমার মন্দির দেখিয়া মনে করে, বিশ্বসংসারেরও বহিঃপ্রাচীরে আমরা

এইরূপ ভাস্কর্য্যের মত—আপন আপন বিচিত্র জীবন যৌবন লইয়া নিত্য এই বিশ্বপাষাণে মুদ্রিত হইতেছি; কিন্তু বিশ্বের অন্তরের মধ্যে যে মহান্ দেবতা জাগিয়া বসিয়া আছেন, এ মায়াবুদ্বুদ তাঁহার চরণে পঁহুছে না।—বৈরাগ্য ও বিলাস যেন দেবতামন্দিরে দুই দিক্ হইতে আসিয়া মিশিয়াছে—শুধু এপিঠ ওপিঠ, শুধু ভিতর বাহির, শুধু দেহ মন।

কণারকে এখন দেবতা নাই—এত কথা বলা খাটে না। কিন্তু সমস্ত প্রান্তর জুড়িয়া সেখানে এক নিশ্চল বৈরাগ্য বাসা বাঁধিয়াছে। তাহার মুখে কেবল হায় হায়। বৈদান্তিক মায়াবাদীর মত সে শুধু বলিতেছে, জীবন অনিত্য, যৌবন অনিত্য, ধনজন অনিত্য, সুখ অনিত্য, সংসার অনিত্য, সকলি যেখানে অনিত্য ও মায়া সেখানে দেবালয়ে এ বিড়ম্বনা কেন? দ্বাদশ বৎসরের দুর্ভিক্ষ দিয়া এ পাষাণস্তূপ রচনা করিয়া কি ফল? দেশকাল ত সাগরবক্ষে একটা ক্ষণিক বুদ্বুদ মাত্র; হায়, মায়াহত, তুমি জানিয়া শুনিয়াও ইহা বুঝিলে না!

মায়াই বটে—বিধাতার মায়ারাজ্যে এ শুধু মানবের মায়া-স্বপ্ন।

ভুল করিয়া শাম্ব সেদিন সরসীতীরে আসিয়াছিলেন—জননী জাম্ববতী জানিলে নিষেধ করিতেন, জনক শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে থাকিলে আসিতে দিতেন না—শাম্বের বিমাতৃগণ তখন পরিপূর্ণ যৌবনে জলক্রীড়ায় মত্ত। মৃণাল-ভুজ আলোড়নে জল যেমন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, সুন্দরীদের যৌবনও তখন সেইরূপ আবেগ-ভরে আন্দোলিত। এই পথে শাম্ব! পিতৃমুখ হইতে অভিশাপ বাহির হইল—কুষ্ঠরোগে তোমার প্রায়শ্চিত্ত হউক্।—অভিশপ্ত দ্বাদশ বৎসর কাল শান্ত দান্ত নিরাহার বায়ুভক্ষ্য জিতে-

স্থির হইয়া চন্দ্রভাগা নদীতীরে সূর্য্যকে স্তবে সন্তুষ্ট করিলেন। এবং সর্ব্বপাপঘ্ন দিবাকরের বরে রোগমুক্ত হইয়া মুক্তিদাতা দেবতার নামে এই মন্দির উৎসর্গ করিলেন।

সেই অবধি এই অর্কক্ষেত্রে আসিয়া সমুদ্রে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ হইতে সদ্য মুক্তিলাভ হয়। ঐ যে অর্কবট দেখা যায়, সূর্য্য স্বয়ং এখানে আসিয়া ঐ রূপ ধারণ করিয়াছেন; তিন পক্ষ কাল এই বটতরুতলে বসিয়া সূর্য্যমন্ত্র জপ করিলে মানব তৎক্ষণাৎ চরম সদ্গতি লাভ করে। এখানে রথযাত্রা দর্শনমাত্রে সূর্য্যের শরীরী রূপ দর্শনলাভ ঘটে। যে পুণ্য জন এইখানে আসিয়া অনন্যমনে নবগ্রহের স্তোত্র পাঠ করিতে পারেন, তিনি ধন্য।—অর্কক্ষেত্রের মহিমা একমুখে বলিয়া শেষ করা যায় না। কপিলসংহিতা-রচয়িতা শত শ্লোকে তাহা শেষ করিতে পারেন নাই।

কিন্তু এই ঘোর কলির অভ্যুদয়ে সে প্রাচীন শ্লোকসমূহও ব্যর্থ। সংহিতা কে শুনে? বিধি কে মানে? মন্দিরের দ্বার হইতে সমুদ্র যেমন মাইল পথ সরিয়া গিয়াছে, যাত্রীর প্রবাহও সেইরূপ অর্কক্ষেত্র ছাড়িয়া পুরুষোত্তমে গিয়া ঠেকিয়াছে।—রৌদ্রদীপ্ত নারিকেল তরুশ্রেণীর গায়ে শৈবালশ্যাম কণারক শুধু চিত্রার্পিতবৎ দেখায়।

পরিত্যক্ত পাষাণস্তূপের নির্জ্জন নিকেতনে নিশাচর বাঁদুড় বাসা বাঁধিয়াছে, হিম শিলাখণ্ডোপরি বিষধর ফণিনী কুণ্ডলী পাকাইয়া নিঃশঙ্ক বিশ্রামসুখে লীন হইয়া আছে; সম্মুখের ঝিল্লি-মুখরিত প্রান্তরদেশ দিয়া গ্রাম্য পথিকজন যখন কদাচিৎ দূর তীর্থ উদ্দেশে যাত্রা করে, একবার এই জীর্ণ দেবালয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখে এবং বিলম্ব না করিয়া আপন

সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই দ্রুতপদে আবার পথ চলিতে থাকে।—কণারক এখন শুধু স্বপ্নের মত, মায়ার মত; যেন কোন্ প্রাচীন উপ-কথার বিস্মৃতপ্রায় উপসংহার শৈবালশয্যায় এখানে নিঃশব্দে অবসিত হইতেছে—এবং অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মিরেখায় ক্ষীণপাণ্ডু মৃত্যুর মুখে রক্তিম আভা পড়িয়া সমস্তটা একটা চিতাদৃশ্যের মত বোধ হয়। মনে হয়,

"যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী
রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা।"

পাঞ্চভৌতিক ডায়ারি।

বর্ষায় নদী ছাপিয়া ক্ষেতের মধ্যে জল প্রবেশ করিয়াছে; আমাদের বোট অর্দ্ধমগ্ন ধানের উপর দিয়া সর্ সর্ শব্দ করিতে করিতে চলিয়াছে।

অদূরে উচ্চভূমিতে একটা প্রাচীরবেষ্টিত একতালা কোঠা বাড়ি এবং দুই চারিটি টিনের ছাদবিশিষ্ট কুটীর ফলা কাঁঠাল আম বাঁশঝাড় এবং বৃহৎ বাঁধানো অশ্বত্থগাছের মধ্য দিয়া দেখা যাইতেছে।

সেখান হইতে একটা সরু সুরের সানাই এবং গোটাকতক ঢাকঢোলের শব্দ শোনা গেল। সানাই অত্যন্ত বেসুরে একটা মেঠো রাগিণীর আরম্ভ অংশ বারম্বার ফিরিয়া ফিরিয়া নিষ্ঠুর ভাবে বাজাইতেছে এবং ঢাকঢোলগুলা যেন অকস্মাৎ বিনা কারণে ক্ষেপিয়া উঠিয়া বায়ুরাজ্য লণ্ডভণ্ড করিতে উদ্যত হইয়াছে।

আসি নাই। কিন্তু একটু ঠাণ্ডা হইয়া বল দেখি পুণ্যাহের দিন ঐ বেসুরো সানাইটা বাজাইয়া পৃথিবীর কি সংশোধন করা হয়! সঙ্গীতকলা ত নহেই।

সঙ্গীরণ কহিল, ও আর কিছুই নহে একটা সুর ধরাইয়া দেওয়া। সংবৎসরের বিবিধ পদস্খলন এবং ছন্দঃপতনের পর পুনর্ব্বার সমের কাছে আসিয়া একবার ধুয়ায় আনিয়া ফেলা। সংসারের স্বার্থকোলাহলের মধ্যে মাঝে মাঝে একটা পঞ্চম সুর সংযোগ করিয়া দিলে নিদেন ক্ষণকালের জন্য পৃথিবীর শ্রী ফিরিয়া যায়, হঠাৎ হাটের মধ্যে গৃহের শোভা আসিয়া আবির্ভূত হয়, কেনাবেচার উপর ভালবাসার স্নিগ্ধদৃষ্টি চন্দ্রালোকের ন্যায় নিপতিত হইয়া তাহার শুষ্ক কঠোরতা দূর করিয়া দেয়। যাহা হইয়া থাকে পৃথিবীতে তাহা চীৎকার স্বরে হইতেছে, আর, যাহা হওয়া উচিত তাহা মাঝে মাঝে এক একদিন আসিয়া মাঝখানে বসিয়া সুকোমল সুন্দর সুরে সুর দিতেছে, এবং তখনকার মত সমস্ত চীৎকারস্বর নরম হইয়া আসিয়া সেই সুরের সহিত আপনাকে মিলাইয়া লইতেছে—পুণ্যাহ সেই সঙ্গীতের দিন।

আমি কহিলাম, উৎসবমাত্রই তাই। মানুষ প্রতিদিন যে ভাবে কাজ করে এক একদিন তাহার উল্টাভাবে আপনাকে সারিয়া লইতে চেষ্টা করে! প্রতিদিন উপার্জ্জন করে একদিন খরচ করে, প্রতিদিন দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখে একদিন দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়, প্রতিদিন গৃহের মধ্যে আসিই গৃহকর্ত্তা, আর একদিন আসি সকলের সেবায় নিযুক্ত। সেই দিন শুভদিন, আনন্দের দিন, সেই দিনই উৎসব। সেই দিন সম্বৎসরের আদর্শ। সে দিন ফুলের মালা, স্ফটিকের প্রদীপ, শোভন ভূষণ।

সুরে একটি বাঁশি বাজিয়া বলিতে থাকে, আজিকার এই সুরই যথার্থ সুর, আর সমস্তই বেসুরা। বুঝিতে পারি আমরা মানুষে মানুষে হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিত হইয়া আনন্দ করিতে আসিয়াছিলাম কিন্তু প্রতিদিনের দৈন্যবশতঃ তাহা পারিয়া উঠি না;—যে দিন পারি সেই দিনই প্রধান দিন।

সমীরণ কহিল, সংসারে দৈন্যের শেষ নাই। সেদিক হইতে দেখিতে গেলে মানবজীবনটা অত্যন্ত শীর্ণ শূন্য শ্রীহীনরূপে চক্ষে পড়ে। মানবাত্মা জিনিষটা যতই উচ্চ হউক্ না কেন দুই-বেলা দুই মুষ্টি তণ্ডুল সংগ্রহ করিতেই হইবে, একখণ্ড বস্ত্র না হইলে সে মাটিতে মিশাইয়া যায়। এদিকে আপনাকে অবিনাশী অনন্ত বলিয়া বিশ্বাস করে, ওদিকে যে দিন নস্যের ডিবাটা হারাইয়া যায় সে দিন আকাশ বিদীর্ণ করিয়া ফেলে। যেমন করিয়াই হৌক্, প্রতিদিন তাহাকে আহারবিহার কেনাবেচা দরদাম মারামারি ঠেলাঠেলি করিতেই হয়—সে জন্য সে লজ্জিত। এই কারণে সে এই শুষ্ক ধূলিময় লোকাকীর্ণ হাটবাজারের ইতরতা ঢাকিবার জন্য সর্ব্বদা প্রয়াস পায়। আহারে বিহারে আদানে প্রদানে আত্মা আপনার সৌন্দর্য্যবিভা বিস্তার করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। সে আপনার আবশ্যকের সহিত আপনার মহত্ত্বের সুন্দর সামঞ্জস্য সাধন করিয়া লইতে চায়।

আমি কহিলাম, তাহারই প্রমাণ এই পুণ্যাহের বাঁশি। একজনের ভূমি, আর একজন তাহারই মূল্য দিতেছে, এই শুষ্ক চুক্তির মধ্যে লজ্জিত মানবাত্মা একটি ভাবের সৌন্দর্য্য প্রয়োগ করিতে চাহে। উভয়ের মধ্যে একটি আত্মীয় সম্পর্ক বাঁধিয়া দিতে ইচ্ছা করে। বুঝাইতে চাহে ইহা চুক্তি নহে, ইহার মধ্যে একটি প্রেমের স্বাধীনতা আছে। রাজাপ্রজা

ভাবের সম্বন্ধ, আদানপ্রদান হৃদয়ের কর্ত্তব্য। খাজনার টাকার সহিত রাগরাগিণীর কোন যোগ নাই। খাজাঞ্চিখানা নহবৎ বাজাইবার স্থান নহে। কিন্তু যেখানেই ভাবের সম্পর্ক আসিয়া দাঁড়াইল অমনি সেখানেই বাঁশি তাহাকে আহ্বান করে, রাগিণী তাহাকে প্রকাশ করে, সৌন্দর্য্য তাহার সহচর। গ্রামের বাঁশি যথাসাধ্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে আজ আমাদের পুণ্য-দিন, আজ আমাদের রাজাপ্রজার মিলন। জমিদারী কাছারিতেও মানবাত্মা আপন প্রবেশপথ নির্ম্মাণের চেষ্টা করিতেছে, সেখানেও একখানা ভাবের আসন পাতিয়া রাখিয়াছে।

স্রোতস্বিনী আপনার মনে ভাবিতে ভাবিতে কহিল, আমার বোধ হয় ইহাতে যে কেবল সংসারের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে তাহা নহে, যথার্থ দুঃখভার লাঘব করে। সংসারে উচ্চনীচতা যখন আছেই, সৃষ্টিলোপ ব্যতীত কখনই যখন তাহা ধ্বংস হইবার নহে, তখন উচ্চ এবং নীচের মধ্যে একটা অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ থাকিলে উচ্চতার ভার বহন করা সহজ হয়। চরণের পক্ষে দেহভার বহন করা যেমন সহজ; বিচ্ছিন্ন বালিরের বোঝাই বোঝা।

উপমাপ্রয়োগ পূর্ব্বক একটা কথা ভাল করিয়া বলিবামাত্র স্রোতস্বিনীর লজ্জা উপস্থিত হয়, যেন একটা অপরাধ করিয়াছে। অনেকে অন্যের ভাব চুরি করিয়া নিজের বলিয়া চালাইতে এরূপ কুণ্ঠিত হয় না।

ব্যোম কহিল, যেখানে একটা পরাভব অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে সেখানে মানুষ আপনার হীনতা-দুঃখ দূর করিবার জন্য একটা ভাবের সম্পর্ক পাতাইয়া লয়। কেবল মানুষের কাছে বলিয়া নয়, সর্ব্বত্রই। পৃথিবীতে প্রথম আগমন করিয়া মানুষ যখন দাবাগ্নি ঝটিকা বন্যার সহিত কিছুতেই পারিয়া উঠিল না,

পর্ব্বত যখন শিবের প্রহরী নন্দীর ন্যায় তর্জ্জনী দিয়া পথরোধ পূর্ব্বক নীরবে নীলাকাশ স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, আকাশ যখন স্পর্শাতীত অবিচল মহিমা অমোঘ ইচ্ছাবলে কখন বৃষ্টি কখন বজ্র বর্ষণ করিতে লাগিল, তখন মানুষ তাহাদের সহিত দেবতা পাতাইয়া বসিল। নহিলে চিরনিবাসভূমি প্রকৃতির সহিত কিছুতেই তাহার সন্ধিস্থাপন হইত না। অজ্ঞাতশক্তি প্রকৃতিকে যখন সে ভক্তিভাবে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল তখনই মানবাত্মা তাহার মধ্যে গৌরবের সহিত বাস করিতে পারিল।

ক্ষিতি কহিল, মানবাত্মা কোন মতে আপনার গৌরব রক্ষা করিবার জন্য নানাপ্রকার কৌশল করিয়া থাকে সন্দেহ নাই। রাজা যখন যথেচ্ছাচার করে, কিছুতেই তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি নাই তখন প্রজা তাহাকে দেবতা গড়িয়া হীনতাদুঃখ বিস্মৃত হইবার চেষ্টা করে। পুরুষ যখন সবল এবং একাধিপত্য করিতে সক্ষম তখন অসহায় স্ত্রী তাহাকে দেবতা দাঁড় করাইয়া তাহার স্বার্থপর নিষ্ঠুর অত্যাচার কথঞ্চিৎ গৌরবের সহিত বহন করিতে চেষ্টা করে। এ কথা স্বীকার করি বটে মানুষের যদি এইরূপ ভাবের দ্বারা অভাব ঢাকিবার ক্ষমতা না থাকিত তবে এতদিনে সে পশুর অধম হইয়া যাইত।

স্রোতস্বিনী ঈষৎ আহতভাবে কহিল, মানুষ যে কেবল অগত্যা এইরূপ আত্মপ্রতারণা করে তাহা নহে। যেখানে আমরা কোনরূপে অভিভূত নহি বরং আমরাই যেখানে সবল পক্ষ সেখানেও আত্মীয়তা স্থাপনের একটা চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। গাভীকে আমাদের দেশের লোক মা বলিয়া ভগবতী বলিয়া পূজা করে কেন? সে ত অসহায় পশুমাত্র; পীড়ন করিলে তাড়না করিলে তাহার হইয়া দু'কথা বলিবার কেহ নাই।

আমরা বলিষ্ঠ, সে দুর্ব্বল, আমরা মানুষ, সে পশু; কিন্তু আমাদের সেই শ্রেষ্ঠতাই আমরা গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছি। যখন তাহার নিকট হইতে উপকার গ্রহণ করিতেছি তখন যে সেটা বলপূর্ব্বক করিতেছি, কেবল আমরা সক্ষম এবং সে নিরুপায় বলিয়াই করিতেছি, আমাদের অন্তরাত্মা সে কথা স্বীকার করিতে চাহে না। সে এই উপকারিণী পরমসহিষ্ণু প্রশান্ত পশুমাতাকে না বলিয়া তবেই ইহার দুগ্ধ পান করিয়া যথার্থ তৃপ্তি অনুভব করে; মানুষের সহিত পশুর একটি ভাবের সম্পর্ক, একটি সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তবেই তাহার সৃজনচেষ্টা বিশ্রাম লাভ করে।

ব্যোম গম্ভীরভাবে কহিল তুমি একটা খুব বড় কথা কহিয়াছ। শুনিয়া স্রোতস্বিনী চমকিয়া উঠিল। এমন দুষ্কর্ম্ম কখন্ করিল সে জানিতে পারে নাই। এই অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য সলজ্জ সঙ্কুচিতভাবে সে নীরবে মার্জ্জনা প্রার্থনা করিল।

ব্যোম কহিল, ঐ যে আত্মার সৃজনচেষ্টার কথা উল্লেখ করিয়াছ উহার সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। মাকড়সা যেমন মাঝখানে থাকিয়া চারিদিকে জাল প্রসারিত করিতে থাকে, আমাদের কেন্দ্রবাসী আত্মা সেইরূপ চারিদিকের সহিত আত্মীয়তা-বন্ধন স্থাপনের জন্য ব্যস্ত আছে। সে ক্রমাগতই বিসদৃশকে সদৃশ, দূরকে নিকট, পরকে আপনার করিতেছে। বসিয়া বসিয়া আত্মপরের মধ্যে সহস্র সেতু নির্ম্মাণ করিতেছে। ঐ যে আমরা যাহাকে সৌন্দর্য্য বলি সেটা তাহার নিজের সৃষ্টি। সৌন্দর্য্য আত্মার সহিত জড়ের মাঝখানকার সেতু। বস্তু কেবল পিণ্ডমাত্র; আমরা তাহা হইতে আহার গ্রহণ করি, তাহাতে বাস করি, তাহার নিকট হইতে আঘাতও প্রাপ্ত হই। তাহাকে যদি

গল্প বলিয়া দেখিতাম তবে বস্তুসমষ্টির মত এমন গল্প আর কি আছে! কিন্তু আত্মার কার্য্য আত্মীয়তা করা। সে মাঝখানে একটি সৌন্দর্য্য পাতাইয়া বসিল। সে যখন জড়কে বলিল সুন্দর, তখন সেও জড়ের অন্তরে প্রবেশ করিল, জড়ও তাহার অন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিল, সে দিন বড়ই পুলকের সঞ্চার হইল। এই সেতুনির্ম্মাণকার্য্য এখনো চলিতেছে। কবির প্রধান গৌরব ইহাই। পৃথিবীতে চারিদিকের সহিত সে আমাদের পুরাতন সম্বন্ধ দৃঢ় ও নব নব সম্বন্ধ আবিষ্কার করিতেছে। প্রতিদিন গল্প-পৃথিবীকে আপনার, এবং জড়পৃথিবীকে আত্মার বাসযোগ্য করিতেছে। বলা বাহুল্য, প্রচলিত ভাষায় যাহাকে জড় বলে আমিও তাহাকে জড় বলিতেছি। জড়ের জড়ত্ব সম্বন্ধে আমার মতামত ব্যক্ত করিতে বসিলে উপস্থিত সভায় সচেতন পদার্থের মধ্যে আমি একামাত্র অবশিষ্ট থাকিব।

সমীরণ ব্যোমের কথায় বিশেষ মনোযোগ না করিয়া কহিল, স্রোতস্বিনী কেবল গাভীর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, কিন্তু আমাদের দেশে এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সেদিন যখন দেখিলাম এক ব্যক্তি রৌদ্রে তাতিয়া পুড়িয়া আসিয়া মাথা হইতে একটা কেরোসিন তেলের শূন্য টিনপাত্র কূলে নামাইয়া মা গো বলিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল মনে বড় একটু লাগিল। এই যে স্নিগ্ধ সুন্দর সুগভীর জলরাশি সুমিষ্ট কলস্বরে দুই তীরকে স্তনদান করিয়া চলিয়াছে ইহারই শীতল ক্রোড়ে তাপিত শরীর সমর্পণ করিয়া দিয়া ইহাকে মা বলিয়া আহ্বান করা, অন্তরের এমন সুমধুর উচ্ছ্বাস আর কি আছে! এই ফলশস্যসুন্দরা বসুন্ধরা হইতে আর পিতৃপিতামহসেবিত আজন্মপরিচিত বাস্তুগৃহ পর্য্যন্ত যখন স্নেহসজীব আত্মীয়রূপে দেখা দেয় তখন জীবন অত্যন্ত উর্ব্বর সুন্দর শ্যামল হইয়া

উঠে। তখন জগতের সঙ্গে সুগভীর যোগসাধন হয়। জড় হইতে জন্তু এবং জন্তু হইতে মানুষ পর্য্যন্ত যে একটি অবিচ্ছেদ্য ঐক্য আছে একথা আমাদের কাছ অত্যদ্ভুত বোধ হয় না; কারণ, বিজ্ঞান এ কথার আভাস দিবার পূর্ব্বে আমরা অন্তর হইতে এ কথা জানিয়াছিলাম; পণ্ডিত আসিয়া আমাদের জ্ঞাতি-সম্বন্ধের ফুলজি বাহির করিবার পূর্ব্বেই আমরা নাড়ির টানে সর্ব্বত্র ঘরকন্না পাতিয়া বসিয়াছিলাম।

আমাদের ভাষায় "থ্যাঙ্ক" শব্দের প্রতিশব্দ নাই বলিয়া কোন কোন য়ুরোপীয় পণ্ডিত সন্দেহ করেন, আমাদের কৃতজ্ঞতা নাই। কিন্তু আমি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিতে পাই। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবার জন্য আমাদের অন্তর যেন লালায়িত হইয়া আছে। জন্তুর নিকট হইতে যাহা পাই জড়ের নিকট হইতে যাহা পাই তাহাকেও আমরা স্নেহ দয়া উপকাররূপে জ্ঞান করিয়া প্রতিদান দিবার জন্য ব্যগ্র হই। যে জাতির লাঠিয়াল আপনার লাঠিকে, ছাত্র আপনার গ্রন্থকে এবং শিল্পী আপনার বস্ত্রকে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিবার মনে মনে জীবন্ত করিয়া তোলে, একটা বিশেষ শব্দের অভাবে সে জাতিকে অকৃতজ্ঞ বলা যায় না।

আমি কহিলাম, বলা যাইতে পারে। কারণ, আমরা কৃতজ্ঞতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া গিয়াছি। আমরা যে পরস্পরের নিকট অনেকটা পরিমাণে সাহায্য অসঙ্কোচে গ্রহণ করি অকৃতজ্ঞতা তাহার কারণ নহে, পরস্পরের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যভাবের অপেক্ষাকৃত অভাবই তাহার প্রধান কারণ। ভিক্ষুক এবং দাতা, অতিথি এবং গৃহস্থ, আশ্রিত এবং আশ্রয়দাতা, প্রভু এবং ভৃত্যের সম্বন্ধ যেন একটা স্বাভাবিক সম্বন্ধ। সুতরাং সে স্থলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্ব্বক ঋণমুক্ত হইবার কথা কাহারো মনে উদয় হয় না।

ব্যোম কহিল, বিলাতী হিসাবের কৃতজ্ঞতা আমাদের দেবতাদের প্রতিও নাই। ইয়ুরোপীয় যখন বলে থ্যাঙ্ক গড্ তখন তাহার অর্থ এই, ঈশ্বর যখন মনোযোগপূর্ব্বক আমার একটা উপকার করিয়া দিলেন তখন সে উপকারটা স্বীকার না করিয়া বর্ব্বরের মত চলিয়া যাইতে পারি না। আমাদের দেবতাকে আমরা কৃতজ্ঞতা দিতে পারি না, কারণ, কৃতজ্ঞতা দিলে তাঁহাকে অল্প দেওয়া হয়, তাঁহাকে ফাঁকি দেওয়া হয়। তাঁহাকে বলা হয়, তোমার কাজ তুমি করিলে, আমার কর্ত্তব্যও আমি সারিয়া দিয়া গেলাম। বরঞ্চ স্নেহের একপ্রকার অকৃতজ্ঞতা আছে, কারণ, স্নেহের দাবীর অন্ত নাই। সেই স্নেহের অকৃতজ্ঞতাও স্বাতন্ত্র্যের কৃতজ্ঞতা অপেক্ষা গভীরতর মধুরতর। রামপ্রসাদের গান আছে—

"তোমায় মা মা বলে' আর ডাকিব না,
আমায় দিয়েছ দিতেছ কত যন্ত্রণা।"

এই উদার অকৃতজ্ঞতা কোন য়ুরোপীয় ভাষায় তর্জ্জমা হইতে পারে না।

ক্ষিতি বলিল, কেন পারিবে না। আমি এখনি করিয়া দিতেছি।

Oh I never shall call you mother
You have giv'n a deal of bother!

এই পরিহাসে দীপ্তি হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না, এবং স্রোতস্বিনীর কপোলদেশ আন্তরিক বিরক্তিভরে রক্তিম হইয়া উঠিল।

তাহা লক্ষ্য করিয়া ক্ষিতি অনুতপ্তচিত্তে তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়িল। কহিল, য়ুরোপীয়দের প্রতি আমাদের যে অকৃত-

ক্ষতা, তাহারও বোধ হয় একটি গভীর এবং উদার কারণ কিছু থাকিতে পারে। জড়প্রকৃতির সহিত আত্মীয়সম্পর্ক স্থাপন সম্বন্ধে যে কথাগুলি হইল তাহা সম্ভবতঃ অত্যন্ত সুন্দর; এবং গভীর যে, তাহার আর সন্দেহ নাই, কারণ, এপর্য্যন্ত আমি সম্পূর্ণ তলাইয়া উঠিতে পারি নাই। সকলেই ত একে একে বলিলেন যে, আমরাই প্রকৃতির সহিত ভাবের সম্পর্ক পাতাইয়া বসিয়াছি আর য়ুরোপ তাহার সহিত দূরের লোকের মত ব্যবহার করে; কিন্তু জিজ্ঞাস করি, যদি য়ুরোপীয় সাহিত্য ইংরাজি কাব্য আমাদের না জানা থাকিত তবে আজিকার সভায় এ আলোচনা কি সম্ভব হইত? এবং যিনি ইংরাজি কখনো পড়েন নাই তিনি কি শেষ পর্য্যন্ত ইহার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিবেন?

আমি কহিলাম, না, কখনই না। তাহার একটু কারণ আছে। প্রকৃতির সহিত আমাদের যেন ভাইবোনের সম্পর্ক এবং ইংরাজ ভাবুকের যেন স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক। আমরা জন্মাবধিই আপনার, আমরা স্বভাবতই এক। আমরা তাহার মধ্যে নব নব বৈচিত্র্য, পরিসূক্ষ্ম ভাবচ্ছায়া দেখিতে পাই না, একপ্রকার অন্ধ অচেতন স্নেহে মাখামাখি করিয়া থাকি। আর ইংরাজ, প্রকৃতির বাহির হইতে অন্তরে প্রবেশ করিতেছে। সে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে বলিয়াই তাহার পরিচয় এমন অভিনব আনন্দময়, তাহার মিলন এমন প্রগাঢ়তর। সেও নববধূর ন্যায় প্রকৃতিকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে, প্রকৃতিও তাহার মনোহরণের জন্য আপনার নিগূঢ় সৌন্দর্য্য উদ্ঘাটিত করিতেছে। সে প্রথমে প্রকৃতিকে জড় বলিয়া জানিত, হঠাৎ একদিন যেন যৌবনারম্ভে তাহার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিল

তাহার অনির্ব্বচনীয় অপরিমেয় আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করিয়াছে। আমরা আবিষ্কার করি নাই, কারণ, আমরা সন্দেহও করি নাই, প্রশ্নও করি নাই।

আত্মা অন্য আত্মার সংঘর্ষে তবেই আপনাকে সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারে,তবেই সে মিলনের আধ্যাত্মিকতা পরিপূর্ণমাত্রায় মন্থিত হইয়া উঠে। একাকার হইয়া থাকা কিছু না থাকার ঠিক পরেই। কোন একজন ইংরাজ কবি লিখিয়াছেন, ঈশ্বর আপনারই পিতৃ-অংশ এবং মাতৃ-অংশকে স্ত্রীপুরুষরূপে পৃথিবীতে ভাগ করিয়া দিয়াছেন; সেই দুই বিচ্ছিন্ন অংশ এক হইবার জন্য পরস্পরের প্রতি এমন অনিবার্য্য আনন্দে আকৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু এই বিচ্ছেদটি না হইলে পরস্পরের মধ্যে এমন প্রগাঢ় পরিচয় হইত না। ঐক্য অপেক্ষা মিলনেই আধ্যাত্মিকতা অধিক।

আমরা পৃথিবীকে নদীকে মা বলি, আমরা ছায়াময় বট অশ্বত্থকে পূজা করি, আমরা প্রস্তরপাষাণকে সজীব করিয়া দেখি, কিন্তু আত্মার মধ্যে তাহার আধ্যাত্মিকতা অনুভব করি না। বরঞ্চ আধ্যাত্মিককে বাস্তবিক করিয়া তুলি। আমরা তাহাতে মনঃকল্পিত মূর্ত্তি আরোপ করি, আমরা তাহার নিকট সুখসম্পদ সফলতা প্রার্থনা করি। কিন্তু আধ্যাত্মিক সম্পর্ক কেবলমাত্র সৌন্দর্য্য কেবলমাত্র আনন্দের সম্পর্ক, তাহা সুবিধা অসুবিধা সঞ্চয় অপচয়ের সম্পর্ক নহে। স্নেহসৌন্দর্য্যপ্রবাহিনী জাহ্নবী যখন আত্মার আনন্দ দান করে তখনই সে আধ্যাত্মিক, কিন্তু যখনই তাহাকে মূর্ত্তিবিশেষে নিবদ্ধ করিয়া তাহার নিকট হইতে ইহকাল অথবা পরকালের কোন বিশেষ সুবিধা প্রার্থনা করি তখন তাহা সৌন্দর্য্যহীন মোহ, অন্ধ অজ্ঞানতা মাত্র। তখনি আমরা দেবতাকে পুত্তলিকা করিয়া দিই।

ইহকালের সম্পদ এবং পরকালের পুণ্য, হে জাহ্নবি, আমি তোমার নিকট চাহি না এবং চাহিলেও পাইব না, কিন্তু শৈশব-কাল হইতে জীবনের কতদিন সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তে, কৃষ্ণ-পক্ষের অর্দ্ধচন্দ্রালোকে, ঘনবর্ষার মেঘশ্যাম মধ্যাহ্নে আমার অন্তরাত্মাকে যে এক অবর্ণনীয় অলৌকিক পুলকে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছ সেই আমার দুর্লভ জীবনের আনন্দসঞ্চয়গুলি যেন জন্ম-জন্মান্তরে অক্ষয় হইয়া থাকে; পৃথিবী হইতে সমস্ত জীবন যে নিরুপম সৌন্দর্য্য চয়ন করিতে পারিয়াছি যাইবার সময় যেন একখানি পূর্ণশতদলের মত সেটি হাতে করিয়া লইয়া যাইতে পারি এবং যদি আমার প্রিয়তমের সহিত সাক্ষাৎ হয় তবে তাহার করপল্লবে সমর্পণ করিয়া দিয়া একটিবারের মানবজন্ম কৃতার্থ করিতে পারি।

সাংখ্যদর্শন।

৫॥ সৃষ্টি॥

এক কথার দুই অর্থ বুঝাইলে যুক্তিস্থলে তাহার ব্যবহার বড়ই অনর্থের কারণ হয়। তজ্জন্য দার্শনিকেরা সকল সময়ে শব্দের অর্থ ও লক্ষণ নিরাকরণ বিষয়ে বড়ই যত্ন করেন। যে সকল শব্দের বহ্বর্থ-মূলক অনর্থকারিতার আশঙ্কা আছে—"সৃষ্টি" তন্মধ্যে একটি।

বেদে ও পুরাণে একপ্রকার সৃষ্টির কথা শুনা যায়। পর-মেশ্বর যেরূপে যে উপাদানে যে অভিপ্রায়ে যে প্রক্রিয়া দ্বারা,

সাধারণ লোকে যাহাকে ব্রহ্মাণ্ড বলে—তাহা উৎপাদন করিলেন, বেদে ও পুরাণে এই অতিগম্ভীর মনুষ্যবুদ্ধির সর্ব্বপ্রকারে অতীত বার্ত্তার আলোচনা দেখা যায়। তাহাকে "সৃষ্টি" বলে। কিন্তু দর্শনশাস্ত্রের সহিত সেইপ্রকার সৃষ্টির কোন সংশ্রব নাই। দর্শনশাস্ত্র যদি সেই পুরাবৃত্তের আলোচনা করিতে অগ্রসর হয় তবে তাহার অনধিকার চর্চ্চা। তবে দার্শনিক সৃষ্টি কেমন?

সৃজ্ (বা সর্জ্) ধাতুর আদিম অর্থ বোধ হয় ত্যাগ বা নিক্ষেপ। এই ধাতু হইতে বিসর্জ্জন, সর্গ, বিসৃষ্ট, বিসৃষ্টি, সৃষ্টি ইত্যাদি শব্দ নির্ম্মিত হইয়াছে। যে প্রক্রিয়া দ্বারা আত্মা আপনার জ্ঞান-রাশিকে জ্ঞেয়ের উপর নিক্ষেপ করে, আপনা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া তদ্দ্বারা জ্ঞেয়কে আবৃত করে,—অর্থাৎ আত্মা হইতে যেরূপে স্থূলভূতের আবির্ভাব হয়—তাহার নাম দার্শনিক সৃষ্টি। পিণ্ডের "তন্মাত্র" যে প্রক্রিয়া দ্বারা তরুণের পঞ্চবিধ স্থূলভূতে পরিণত হয় তাহার নাম "সৃষ্টি"। যেমন গুটিপোকাতে রেশমের কোয়া নির্ম্মাণ করিয়া আপনাকে তন্মধ্যস্থ করে, তদ্রূপ প্রত্যেক নরনারী যে প্রক্রিয়া দ্বারা নিজ নিজ সংসারের (ব্যক্ত জগৎ বা স্থূলভূত সংঘের) তন্তু দ্বারা আপনাকে আবৃত করে—দর্শনশাস্ত্রে তাহার নাম সৃষ্টি। ইহা বড় অদ্ভুত ব্যাপার। দর্শনশাস্ত্র এই তত্ত্ব নিরাকরণে সমর্থ। দর্শন ও দর্শনমূলক অনুমানের দ্বারা ইহার নিরাকরণ সম্ভব। ইহা আমাদের জীবনের ইতিহাসের মূলকথা। আমরা এই তত্ত্বের মীমাংসা করিতে পারিলে একটি উজ্জ্বল জ্ঞানরত্নের অধিকারী হই। তোমার সংসার তুমি কিরূপে নির্ম্মাণ করিলে, আমার সংসার আমি কিরূপে নির্ম্মাণ করিলাম ইহা জানিতে কাহার

না কৌতূহল হয়?—এই সংসারের ন্যায় জ্ঞানবুদ্‌বুদ্‌ অন্তর্হিত হইলে আর কি বাকী থাকিবে—ইহা জানিতে কাহার কৌতূহল না হয়?

সাংখ্যেরা এই গভীর প্রশ্নের বিস্তর আন্দোলন করিয়া যে একটি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হইতে পারে, কিন্তু তাহা আমাদের জানা অত্যাবশ্যক। আমি এক্ষণে তাহার দোষগুণ বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া তাহা বর্ণনা করিতে ব্যাপৃত হইলাম।

আমরা দেখিতেছি আত্মার সহিত অব্যক্তের "জ্ঞ-জ্ঞেয়" নামক সাক্ষাৎকার সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। ইহা অস্বীকার করিবার যো নাই; এই আমি কাগজের উপর মসী দ্বারা লিপি অঙ্কিত করিতেছি। আমি হইতেছি আত্মা, আমার হস্ত, যে কাগজের উপর লিখিতেছি, মসী প্রভৃতি লেখনসাধন ইহারা মূলে অব্যক্ত, তাহাদের সহিত আমার "জ্ঞ-জ্ঞেয়" নামক সাক্ষাৎকার সম্পর্ক রহিয়াছে। আমি সাক্ষাৎকার প্রতীতি দ্বারা তাহাদের সত্তা অনুভব করিতেছি—তাহাদিগকে জ্ঞেয় বলিয়া জানিতেছি—এবং মসী কালবর্ণ, কাগজ শাদা বর্ণ, তাদৃশ সম্পর্কবশাৎ আমার এবম্বিধ জ্ঞানের উদয় হইতেছে।

এই সম্পর্ক কিরূপে জন্মিল? সাংখ্যেরা বলেন তাহা জানি না—তাহা জানিবার উপায় নাই, তাহা অদৃষ্ট। আমরা জ্ঞানের শেষ ও চরম সীমায় দাঁড়াইয়া এই সম্পর্ক আছে বলিয়া উপলব্ধি করিতেছি; তাহা অতিক্রম করিতে গেলে জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করার চেষ্টা হয়—তাহা অসম্ভব। সে চেষ্টা বিফল।

অতএব এইখানে দাঁড়াইয়া আমাদিগকে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া অধ্যয়ন করিতে হইবে। এইখানে দণ্ডায়মান হইয়া জীবনের ক্রিয়া

সকল তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলে আমাদের উপলব্ধি হয় যে, এক্ষণে যাহাকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, সংসার, বাহ্যজগৎ বা স্থূলভূত বলিয়া মনে হয় তাহা জ্ঞানের উপাদানে ক্রমশঃ গঠিত হইয়াছে। সাংখ্যেরা সেই ক্রমপর্য্যায় একটি আর্য্যা দ্বারা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা এই ;—

(১) প্রকৃতে র্মহাং।

(২)———স্ততোঽহঙ্কারঃ,

(৩) তস্মাচ্চ গণঃ ষোড়শকঃ।

(৪) তস্মাচ্চ ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চভূতানি॥ ইতি॥

ইহার অর্থ এইঃ—

১। প্রকৃতিপুরুষের সংযোগবশতঃ প্রথমে "মহৎ" নামক পদার্থ উৎপন্ন হয়।

২। সেই "মহৎ" নামক পদার্থ হইতে ক্রমশঃ "অহঙ্কার" নামক পদার্থ উৎপন্ন হয়।

৩। সেই অহঙ্কার হইতে ক্রমশঃ পঞ্চ "তন্মাত্র" এবং একাদশ "ইন্দ্রিয়" নামক ষোড়শবিধ পদার্থ উৎপন্ন হয়।

৪। সেই ষোড়শবিধ পদার্থের মধ্যে পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পৃথিবী প্রভৃতি ব্যক্ত পদার্থ বা স্থূলভূত নামক পদার্থ উৎপন্ন হয়।

৬॥ সাংখ্যদর্শনের "মহৎ"॥

সৃষ্টিব্যাপারে যে পদার্থ সর্ব্বপ্রথমে উৎপন্ন হয় সাংখ্যেরা তাহার "মহৎ" এই নামকরণ করিয়াছেন। অর্ব্বাচীন সংস্কৃত ভাষায় "মহৎ" শব্দে বড় বুঝায়। বাঙ্গালা ভাষাতেও "মহৎ" শব্দের তাদৃশ অর্থ। কিন্তু সাংখ্য অতি প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র, সুতরাং ইহার পরিভাষা কিছু অস্পষ্ট। আদিম বৈদিক সংস্কৃত ভাষায়

"মহস্" বা "মঘস্" নামক একটি শব্দ আছে, তাহার অর্থ জ্যোতিঃ। সেই জ্যোতিঃবাচক মহস্ শব্দ হইতেই "মহৎ" শব্দ উৎপন্ন। ইহার আদিম অর্থ প্রকাশ, বা প্রকাশাত্মক জ্ঞান।

প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ সাধন হইলে অর্থাৎ জ্ঞ-জ্ঞেয় নামক সাক্ষাৎকার সম্পর্ক স্থাপিত হইলে যে আদিম বীজস্বরূপ জ্ঞানের উদ্ভব হয় সাংখ্যেরা তাহাকে বলেন "মহৎ"। জ্ঞানের সেই আদিম অবস্থা হইতে আমরা এক্ষণে এতদূরে আসিয়া পড়িয়াছি যে, সম্প্রতি তাহার স্বরূপ নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে কঠিন। যাঁহারা সাংখ্যশাস্ত্রের টীকাকার তাঁহারা "মহৎ" অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্ব এই বলিয়াই ক্ষান্ত।

গত মাসের সাধনায় আমাদের পরম ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় মহতের অভিব্যক্তি নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি লেখেন, "সাংখ্যের মতে প্রকৃতি ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা এবং মহৎ সেই সাম্যাবস্থার প্রথম বিচ্যুতি—মহৎ প্রকৃতির প্রথম অভিব্যক্তি।" সংস্কৃত ভাষায় সাংখ্যদর্শনের যে সকল গ্রন্থ আছে তাহাদের ভাষা অনেকস্থলে বড় জটিল এবং অন্ধকারময় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা ঐরূপ একটি জটিল ও দুর্বোধ শব্দ। সাম্যাবস্থা=অব্যক্ত ও অপ্রকাশিত অবস্থা, এই এক অর্থ হইতে পারে। সেই অবস্থা দর্শনশাস্ত্রের আলোচনার অতীত অবস্থা। দর্শনের সীমায় প্রকৃতি নামক পদার্থপুঞ্জকে ঘোরতর সংঘট্ট ও বিলোড়ন অবস্থাপন্ন দেখা যায়। যেন সমুদ্রমন্থনে বারিরাশির ন্যায় বিপর্য্যস্ত ও সংক্ষুভিত দেখা যায়। ইহারই নাম অসাম্যাবস্থা হইতে পারে। এবং ইহার বিপরীত ভাবকে সাম্যাবস্থা বলা যায়। ইহা ভিন্ন ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা শব্দের আর কোন অর্থ পাওয়া দুষ্কর। সৃষ্টির (অর্থাৎ

দার্শনিক সৃষ্টির) প্রাক অবস্থায় অবস্থিত প্রকৃতির অন্য নাম "তমস্", *অর্থাৎ অন্ধকারময় অব্যক্ত অপ্রজ্ঞাত অলক্ষণ বস্তু। সেই তমোভূত অবস্থাকে কেবল নঙর্থ শব্দের দ্বারা বর্ণনা করা যায়, ভাববাচক কোন শব্দের দ্বারা তাহার বর্ণনা অসাধ্য। সেই অবস্থাকে সাম্যাবস্থা বলিয়া যদি ভাববাচক কোন অবস্থার পরিচয় দিবার চেষ্টা করা হয় তাহা বিফল। আমার মতে সাম্যাবস্থা এই শব্দটি সাংখ্যদর্শন হইতে বর্জ্জন করিলে ভাল হয়। "মহৎ সেই সাম্যাবস্থার প্রথম বিচ্যুতি" † ইহার অর্থ কি? লেখক মহাশয় নিজেই ইহা পরিষ্কার করিবার জন্য লিখিয়াছেন "মহৎ প্রকৃতির প্রথম অভিব্যক্তি"—অর্থাৎ অব্যক্ত প্রকৃতির প্রথম অভিব্যক্তি বা আবির্ভাব বা প্রকাশ। সে প্রকাশ কোথায়, আত্মা ভিন্ন আর কোথায় সম্ভব?—আত্মাতে বা আত্মার জ্ঞানেতে প্রকৃতির প্রথম বিকাশের নাম মহৎ। যদি শ্রদ্ধাস্পদ লেখক মহাশয়ের ইহা মর্ম্ম হয় তাহা ঠিক কথা, কিন্তু তাহাকে "সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি" বলাতে "মহৎ" যেন প্রকৃতিরই কোন অবস্থাভেদ বলিয়া মনে ভ্রম জন্মিবার সম্ভাবনা। সেই প্রথম বিকাশেই প্রকৃতির গোরতর চাঞ্চল্যের আভাস পাওয়া যায় সত্য—কিন্তু তাহাকে প্রকৃতির অবস্থা পরিবর্ত্তন বলা যায় না। লেখক মহাশয় পরে লিখিয়াছেন "সাংখ্যদর্শন মহৎশব্দের যেরূপ সংজ্ঞা করিয়াছেন তাহাতে মহৎ শব্দে বুদ্ধি পর্য্যন্তই বুঝায়, তাহার উপরে আর কিছু বুঝায় না।

* মনুসংহিতায় "আসীদিদং তমোভূতং" ইত্যাদি সৃষ্টিপ্রকরণে এই অর্থে "তমস্" শব্দ ব্যবহৃত।

† "বিচ্যুতি" শব্দের অর্থ এখানে ভঙ্গ বা স্খলন। "সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি"র অর্থ সাম্যভঙ্গ, অর্থাৎ সাম্যাবস্থা হইতে বৈষম্যাবস্থায় পরিণতি। সাংখ্যের মতে গুণসাম্যের বিচ্যুতি না হইলে প্রকৃতি হইতে কোন কিছু উৎপন্ন হইতে পারে না।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কিন্তু বেদান্তদর্শন সাংখ্যের বিরুদ্ধে বেদের বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সাধারণতঃ সকল বুদ্ধি মহৎ শব্দের বাচ্য হইতে পারে না, কেবল 'যা প্রথমজন্যা হিরণ্যগর্ভস্য বুদ্ধিঃ সা সর্ব্বাসাং বুদ্ধীনাং প্রথমা প্রতিষ্ঠা, সেহ মহান্ আত্মেত্যুচ্যতে।' —প্রথমজাত হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধি যাবতীয় বুদ্ধির প্রথম প্রতিষ্ঠা তাহাই মহান আত্মা বলিয়া বেদে উক্ত হইয়াছে— তাৎপর্য্য এই যে, তাহাই মহৎ শব্দের বাচ্য। সাংখ্যের বিরুদ্ধে বেদান্তের এই যে প্রতিবাদ ইহা সঙ্গত নহে—কেন না, যে বুদ্ধি আদিসৃষ্টি তাহা যে তোমার আমার যে সে ব্যক্তির বুদ্ধি, একথা হইতেই পারে না।"

আমরা বিনীতভাবে বলিতে চাই দর্শনের সীমায় বেদকে আনা অনুচিত। লেখক মহাশয় সাংখ্যের বিরুদ্ধে যে বেদান্তের প্রতিবাদের উল্লেখ করেন তাহা বেদান্তেরই বুঝিবার ভ্রম—It is not that Homer nods but we that sleep! সাংখ্যেরা যে সৃষ্টির কথা বলেন তাহা আদৌ বৈদিক সৃষ্টি নহে তাহা দার্শনিক সৃষ্টি—তাহা স্থূলভূতের আবির্ভাবের ব্যাখ্যা। সাংখ্যের মতে প্রত্যেক মনুষ্য আপন আপন স্থূলভূতের (অর্থাৎ সংসারের) সৃষ্টিকর্ত্তা। তুমি যে অলীক সূর্য্যকে দেখিতেছি বলিয়া মনে কর তাহা তোমার সৃষ্টি নয় ত কাহার সৃষ্টি? তুমি মরিয়া গেলে আর সে সূর্য্য কোথায় থাকিবে? এমন কি, তুমি চক্ষু মুদিলে সে সূর্য্য বিলুপ্ত হয়। সে বস্তু তোমার চক্ষে প্রতিবিম্ব মাত্র। অতএব প্রত্যেক নরনারীর আত্মায় প্রকৃতি সংযোগ জন্য যে প্রথম জ্ঞানের বিকাশ হয় তাহার নাম "মহৎ"; তাহা প্রকৃতই তোমার আমার যে সে ব্যক্তির বুদ্ধি।*

* মাননীয় লেখক মহাশয় এখানে যেরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা স্পষ্টই এক প্রকার মায়াবাদ। কিন্তু সাংখ্যের মূলমত মায়াবাদ নহে, সাংখ্যের মূলমত প্রকৃতিবাদ। সাংখ্যের মতে "জ্ঞ" ভিন্ন আর যাহা কিছু সমস্তই প্রকৃতির অন্ত-

এস্থলে বুদ্ধি শব্দে কোন শক্তি বুঝিলে ভ্রম হইবে। বুদ্ধি=বোধ। সাংখ্যেরা কেহ কেহ এই মহৎ বা বোধকে "প্রকৃতির বিকৃতি" বলিয়া বর্ণনা করেন। তাহাতে আমি এইরূপ অর্থ বুঝি যে, তাঁহারা প্রকৃতির সংযোগ জন্য আত্মার বিকৃতিভাব, অর্থাৎ জ্ঞানের পরিবর্তে বিবেক। সেই জ্ঞানে প্রকৃতির অব্যক্ত সত্তার আভাস আছে।

আত্মা স্বভাবতঃ চৈতন্যময়, প্রকৃতির সহিত অসংসক্ত অবস্থায় আত্মার শুদ্ধ চৈতন্য কীদৃশ, অথবা প্রকৃতি হইতে ভিন্নজাতীয় পদার্থের সহিত তাহার সাক্ষাৎকার সম্পর্ক স্থাপিত হইলে তাহার জ্ঞানের কিরূপ পরিণতি হয় তাহা মর্ত্যবাক্যের অতীত বিষয়। তবে প্রকৃতির সহিত সংযোগ হইলে আত্মার চৈতন্যের যে ভাবান্তর ঘটে—তাহা সাংখ্যেরা একটি বিকৃতিভাব বলিয়া মনে করেন। এই বিকৃত চৈতন্যের প্রথম উন্মেষের নাম "মহৎ"—ইহাই বোধ হয় প্রাচীন সাংখ্যাচার্য্যদের অভিপ্রায় ছিল।

সাংখ্যদের মতে মহতে আমি এইরূপ বোধ নাই। সেই বোধকে তাঁহারা "অহঙ্কার" এই সংজ্ঞা দেন। পরে এই অহঙ্কার-তত্ত্বের আলোচনা আসিবে। এক্ষণে ইহাই প্রণিধানের যোগ্য যে, সাংখ্যমতে যাহা প্রকৃতিপুরুষ সংযোগ জন্য আদিম জ্ঞান বা বোধ তাহাতে "আমি বা আমার" এইরূপ কোন অনুভবের বিকাশ নাই।

কোন্ সময়ে মহতের আবির্ভাব হয় তাহা নিশ্চয় করা কঠিন।

লোম পরিণাম। পুনশ্চ প্রকৃতি সাংখ্যের মতে জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থ। জ্ঞানের সহিত প্রকৃতির যে সূত্রে সম্বন্ধ ঘটে, সাংখ্য তাহাকে বলেন "আকূতি," অর্থাৎ একপ্রকার অন্ধপ্রবৃত্তি। যেমন বৎসদৃষ্টে নাসীর দুগ্ধ অজ্ঞাতসারে নিঃসৃত হয়, তেমনি প্রকৃতি পুরুষের ভোগমোক্ষসাধনের উদ্দেশে অজ্ঞাতসারে কার্য করে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নূতন মনুষ্য পুরাতন মনুষ্য হইতে গঠিত হয়। অর্থাৎ প্রকৃতির যে অংশের সহিত পুরুষের সাক্ষাৎ জ্ঞ-জ্ঞেয় সম্পর্ক সম্ভব (=দেহ) সেই অংশ দুই ভাবে অবস্থিত দেখা যায়,—নর ও নারী। তাদৃশ ভিন্ন ভিন্ন দুইটি অংশের একত্রীভাব সংঘটিত না হইলে তাদৃশ অপর একটি অংশ জন্মে না। নারী-অংশের গর্ভে এই অভিনব অংশের উৎপত্তি। সেই গর্ভাবস্থাতেই তদংশে পুরুষ বা জ্ঞ শ্রেণীর পদার্থবিশেষের সংযোগ সংসাধিত হয়; কি-রূপে কোন দিনে হয় তাহা ঈশ্বর জানেন। তবে দেখা যায় যে, যখন শুক্রশোণিতভাবে তাহা অবস্থিত তখন তাহাতে চৈতন্যের কোন লক্ষণ নাই; আর যখন তাহা হস্তপদাদি অবয়ব সংযুক্ত হইয়া গর্ভ হইতে চ্যুত হয় তখন তাহাতে চৈতন্যের লক্ষণ বিদ্যমান। অতএব এই উভয় ঘটনার মধ্যেই মহতের আবির্ভাব হয়।

ইহাতে দেখা যায় গর্ভস্থ শিশুর আদিম জ্ঞানের নাম "মহৎ"। সে কিরূপ জ্ঞান? তখন চক্ষু মুদ্রিত, অতএব বর্ণজ্ঞান নাই; কাণে কিছু শুনা যায় কি না বলা যায় না। নাসিকায় কিছু গন্ধ অনুভব হয় কি না বলা যায় না. তবে শ্বাসপ্রশ্বাস না থাকা গন্ধানুভব না থাকাই সম্ভব। তখন আহার নাই—সুতরাং রসেরও বোধ নাই। তবে ত্বক ও মাংসপেশী দ্বারা শীতোষ্ণ জ্ঞান ও অবরোধের জ্ঞান হয় ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। তৎসঙ্গে সঙ্গে সুখদুঃখের জ্ঞানও হয় তাহা অনুমান করা যাইতে পারে, কেন না, শিশু গর্ভেই হস্তপদ চালনা করে, তাহা ইচ্ছার কার্য্য এবং সেই ইচ্ছা সুখ বা ক্লেশানুভব জন্য হওয়াই সম্ভব। বোধ হয় শীতোষ্ণের অনুভব, অবরোধের অনুভব, সম্ভবতঃ একপ্রকার শব্দের অনুভব পিণ্ডীভূত হইয়া আদিম জ্ঞানে বিকা-

শিত হয়; তৎসঙ্গে সুখদুঃখের অনুভবও জড়িত থাকে। তাহাই সাংখ্যদের "মহৎ"।

৭ ॥ সাংখ্যদর্শনের অহঙ্কার ॥

আমি আমার আমাতে ইত্যাদি "অহং" অনুভবকে সাংখ্যেরা বলেন "অহঙ্কার"। ভাষাকথায় অহঙ্কার শব্দের অর্থ গর্ব্ব, নিজের উৎকর্ষাভিমান; কিন্তু সাংখ্যদর্শনের অহঙ্কার সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ।

সাংখ্যেরা বিবেচনা করেন উপর্য্যুপরি এক বা নানাবিধ জ্ঞানের উদয় না হইলে আমি বা আমার জ্ঞান হইতেছে এরূপ অনুভব হয় না। নাস্তিকেরা বলে অহংজ্ঞান জ্ঞানের ধারাবাহিকতার ফল। সাংখ্য ও বেদান্তীগণের "সোঽহং" এইরূপ বাক্যবিন্যাসে তাঁহারা অহংজ্ঞানকে স্মৃতির ফল বলিয়া মনে করেন এইরূপ বোধ হয়। সাংখ্যশাস্ত্রে অহংজ্ঞান বা অহংকারের অপর নাম অধ্যবসায়। এস্থলেও বাঙ্গলা অধ্যবসায় বুঝিলে চলিবে না। অকৃতকার্য্য হইয়াও পুনঃপুনঃ চেষ্টা করাকে বাঙ্গলায় অধ্যবসায় বলে। এই অনুভব আমার—আমি দেখিতেছি—আমি শুনিতেছি এইরূপ নিশ্চয়ের নাম অধ্যবসায়।

ফলতঃ সাংখ্যশাস্ত্রের অহংকারতত্ত্বের বিচারটি অতীব হৃদয়গ্রাহী। ক্ষণিক জ্ঞানরাশির মধ্যে আত্মাকে নিত্য বলিয়া অনুভব করার নাম অহংকার। একের ক্ষণিকত্ব অপরের স্থায়িত্ব এই অনুভবে পরিস্ফুট হয়। অর্থাৎ তুলনা দ্বারা পরিস্ফুট হয়। সুতরাং জ্ঞানের ক্ষণিকত্বের পরিচয় প্রথমে না পাইলে আর আত্মার নিত্যত্বানুভবের বিকাশ হইতে পারে না। আদিম জ্ঞানের অবস্থা বোধ হয় এইরূপ যথা—"উষ্ণ", "কোমল,"

"শীতল", "মধুর", "ক্লেশ" ইত্যাদি। এই অবস্থা উত্তরোত্তর আর একভাবে দাঁড়ায় যথা, "এই উষ্ণ অনুভব করিতেছিলাম এই শীতল অনুভব হইতেছে"—"এই মধুর বোধ হইতেছিল এই ক্লেশ বোধ হইতেছে"। প্রথম প্রকার জ্ঞানে অহঙ্কারের বিকাশ নাই; দ্বিতীয়প্রকার জ্ঞানে অহঙ্কারের বিকাশ দেখা যায়।

এস্থলে একটি প্রশ্নের উদয় হয়—জ্ঞান ত আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম; সুতরাং মহতের আবির্ভাবের পূর্ব্বে যে জ্ঞান ছিল না তাহা কিরূপে বলিব? তাহা হইলে মহতের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব্বের যে জ্ঞান তাহার সহিত তুলনায় যে মহতের সঙ্গে সঙ্গেই অহংকার আসিবে? এমন কি মহতের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও যে আত্মাতে অহঙ্কারের সদ্ভাব ছিল না তাহাই বা কিরূপে প্রতিপন্ন হয়?

প্রশ্নটি বড়ই কঠিন। কিন্তু প্রাচীন সাংখ্যাচার্য্যেরা মহতের আবির্ভাবের পূর্ব্বে আত্মার যে বিশুদ্ধ চৈতন্য থাকে তাহা "অদৃষ্ট"তত্ত্ব বলিয়া মনে করিতেন। প্রকৃতিপুরুষের সংযোগে আত্মার একপ্রকার বিকৃত চৈতন্যের উদয় হয় তাহাকেই তাঁহারা মহৎ বলেন। সেইরূপ বিকৃত চৈতন্যের মধ্যেও আত্মার নিত্যত্বের জ্ঞানের নাম অহঙ্কার; শুদ্ধ চৈতন্যাবস্থায় আত্মার স্বীয় নিত্যত্ব জ্ঞান কি প্রকার তাহা জানিবার উপায় নাই। মহতের আবির্ভাবের পূর্ব্বের সকল কথাই "অদৃষ্ট" বিবেচনা করিয়া সাংখ্যেরা বলেন, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার বিকৃত অহংজ্ঞান আদিম জ্ঞানে বিকাশ পায় না।

৮॥ তন্মাত্র ও ইন্দ্রিয়॥

অহঙ্কার স্ফূর্ত্তি হইলে আমি দেখিতেছি, আমি [illegible]

আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি উদাসীন, আমি ক্রিয়াবান,জ্ঞানের আকার এইরূপ ধারণ করে। রূপরসাদির মিশ্রিত পিণ্ডীকৃত জ্ঞান ক্রমশঃ বিযুক্ত ও বিশ্লিষ্ট হইয়া এটি রূপ, ঐটি রস, সেটি গন্ধ, ওটি স্পর্শ, এইটি শব্দ, এইপ্রকার পৃথক পৃথক অনুভবের অঙ্গ গঠিত হইতে থাকে। অগ্রে যেন রূপরস সব জড়াইয়া একটা তালবাঁধা গোছের ছিল—ক্রমশঃ তাহাদের পার্থক্য বিশ্লিষ্টীকৃত হইতে থাকে। অবশেষে সকলপ্রকার প্রত্যক্ষানুভব বিযুক্ত হইয়া যেন এক এক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়।

কিন্তু এ পর্য্যন্ত অনুভবসকল আমারই অনুভব, উহারা আমারই জ্ঞান এ সংস্কার বিদ্যমান, উহা যে বহিঃস্থ কোন দ্রব্যের গুণ তাহা পরিগ্রহ হয় না। এই অবস্থায় জ্ঞান "তন্মাত্র" বা জ্ঞানমাত্র। সাংখ্য পরিভাষায় ইহার নাম সূক্ষ্মভূত। মহৎ ও অহঙ্কার হইতে সূক্ষ্মভূতের আবির্ভাব হয়।

সাংখ্যেরা আরো বলেন যে, তন্মাত্র সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আত্মা আপনার শক্তি বা ঐশ্বর্য্যের (ঈশ্বরভাবের) অর্থাৎ ক্ষমতার পরিচয় প্রাপ্ত হয়। যখন রূপরসাদি পিণ্ডীকৃত থাকে তখন কোথা হইতে যে হইতেছে তাহা বুঝা যায় না। অবশেষে যখন অন্যান্য জ্ঞানের সহিত রূপজ্ঞানের পার্থক্য সাধিত হয় তখন রূপজ্ঞান হওয়া না হওয়ার পক্ষে আত্মার নিজের বিবেচনার অবকাশ আছে; এক-প্রকার ক্রিয়া (যাহাকে আমরা চক্ষু উন্মীলন বলি) করিলে রূপজ্ঞান হয়, আর এক প্রকার ক্রিয়া (যাহাকে আমরা চক্ষু নিমীলন বলি) করিলে রূপজ্ঞান হয় না—তাদৃশ ক্রিয়ার করণে বা অকরণে আত্মাদের [illegible] এইরূপ ধারণা জন্মে। এই শক্তির নাম "ঈশিত্ব"। [illegible] ইহা পরমৈশ্বর্য্যে [illegible] হইতে ঈশ্বর শব্দ [illegible]। বেদে পরমেশ্বরের

নাম ইন্দ্র। তিনি শক্তিমান বলিয়াই তাঁহার নাম ইন্দ্র। দর্শনশাস্ত্রে আত্মার ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জ্ঞানশক্তির নাম ইন্দ্রিয়।

ভাষাকথায় ইন্দ্রিয়শব্দে চোখ্ কান্ ইত্যাদি বুঝায়; সাংখ্যেরা তাহা বুঝেন না। যাহাকে আমরা সচরাচর চোখ্ কান্ বলি তাহা ও একপ্রকার জ্ঞানমাত্র। সাংখ্যমতে বাহ্যবস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের কোনপ্রকার সংস্রব নাই, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় কোনপ্রকার বাহ্যবস্তু নহে। আত্মার যে শক্তিদ্বারা রূপতন্মাত্রের জ্ঞান হয় তাহা একপ্রকার ইন্দ্রিয়—দর্শনেন্দ্রিয়, যে শক্তি দ্বারা রসতন্মাত্রের জ্ঞান হয় তাহা একপ্রকার ইন্দ্রিয়—রসনেন্দ্রিয়, ইত্যাদি।

জ্ঞানশক্তির সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মশক্তির ও অনুভবেরও উদয় হইয়া থাকে। রূপজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু উন্মীলন ও নিমীলন নামক ব্যাপারের জ্ঞান হইয়া থাকে। প্রথমতঃ এই ক্রিয়া স্বাভাবিক ও প্রযত্নশূন্য। তেমনি আদিম হস্তপদাদির চালনাও স্বাভাবিক ও প্রযত্নশূন্য, কিন্তু ক্রমশঃ উহা আত্মার প্রযত্নবিশেষের কার্য্য বলিয়া উপলব্ধি হইতে থাকে। এইরূপে তন্মাত্রসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সৃষ্টি অভিব্যক্ত হয়। সাংখ্যেরা ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা একাদশ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন—চক্ষুরাদি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, হস্তপদাদি পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন নামক মিশ্র উভয়েন্দ্রিয়। আমরা এস্থলে এই সংখ্যানির্ণয়ের দোষগুণ বিচারে কালহরণ করিব না।

৯॥ স্থূলভূত॥

একদিকে আত্মার জ্ঞানের যেমন ঈদৃশ পরিণতি সাংসাধিত হইতে থাকে তেমনি অপর দিকে অব্যক্তের অস্তিত্বানুভব বদ্ধমূল হইতে থাকে। অব্যক্তের সহিত আত্মার "জ্ঞ-জ্ঞেয়" সাক্ষাৎ সম্বন্ধ

সুতরাং মহতের আবির্ভাবের সমকালেই আমরা অব্যক্তের সত্তা অনুভব করি। কিন্তু সে অনুভব কি একটা এইরূপ অপ্রকাশময় সত্তার অনুভব মাত্র। পরে যখন অহঙ্কারের আবির্ভাব হয় সেই সঙ্গে অব্যক্তের অনুভব যেন আরো একপদ অগ্রসর হয়, তখন কি একটা আমাকে অভিভূত করিতেছে এইরূপ প্রতীতি জন্মে। তাহার পর আবার যখন আত্মা আপনার ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জ্ঞানকে পরস্পর পৃথক বলিয়া অনুভব করে—এটি আমার রূপজ্ঞান, এটি আমার রসজ্ঞান এই প্রকার অনুভব করে, তখন সেই সঙ্গে সঙ্গে ঐ কি একটা আমাতে রূপের জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি করিয়া দিতেছে এইরূপ অনুভব হয়; এখন অব্যক্তের অনুভব আরো যেন একপদ অগ্রসর হইল। এই অবস্থায় আবার আত্মা আপনার জ্ঞানশক্তি ও কর্ম্মশক্তি অনুভব করিয়া দেখে যে, সেই শক্তি অব্যক্তের শক্তি দ্বারা নিয়মিত। যেমন ইচ্ছা তেমন জ্ঞান, যেমন ইচ্ছা তেমন কর্ম্ম হয় না! আশ্চর্য্য!! একি? ইচ্ছা করি বা না করি আমাকে নানা প্রকার অনুভবে অভিভূত করিতেছে ওটা কি?—এইরূপে ওটা কি—এটা কি করিয়া অব্যক্তের আমরা কোন অন্তই পাই না—তাহা যেমন গোড়ায় অব্যক্ত শেষেও তেমনি অব্যক্ত! আমরা আশ্চর্য্য ও স্তম্ভিত হইয়া তাহার রঙ্গ দেখিতে থাকি। তাহা আমাদিগকে হাসাইতেছে কাঁদাইতেছে; তাহার আবেগে আমরা চঞ্চল; হাসিয়া আবার কিরূপে সেইরূপ হাসি হইবে তাহার চেষ্টা, কাঁদিয়া আবার কিসে সেরূপে কাঁদিতে না হয় তাহার চেষ্টা। ক্রমশঃ অব্যক্তকে নিগূঢ়রূপে জানিবার পিপাসা অসহ্য হইয়া দাঁড়ায়। সমুদয় জীবন সেই অব্যক্তের আন্দোলনে তাহার বিতর্কে ব্যাপৃত ও পর্য্যবসিত হইতে থাকে। সাংখ্য-

শাস্ত্রের ভাষায় "আত্মা প্রকৃতিকে দেখিতে ব্যাকুল হয়"—এবং অবশেষে এক কৌশল অবলম্বন করে। মনে কর একটি নদীতে একটি বৃক্ষ নিমগ্ন আছে, নদীর স্রোতে নৌকা তাহার উপরে পড়িয়া বিনষ্ট হয়। তখন যেমন নাবিকেরা সেই জলমগ্ন বৃক্ষকে জানিবার জন্য সেই স্থলে একটি ধ্বজা পুতিয়া দেয়—সেই ধ্বজা দেখিয়া জলমগ্ন বৃক্ষের বিষয় অবগত হয়—তদ্রূপ আত্মা অন্ধকারমগ্ন "তমোভূত" "অপ্রজ্ঞাত" "অলক্ষণ" অব্যক্ত প্রকৃতিতে তাহাকে ব্যক্তকরণাভিপ্রায়ে রূপরসাদির নিশান নিখাত করে। ইহার নাম সর্গ বা সৃষ্টি; রূপরসাদি আত্মা হইতে বিসৃষ্ট হইয়া যেন প্রকৃতির উপরে নিক্ষিপ্ত হয়, এবং প্রকৃতির ধ্বজা নিশান হেতু বা লিঙ্গ বা আবরণস্বরূপ হইয়া উঠে। অর্থাৎ সাংখ্যদের পরিভাষায় সূক্ষ্মভূত স্থূলভূতে পরিণত হয়।

জ্ঞানই আত্মার আবরণস্বরূপ; সেই জ্ঞান যখন প্রকৃতির নিশানস্বরূপ পরিকল্পিত হইয়া অবশেষে প্রকৃতির সহিত অভিন্ন ভাব ধারণ করে—তখন আত্মাকে প্রকৃতিকে আপনার আবরণ বলিয়া ভ্রান্ত হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? প্রকৃতির যে অংশের সহিত আত্মার সাক্ষাৎকার সম্পর্ক তাহা এক্ষণে আবরণকারী দেহ বলিয়া পরিকল্পিত হয়। প্রকৃতপক্ষে স্বীয় জ্ঞানাবরণের সহিত আত্মার অভেদ; কিন্তু সেই জ্ঞানাবরণ যখন "দেহ" বলিয়া পরিকল্পিত হয়—তখন আত্মা দেহের সহিত আপনাকে অভিন্ন বোধ করিয়া ভ্রমে পতিত হয়। এইরূপে আমরা স্বীয় স্বীয় ঘরদ্বার পুত্রকলত্র বন্ধুপরিজনের গঠন করিয়া সংসার-মহার্ণবে পতিত হই।

স্বরলিপি।

গৌরী—তাল ফেরতা।

আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি
তুমি অবসর মত বাসিয়ো।
আমি নিশিদিন হেথায় বসে আছি
তোমার যখন মনে পড়ে আসিয়ো।
আমি সারানিশি তোমা লাগিয়া
রব' বিরহ-শয়নে জাগিয়া,
তুমি নিমেষের তরে প্রভাতে
এসে মুখপানে চেয়ে হাসিয়ো।
তুমি চিরদিন মধুপবনে
বিকশিত বন-ভবনে
যেয়ো মনোমত পথ ধরিয়া
তুমি নিজ সুখস্রোতে ভাসিয়ো।
যদি তার মাঝে পড়ি আসিয়া
তবে আসিও চলিব ভাসিয়া,
যদি দূরে পড়ি তাহে ক্ষতি কি,
মোর স্মৃতি মন হতে নাশিয়ো।

৷ গা -া গক্ষা -পধা। পা ক্ষপা ক্ষা ধলা।
৷ আ — মি — । নি শি দি ন ।

॥ গা গ-লা সাঃ -নঃ। সা লা লা -া। সা -া সা -সন্া।
॥ তো — মায় — । ভা ল বা — । সি — তু মি ।

। সা পা পা পা। পা -া ক্ষাঃ -পক্ষঃ। গা -মা গা -া।
। অ ব স র। ম — ত — । বা — মি —।

। গপ্পা -পধ্পা পা ক্ষপা। ক্ষা গমা গা গলা॥ -া -া ।
। যো — আ মি । নি শি দি ন ॥ — — ।

। গপা গা পা ধা। র্সাঃ -নঃ র্সর্সনা -র্সা ।
। নি শি দি ন । হে — থায় — ।

। না ধনা ধাঃ -ক্ষঃ। পধপক্ষা -পক্ষা গা ক্ষা। না ধা -া পা।
। ব সে আ —। ছি — তো মার। য খন্ — ম।

। ক্ষা -পা ক্ষপা গা। গা মা গা -া। গা ধা পা ক্ষপা।
। নে — প ড়ে। আ — সি —। যো — আ মি ।

। ক্ষা গমা গা গলা ॥ গা গা। গপা গা পা ধা।
। নি শি দি ন ॥ আ মি সা রা নি শি।

। ধা -র্সা র্সাঃ -নঃ র্সা -নর্সা র্সর্সনা -র্সা। র্সা -া র্সা র্সা।
। ভো — ব া —। লা — গি —। য়া — র ব ।

। না র্সা নর্সা ধা। ধা ধ্না ধপ্না -ধপা। ধা পধনর্সা র্সাঃ -নঃ।
। বি র হ শ। ষ্ণু — নে —। জা — গি —।

। নর্সনাঃ -ধঃ পক্ষপা গা। {গপা পা পা পা। পা -া পাঃ -ক্ষঃ।
। মা — তু মি। {নি- ম্মে ষে র। ভ — মে —।

। পা -ক্ষপনা ধা -া। ক্ষপধা -পা ক্ষপা গা)} ।
। প্র — ভা —। (তে — তু মি)} ।

। ক্ষপধা -পা ক্ষপা গা। লা পা ক্ষপা গা। লগা -লা সা বনা।
। তে — এ সে। মু খ পা —। নে — ছে লে।

। সা -পা পা -। ঋা -পা ঋা গা। লা পা ঋা গলা ॥
। হা — ঁ সি —। য়ো — আ মি। নি শি দি ন ॥

৩।০

। সসা। সগা ললা ললা। ললা সা সন্া। সপা পপা ঋগা।
। তুমি। চির দিন মধু। পব নে চির। বিক শিত বন।

। দদা পগা লসা। ন্সা ন্দা ন্সা। ললা সা সন্া।
। ভব নে যেয়ো। মনো মত পথ। ধরি য়া তুমি।

৪।০

। সা লা গা গা। ঋা -। পা -। ঋপদা -। দাঃ -ঞ্দঃ।
। নি জ সুখ। স্রো — তে —। ভা — নি — ।

। পা -। পা পা। ঋপা গা পা ধা। র্সা -। র্সাঃ -নঃ।
। য়ো — য দি। তা র মা ঝে। প — ড়ি —।

। র্সা -নর্সর্রা র্সা -। র্সা -। র্সা র্সা। না র্সা র্গা র্লা।
। আ — সি —। য়া — ত বে। আ মি ও চ।

। র্সা -। র্সাঃ -নঃ। ধনা ধনর্সা র্সাঃ -নঃ। ধর্সনাঃ -ধঃ পঋপা গা।
। লি — ব —। ভা — সি —। য়া — য দি।

। {গপা পা পা -। পা -। পা পঋা। পা -ঋপনা ধা -।
। {দু রে প —। ড়ি — তা হে। ক্ষ — ন্তি —।

। (ক্ষধা -পধপা ঋপা গা)}। ঋপধা -পা ঋপা গা।
। (কি — ষ দি)}। কি — যো ন্।

। গা ধা পা পা। ঋা -পা ঋাঃ -পঋঃ। গা মা গা -।
। সু স্থি র ন। হ — তে —। না — শি —।

। গক্ষা -পধা পা ক্ষপা। ক্ষ: গমা গা গ্লা ॥
। য়ো — আ মি । নি শি দি ন ॥

ব্যাখ্যা।

১। প=কোমল রেখাব; ক্ষ=কড়ি মধ্যম; দ=কোমল ধৈবৎ; ণ=কোমল নিখাদ।

২। এ গানের প্রথম ও শেষ অংশে কাওয়ালি এবং মধ্যে একতালা। যে অংশে যে তাল তাহার প্রথমেই তালাঙ্ক দেওয়া হইয়াছে।

৩। যুগল ছেদ আস্থায়ীতে ফিরিয়া যাইবার চিহ্ন। এই গানের প্রথমেই যুগল ছেদ নাই। "তোমায় ভালবাসি"র গোড়ায় যুগল ছেদ; গানের প্রত্যেক কলি শেষ করিয়া "আমি নিশিদিন" হইতে না ধরিয়া "তোমায় ভালবাসি" হইতে ধরিতে হইবে। এবং যেখানে শিরোদেশে যুগল ছেদ আছে সেখানে থামিতে হইবে।

রবিখন্দ, পাট শণ ও তরকারী।

(কৃষিকথা।)

রবিখন্দের মধ্যে মাসকলাই, মুগ, ছোলা, অরহর, মুসুরী, তেওড়া প্রভৃতি প্রধান। এই সকল শস্য দাউল রূপে আমাদের দেশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সমুদায়ই শীতঋতুতে জন্মে। ইহার মধ্যে অরহরের চাষ সর্ব্বাগ্রে আরম্ভ করিতে হয়। ইহার বিশেষ চাষও কিছু নাই। জ্যৈষ্ঠ মাসে জমীকে চষিয়া এক একটি খুরী কাটিয়া ঐ খুরী মধ্যে দুই তিনটা করিয়া অরহর নিক্ষেপ করিতে হয়। এক ছাট জল পাইলেই সেই অরহর অঙ্কুরিত হইয়া উঠে এবং ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া পৌষ মাসে

ফল ধরে, আর মাঘ ফাল্গুনে পাকিয়া উঠে। কোন কোন অরহর পৌষ মাসেও পাকে। তখন গাছগুলি কাটিয়া আনিয়া কোন একটা স্থানে শুখাইতে দিতে হয়। কয়েক দিন মধ্যে শুষ্ক হইলে, ছিঁড়িয়া গরুর দ্বারা দলিত করিয়া, দানা বাহির করিয়া লইলেই হইল। অরহরের ফলে দাউল হয়, গাছে জ্বালানি কাষ্ঠের কাজ করে।

কলাইয়ের চারা আশ্বিন মাসের শেষে বাহির হওয়া আবশ্যক। রীতিমত জমী চষিয়া বীজ ছড়াইয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাক। শিশির পাইয়া আপনি অঙ্কুর হইবে, গাছ বাড়িবে, সুটি ধরিবে, ফল পাকিবে। তখন, পৌষ মাসে, উপড়াইয়া আনিয়া শুষ্ক কর, গো দ্বারা মাড়িয়া লও, তৎপরে দাউল প্রস্তুত করিয়া সুখে আহার কর। কলাইয়ের ন্যায় মুগ, ছোলা, মুসুরী, তেওড়া চাষ একই প্রকার। কেবল মুসুরীর জমীতে বড় বড় ঢেলা থাকা আবশ্যক। আর সকল শস্যের জমী যেন ঘাস-শূন্য করা হয়। কার্ত্তিক মাসে জমীর চাষ করা বড় কঠিন। ঐ সময়ে মাটি প্রায়ই কঠিন হয়। উহাতে সহজে লাঙ্গল বিদ্ধ হয় না। এই নিমিত্ত চাষারা প্রায়ই ভাল করিয়া জমীর চাষ করে না, বেতনভোগী কৃষাণেরা ত প্রায়ই ফাঁকি দিয়া থাকে। অতএব এদিকে গৃহস্থের বিশেষ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। গঙ্গা বা অপর নদীর ধারের পলি-পড়া জমীতে ডাঙ্গা জমী অপেক্ষা অধিক পরিমাণে রবিখন্দ জন্মিয়া থাকে। রবিখন্দে পোকা লাগিলেই উহার অনিষ্ট হয়; তন্নিবারণের চেষ্টা করা আবশ্যক; নতুবা আর কোন বিশেষ তত্ত্বাবধারণের প্রয়োজন থাকে না। পৌষ মাসের শেষ হইতে আরম্ভ করিয়া চৈত্র মধ্যে সকল রবি-খন্দ উপড়াইয়া আনিতে হয়।

তরকারীর মধ্যে আলু প্রধান, তাহার আবাদের কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। তৎপরে বেগুণ, পটল, উচ্ছে, ঝিঙ্গা প্রভৃতি উল্লেখ-যোগ্য। ইহার মধ্যে বেগুণ ও পটলের চাষই প্রধান, ঝিঙ্গে উচ্ছের কোন চাষ নাই। মাটিতে পুঁতিয়া দিলেই গাছ জন্মে, আর গরুতে না খাইলেই ফল হয়—অবশ্য মাটীটা পরিষ্কার থাকা চাই। বেগুণের ক্ষেত রীতিমত চষিতে এবং পরিষ্কার করিতে হয়। ধান্যাবাদের পূর্ব্বে জৈষ্ঠ মাসের শেষে মাঝে মাঝে বৃষ্টি আরম্ভ হইলে খানিকটা জায়গা খুঁড়িয়া বেগুণের বীজগুলি ছড়াইয়া দেওয়া রীতি। আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহেই তাহার অগণ্য চারা বাহির হয়। উহাকে বেগুণের পোয়া (পো=পুত্র) কহে। বর্ষা আরম্ভ হইলে ঐ সকল পোয়া উঠাইয়া ক্ষেতে সারি সারি বসাইতে হয় এবং মাঝে মাঝে খুঁড়িয়া দিতে হয়। এই সময়ে একবার প্রত্যেক গাছের গোড়ায় কিছু কিছু খইল ছড়াইয়া দিয়া, মাটি ধরাইয়া দিলেই অতি অল্পদিন মধ্যে গাছ-গুলি তেজ করিয়া উঠে। আশ্বিন মাসের প্রথমেই বেগুণ ফলিতে আরম্ভ হয়। সমুদায় শীতকালে বহুল পরিমাণে বেগুণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু বেগুণ খুব স্বাস্থ্যকর তরকারী নহে।

পটলের গোড়া পরিষ্কৃত জমীতে খুঁড়িয়া বসাইয়া দিলেই অল্পকাল মধ্যে বড় বড় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া গাছ হয়। ঐ গাছের নাম লতি, উহা বড় উপকারী। পটল বৈশাখ মাস হইতে ফলিতে আরম্ভ হয়।

তরকারীর মধ্যে লাউ কুমড়া প্রভৃতির এবং শাক মধ্যে পালিং পুনকা নটে প্রভৃতির চাষের পারিপাট্য নাই। ইহা অল্প যত্নে জন্মে এবং ইহা জন্মাইবার প্রকরণ পদ্ধতি সকল গৃহস্থ সন্তান জানেন, অথবা একবার দেখিলেই শিখিতে পারেন। তবে

অনেকে আলস্যপ্রযুক্ত আবশ্যকমত উৎপন্ন করান না। তাঁহারা এমনি অলস হইয়া পড়িয়াছেন যে, অকাতরে কুমড়া লাউ প্রভৃতি ক্রয় করিবেন, কিন্তু একটু চেষ্টা করিলেই যে এই সকল দ্রব্য নিজ বাটীতে উৎপন্ন করাইতে পারেন, তৎপ্রতি দৃষ্টি নাই। বিলাত প্রভৃতির দেশের ন্যায় আমাদের উপযুক্ত জমীর তত অভাব নাই। প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থের আবশ্যকমত জায়গা একটু-না-একটু পড়িয়া থাকে। তাঁহারা উহার প্রকৃত ব্যবহার করেন না, বা করিতে জানেন না। শাকসব্জির বাগান তৈয়ারির প্রথা সকল গৃহস্থের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ প্রচলিত নাই। একশ্রেণীর চাষালোক আছে তাহারাই এই সকল দ্রব্য উৎপাদন করে। অধিকাংশ লোকে তাহাদের নিকট হইতে ঐ সকল দ্রব্য ক্রয় করিয়া লয়, প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যয়সংক্ষেপ প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, এই প্রথা সাধারণের পক্ষে ভাল নহে।

সাময়িক সারসংগ্রহ।

মানুষসৃষ্টি।

জুনমাসের ফর্টনাইট্‌লি রিভিয়ু পত্রিকায় বিখ্যাত পর্য্যটক ষ্ট্যান্‌লি সাহেব মধ্য-আফ্রিকাবাসীদের মধ্যে প্রচলিত কতকগুলি গল্প প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে মানুষসৃষ্টির গল্প পাঠকদের কৌতুকাবহ মনে হইতে পারে।

প্রাচীনকালে এক সময় পৃথিবীতে কোন জীবজন্তু ছিল না,

কেবল একটি পুষ্করিণীতে একটি বড়গোছের ব্যাং ছিল। আর আকাশে ছিল চাঁদ। উভয়ের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিত।

একদিন চাঁদ বলিল, দেখ ব্যাং, মনে করিতেছি পৃথিবীর ফলশস্য ভোগ করিবার জন্য আমি একটি পুরুষ এবং একটি স্ত্রী নির্ম্মাণ করিব।

ব্যাং কহিল, আমি পৃথিবীতে থাকি, পৃথিবীর প্রাণী আমিই ভালরূপ গড়িতে পারিব, অতএব সে ভার আমি লইলাম।

চাঁদ কহিল, আমি যাহাদের সৃজন করিব তাহারা অমর হইবে, তোমার সে শক্তি নাই।

ব্যাং কহিল, ভাই তোমার আকাশ লইয়া তুমি থাক না, এ পৃথিবীর জীবসৃষ্টি আমারই কর্ত্তব্য কার্য্য।

অতঃপর ব্যাং ভাবাবেশে ক্রমশঃ স্ফীত হইয়া একযোড়া পূর্ণতা-প্রাপ্ত নরনারীকে জন্মদান করিল।

চাঁদ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, এ কি কাণ্ড করিয়াছ? এই যে দুটো জীবকে জন্ম দিয়াছ ইহাদের না আছে বুদ্ধি না আছে আত্মরক্ষার ক্ষমতা না আছে দীর্ঘ জীবন। বেচারাদের প্রতি দয়া করিয়া আমি যতটা পারি সংশোধন করিয়া লইব। উহা-দিগকে কিছু বুদ্ধি দিব এবং আয়ুও বাড়াইয়া দিব কিন্তু তোমাকে আর রাখিতেছি না।

এই বলিয়া অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিয়া ব্যাংটাকে চাঁদ দগ্ধ করিয়া ফেলিল।

অতঃপর ভীত লুক্কায়িত মানুষ দুটোকে ধরিয়া তাহাদিগকে স্নান করাইয়া, ইতস্ততঃ টিপিয়া-টুপিয়া তাহাদের শরীরের গড়ন কতকটা দুরস্ত করিয়া লইল। এবং পুরুষের নাম দিল বাটেটা এবং মেয়ের নাম দিল হানা। অবশেষে তাহাদিগকে সম্বোধন

করিয়া কহিল, দেখ, এই তৃণলতা তরুগুল্ম সবই তোমাদের এবং তোমাদের সন্তানদের জন্য। তোমাদিগকে বুদ্ধি দিয়াছি অতএব ইহার মধ্য হইতে তোমরা নিজেরা ভালমন্দ বাছিয়া লইবে। এই লও একটি কুঠার। এবং তোমাদের জন্য আমি এই আগুন করিয়া দিলাম ইহাকে রক্ষা করিবে এবং কেমন করিয়া আহারের পাত্র গড়িতে হয় দেখাইয়া দিতেছি, শিখিয়া লও।

এই শিক্ষা দিয়া এবং রাঁধিয়া খাইবার উপদেশ দিয়া চাঁদ আকাশে চড়িলেন এবং প্রসন্ন হাস্যের সহিত ইহাদের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিলেন।

তখন এই নরনারী চন্দ্রালোকে ভ্রমণ করিতে করিতে একটি তরুকোটর দেখিয়া তাহার মধ্যে আশ্রয় লইল।

মাসখানেকের মধ্যেই হানা একটি যমজ পুত্রকন্যাকে জন্ম দিল। বাটেটা বড় খুসী হইয়া তাহার স্ত্রীর সেবা করিতে লাগিল এবং তাহার জন্য উত্তম সুখাদ্য সন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিল কিন্তু কিছুই প্রসূতির রুচিকর বোধ হয় না। তখন চাঁদের দিকে হাত তুলিয়া কহিল—হে চাঁদ, আমি ত আমার স্ত্রীর পছন্দমত কোন খাদ্যই খুঁজিয়া পাই না একটা উপায় বলিয়া দাও!

চাঁদ নামিয়া আসিয়া বাটেটার হাতে একছড়া কলা দিয়া কহিল, দেখ দেখি, ইহার গন্ধটা কেমন লাগে?

বাঁটেটা কহিল, বাঃ অতি চমৎকার!

তখন চাঁদ একটির খোসা ছাড়াইয়া তাহার হাতে দিয়া কহিল, খাইয়া দেখ দেখি কেমন বোধ হয়?

সে খাইয়া মহা খুসী হইয়া স্ত্রীর জন্য লইয়া গেল। স্ত্রীও বড় পরিতোষ লাভ করিল। কহিল, জিনিষটি উত্তম কিন্তু ইহাতে শরীরে বল পাইতেছি না।

বাটেটা চাঁদকে সে কথা জানাইলে চাঁদ কহিল, দেখ দেখি ঐ কি যায়।

বাটেটা কহিল, ও ত মহিষ

চাঁদ বলিল—ঠিক বলিয়াছ। উহার পশ্চাতে কি যায়?

বাটেটা কহিল—ছাগল।

চাঁদ কহিল। আচ্ছা। তাহার পশ্চাতে কি বল দেখি!

বাটেটা কহিল—হরিণ।

চাঁদ কহিল—অতি উত্তম। তাহার পরে?

বাটেটা—ভেড়া।

চাঁদ—ভেড়াই বটে। এখন আকাশে কি উড়িতেছে দেখ দেখি!

বাটেটা। মুরগী এবং পায়রা।

চাঁদ কহিল—বেশ বলিয়াছ তা, এই সমস্ত তোমাদিগকে দেওয়া গেল। ইহারই মাংস স্ত্রীকে রাঁধিয়া খাওয়াও।

এই ভাবে সময় যায়। আদি-দম্পতি হঠাৎ একদিন সকালে উঠিয়া দেখে মস্ত একটা আগুনের চাকার মত আকাশে উঠিয়া আলোকে চতুর্দ্দিক উজ্জ্বল করিয়াছে। হানা কহিল, বাটেটা এ কি হইল?

বাটেটা কহিল, চাঁদকে না জিজ্ঞাসা করিয়া ত বলিতে পারি না। এই বলিয়া চাঁদকে ডাকাডাকি করিতে লাগিল। একটা বজ্রতুল্য স্বর আকাশ হইতে কহিল—বোস, আগে এই নূতন আলোকটা নিবিয়া যাক্ তার পরে কথাবার্ত্তা হইবে।

অন্ধকার হইলে চাঁদ উঠিয়া কহিল, এখন হইতে সময় দিন এবং রাত্রে ভাগ হইবে। সকালে সূর্য্য এবং রাত্রে আমি এবং আমার সন্তান নক্ষত্রগণ আলো দিবে। এ নিয়মের কোন কালে

সম্ভবন হইবে না। এবং যেহেতু তোমরা সর্ব্বপ্রথম প্রাণী তোমাদের সন্তানেরা জীবরাজ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবে। তোমাদিগকে আমি পরিপূর্ণতা এবং অনন্ত জীবন দান করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই ব্যাংটার জন্মদোষ তোমাদের শরীরে রহিয়া গেছে অতএব মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইবে না। সবশেষে কহিল, যে পর্য্যন্ত তুমি এবং হানা পৃথিবীতে থাকিবে আমি আবশ্যকমত তোমাদের সাহায্য ও পরামর্শ দিতে ত্রুটি করিব না—কিন্তু তোমাদের অবর্ত্তমানে মানুষের সহিত আলাপ পরিচয় আর চলিবে না। অতএব তোমরা যাহা কিছু শিখিবে ছেলেদের শিখাইয়া দিয়ো।

মানুষের উৎপত্তির এই ইতিহাস। ডারুয়িনের এভোল্যুশন্ থিওরি যে বহুপূর্ব্বে আফ্রিকা দেশে আবিষ্কৃত হইয়াছিল এই ভেক হইতে মনুষ্যোৎপত্তির গল্প তাহার প্রমাণ; কিন্তু উক্ত জাতির মধ্যে এখনো তেমন সূক্ষ্মবুদ্ধি কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই যে এই অকাট্য প্রমাণ অবলম্বন করিয়া য়ুরোপের দর্পচূর্ণ করে।

ওলাউঠার বিস্তার।

ভারতবর্ষ যে ওলাউঠা রোগের জন্মভূমি, এ সম্বন্ধে সন্দেহ অতি অল্পই আছে। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে এই ভীষণ মড়ক বঙ্গদেশ হইতে দিগ্বিজয় করিতে বাহির হইয়া সিন্ধু, য়ুফ্রাটিস, নীল, দানিয়ুব, ভল্‌গা, অবশেষে আমেরিকার সেণ্টলরেন্স এবং মিসিসিপি নদী পার হইয়া দেশবিদেশে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত করিয়াছিল।

কিন্তু এই রোগ জল, খাদ্য অথবা বায়ু কোন্ পথ অবলম্বন

করিয়া ভ্রমণ করে এখনও তাহা নিঃসংশয়রূপে স্থির হয় নাই। তবে, জলটাই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বাহন, তাহার অনেকগুলা প্রমাণ পাওয়া যায়। মে মাসের নিয়ু রিভিয়ু পত্রে এ সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে যখন এই মড়কের প্রাদুর্ভাব হয় তখন সেখানে সাধারণতঃ টেম্‌স্ নদীর জল ব্যবহার হইত। সহরের নর্দ্দমা এই নদীতে গিয়া মিশিত। সেই সময় দেখা গিয়াছে, নদীর জল সহরের যত নীচে হইতে লওয়া হইয়াছে মৃত্যুসংখ্যা ততই বাড়িয়াছে, এবং সহরের সংস্রবে অপেক্ষাকৃত অল্পদূষিত অংশের জল যাহারা ব্যবহার করিয়াছে তাহাদের মধ্যে মৃত্যুসংখ্যাও তত অল্প হইয়াছে।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে যে ওলাউঠার মড়ক হয় তখনও এসম্বন্ধে একটি প্রমাণ পাওয়া গেছে। লণ্ডনে যে দুই জলের কলওয়ালা জল যোগাইয়া থাকে তন্মধ্যে সাউথ্‌ওয়ার্ক্ ওয়াটার কম্পানি ব্যাটার্সি নামক স্থানের পয়ঃপ্রণালীর নিকটবর্ত্তী টেম্‌স্ হইতে জল লইত। এবং ল্যাম্বেথ্ ওয়াটার কম্পানি নদীর অনেক উপর হইতে অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ জল আহরণ করিত। লণ্ডনের স্থানে স্থানে এই দুই কম্পানির পাইপ্ সংলগ্নভাবে দুই পাশাপাশি বাড়িতে ব্যবহৃত হইয়াছে অথচ মৃত্যুসংখ্যা তুলনা করিয়া দেখা গিয়াছে সাউথ্‌ওয়ার্ক্ কোম্পানির জল যাহারা ব্যবহার করিয়াছে তাহাদের মধ্যে হাজার করা সাতান্ন জন মরিয়াছে আর ল্যাম্বেথ্ কোম্পানির জল যাহারা পান করিত তাহাদের মধ্যে হাজার করা এগারো জনের মৃত্যু হয়।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে সোহোপল্লীর গোল্‌ডেন্ স্কোয়ার নামক একটি ক্ষুদ্র অংশে ওলাউঠা দেখা দেয়। তাহার কারণ নির্ণয়ের

জমা যে কমিশন বসে তাঁহারা দেখিলেন সেখানে পল্লীর লোক একটি বিশেষ কূপের জল পান করিয়া থাকে। এবং সন্ধানের দ্বারা জানিলেন, মড়কের প্রাদুর্ভাবের প্রাক্কালে স্থানীয় একটি মল-কূপ কিরূপে জীর্ণ হইয়া যায় এবং মৃত্তিকাতল দিয়া আবর্জ্জনাপ্রবাহ এই জলের সহিত মিশ্রিত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যেখানে এই জলাশয় অবস্থিত সেই রাস্তার উপরেই একটি মদ চোঁয়াইবার কারখানা ছিল, সেখানকার কর্ম্মচারীরা উক্ত জল পান করিত না এবং তাহাদের মধ্যে একজনেরও ওলাউঠা হয় নাই।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ডোরাণ্ডা নামক একটি কুলিজাহাজ ইংলণ্ড ছাড়িয়া মাসখানেক পরে বাভাঘীপের বন্দরে কয়লা তুলিয়াছিল। সেখানে কোন মাল বোঝাই হয় নাই, কেবল ফার্ষ্টক্লাস প্যাসেঞ্জারদের জন্য ফল এবং শাকসবজি লওয়া হয়। সমস্ত পথ ডিষ্টিল্-করা জল ব্যবহার হইয়াছে এবং কোন বন্দর হইতে জল লওয়া হয় নাই। বন্দর ছাড়ার পর জাহাজে ওলাউঠা দেখা দিল। কিন্তু প্রথমশ্রেণীর প্যাসেঞ্জারদের কেহ রোগগ্রস্ত হয় নাই। তাহারাই ফল ও উদ্ভিজ্জ খাইয়াছিল এবং বন্দরে নামিয়া রাত্রিযাপন করিয়া আসিয়াছিল। জাহাজের ডেক্ সাফ করিবার জন্য তীর হইতে কিয়ৎ পরিমাণে বালুকা আনা হইয়াছিল। সেই বালুকা জাহাজের কোন কোন বিভাগে দুই দিন ব্যবহার করিয়া দুর্গন্ধবোধে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল; জাহাজের লোকের বিশ্বাস সেই বালুকার মধ্যেই ওলাউঠার বীজ ছিল। যদি তাহাই সত্য হয় তবে এস্থলে জলের দোষ দেওয়া যায় না। বালুকা হইতে বিষ নিশ্বাসযোগে শরীরে গৃহীত হইয়াছে এইরূপ অনুমান করিতে হয়।

"ইংলণ্ড" নামক ষ্টীমার ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে লিভারপুল হইতে যাত্রা করিয়া হ্যালিফ্যাক্সে পৌঁছায়। পথের মধ্যে ওলাউঠায় তিনশো লোক মরে। বন্দরে আসিলে পাইলট উক্ত জাহাজের সহিত নৌকা বাঁধিয়া তাহাকে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দেয়। ঐ পাইলট এবং তাহার দুই জন সঙ্গী জাহাজে পদার্পণমাত্র করে নাই। দুই দিন পরেই ঐ পাইলট ওলাউঠায় আক্রান্ত হয় এবং তৃতীয় দিনে তাহার একটি সঙ্গীকেও ওলাউঠায় ধরে। তখন সে অঞ্চলে আর কোথাও ওলাউঠা ছিল না। এখানেও বায়ু ব্যতীত আর কিছুকে দায়ী করা যায় না।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কক্ সাহেব, ওলাউঠাকে শরীরের উপরে জীবাণুবিশেষের ক্রিয়া বলিয়া সাব্যস্ত করেন। যদিও এ মত এখনো সম্পূর্ণ সর্ব্ববাদীসম্মত হয় নাই তথাপি অধিকাংশের এই বিশ্বাস।

অনেক জীবাণুবীজ বহুকাল শুষ্ক অবস্থায় থাকিয়া অনুকূল আধার পাইলে পুনরায় বাঁচিয়া উঠে। কিন্তু কক্ সাহেবের ওলাউঠা-জীবাণুগণকে এ পর্য্যন্ত বীজ সৃজন করিতে দেখা যায় নাই এবং একবার শুষ্ক হইয়া গেলে তাহারা মরিয়া যায়। এ কথা যদি সত্য হয় তবে ধূলা প্রভৃতি শুষ্ক আধার অবলম্বন করিয়া সজীব ওলাউঠা-জীবাণু বায়ুযোগে চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইতে পারে না। জলপথই তাহার প্রশস্ত পথ এবং ওলাউঠা-জীবাণু জলজ।

জিব্রল্টার বর্জ্জন।

গ্যাম্বিয়র সাহেব বলিতেছেন, ইংরাজ জিব্রল্টারের উপর দুর্গ ফাঁদিয়া ভারতবর্ষের পথ আগলাইয়া বসিয়া আছে, কিন্তু সে

তাহার গণ্ডশ্রম মাত্র। কারণ, যুদ্ধের সময় যদি সুয়েজখালের পথ ব্যবহার করা সম্ভব হয় তবে জিব্রল্টার দুর্গের উপযোগিতা থাকে; কিন্তু লেখকের মতে তাহা সম্ভব নহে। কেন না, রুষিয়া প্রভৃতি কোন য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যের সহিত ইংরাজের যদি যুদ্ধ বাধে, তবে ইজিপ্ট কোন পক্ষ অবলম্বন করিতে না পারিয়া সন্ধির নিয়মানুসারে ইংরাজকে খালের পথে প্রবেশ করিতে দিবে না। ফ্রান্স এবং রুষিয়া যদি কখনো একত্র মিলিত হইয়া তুরস্ক আক্রমণ করে তবে তুরস্কের অধীনস্থ ইজিপ্ট আক্রমণে বাধা দিবার অধিকার ইংরাজের নাই, কারণ, ইংরাজ সেখানে অতিথি মাত্র। সুতরাং বিপদের সময় সুয়েজপথের কোন মূল্য দেখা যায় না। কেবল তাহাই নহে। লেখক বলেন, জিব্রল্টার-প্রণালী দিয়া অন্য য়ুরোপীয় সৈন্যপ্রবেশ প্রতিহত করা সহজ নহে, কারণ, প্রণালীটি যথেষ্ট প্রশস্ত। এবং আটলাণ্টিক ও ভূমধ্যসাগরের যোগসাধন করিয়া ফ্রান্স যে খাল খনন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে তাহা সমাধা হইলে জিব্রাল্টরের কোন মূল্যই থাকে না।

আরো একটা কথা আছে। সুয়েজখাল বালির মধ্য দিয়া একটা সামান্য নালা মাত্র। সের দেড়েক ডাইনামাইট লাগাইলেই তাহাকে ধ্বংস করা যায় এবং একটা জাহাজ যদি ইঁট ও লোহার রেলে বোঝাই পূর্ব্বক আড় করিয়া মাঝখানে ডুবাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলেই পথ বন্ধ।

লেখক বলেন, ভূমধ্যসাগরের পথ ছাড়িয়া ইংলণ্ড যদি উত্তমাশা অন্তরীপ দিয়া পথ ঘুরাইয়া লন তাহা হইলে আর কোন চিন্তার কারণ থাকে না। তাহা হইলে য়ুরোপের সহিত আর কোন সংস্রবই থাকে না, সমস্ত পথ খোলসা পাওয়া যায়।

লেখক প্রস্তাব করেন, স্পেনকে জিব্রাল্টার ছাড়িয়া দিয়া তা-

পরিবর্ত্তে তাহার নিকট হইতে ক্যানারি দ্বীপ লওয়া হউক; সেখানে পথের মধ্যে দিব্য একটি দুর্গ ফাঁদিয়া বেশ শক্ত হইয়া বসা যায় এবং জাহাজ মেরামত, কয়লাতোলা এবং সৈন্যনিবাসের পক্ষে একটি সুবিধামত আড্ডা হয়।

পর্টুগালের নিকট হইতে ম্যাডেরা দ্বীপটাও পাঁচ রকম প্রলোভন দ্বারা যোগাড় করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

তাহার পর ইজিপ্টের দখল ছাড়িয়া দিয়া ফ্রান্সের নিকট হইতে তৎপরিবর্ত্তে ম্যাডাগাস্কর চাহিয়া লইলে ফ্রান্স নারাজ হইবে না।

তাহার পর ইংলণ্ড হইতে বুক ফুলাইয়া যুমোদ্যার করিয়া রণতরী ছাড়িবে এবং অবাধে সমস্ত আট্‌লাণ্টিক্ কর্ষণ করিয়া ভারতসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া একেবারে ভারতবর্ষের ঘাটে আসিয়া লাগিবে; য়ুরোপের চোকরাঙানীকে আর কিছুমাত্র কেয়ার করিতে হইবে না। ভারতবর্ষের কণ্ঠলগ্ন লৌহশৃঙ্খলটি বরাবর নিরাপদ সমুদ্রমধ্যে দিয়া একটানে চলিয়া গিয়া ইংলণ্ডের দ্বারদেশে দৃঢ়পাকে বদ্ধ হইয়া থাকিবে।

ঈথর।

ঈথর স্পর্শের অতীত, এবং পদার্থের গতিকে কিছুমাত্র বাধা দেয় না, এ সম্বন্ধে বিস্তর পরীক্ষা করা হইয়াছে। এইজন্য বোধ হয়, অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি ঈথরের অস্তিত্বকে কাল্পনিক অনুমান মনে করেন। কিন্তু ঈথর আমাদের ইন্দ্রিয়ের অগম্য নহে, আলোকবোধ ও উত্তাপবোধই তাহার প্রমাণ।

কথাটা সংক্ষেপে এই;—পৃথিবীতে প্রধানতঃ সূর্য্য হইতে আলোক ও উত্তাপ বিকীর্ণ হইতেছে। এই পৃথিবী ও সূর্য্যের

মাঝখানকার আকাশে যদি কোন জানত বস্তু থাকে, সে অতি সূক্ষ্ম গ্যাস; কোথাও বা পরমাণু আকারে, কোথাও বা খানিকটা সমষ্টিবদ্ধ ভাবে; কিন্তু ইহাদের পরস্পরের মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধান। এই বিচ্ছিন্ন পদার্থগুলি আলোকবহনকার্য্যে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। বিশেষতঃ আলোক যে গতি অবলম্বন করিয়া আসে, কোন কঠিন, তরল অথবা বাষ্পীয় পদার্থ সে গতি চালনা করিতে পারে না। অতএব তাহার একটা স্বতন্ত্র বাহন আছে সন্দেহ নাই। বাহন আছে তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই, কারণ, কিরণ-মাত্রই যে তরঙ্গবৎ কম্পমান এবং তাহার গতির সময় সুনির্দ্দিষ্ট ইহা সম্পূর্ণ প্রমাণ হইয়া গেছে।

ক্রিয়া শূন্য আশ্রয় করিয়া হইতে পারে না ইহাও বিজ্ঞানের একটি অকাট্য সিদ্ধান্ত। বস্তু আপন সংলগ্ন পদার্থের উপরেই কাজ করে। শক্তি অবিচ্ছিন্ন মধ্যস্থ পদার্থ অবলম্বন করিয়াই একস্থান হইতে অন্য স্থানে সঞ্চরণ করিতে পারে। পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যে যে কেবল কিরণের সম্বন্ধ তাহা নহে, একটা আকর্ষণের যোগ আছে। আকর্ষণটি বড় কম নহে; যে টান পড়ে তাহা সতেরো ফুট চওড়া ১০০০০০০০০০০০টা ইস্পাতের রজ্জুও সহিতে পারে না। এত বড় একটা প্রবল শক্তিকে কে চালনা করিতেছে? একটা ইস্পাতের পাতকে বিস্তর বলপ্রয়োগ করিয়াও বিচ্ছিন্ন করা কঠিন; অথচ এ কথা সকলেরই জানা আছে যে, বস্তুমাত্রেরই পরমাণু গায়ে গায়ে সংলগ্ন নহে; পরস্পরের মধ্যে ফাঁক আছে এবং সেই ফাঁকে ঈথর নামক বিশ্বব্যাপী যোজক পদার্থ অবস্থিতি করিয়া অসংলগ্ন পরমাণুপুঞ্জকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। এই মধ্যস্থ জিনিষটি স্পর্শাতীত বটে, কিন্তু তাহার এমন গুণ আছে যে, প্রবলতম আকর্ষণ সঞ্চার করিতে পারে।

এই ঈথরের কম্পন কেবল যে আমরা আলোক ও উত্তাপ-বোধের দ্বারা অনুভব করি তাহা নহে। যে সকল বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের দ্বারা তড়িৎপ্রবাহ সম্বন্ধে আমরা জ্ঞানলাভ করিয়া থাকি, সেগুলাও যেন সেই বিশ্বব্যাপী ঈথরের নাড়ির বেগ অনুমান করিবার যন্ত্র। এখনো এই আলোক এই তড়িতের গতি ও শক্তিতত্ত্ব নির্ণয় হয় নাই; এখনো ইহার ক্রিয়াকলাপ যন্ত্রতত্ত্বের ধারণার বাহিরে। বর্ত্তমান শতাব্দীতে ইহাদের সম্বন্ধে বিস্তর তথ্য জানা গিয়াছে। অনেক পণ্ডিত আশা করিয়া আছেন ভাবী শতাব্দীতে ইহার একটা তত্ত্বনির্ণয় হইবে এবং সেই তত্ত্বের উপর সমস্ত পদার্থবিদ্যার একটা নূতন ভিত্তি স্থাপিত হইবে। জীবনীশক্তি এবং মানসশক্তি এখনো বিজ্ঞানের হস্তে ধরা দেয় নাই, কিন্তু বিখ্যাত পদার্থতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক অলিভার লজ সাহেব অনুমান করিতেছেন ঈথরের সঙ্গে সঙ্গেই সে দুটো ধরা পড়িবে, পরস্পরের মধ্যে বোধ করি বা কোন একটা নিগূঢ় যোগ আছে।

পুনর্জন্ম সম্বন্ধে শ্রীমতী বেস্যাণ্টের মত।

থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান অধিনেত্রী শ্রীমতি বেস্যাণ্ট, "মৃত্যু ও মৃত্যুর পর" এই বিষয়ে 'লুসিফর'-পত্রে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন;—"অনন্তের যাত্রী আমাদের অন্তরাত্মা, এই মানবাত্মা, দেহ পরিগ্রহ করিয়া, এক এক কল্পকাল মধ্যে কি করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহা একবার সাধারণ ভাবে আলোচনা করিয়া দেখা যাক্। ইহজীবনের পূর্ব্বেও জীবাত্মা অনেকবার জীবনপথের যাত্রী হইয়াছে; সেই সময়ে যে সকল শক্তি অর্জ্জিত হইয়াছিল তাহারই বলে সে এখানে পদার্পণ করিতে

সমর্থ হইয়াছে। এই অভিনব যাত্রা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে সে দেবাত্মারূপে বর্ত্তমান ছিল; বিশুদ্ধ পরমাত্মার নিশ্চেষ্ট ভাবকে অতিক্রম করিয়া, অতীত জীবনের আধিভৌতিক অভিজ্ঞতা-প্রভাবে আপনার মধ্য হইতে বুদ্ধিকে, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন মনকে ক্রমশঃ বিকশিত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু এই অভিজ্ঞতামূলক ক্রমবিকাশ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই; এখনও এতটা হয় নাই যাহাতে জড়জগতের উপর সম্পূর্ণ প্রভুত্বলাভ করিতে পারে; এখনও জীবাত্মা অজ্ঞানবশতঃ যখনই স্থূল জড়ের সংসর্গে আইসে অমনি সে নানাপ্রকার মায়া-বিভ্রম দ্বারা আক্রান্ত হয়। কল্প-কালস্থায়ী দেহপরিগ্রহের উদ্দেশ্য এই, যাহাতে জীবাত্মা মায়া-জাল হইতে মুক্ত হইতে পারে; স্থূল জড়ের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া ও তাহার মধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক কাজকর্ম্ম করিয়াও যাহাতে স্বীয় দৃষ্টিকে পরিষ্কার রাখিতে পারে—মায়ার দ্বারা অন্ধীভূত হইয়া না যায়। এই কল্পকালস্থায়ী দেহপরিগ্রহের দুইপ্রকার বৈকল্পিক অবস্থা;—একটা অপেক্ষাকৃত অল্পকাল স্থায়ী; উহা আমাদের পার্থিব জীবন; এই জীবনকাল মধ্যে যাত্রী-দেবাত্মা স্থূল জড়ের মধ্যে নিমগ্ন থাকে। আর একটা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালস্থায়ী; উহার নাম "দেবচন"-জীবন; এই অবস্থায় আত্মা সূক্ষ্মতর ব্যোম-পদার্থে পরিবেষ্টিত হয়, ইহা পার্থিব পদার্থের ন্যায় ততটা মায়াময় নহে—ইহার মায়াজাল অনেকাংশে কম। এই দ্বিতীয় অবস্থা-টিই, বলিতে গেলে, জীবাত্মার স্বাভাবিক অবস্থা। কেন না, এই অবস্থা অধিকতর স্থায়ী এবং জীবাত্মার স্বরূপগত দেবজীবনের অনেকটা নিকটবর্ত্তী; এই অবস্থায় জড়ের দ্বারা জীবাত্মা ততটা আচ্ছন্ন হয় না এবং দ্রুতপরিবর্ত্তনশীল বিষয়াভাসের দ্বারা ততটা প্রবঞ্চিত হয় না। ক্রমশঃ ধীরে ধীরে, পুনঃপুনঃ অভিজ্ঞতার

ফলে, স্থূলজড়ের প্রভাব আত্মা হইতে অপসৃত হয় এবং অবশেষে আত্মা জড়ের দাস না হইয়া জড়ের উপর প্রভুত্বলাভ করে।

"দৈবচনিক" অবস্থায় জীবাত্মা সম্পূর্ণ মুক্ত নহে; তখনও সে পার্থিব জ্ঞানকে পরিপাক করিতে থাকে; তখনও পার্থিব অভিজ্ঞতা তাহার উপর কতকটা কর্ত্তৃত্ব করে; তখনও "দৈবচনিক" জীবনকে পার্থিব জীবনের সূক্ষ্মীকৃত অনুবৃত্তি মাত্র বলিয়া উপলব্ধি হয়। কিন্তু ক্রমশঃ যতই পার্থিব জ্ঞানকে ক্ষণস্থায়ী ও বাহ্যিক বলিয়া জানিতে পারে, ততই জীবাত্মা তাহা হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে প্রয়াস পায়; এবং যাবৎ না জীবাত্মা মনস্বী হইয়া, জিতেন্দ্রিয় হইয়া, বিমুক্ত দেবাত্মা হইয়া অবিচ্ছিন্ন আত্মজ্ঞান সহকারে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে কোন স্থানে অবাধে ভ্রমণ করিতে পারে, তাবৎ তাহার চেষ্টার বিরাম হয় না। এইপ্রকারে দেবপ্রকৃতি স্থূল জড়দেহে বিজয় লাভ করে; সর্ব্বপ্রকার জড়পদার্থকে বশীভূত করিয়া আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী দাসরূপে তাহাদিগকে নিযুক্ত করে।

আর একটি নিগূঢ় কথা এই;—পার্থিব জীবনের পূর্ব্বেও যেমন "দৈবচনিক" অবস্থা, পার্থিব জীবনের পরেও আবার সেই "দৈবচনিক" অবস্থা। মনুষ্য পৃথিবীতে যে জ্ঞানধর্ম্ম অর্জ্জন করে, তাহাই সে "দৈবচনিক" অবস্থাতে ভাল করিয়া পরিপাক করিতে থাকে। কিন্তু পৃথিবীতে যদি মানবাত্মা অধিক বীজ বপন না করে, তাহা হইলে "দৈবচনিক" অবস্থাতে ফসলও কম জন্মায়; এবং পুষ্টিকর দ্রব্যের অপ্রতুলতা নিবন্ধন আত্মার পোষণক্রিয়াও বিলম্বে সাধিত হয়। এই নিমিত্ত, পার্থিব জীবনের এতটা প্রয়োজন ও গৌরব; এই পার্থিব জীবন-ক্ষেত্রেই বীজ বপন হইয়া থাকে এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়। "দৈবচনিক"

অবস্থায় আত্মা স্বীয় অভিজ্ঞতার উপকরণ সকল "সাফাই ও বাছাই" করে; এই অবস্থায়, আত্মা অপেক্ষাকৃত মুক্তিলাভ করে এবং ক্রমশঃ পার্থিব জ্ঞান-রাশির প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হয়। পৃথিবীতে যে সকল কল্পনার বীজ জীবাত্মা অন্তরে ধারণ করে, "দৈবচনিক" অবস্থায় তাহা নিজ চেষ্টায় বাস্তবিকতাতে পরিণত করিতে পারে। আত্মা যে বীজ "দৈবচনিক" অবস্থায় প্রস্ফুটিত করিয়া তুলে, যে উন্নত ভাবকে পোষণ করে, তাহারই মানসিক প্রতিবিম্ব শরীর পরিগ্রহ করিয়া অবতীর্ণ হয়। কেন না, মন-জগৎ সৃষ্টির জগৎ এবং পৃথিবী সেই স্থান যেখানে আসিয়া পূর্ব্বজন্মের চিন্তাসমূহ ভৌতিক আকারে পরিণত হয়। আত্মা গৃহনির্ম্মাতার ন্যায় নিস্তব্ধতার মধ্যে ও গভীর ধ্যান সহকারে গৃহ নির্ম্মাণের নক্সা প্রস্তুত করে এবং বহির্জ্জগতের যে অংশে গৃহ নির্ম্মিত হইবে সেইখানে আসিয়া আপনার নক্সাগুলি বাহির করে; অতীত জীবনে যে জ্ঞান অর্জ্জিত হয় তাহা হইতেই আত্মা পরজন্মের কার্য্য-কল্পনা সুস্থির করে এবং পৃথিবীতে আসিয়া সেই কল্পনাগুলিকে মূর্ত্তিমান করিয়া তুলে।

প্রথম মানসিক ধ্যান—তাহার পর তাহার বাহ্যবিকাশ; প্রথমে কল্পনা, তাহার পর আকার।... ক্রিয়া ফলবতী হইতে হইলে তাহার মূলে গভীর চিন্তা চাই, এবং নিস্তব্ধতার মধ্য হইতেই সৃষ্টিকারী মহাশব্দ উৎপন্ন হয়।"

ভারতবাসী সম্বন্ধে বিদেশীর মত।

জুন মাসের "নিয়ুরিভিয়ু" পত্রিকায় "য়ুনিভার্সিটি শিক্ষা—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" নামক প্রবন্ধে লেখক বলেন যে, প্রাচ্য ও

পাশ্চাত্য উভয় প্রদেশেই য়ুনিভার্সিটি শিক্ষায় বিশেষ কোন ফল ফলে নাই। যেরূপ শিক্ষায় হৃদয়ের বৃত্তিসকল সম্যক অনুশীলিত হইয়া মানুষ অন্তরের মধ্যে অবগাহন করিয়া, সকলের প্রতি ভ্রাতৃভাব স্থাপনা করিয়া এবং ঈশ্বরে প্রীতি ও প্রেম অর্পণ করিয়া অপার সুখসঞ্চয় করিতে পারে সেইরূপ শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা।

শিক্ষা সম্বন্ধে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া লেখক পরে দেশভ্রমণকালে ভারতবাসী, চীন জাপানী ও অ্যামেরিকানকে দেখিয়া তাহাদের চরিত্র সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা জন্মিয়াছে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। লেখক ভারতবাসী সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন সাধনার পাঠকদিগের অবগতির জন্য শুধু তাহাই আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম। তিনি বলেন, "ভারতবাসীকে দেখিলে মনে হয় উহারা পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্ত ও নিরানন্দ। হাজার বেতন দাও বক্‌সিস্ দাও কিছুতেই উহাদের অভাবপূর্ণ হয় না। ভারত-গভর্মেণ্ট দয়া করিয়া প্রাণরক্ষার উপযোগী উহাদিগকে যথেষ্ট দিয়া থাকেন এবং উপযুক্ত বেতনের কেরাণিগিরি ও সিভিল সার্ভিসের জন্য ভালরকম শিক্ষারও ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভারতগভর্মেণ্টকে অনেক হিসাবে আইডিয়াল গভর্মেণ্ট বলা যাইতে পারে। বুদ্ধিমান মান্যগণ্য কর্ত্তব্যপরায়ণ কর্ম্মচারীরা দুঃখনিবারণ সর্ব্বত্র স্কুলের বিস্তার ইত্যাদি নানা উপায়ে দেশের উন্নতির জন্য প্রাণ-মন সমর্পণ করিয়াছেন। বাণিজ্যবিস্তার, দুর্ব্বলকে সহায়দান এই সকল মহৎ কার্য্য হুহু শব্দে সম্পন্ন হইতেছে। এক কথায় সোশ্যালিষ্টরা গভর্মেণ্টের নিকট হইতে যাহা চায় ভারতবাসীরা তাহা সব পাইয়াছে। তবু কিন্তু উহারা বিষণ্ণ নির্জ্জীব ও কুসংস্কা-রাপন্ন। এমন কি, য়ুনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েটেরাও পার্শ্বীকে মাত-

বলিয়া পূজা করে, স্ত্রীলোকদিগকে অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ রাখে এবং পুতুল-পূজা করে। যাহারা উহাদের মধ্যে কুসংস্কারবিহীন তাহারাও একঘরে হইবার ভয়ে নিজ মত সমর্থন কিম্বা তদনুযায়ী কাজ করিতে সাহস করে না।"

লেখক বলেন ইহার প্রতিকারের একমাত্র উপায় ভারতবাসীকে এইরূপ শিক্ষা দেওয়া যাহাতে অন্তরের মধ্যে বিপুল শক্তি অনুভব করিয়া তাহারা সজীব হইয়া উঠে।

শিক্ষাসত্ত্বেও আমরা কুসংস্কারের হাত সম্পূর্ণ এড়াইতে পারিতেছি না এ কথা মানিলেও ভারতগভর্মেণ্টকে আমরা কিছুতেই আইডিয়াল বলিতে পারি না। সমকক্ষ হইলেও কেবল কালো রঙের জন্য আমরা তোমাদের সমান বেতন পাই না, কাজ খালি হইলে আমাদের প্রোমোশান্ বন্ধ রাখিয়া বাহির হইতে তোমাদের জাতভায়াদের পিল্‌পিল্ করিয়া ঢোকাও, সুবিধা পাইলেই আমাদের একেকটাকে লাথাইয়া সারিয়া ফেল এবং বিনা দণ্ডে অব্যাহতি পাও, হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা বাধিলে পলিসির খাতিরে মুসলমানের পক্ষ অবলম্বন কর, কি কারণে জানি না, সম্প্রতি সরকারী কালেজ উঠাইয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছ এবং দুর্ভিক্ষ সমুপস্থিত হইলে গাঁজা ও কেসুরের ব্যবস্থা করিতেছ—ইহাই কি দুর্ব্বলের সহায়দান, স্কুলকালেজের বিস্তার, আইডিয়াল গভর্মেণ্ট?

বিদেশী গভর্মেণ্টের নিকট হইতে আমরা যথেষ্ট পাইতেছি কিন্তু কথায় কথায় "আইডিয়াল" "আইডিয়াল" বলিয়া চীৎকার করা অতীব হাস্যজনক।

ব্যায়াম-বিজ্ঞান।

শরীর-চালনার আবশ্যকতা এবং উপকারিতা অনেক কাল হইতে লোকে স্বীকার করিয়া আসিতেছে কিন্তু ঠিক কি উপায়ে উহার দ্বারা শরীরের উপকার হয় তাহা পূর্ব্বে কেহ ভাল করিয়া অনুসন্ধান করেন নাই, সুতরাং এবিষয়ে উপদেশ দিতে হইলে সকলেই নিজ শরীরের উপর ব্যায়াম বিশেষের ফলাফল দেখিয়া সেই অনুসারে তাহার উপকারিতা বা অপকারিতা স্থির করিতেন। কিন্তু সকলের শরীর এবং অবস্থা কিছু সমান নহে—একজনের যাহাতে উপকার হয় আর একজনের তাহাতে অপকার হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নহে, সুতরাং উক্ত প্রণালীতে অনেক ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সম্ভব।

আজকাল যেমন সকল বিষয়েরই তত্ত্বানুসন্ধান হইতেছে তেমনি এ সম্বন্ধেও অনেক প্রসিদ্ধ ডাক্তার বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে অনুসন্ধান করিয়া কাহার পক্ষে কোন্ অবস্থায় কি-রূপ ব্যায়ামচর্চ্চা ভাল তাহা বিচার করা অপেক্ষাকৃত সহজ করিয়া দিয়াছেন।

পরিশ্রমের দ্বারা কিরূপ ফল পাওয়া যায় ইহা দেখিবার পূর্ব্বে শরীরের পরিশ্রম করিবার সমস্ত কলকৌশল বুঝিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। আমাদের ইচ্ছা হইল এবং একটি অঙ্গুলী নড়িয়া উঠিল—শরীরের মধ্যে কি কি কল চলিলে এই ঘটনাটি ঘটিতে পারে দেখা যাক্।

শরীরের যে অংশটাকে মাংস বলা যায়, তাহা সরু সরু রবারের সূতার মত পদার্থের সমষ্টি। এই সূতা-পাকান দড়ি প্রত্যেক হাড়কে তাহার নিকটবর্ত্তী হাড়ের সহিত বাঁধিয়া রাখে। এই দড়িগুলি সংলগ্ন অস্থিদ্বয়ের চতুর্দ্দিকে এমন করিয়া লাগান থাকে যে, কতকগুলির উপর টান পড়িলে হাড় দুটি

পরস্পরের জোড়ের উপর নড়িতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই মাংস-পেশীগুলর সঙ্গে ইচ্ছাশক্তির কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই। মনে যখন অঙ্গুলী নাড়িবার ইচ্ছা হয় তখন মস্তিষ্কের স্থানবিশেষে পরিবর্ত্তন হয়। সেই পরিবর্ত্তনপরম্পরা স্নায়ু দ্বারা প্রবাহিত হইয়া তবে মাংসপেশীতে পৌঁছে—এই পরিবর্ত্তনজনিত শক্তির প্রভাবে মাংসপেশীগুলির সঙ্কোচ উপস্থিত হয় এবং তাহারা যে হাড়ের সহিত যুক্ত আছে তাহাদের নাড়ায়। ইচ্ছাশক্তির প্রবলতা অনুসারে এই পরিবর্ত্তনও কম বেশী হয় এবং সেই সঙ্গে অঙ্গও কম বেশী নড়ে।

ইচ্ছাশক্তির প্রভাব ব্যতীত যে সকল কার্য্য হইয়া থাকে সে বিষয়ে এখন আলোচনা স্থগিত রাখা যাক্। আপাততঃ এই সকল মাংসপেশীর নড়াচড়ার দরুণ শরীরের উপকার কি উপায়ে সাধিত হয় তাহাই আলোচ্য।

পরীক্ষার দ্বারা জানা গিয়াছে যে, যখনি কোন মাংসপেশী কার্য্য করিতে থাকে তখনি তাহার দিকে অধিক রক্ত প্রবাহিত হয় এবং যখন উক্ত মাংসপেশী কার্য্য হইতে অব্যাহতি পায় তখন উহা রক্ত হইতে সারপদার্থ সকল টানিয়া লইয়া যে বল ব্যয় করিয়াছে তাহা সুদসুদ্ধ আদায় করিয়া লয়। ইহাতে, যে অঙ্গ কার্য্য করিতেছিল তাহারই পুষ্টির কারণ বুঝা গেল কিন্তু শরীরের বাকি অংশের উপকার কি উপায়ে হইল? কোন একস্থানে অধিক রক্তের আবশ্যক হইলেই হৃৎপিণ্ডের সাহায্য আবশ্যক—এবং হৃৎপিণ্ড যদি অধিক জোরে রক্ত প্রেরণ করে তাহা হইলে সে রক্ত কেবলমাত্র আবশ্যকীয় স্থানে না গিয়া চতুর্দ্দিকেই অধিক পরিমাণে ছড়াইয়া পড়িবে। এই উপায়ে প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নিকট অধিক রক্ত উপস্থিত হইয়া তাহাদের পুষ্টিসাধন করে।

এইটুকু বলিলেই সব বলা হইল না। যেমন তেমন রক্ত গেলেই যে উপকার হইবে তাহা নহে। যে রক্ত একবার সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়া ঘুরিয়া, সার-বিবর্জ্জিত এবং কর্ম্ম-ব্যাপৃত অঙ্গসকলের ক্ষয়জনিত ত্যাজ্যপদার্থ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া আসে তাহাই শরীরের কার্য্যে পুনঃ-প্রেরিত হয় বটে, কিন্তু যাইবার আগে তাহাকে ফুস্‌ফুসের মধ্য দিয়া শোধিত হইয়া যাইতে হয়। নিশ্বাসের অম্লজানের দ্বারা দূষিত পদার্থসকল পুড়িয়া, অঙ্গারক অম্লে পরিণত হইয়া প্রশ্বাসের সহিত দূর হইয়া যায়; এবং রক্ত নূতন শক্তি সঞ্চার করিয়া পুনরায় সারপ্রদান কার্য্যে চলিয়া যায়। যত অধিক অম্লজান পায় ততই রক্তের সঞ্জীবনী শক্তি বাড়িয়া উঠে এবং সেই রক্তের সংস্পর্শে শরীরের অঙ্গসকল ততই অধিক পুষ্ট হইয়া উঠে। সাধারণতঃ ফুস্‌ফুসের সমস্তটা কার্য্য করে না। সচরাচর লোকে ফুস্‌ফুসের শেষ পর্য্যন্ত ভরিয়া নিশ্বাস লয় না। কিন্তু পরিশ্রম করিবার সময় যে অঙ্গগুলা খাটিতেছে তাহাদের অধিক পরিমাণে ক্ষয় হইতে থাকে, সুতরাং রক্তও অধিক পরিমাণে দূষিত হইয়া পড়ে। সে অবস্থায় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অম্লজান না পাইলে রক্ত পরিষ্কার হইয়া উঠিতে পারে না এবং পরিষ্কার হইবার পর অধিক পরিমাণে অঙ্গারক অম্ল শরীর হইতে বাহির করিতে হয়। এই সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার নিমিত্ত আমাদের দায়ে পড়িয়া নিশ্বাসপ্রশ্বাসের মাত্রা বাড়াইতে হয় এবং ফুস্‌ফুসের সমস্তটাকেই খাটিতে হয়। যাহাদের নিয়মিত পরিশ্রম করা অভ্যাস তাহাদের ফুস্‌ফুসের সর্ব্বাংশের খাটুনি এমনি অভ্যাস হইয়া যায় যে, এইরূপ দায়ে না পড়িলেও নিশ্বাসে আপনিই ফুস্‌ফুসের শেষ পর্য্যন্ত ভরিয়া যায়।

ইহার দ্বারা রক্তটা সর্ব্বদাই তেজাল এবং পুষ্টিকর অবস্থায় থাকে।

যাহা বলা হইল তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, যে অঙ্গকে খাটান যায় তাহার দিকে অধিকমাত্রায় রক্ত যাওয়াতে তাহার পুষ্টিসাধন হয় এবং সেই সঙ্গে সমস্ত শরীরে রক্ত চলাচল হওয়াতে শারীরিক ক্রিয়াসকল উত্তমরূপে এবং বর্দ্ধিততেজে সাধিত হইয়া থাকে। ইহার উপর দূষিত রক্ত পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত আমাদের অধিক পরিমাণে অম্লজান শরীরের মধ্যে লইতে হয়—তাহাতে রক্ত পরিষ্কৃত হইয়া উঠে।

কেবলমাত্র উপরি-উক্ত যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া নানা জাতীয় পরিশ্রমের ফলাফল বিচার করিতে গেলে কোন একটাকে বিশেষ করিয়া অপরের অপেক্ষা ভাল বা মন্দ স্থির করা শক্ত হইবে—মনে হইতে পারে যে, যথেষ্ট পরিমাণে যে কোনপ্রকার পরিশ্রম করিলেই শরীরের সমান উপকার হইবার কথা, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। ইহার ভিতর আরও দুই একটি বিবেচনা করিবার বিষয় আছে।

রক্ত-চলাচল এবং দীর্ঘ নিশ্বাসপ্রশ্বাস দুইই পরিশ্রমের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। কিন্তু পনের মিনিট কাল পায়ের বিপুল মাংসপেশীগুলিকে খাটাইলে সবসুদ্ধ যে পরিমাণ পরিশ্রম হইবে, অঙ্গুলী নাড়াইয়া ফুলাইয়া ফেলিলেও তাহার দ্বারা সে পরিশ্রম করিয়া উঠা কঠিন হইবে। এই যুক্তি ন্যূনাধিক সকল মাংসপেশী সম্বন্ধেই খাটে। সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া একতলা হইতে দোতলায় উঠিলে পায়ের সমস্ত মাংসপেশী কর্ত্তৃক অনেকটা কার্য্য সম্পন্ন হয় বটে, কিন্তু কোনও সুস্থ লোকের ইহাতে শ্রান্তি কিম্বা পায়ে ব্যথা হইবে না। কিন্তু যদি দড়ি বাহিয়া হাতের অপেক্ষাকৃত অল্প

মাংসপেশীর সাহায্যে ঐ একই কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয় তাহা হইলে শ্রান্তি এবং হাতে ব্যথা দুইই হইবে, এমন কি, বলিষ্ঠ লোক ব্যতীত কেহ এ কার্য্য করিতেই পারিবে না।

শ্রান্তি হইবার সংক্ষেপ অর্থ এই যে, মাংসপেশীগুলির অতিরিক্ত পরিশ্রমের দরুণ এতটা ক্ষয় হইয়া গিয়াছে যে, রক্ত হইতে সার শোষণ করিয়াও তাহা সহজে পূরণ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না এবং কোন স্থানে ব্যথা হইবার অর্থ এই যে, কাজ করিবার সময় সে স্থানের মাংসপেশী পরস্পরের সহিত ঘষড়াইয়া কতক পরিমাণে বিক্ষত হইয়াছে। এই দুইয়ের মধ্যে কোন অবস্থাই শরীরের পক্ষে উপকারী নহে। কাজেই বুঝিতে হইবে যে, যেমন তেমন পরিশ্রম করিলেই চলিবে না—প্রত্যেক অঙ্গের মাংসপেশীর ক্ষমতা বুঝিয়া তাহার দ্বারা সেই পরিমাণে কার্য্য করাইতে হইবে।

একটি বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, বুক চওড়া হওয়াটা খুব বাঞ্ছনীয়। আমরা যাহা বলিলাম তাহাতে এ কথারই সমর্থন করা হইয়াছে, কারণ, বুক চওড়া অর্থাৎ বুকের গহ্বর প্রশস্ত হওয়াতে ফুস্‌ফুসের সমস্তটা নিশ্বাসের দ্বারা ভরিয়া উঠিবার স্থান পায়, এবং সেই স্থানটা নিয়মিতরূপে অধিকার করিয়া থাকে; কাজেই যাহার বুক চওড়া তাহার রক্তও তেজাল এবং সেইজন্য শরীরও বলিষ্ঠ ইহা অনুমান করা যায়। কিন্তু বুক চওড়া করিবার উপায় সম্বন্ধে যে বিশ্বাস আছে তাহা ভুল। অনেকে মনে করে যে, ক্রমাগত হাতের পরিশ্রম করিলে, বিশেষতঃ যে গুলির দ্বারা বুকে চাড় পড়ে তাহার দ্বারাই ক্রমে বুক প্রশস্ত হইয়া উঠিবে—ইহাতে ক্রমে বুক পিঠের মাংসপেশীর অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হইয়া, বুকের ঘের মাপিতে কিম্বা দেখিতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইতে পারে সন্দেহ নাই, কিন্তু বুকের এরূপ বৃদ্ধিতে বিশেষ উপকার নাই এবং

উহা একপ্রকার শারীরিক বিকৃতির মধ্যে গণ্য হইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে বুকের গহ্বর প্রশস্ত না হইলে কোনই ফল নাই এবং ফুস্‌ফুসের উন্নতি না হইলে ইহা অসম্ভব। যত বড় জোয়ান লোক হোক্ না কেন, তাহার যদি ফুস্‌ফুসের কোন রোগ হয় তাহা হইলে তাহার বুকের ছাতি বসিয়া যাইবে এবং কোনপ্রকার ব্যায়ামের দ্বারা তাহার প্রতিকার করা অসম্ভব হইবে। যে সকল পরিশ্রমে সহজেই হাঁপ ধরে, যথা দৌড়াদৌড়ি, কোস্তাকুস্তি প্রভৃতি, তাহাতে হাত অপেক্ষা পায়েরই বেশীর ভাগ কার্য্য করিতে হয়।

এখন আমরা অনায়াসেই প্রচলিত ব্যায়ামের পদ্ধতিসকল সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া মোটামুটি তাহাদের আপেক্ষিক উপকারিতা স্থির করিতে পারি।

প্রথমতঃ জিম্‌ন্যাষ্টিক্‌স্‌কে অর্থাৎ প্যারালেল্-বার, হরিজন্টাল্ বার এবং ট্র্যাপীজের উপর যে সকল ব্যায়াম করা হয় উপকারিতা হিসাবে তাহাদিগকে সকল ব্যায়ামের অধম স্থান দিতে হয়। হাত দুটার দ্বারা সমস্ত শরীরের ভার বহন করাই জিম্‌ন্যাষ্টিক্সের একটা প্রধান অঙ্গ। ইহার দ্বারা যে শরীরের কোনপ্রকার উপকার পাওয়া যায় না তাহা নহে, তবে সেই উপকারের সঙ্গে অপকারও হয়। কারণ, ইহাতে কেবলমাত্র দেহের উপরিভাগের বৃদ্ধি হইয়া শরীরের গঠনের সৌন্দর্য্য কতকটা নষ্ট হইয়া যায়। শরীরের ভারবহনের জন্য প্রকৃতি মনুষ্যকে পা দুটো দিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে উপযুক্ত মাংসপেশীও দিয়াছেন। হাতের অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল মাংসপেশী দ্বারা সে কার্য্য করিলে তাহার ফল ভাল না হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নহে। তবে অবশ্য খুব অল্প পরিমাণে জিম্‌ন্যাষ্টিক্স্ করিয়া সেই সঙ্গে পায়ের কোন পরিশ্রম চালাইতে পারিলে আর বলিবার কোন কথা থাকে না।

ডম্বেল মুগুর-ভাঁজা প্রভৃতি ব্যায়ামে বেশীর ভাগ হাতের উপর জোর পড়ে, এবং হাঁটা ও দ্বিচক্র ত্রিচক্র গাড়ি-চালনাতে বেশীর ভাগ পায়ে জোর পড়ে, দুইয়ের উপযুক্ত সম্মিশ্রণ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইবার কথা।

কুস্তিতে অঙ্গবিশেষের প্রতি পক্ষপাতের দোষ দেওয়া যায় না কিন্তু উহাতে আর একপ্রকারের দোষ আসিয়া পড়ে। হাত দিয়া কোন জিনিষকে সজোরে ঠেলিতে গেলে দেখা যাইবে যে, পঞ্জরের উপর চাপটা আসিয়া পড়ে। পঞ্জর যদি দৃঢ়ভাবে এই চাপ না বহন করিতে পারে তাহা হইলে শরীরের ভিতরকার যন্ত্রসকলের অনিষ্ট হইতে পারে, সুতরাং দেখিতে পাওয়া যায় যে, সজোরে কোন কার্য্য করিতে হইলেই আমরা একটি দীর্ঘনিশ্বাস টানিয়া দম আটকাইয়া ধরিয়া চাপ বহন করিবার নিমিত্ত একটি হাওয়ার বালিশের মত প্রস্তুত করি। এইরূপ দম আটকানর দরুণ ফুসফুসের উপর চাপ পড়ে এবং যে রক্ত ফুসফুসের ভিতর পরিষ্কার হইবার নিমিত্ত আসিতেছিল তাহাকে এই চাপে ঠেলিয়া ফিরাইয়া দেয়। একপক্ষে ইহার দরুণ সমস্ত শিরায় চাড় পড়ে, বিশেষতঃ গলার এবং কপালের শিরা ফুলিয়া উঠে—অপরপক্ষে হৃৎপিণ্ড কার্য্যে বাধা পাইয়া দ্বিগুণবলে বাধা অতিক্রম করিবার চেষ্টা করে। এই অবস্থায় যদি কোন শিরা চাড় না সহিতে পারিয়া ছিঁড়িয়া যায় তাহা হইলে ত শরীরের বিশেষ ক্ষতি হয়, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে—কিন্তু তাহা না হইলেও হৃৎপিণ্ডের এইরূপ অতিরিক্তপ্রয়াসে ক্ষতি হয়। শরীরের অন্য কোন অঙ্গের মাংসপেশীর অতিরিক্ত খাটুনি হইলে, উহাকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে দিলেই, উহা রক্ত হইতে সার শোষণ করিয়া এবং নিজ ক্ষয়জাত

ঘূষিত পদার্থ দূর করিয়া ক্রমে স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থা ফিরাইয়া পাইতে পারে। কিন্তু হৃৎপিণ্ড বেশীক্ষণ বিশ্রাম করিলে ত কাজ চলে না। দুইবার স্ফীতির মাঝখানে যেটুকু সময় পায় তাহাতেই হৃৎপিণ্ড নিয়মিত খাটুনির যা ক্ষয় তাহা পূরণ করিয়া লইতে পারে কিন্তু অস্বাভাবিক রকম অতিরিক্ত পরিশ্রম হইলে হৃৎপিণ্ড ক্ষয়-পূরণের সময় পায় না। এক আধবার এইরূপ হইলে বিশেষ কুফল টের পাওয়া যায় না—কিন্তু কুস্তি করিতে গেলে কথায় কথায় শরীরের সমস্ত বলপ্রয়োগ করা আবশ্যক হইয়া পড়ে এবং আমরা যেরূপ অবস্থা বর্ণনা করিয়াছি তাহা প্রায়ই ঘটে। যৌবনাবস্থায় যতক্ষণ শরীরে বলের অভাব নাই ততক্ষণ কিছু বুঝা যায় না কিন্তু বয়স হইলে এইরূপ নিয়মিত অতিরিক্ত পরিশ্রম হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতার কারণ হইতে দেখা যায়।

ব্যায়ামের মধ্যে সাঁতার এবং দাঁড়টানাকে শ্রেষ্ঠপদ দেওয়া যাইতে পারে। এই দুইটাতেই সকল অঙ্গ নিজ নিজ শক্তি অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকে। তবে আমাদের দিশি ভাউলে কিম্বা পান্সীতে যেরূপ দাঁড়টানা হইয়া থাকে, তাহাকে, কি নৌকা চালান কি শরীরচালনা, কোন হিসাবেই আদর্শ দাঁড়টানা বলা যাইতে পারে না। কার্য্যটা ভালরকম করিয়া সম্পন্ন করিতে হইলে একটা খোলা ডিঙ্গির মাঝামাঝি খোলের মধ্যে পা দিয়া বসিয়া টানা উচিত। পা বাধাইয়া দিবার জন্য কাঠ থাকা চাই যাহাতে পা সরিয়া না যায়, কারণ, পায়ের দ্বারা বেশীর ভাগ কার্য্য করিতে হইবে। হাতকে কেবল দাঁড় তোলা ও ফেলা এবং জল হইতে উঠাইয়া সম্মুখ হইতে পশ্চাতে লইয়া যাইবার কার্য্যে নিযুক্ত রাখা উচিত। জলে বাধাইয়া টানিবার সময়ে বেশীর ভাগ শরীরের ভার এবং পায়ের জোরের উপর নির্ভর করিতে

হইবে। কেবলমাত্র হাত ছড়াইয়া দিয়া আবার বুকের নিশ্বাস টানিয়া আনাতে কোন ফল নাই। সমস্ত শরীর দিয়া টানা উচিত।

টেনিস ক্রিকেট ফুটবল প্রভৃতি খেলাগুলও অতি উত্তম ব্যায়াম। টেনিসে বাম হাত বাম যায় কিন্তু অন্য কোন সময়ে ডম্বেল বা মুগুরের দ্বারা সহজেই তাহার প্রতিকার করা যায়। ফুটবলে দুর্ব্বল লোকের পক্ষে পরিশ্রমটা হয় ত কিছু অতিরিক্ত হইয়া পড়ে। আমাদের দিশি খেলার মধ্যে কপাটিখেলাও ব্যায়াম হিসাবে উত্তম বটে, তবে একটু বয়স হইলে লোকে সহজে কপাটি খেলিতে রাজি হয় না।

যে সকল ব্যায়ামের নাম উল্লেখ করা হইল এ সমস্ত করিতে গেলে গায়ে কিছু না কিছু বল আবশ্যক। কিন্তু অনেক সময়ে এমনও দেখা যায় যে, কেহ কেহ নিতান্ত দুর্ব্বল শরীরের জন্য কোনপ্রকার ব্যায়াম করিয়া উঠিতে পারে না অথচ তাহার অভাবে শারীরিক স্ফূর্ত্তি হ্রাস হয়। এইরূপ অবস্থায় একেবারে নিরাশ হইবার আবশ্যক নাই। আমরা দেখিয়াছি যে, শারীরিক পরিশ্রমের উপকারিতার দুই অঙ্গ; ১। রক্তচলাচল, ২। দীর্ঘ নিশ্বাসপ্রশ্বাস। ইহার মধ্যে যদি কোনটাকে প্রাধান্য দিতে হয় তাহা দ্বিতীয়কেই দেওয়া উচিত, কারণ, রক্তের চলাচল ত কিছু-না-কিছু পরিমাণে হইয়াই থাকে, কিন্তু রক্তের শোধনভার নিশ্বাস লওয়ার উপরেই নির্ভর করিতেছে। সেইজন্য ঘরে বসিয়া দীর্ঘ নিশ্বাসপ্রশ্বাস অভ্যাস করিলে দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ হয়। প্রণালী সহজ। জোর করিয়া খুব গভীর নিশ্বাস টানিয়া কিছুক্ষণ আটকাইয়া আবার ধীরে ধীরে ছাড়িয়া দেওয়া—আমাদের শাস্ত্রে যাহাকে প্রাণায়াম বলে তাহা উহাতেও একই ফল পাওয়া যাইবে। যাহাদের ফুস্ ফুস্ আছে

তাঁহারা গান গাহিয়া আমোদ এবং উপকার একসঙ্গেই পাইতে পারেন।

নানাজাতীয় ব্যায়ামের ফলাফল মোটামুটি একপ্রকার দেখা হইল। কিন্তু এমন আরো কতকগুলি বিবেচনা করিবার বিষয় রহিয়া গেল। যাহারা দেহের স্থূলতা হ্রাস জন্য পরিশ্রম করিতে চায় এবং যাহারা ক্ষীণতা দূর করিবার জন্য পরিশ্রম করে, যাহারা নিয়মিত মস্তিষ্ক পরিচালনা-জনিত অবসাদ হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য ব্যায়ামচর্চ্চা করে এবং যাহারা আলস্য-জনিত জড়তা দূর করিবার জন্য ব্যায়াম করে ইহাদের সকলের এক-প্রকার পরিশ্রমের ব্যবস্থা সঙ্গত হইতে পারে না। এ বিষয়ে বারান্তরে বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব।

সৌন্দর্য্য মানবজীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। সৌন্দর্য্য উপভোগের ক্ষমতা জীবনের প্রধান সম্পত্তি। কেবল যে কবি-নামধেয় সম্প্রদায়বিশেষই সৌন্দর্য্য-মধুর অন্বেষণে ভ্রমরবৃত্তি হইয়া জীবনপাত করিতেছে, তাহা নিরপেক্ষভাবে বলা যায় না। কেন না, জগৎ হইতে তাহার সৌন্দর্য্যটুকু কোন প্রক্রিয়াবিশেষে অকস্মাৎ বাদ দিলে সম্পূর্ণ কাব্যরসবর্জ্জিত বিষয়ী লোকদিগের জন্যও দড়ি কলসী সংগ্রহ করা দুষ্কর হইয়া উঠে। সাংসারিক নিত্য সুখদুঃখের সহিত সৌন্দর্য্যতৃষ্ণার এমন প্রগাঢ় সম্পর্ক যে, বোধ করি, মনুষ্যমাত্রেরই জীবনকাহিনী বিশ্লেষণ করিলে সেই পিপাসার সফলতা বা নিষ্ফলতার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়।

সকলেরই জীবনকালে এমন একটি মুহূর্ত্ত দেখা যায়, যখন সে সুদূর বনপ্রদেশ হইতে সায়ংকালীন বংশীধ্বনি কর্ণাগত করিয়া চন্দ্রাপীড়ের ঘোড়ার মত সেই অনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি দিগ্বিদিক্ পথে ছুটিয়াছে, এবং হয় ত শেষ পর্য্যন্ত তাহার উদ্ভ্রান্ত জীবন চরম লক্ষ্যের ঠাহর না পাইয়া নিয়তিবশে কোনরূপ অচ্ছোদ সরোবরের সলিলতলে সমাধি লাভ করিয়াছে।

সৌন্দর্য্যপিপাসা মনুষ্যত্বের অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করি। এবং যাহার সৌন্দর্য্যপিপাসা জন্মে নাই, তাহার মনুষ্যত্বের প্রকোষ্ঠে পৌঁছিতে এখনও বিলম্ব আছে, অক্লেশে এরূপও নির্দ্দেশ করা যায়। নীরব বনস্থলীতে, চন্দ্রিকা-স্নাত শিলাতলে, মহাশ্বেতার সহিত উপবিষ্ট হইয়া অতীতের কাহিনী শুনিতে শুনিতে পুণ্ডরীকের মত চন্দ্রকরাহত হইয়া মরিতে যাহার অভিলাষ না জন্মে, আমার মতে সে ব্যক্তি নিতান্ত হতভাগ্য। জীবনের সত বস্তুটাকে কাব্য-রসের জন্য এরূপ অবলীলাক্রমে বিসর্জ্জন দিতে অনেকের আপত্তি থাকিতে পারে, কিন্তু মধুকরোদ্বেজিতা শকুন্তলার লীলাকমলের আঘাত পাইবার জন্য স্বয়ং মধুকরস্থলীয় হইতে কেহ যে বাসনা করেন না, ইহা সহজে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। বারুণীতীরে তরুশাখার অন্তরালে কোকিল ডাকিয়া ক্ষুদ্র একটি গৃহস্থ পরিবারে ভয়ানক নৈতিক বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল। এইরূপ নৈতিক বিপ্লবও যে, মনুষ্যসংসারে অসাধারণ ঘটনা তাহাও সহজে বিশ্বাস করিব না। সুতরাং সৌন্দর্য্যের সহিত মনুষ্যত্বের সম্বন্ধ; সুতরাং সৌন্দর্য্যপিপাসা মনুষ্যত্বের অঙ্গ।

মানুষ সৌন্দর্য্য চায় ও সৌন্দর্য্য পায়; অর্থাৎ প্রকৃতির খানিকটা অংশ মানুষের চোখে সুন্দর বলিয়া ঠেকে; অর্থাৎ প্রকৃতির বাকী অংশ অসুন্দর অথবা কুৎসিত বলিয়া বোধ হয়। খানিকটা

সুন্দর, কেন না বাকীটা কুৎসিত। খানিকটা কুৎসিত, কেন না বাকীটা সুন্দর। অর্থাৎ কুৎসিতের সহিত সমবায়ে, তাহার সহিত তুলনায় বাকীটা সুন্দর। কতকটা কুৎসিত না হইলে বাকীটা সুন্দর হইত না, অথবা সবটা সুন্দর হইলে সৌন্দর্য্য শব্দ নিরর্থক হইত। সুতরাং সুন্দরের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে কুৎসিতের অস্তিত্বও স্বীকার করিতে হইবে। একটকে ছাড়িয়া অন্যের অস্তিত্ব নাই। কোন্‌টা সুন্দর, আর কোন্‌টাই বা কুৎসিত; এটাই বা সুন্দর কেন আর ওটাই বা কুৎসিত কেন, এই প্রশ্ন সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া পড়ে। মানুষের মনের সহিত বহিঃপ্রকৃতির এমন সম্বন্ধ কেন, যে, মন খানিকটাকে সুন্দর বলিয়া বাছিয়া লয়, সেইটাকে আপনার করিতে চায়, সেইটার দিকে ধাবিত ও আকৃষ্ট হয় ও অবশিষ্টটাকে কুৎসিত বলিয়া পরিত্যাগ করে, তাহা হইতে দূরে রহে, তাহার সংসর্গ ছাড়িতে চায়; এই গভীরতর প্রশ্নও ইহার সঙ্গে উপস্থিত হয়। ইহাতে মানুষের লাভ কি? মানুষ এমন করে কেন? মানুষের এ প্রবৃত্তি কোথা হইতে ও কি উদ্দেশ্যে? কিসেই বা ইহার পরিণতি? বস্তুতই কি প্রকৃতির দুইটা ভাগ; একটা ভাগ সুন্দর, আর একটা ভাগ কুৎসিত; শুধু মানুষের পক্ষে নহে, মানুষ ভিন্ন অপর জীবেরও পক্ষে; শুধু মানুষ আর অপর জীব কেন, মানুষ ও ইতরজীব ছাড়িয়া যদি প্রকৃতির কোনরূপ নিরপেক্ষ সত্তা থাকে, তবে সেই নিরপেক্ষ অস্তিত্বের পক্ষে? উপস্থিত প্রবন্ধে এই প্রশ্ন কয়টির যথাসাধ্য আলোচনা করিব।

স্থূল সূক্ষ্ম হিসাবে সমুদয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে দুইটা ভাগ করিতে পারা যায়। এইরূপ শ্রেণীবিভাগের পূর্ব্বে সৌন্দর্য্য কথাটার অর্থ একটু বুঝা উচিত। উপরে যে সংজ্ঞা দিয়াছি,

মোটের উপর তাহাতেই কাজ চলিতে পারে। মানুষের মন যেটাকে টানিয়া রাখিতে চায়, যাহাতে সুখানুভব করে, সুখ বল, তৃপ্তি বল, আরাম বল, আনন্দ বল, এইরকম একটা অনুভূতি যাহার সংস্পর্শে উৎপন্ন হয়, তাহাই সুন্দর। আর মন যাহা হইতে দূরে থাকিতে চায়, দুঃখ বা তজ্জাতীয় কোনরূপ অনুভূতি যাহার পরিণাম, তাহাই কুৎসিত। সুতরাং সৌন্দর্য্যের সহিত সুখের ও কুৎসিতের সহিত দুঃখের সম্বন্ধ। আবার সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখপরিহারের অধ্যবসায় ও ধারাবাহিক চেষ্টাকেই যদি জীবন বল, তাহা হইলে সৌন্দর্য্যপিপাসা জীবনের অঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়।

এই সৌন্দর্য্যের খানিকটা স্থূল, খানিকটা সূক্ষ্ম। মধুর রস, মধুর গন্ধ, মধুর শব্দ, স্পর্শ ও দর্শনে যে সঙ্গে সঙ্গে তৃপ্তি জন্মে, মনুষ্যমাত্রই অথবা সুস্থস্বভাব মনুষ্যমাত্রই যাহা প্রায় সমভাবে সমপরিমাণে উপভোগ করিতে সমর্থ, তাহাকে স্থূলের মধ্যে ফেলা যায়। মিষ্টভোজনে প্রায় সকলেরই সমান তৃপ্তি জন্মে; ইহাতে বড় মতভেদ দেখা যায় না। মানুষেতর জীবও ন্যূনাধিক পরিমাণে এই তৃপ্তির ভাগী, এই স্থূল সৌন্দর্য্য উপভোগে সমর্থ। ইহা জীবনমাত্রেরই, অন্ততঃ অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবনমাত্রেরই নিত্য ভোগ্য। ইহা নহিলে জীবনযাত্রা চলে না। সুতরাং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে ইহার উদ্ভব বেশ বুঝা যায়। দেহরক্ষার জন্য জড়জগৎ হইতে কতকগুলা মালমস্‌লা বাছিয়া লইতে হয়, কতকগুলাকে বাছিয়া ত্যাগ করিতে হয়; কতকগুলা প্রাকৃত শক্তি দেহের ও জীবনের স্থিতি, পুষ্টি ও অভিব্যক্তির অনুকূল, কতকগুলা প্রতিকূল। সুতরাং কতকগুলা স্পৃহার সহিত গ্রহণ করি, কতকগুলা দূরে রাখি, নতুবা জীবন চলিত না।

সুতরাং মিষ্টরস, কোমল শয্যা, স্নিগ্ধ সমীরণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থ, ইন্দ্রিয়-গ্রহণ সময়েই যাহাদের দ্বারা তৃপ্তি বা আরাম উৎপন্ন হয়, নিত্য জীবনযাত্রার নিমিত্ত যাহারা উপযোগী, তাহাদিগকে এই স্থূল শ্রেণীতে ফেলা চলে। জীবনের জন্য ইহাদের দরকার, কাজেই ইহাদের ভাল লাগে; সুতরাং মানুষের প্রবৃত্তির সহিত ইহাদের সম্বন্ধ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ক্রিয়াজনিত তাহাও বুঝা যায়। লঙ্কা অথবা কুইনাইন্ যদি রসনাপ্রিয় হইত, তাহা হইলে জীবনরক্ষা একটা বিকট ব্যাপার ঘটিয়া উঠিত সন্দেহ নাই।

ইহা ছাড়া আর এক শ্রেণীর সৌন্দর্য্য আছে তাহাকে সূক্ষ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা চলে। মানুষ ভিন্ন ইতরজীবের এই সৌন্দর্য্য-ভোগের শক্তি আছে কি না সন্দেহস্থল। এই সৌন্দর্য্যের উপভোগ মানুষের স্পেসিয়াল্ প্রিভিলেজ। মানুষের মধ্যেও সকলে সমানভাবে বা সমানমাত্রায় ইহার উপভোগে অধিকারী নহে। দৈনন্দিন জীবিকানির্ব্বাহের জন্য ইহার অধিক উপযোগিতা আছে সাহস করিয়া বলা চলে না। এই সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য উপভোগের প্রবৃত্তি বা শক্তি কবিশ্রেণীস্থ মনুষ্যের বিশেষরূপে পরিস্ফুট। সাংসারিক বা বৈষয়িক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কবিশ্রেণীস্থ মনুষ্যের যেরূপ অপবাদ প্রচলিত আছে, তাহাতে ইহাকে জীবিকার্জ্জনের প্রতিকূল বলিয়াই বরং বোধ হয়। ইংরাজীতে যাহাকে আর্ট বলে, এই সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি ও প্রকাশই তাহার অবলম্বন ও বিষয়। এবং মানবমনের যে অংশটা ইহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহার ইংরাজী নাম ঈস্থেটিক বৃত্তি। জীবিকার সহিত সম্বন্ধের এইরূপ অভাব বলিয়াই এই বৃত্তিটার তাৎপর্য্য ও অভিব্যক্তি ভাল বুঝা যায় না। এই সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত।

প্রথমে এই প্রশ্ন আইসে, এই সৌন্দর্য্য কিসের ধর্ম্ম? ইহা কি পদার্থবিশেষেরই প্রকৃতিনিহিত ধর্ম্ম, অথবা মনুষ্যের মনেরই একটা সৃষ্টি, কল্পনা বা কারিগরি? বস্তুতঃ এমন দেখা যায় শ্যাম যাহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ, রাম তাহাতে সৌন্দর্য্যের কণিকামাত্র দেখেন না। আমার নিকট যাহা সুন্দর, তোমার কাছে হয় ত তাহা কুৎসিত। মদস্রাবী হস্তীর শুণ্ডাস্ফালন দর্শনে অথবা গিরিগুহার অভ্যন্তরে বীচকধ্বনি শ্রবণে কালিদাস যে আনন্দ অনুভব করিতেন, তাহাতে যে সকলেই সহানুভূতি দেখাইবেন এইরূপ প্রত্যাশা করা যায় না; সৌন্দর্য্য বিষয়ে মনুষ্যের রুচিগত তারতম্য ফেলিবার নহে। উজ্জয়িনীর রাজপথে তামাসা উপস্থিত হইলে কালিদাসের নয়ন তামাসা ফেলিয়া পার্শ্বস্থ সৌধবাতায়নের প্রতি ঊর্দ্ধমুখে ধাবিত হইত; স্নানান্তে আর্দ্রবস্ত্রপরিহিতা যুবতীর সন্দষ্টবস্ত্র অবয়বের প্রতি তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল; এবং তাঁহার স্নানচক্ষু জলদময়ী তিরস্করিণীর আবরণ ভিন্ন করিয়া গুহাস্থিতা কিন্নরীর নগ্নদেহের দিকে বিবর্ত্তিত হইত। কিন্তু কালিদাস একালে আমাদের সংস্কৃত কালেজের ছাত্র হইলে পাশের ঘরে পুরিয়া যথাবিধানে তাঁহার হায়ার ট্রেনিংএর ব্যবস্থা করা যাইত সন্দেহ নাই। আবার বিশ্বাসঘাতী নিষ্ঠুর সংসার কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত মানসিক উপপ্লবে উদ্ভ্রান্ত জরাক্রান্ত রাজা লীয়রকে আঁধারে অসহায়ে প্রান্তরমধ্যে ভতোধিক বিশ্বাসঘাতী ও নিষ্ঠুর জড়-প্রকৃতির উপপ্লবে উৎপীড়িত দেখিয়া জগৎরূপী পেষণযন্ত্রের অনির্দ্দেশ্য আবর্ত্তন-প্রণালীর ঠাহর না পাইয়া স্তম্ভিত হইবার ক্ষমতা যে সকলের জন্মিয়াছে তাহা বলা যায় না।

সুতরাং সুন্দরের সৌন্দর্য্য যে, তাহার স্বভাবসিদ্ধ প্রকৃতিগত ধর্ম্ম, তাহা সকল সময়ে বলা চলে না। যিনি সৌন্দর্য্য ভোগ

করিবেন, তাঁহার অনুভূতির তীক্ষ্ণতার উপরে সৌন্দর্য্যের মাত্রা নির্ভর করে। অমুক পদার্থটাকে সুন্দর বলিবার আমারও যে পরিমাণ দাওয়া আছে, তোমারও কুৎসিত বলিবার সেই পরিমাণ দাওয়া আছে। এ বিষয়ে যে তোমাকে আইনানুসারে বাধ্য করিতে পারি, তাহা বোধ হয় না। তথাপি দেখা যায়, কতকগুলি পদার্থ এমন আছে, যাহারা সুস্থপ্রকৃতি মানুষের মধ্যে অধিকাংশের কাছেই সুন্দর বলিয়া ঠেকে। যেমন পাখী, প্রজাপতি, ফুল। প্রশ্ন এখন এই—কি গুণে ইহারা সুন্দর; ইহাদের সৌন্দর্য্যে আমাদের লাভ কি?

প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া বড় সহজ নহে। বেইন্ সাহেবের বই খুলিলেই পঞ্চাশ রকম সৌন্দর্য্যতত্ত্বের বিশপাতা বিবরণ পাওয়া যায়; কিন্তু তার মধ্যে একটাও তৃপ্তিকর নহে। আজকাল আমাদের একটা রোগ জন্মিয়াছে, কোন একটা কিছুর উৎপত্তি ও অভিব্যক্তির ব্যাখ্যা দরকার হইলে তৎক্ষণাৎ ডারুয়িনের কাছে ছুটিয়া যাই। কিন্তু ডারুইন্‌ও এখানে বড় ভরসা আপাততঃ দেন না। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের মূলমন্ত্র একটা মাত্র কথা। যাহা জীবিকার উপযোগী, যাহাতে কোন-না-কোন রূপে জীবনের সাহায্য করে, তাহাই প্রকৃতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া অভিব্যক্ত ও পরিপুষ্ট হয়। কিন্তু উপরে দেখিয়াছি সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যের সহিত জীবনযাত্রার সম্বন্ধ বড় ঘনিষ্ঠ দেখায় না। কেন না, সাংসারিক বিষয়ে কাব্যরসপিপাসু বড় দুর্ভাগ্য জীব। শীতল সরবতের প্রতি অনুরাগ জীবনরক্ষার উপযোগী বুঝা যায়, কিন্তু ধবলগিরিতে মাহাত্ম্য না দেখায় বিশেষ কিছু আসে যায় না।

ডারুইন বলেন ফুলের রূপ ও প্রজাপতির রূপ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে উৎপন্ন। প্রজাপতি পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে পরাগ-

রেণু বহন করিয়া পুষ্পিত বৃক্ষের বংশরক্ষা ও জাতিরক্ষা করিয়া থাকে। ফুলের রঙে ও রূপে প্রজাপতি আকৃষ্ট হয়, তাই যে ফুলের যত রূপ, তাহার বংশরক্ষা পক্ষে জীবনসংগ্রামে তত ই সুবিধা। কাজেই সুন্দর ফুলের ক্রমশঃ অভিব্যক্তি। আবার নিরীহ প্রজাপতির শত্রুসংখ্যা অনেক; ইহাদের সৌন্দর্য্যবৃত্তি এমনই অপরিস্ফুট যে, এতটা সৌন্দর্য্যকে একবারে উদরসাৎ করিবার জন্য ইহারা বিশেষ লালায়িত। এবং এই সকল শত্রুদের সহিত সম্মুখসমরে দাঁড়ানও নিরীহ প্রজাপতি-জীবনের পক্ষে বিশেষ আশাপ্রদ নহে। তাই প্রজাপতি ফুলের গায়ে গা দিয়া ফুলের সঙ্গে মিশিয়া ফুলের রূপের ভিতর নিজের রূপ লুকাইয়া কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষা করে। কাজেই ফুল এদিকে যেমন সুন্দর, প্রজাপতির কোমল দেহও তেমনি সুন্দর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই হিসাবে ফুলের রূপের সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি, প্রজাপতির সৌন্দর্য্যের সৃষ্টিকর্ত্তা ফুল। উভয়ে উভয়ের রূপরাশি ক্রমেই ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

উভয় উভয়ের সৌন্দর্য্য ফুটাইয়াছে স্বীকার করিতে পারি। কিন্তু আমরা যেমন ফুলের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হই, প্রজাপতিও যে তেমনি রূপমুগ্ধ হইয়া আকৃষ্ট হয়, এতটা স্বীকার করিতে পারি না। ফড়িং জাতির সৌন্দর্য্যবৃত্তির এতটা তীক্ষ্ণতা স্বীকার করিতে বড়ই নারাজ হইতে হয়। ফড়িং জাতি একঘেয়ে শাদা কালোর চেয়ে রঙের বৈচিত্র্য দেখে, তা সে রঙ লবঙ্গ সাহেবের কাঁচেই থাক্, আর কেরোসীন্-দীপের শিখাতেই থাক্; এই পর্য্যন্ত বুঝা যায়। এবং রঙ্‌দার পুষ্পবিশেষের নিকট গেলে মধুসঞ্চয়টাও ঘটিয়া থাকে, এইপর্য্যন্ত জ্ঞানের জন্য প্রজাপতিকে বাহাদুরী দিতে পারি। পুষ্পদেহে আর মক্ষিদেহে বর্ণবৈচিত্র্য

বিকাশের ব্যাখ্যার জন্য ইহার বেশীও আবশ্যক নহে। কিন্তু এইরূপ বর্ণবৈচিত্র্যের সমাবেশ মানুষের চোখে কুৎসিত না লাগিয়া সুন্দর লাগে কেন, এ কথার উত্তর পাওয়া গেল না।

আর একটা কথা আছে—যৌননির্ব্বাচন। ডারুইন সাহেবই ইহারও প্রবর্ত্তক। সিংহের কেশর, পাখীর কাকলি, ময়ূরের পুচ্ছ, এ সমস্তই সুন্দর; এবং এ সমস্তই যৌননির্ব্বাচনে অভিব্যক্ত। স্ত্রীজাতি সুন্দর পুরুষ বাছিয়া লয়; ফলে বংশপরম্পরায় সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয়। পারাবত যখন তাহার বিস্ফারিত নীলকণ্ঠ আনম্র উন্নম্র করিয়া, চারুপুচ্ছ নর্ত্তিত করিয়া, কান্তাধ্বনিতের অনুকরণ করিয়া পারাবতীর নিকট নাচিতে থাকে; তখন সে জানে না যে, সে প্রকৃতির নিয়োগে মানুষের জন্য সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে নিযুক্ত হইয়াছে। যৌননির্ব্বাচন মানিয়া লইলে জীবজগতে সৌন্দর্য্যের উদ্ভব অনেকটা বুঝা যায়; কিন্তু কপোত ও কুক্কুট জাতির পক্ষে এত সূক্ষ্ম রূপানুভূতি মানিয়া লওয়া একটু গায়ের জোর বলিতে হইবে। সম্প্রতি ওয়ালাস্ সাহেব যৌননির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন। তিনি প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের বলেই এ সমুদয়ের উদ্ভব বুঝাইতে চাহেন। সুতরাং ডারুইনের মত এখনও অসংশয়িত চিত্তে গ্রহণ করিতে সাহস হয় না। গ্রহণ করিলেও মূলকথার ব্যাখ্যা হইল না। ময়ূর পুচ্ছ বিস্তার করিয়া ময়ূরীর নিকট বাহবা লইতে পারে; কিন্তু মানুষের তাহাতে কি আসিয়া যায়? মানুষের চোখে ময়ূরপুচ্ছ সুন্দর লাগে কেন? ময়ূরপুচ্ছের উজ্জ্বল বর্ণসমবায়ে কি মাহাত্ম্য আছে যে, এত তৃপ্তি জন্মে?

আধুনিক মনোবিজ্ঞান সৌন্দর্য্যতত্ত্ব যেরূপে বুঝায়, তাহা এইরূপে সংক্ষেপে বিরচিত করা যাইতে পারে। অনুভূতির বৈচিত্র্য-পরম্পরা লইয়া চৈতন্য বা চিৎ-প্রবাহ। সমস্ত অনু-

ভূতিগুলি একরকমের হইলে তাহাদের পরস্পরাকে চৈতন্য বলা যাইত কি না সন্দেহ। অনুভূতির মধ্যে পরস্পর যত পার্থক্য, বৈচিত্র্য বা বিশিষ্টতা, চৈতন্যও তত বিকসিত ও পরিস্ফুট। সুতরাং মানুষের অস্তিত্বের, অর্থাৎ মানুষের চৈতন্যের অস্তিত্বের অর্থই এই যে, অনুভূতিগুলা এক নহে। পঞ্চাশ রকম বিভিন্ন শব্দ-স্পর্শ-গন্ধের সমবায়ে জগতের যে দৃশ্যপট, তাহা ক্ষণে ক্ষণে বদলাইয়া নূতন শব্দ, নূতন স্পর্শ, নূতন গন্ধ সম্মুখে আনিতেছে, তাহাতেই চৈতন্যের ধারাবাহিক স্রোত একটানে চলিয়াছে। চৈতন্যের অস্তিত্বের সঙ্গে বৈচিত্র্যের এমন সম্বন্ধ; সুতরাং যেখানে চৈতন্য আছে, সেখানে বৈচিত্র্যও আছে। যেখানে বৈচিত্র্য পরিস্ফুট, চৈতন্যও সেখানে সম্যক্ বিকসিত। সেইখানেই রূপ ও সেইখানেই সৌন্দর্য্য। আবার অনুভূতির আকস্মিক পরিবর্ত্তন জীবনের পক্ষে শুভ নহে; ধীরে ধীরে ক্রমে পরিবর্ত্তন ঘটিলেই কল্যাণ, নতুবা জীবনের শৃঙ্খল অনেক সময়ে ছিঁড়িয়া যায়। পরিবর্ত্তনের ঘাতপ্রতিঘাতে জীবনের গ্রন্থি আল্‌গা হইয়া পড়ে। কাজেই আকস্মিক বা অতিমাত্র কিছুই ভাল লাগে না।

সুতরাং সৌন্দর্য্যের এক অঙ্গ অনুভাবের চৈতন্য আর পরিবর্ত্তনের আকস্মিকতার অভাব। আবার যাহার সহিত জীবনের স্থিতি ও পুষ্টির কোনরূপ সম্বন্ধ আছে, যাহা স্বাস্থ্যের অনুকূল, যাহাতে জীবনসংগ্রামে আমাদের ভীতির ভাব কোনরূপে কমাইয়া দেয়, তাহারই প্রতি মন স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হয়; তাহাই দেখিতে ভাল লাগে। যেমন সুগঠিত বলিষ্ঠ নরদেহ; যেমন স্বাস্থ্যশোভাসম্পন্ন আরক্তিম যুবতীর গণ্ডদেশ; যেমন দৃঢ়মূল ছায়াবিস্তারী মহীরুহ; যেমন দৃঢ়ভিত্তি সৌষ্ঠবসম্পন্ন অট্টালিকা।

সৌন্দর্য্যের আর একটা অঙ্গ সহানুভূতি। শুধু আমার চোখে যাহা ভাল লাগে তাহা সুন্দর; আবার যাহা আমার চোখে, তোমার চোখে, অপরের চোখেও ভাল লাগে, তাহা আরও সুন্দর। মানুষের কতকগুলা বৃত্তি আত্মপুষ্টির অভিমুখী, আত্মপুষ্টির উদ্দেশ্যে অভিব্যক্ত। কতকগুলা সমাজপুষ্টির অভিমুখী, তদুদ্দেশ্যে অভিব্যক্ত। এই সামাজিক পরার্থবৃত্তিগুলি উন্নত মনুষ্য-প্রকৃতির প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহাতে এই বৃত্তিগুলিকে জাগাইয়া দেয়, উত্তেজিত করে, ইহাদের প্রবলতা ও তীক্ষ্ণতা সাধন করে সেগুলি আরও সুন্দর। দয়া মায়া স্নেহ প্রণয় প্রভৃতি সামাজিক বৃত্তিগুলি যতই ফুটিয়া উঠে, ততই সমাজের কল্যাণ। সেইজন্য যে সকল পদার্থ দয়া মায়া প্রণয়াদি বৃত্তির উত্তেজক ও পরিপোষক তাহারা অতি সুন্দর।

আর অধিক বলার প্রয়োজন নাই। সংক্ষেপে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে। যাহাতে চৈতন্যের প্রবাহ স্থিরবেগে মন্দ-গতিতে চালিত রাখে তাহা সুন্দর; যাহাতে জীবনে ভরসা দেয়, প্রাকৃতিক প্রতিকূল শক্তির সম্মুখে আত্মাকে ম্রিয়মাণ হইতে নিষেধ করে তাহা সুন্দর; আর যাহাতে পাঁচের মনে সমান প্রীতি জন্মাইয়া মনে মনে জড়াইয়া দেয়, পরার্থবৃত্তিগুলিকে জাগ্রত ও উত্তেজিত রাখিয়া সমাজজীবনকে অগ্রসর করে তাহা আরও সুন্দর। এই হিসাবে জীবনরক্ষার সহিত সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধ; শুধু আমার জীবনের রক্ষা নহে, তোমার জীবনের এবং সমগ্র সমাজজীবনের রক্ষার সহিত ইহার সম্বন্ধ। সুতরাং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন এই সৌন্দর্য্য অনুভূতির জনক ও বিকাশক।

এইরূপে ব্যাখ্যার পথে কয়েক পা অগ্রসর হওয়া যায় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ ঘটে না। যখনই মনে করা যায় সৌন্দর্য্য জীবনরক্ষক, তখনি নিতান্ত ইউটিলিটির ভাব আসিয়া পড়ে, সৌন্দর্য্যের সুন্দরতা দূর হয়। সৌন্দর্য্যে এমন একটা জিনিস আছে, যাহার উপভোগে কেবল তৃপ্তিমাত্র, সুখমাত্র; ফলাফল চিন্তা, ইউটিলিটি চিন্তা, ভবিষ্যৎ চিন্তা, জীবনমরণ চিন্তা যাহাকে কলুষিত করে না; যাহা বিশুদ্ধ নিরপেক্ষ নির্ম্মল সুখ বই আর কিছুই নহে। সুতরাং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে কিরূপে ইহার উৎ

পত্তি তাহা সমস্যাই থাকিয়া যায়। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের কাছে সদুত্তর মিলে না।

আমার বিবেচনায় প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনকে আর একটু চাপিয়া ধরিলে কতকটা পরিষ্কার হইতে পারে। প্রকৃতি একভাবে আমার বিরুদ্ধে ও সমাজের বিরুদ্ধে খড়্গহস্তে দণ্ডায়মানা,—নির্ম্মমা, নিষ্ঠুরা, দয়ালেশবিবর্জ্জিতা। আবার প্রকৃতি অন্যভাবে আমাকে ও সমাজকে সেই খড়্গাঘাত হইতে বাঁচাইবার জন্য ব্যাকুলা ও ব্যতিব্যস্তা। কেন এমন তাহা বলা যায় না, কিন্তু ইহা একটি সত্য, ইহা মানিতে হয়, না মানিলে চলে না। ইহাতেই আমার নিজত্বের আর ইহাতেই সমাজের অভিব্যক্তি। ইহার ফলেই আমি সেই খড়্গাঘাত হইতে দূরে থাকিতে ক্রমশঃ শিখিতেছি; ক্রমেই আমার জ্ঞানবিকাশ, বুদ্ধিবিকাশ, ধর্ম্মবিকাশ ঘটিতেছে। আমার অনুভূতি ক্রমেই তীক্ষ্ণ হইতে তীক্ষ্ণতর হইতেছে। অনুভূতি, অর্থাৎ দুঃখের অনুভূতি। দুঃখের অনুভূতি, অর্থাৎ প্রকৃতি-হস্তের খড়্গপাতের আশঙ্কা। এই অনুভূতি যাহার তীক্ষ্ণ নহে, খড়্গপাতের আশঙ্কা যাহার নাই, সে জীবনসমরে আত্মরক্ষায় সমর্থ নহে, তাহার জীবনের ভরসা নাই *। যাহার এই আশঙ্কা প্রবল, এই অনুভূতি প্রবল, তাহারই মোটের উপর জীবনের ভরসা অধিক। সেই ব্যক্তি সংগ্রামে কিছুদিন বাঁচিতে পারিবে। সম্মুখযুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিবে বলা যায় না; ভয়াকুল মৃগের ন্যায়, শঙ্কামাত্রসম্বল শশকের ন্যায় শত্রু হইতে পলাইয়া লুকাইয়া কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষণে সমর্থ হইবে মাত্র। সুতরাং জীবনে দুঃখানুভূতির বিকাশ; সুতরাং জীবন দুঃখময়। জীবপর্য্যায়ে যে যত উন্নত, সে তত দুঃখী; সে তত দুঃখ আহরণে, দুঃখ অন্বেষণে, দুঃখ উপভোগে নিযুক্ত। সমাজের ইতিহাস, সভ্যতার কাহিনী ইহার সাক্ষী।

জীবন দুঃখময়; কেন না, দুঃখময়তাতেই জীবনের উন্নতি ও ভরসা। আবার জীবন দুঃখময় সেইজন্যে জীবনে সুখের আব-

* প্রাকৃত শক্তির অত্যাচার কেবল ব্যক্তিজীবনের উপর নহে; সমাজ-জীবনের উপরেও সমভাবে বিদ্যমান। আবার সমাজরক্ষা না হইলে ব্যক্তি-জীবন রক্ষা হয় না, সুতরাং পরের দুঃখেও সহানুভূতি প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে।

শ্যকতা। নহিলে দুঃখের ভারে জীবন টিকিত না; নাহিলে প্রকৃতির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইত। প্রকৃতির এ কি রকম খেয়াল বুঝা যায় না; কিন্তু প্রকৃতির খেয়াল এইরূপ। মন্দ করিয়া প্রকৃতি ভাল করে, ভাল করিবার জন্য প্রকৃতির মন্দ ব্যবহার; মানুষের প্রতি দয়াবশতঃ প্রকৃতি এত নিষ্ঠুর। প্রকৃতির চরম উদ্দেশ্য কি বলা যায় না; কবিশ্রেষ্ঠ টেনিসন্ দেখিতে পান নাই, আমরাও পাই না; কেন না, যখনই দেখি ভাল, তখনই পরক্ষণে দেখি মন্দ। সুতরাং খেয়াল বা লীলা বলিয়াই নিরস্ত থাকিতে হইবে।

জীবন দুঃখময়, তাই মানুষে সুখ খুঁজিয়া বেড়ায় ও সুখ পায়। সুখ না পাইলে ধরাধামে মানুষ টিকিত না। সুখের মাত্রা অধিক কি দুঃখের মাত্রা অধিক, সে কথা আর তুলিব না। তাহার ঠিক উত্তর নাই। তবে ইহা স্বীকার্য্য যে, খুঁজিলে সুখ মিলে, অন্ততঃ মানুষ সুখের অন্বেষণ করিয়া বেড়ায় এইটা তাহার জীবনের একটা কাজ, এবং অগত্যা সুখের সে সৃষ্টি করে। যে যত উন্নত তাহার তত দুঃখ; তাহার তত সুখের দরকার; নহিলে তাহার জীবন চলে না; মোটের উপর সে তত সুখ খুঁজিয়া পায়। দুঃখের অনুভূতি যাহার তীক্ষ্ণ তাহার নাম কবি; কাজেই মোটের উপর কবির সুখের অনুভূতিও প্রবল। সুখের জন্য যে কতকগুলা সামগ্রী নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা নহে। অমুক অমুক পদার্থগুলাই সুখ দিবে, সুন্দর দেখাইবে, এমন নয়। মানুষ সম্মুখে যাহা পায় তাহা হইতে সুখ টানিয়া আনিতে চেষ্টা করে। দ্রব্যাদ্রব্য বড় বিচার করে না; যেখানে সেখানে যখন তখন সুখের আবিষ্কার করে, সৌন্দর্য্যের আবিষ্কার করে। কতকগুলা পদার্থ আছে বটে, যাহাতে সাধারণ মানুষে কিছু-না-কিছু সুখ পায়, কিছু-না-কিছু সৌন্দর্য্য দেখে; উপরে তাহাদের উল্লেখ করিয়াছি। এই পদার্থগুলা কোন-না-কোন রূপে জীবনরক্ষার পক্ষে অনুকূল, আশাপ্রদ। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে এ সাধারণ নিয়ম খাটে না। তাহাদের সুখের বড়ই দরকার; তাই যাহা তাহা হইতে সুখ আকর্ষণ করে। তাহা জীবনের উপযোগী কি জীবনের অন্তরায়, তাহা বিচার করিবার অবকাশ থাকে না। বিনা

বিচারে তাহাকে মনের মত গড়িয়া লয়, তাহাতে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে। জীবনের পথে চলিতে চলিতে দু চোখে যাহা দেখে, তাহাই প্রীতির চসমা পরিয়া সুন্দর করিয়া দেখিয়া লয়; কেন না, সৌন্দর্য্যই তাহার পক্ষে আবশ্যক; বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যই তাহার অবলম্বন, বিশুদ্ধ সুখই তাহার উদ্দেশ্য। যাহা বুঝিতে পারে তাহাতে আনন্দ পায়; যাহা বুঝে না তাহাতেও আনন্দ পায়। অনেক সময় যাহা বুঝা যায় তার চেয়ে যাহা বুঝা যায় না তাহাতে আনন্দ বেশী হয়। ফলহিসাবে এটা একটা সমস্যা। বিজ্ঞানবিৎ জগৎযন্ত্রের জটিলতা উদ্‌ঘাটন করিয়া যতই কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলার আবিষ্কার করেন, আবিষ্কৃত নিয়ম-প্রণালীকে যতই মনুষ্যজীবনের সহায় করিয়া তুলেন, এক কথায় জগতের রহস্যকে যতই বুঝিতে চেষ্টা করেন ও বুঝেন, ততই তিনি আনন্দ পান, সৌন্দর্য্য অনুভব করেন। আবার সেই দুর্ভেদ্য রহস্যের যে ভাগটা কোন মতে আয়ত্ত হয় না, কোন মতে নিয়মের বশে আসে না, সে ভাগটা আরও সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আমরা সাধারণ মানুষে, যেটা বুঝি তাহাতে বিশেষ আরাম পাই, আবার যেটা বুঝি না, তাহাতে সময়ক্রমে আরও আরাম পাই। * অনেকের মতে বৈজ্ঞানিক জগতের রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া সৌন্দর্য্যের বিনাশে নিযুক্ত। যাই হউক মানুষের সৌন্দর্য্য ও তদনুভবজাত সুখ লইলে মানুষের জীবনযাত্রা দুঃসাধ্য হয়; তাহাতেই মানুষের এই সৌন্দর্য্য-সৃজনে ক্ষমতা।

---

* রামচরিত্রে সীতা নির্ব্বাসন অনেকের চোখে ভাল লাগে না। বিশেষতঃ আমাদের মত ইংরাজীওয়ালাদের কাছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত রামচরিত্রের প্রতি এ কারণে কটাক্ষ করিতে ছাড়েন নাই। রামচরিত্রের এইটুকু ভাল বুঝা যায় না; এবং আমার বিবেচনায় এইজন্যই ইহা সুন্দর। সমাজশক্তির প্রতিঘাতে মহৎ ব্যক্তির জীবনে সময়ে সময়ে এমন একটা বিপ্লব উপস্থিত করে, তাহাতে তাঁহার জীবন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যায়। সামাজিক জীবনের এই একটা দুর্ভেদ্য সুতরাং সুন্দর রহস্য। বাসন্তী দেবী রামকে সম্মুখে পাইয়া যথেচ্ছ তিরস্কার করিয়াছেন; কিন্তু তিনিই আবার রামচরিত্রের এইটুকু বুঝিতে না পারিয়া বলিয়াছেন;—

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো ন জানাতি মহর্ষি।

সৌন্দর্য্যতত্ত্বের আলোচনায় এই কয়টি কথা পাওয়া গেল।

(১) জীবের মধ্যে মনুষ্য সূক্ষ্মসৌন্দর্য্যভোগে অধিকারী।

(২) সকলের আবার সৌন্দর্য্যপিপাসা ও সৌন্দর্য্যভোগ শক্তি সমান নহে। ইহা অপেক্ষাকৃত উন্নত প্রকৃতির লক্ষণ।

(৩) বৈচিত্র্যের সমাবেশে ও পরম্পরায় চৈতন্যের অস্তিত্ব। সুতরাং এরূপ বৈচিত্র্যের আদর।

(৪) কতকগুলি পদার্থ কোন-না-কোন রূপে জীবনের ও স্বাস্থ্যের অনুকূল। কতিপয় পদার্থ জীবনসমরে ভীতি ও নৈরাশ্য দূর করিয়া আশা ও প্রফুল্লতা আনে। কতকগুলি মুখ্য বা গৌণভাবে জাতীয় জীবন বা সমাজ জীবনের অনুকূল, সহানুভূতি ও পরার্থবৃত্তির উদ্দীপক। ইহারা সুন্দর।

(৫) কিন্তু অনেকস্থলে ব্যক্তিজীবন বা জাতীয় জীবনের স্থিতি বা পুষ্টি বিষয়ে কোনরূপ আনুকূল্য করে না, অথচ অনেকের নিকট সুন্দর, এমন পদার্থ দেখা যায়। ইহারা সুন্দর কেন, স্থির করা দুষ্কর।

(৬) মানুষ্যের অভিব্যক্তির সহিত দুঃখবৃত্তি ফুটিয়া আসিতেছে। নিজের জন্য শঙ্কা ও পরের জন্য দয়া ইহার মূল। এই দুঃখ-বৃত্তি ব্যক্তিজীবন ও জাতীয় জীবনরক্ষার অনুকূল।

(৭) দুঃখের উৎপত্তির সহিত সুখের উৎপত্তি না ঘটিলে মনুষ্য-জীবন বা উন্নত মনুষ্যজীবন টিকিত না। তাই যেখানে সেখানে সুখ কুড়াইয়া পাইবার ক্ষমতা মানুষের জন্মিয়াছে। কোথা সুখ পাইবে কোথা পাইবে না, তাহার লক্ষণ নির্দ্দেশ করা সর্ব্বত্র চলে না। যেখানে সুখ বা আনন্দ পাওয়া যায়, তাহাই সুন্দর। সাধারণতঃ যাহাদের দুঃখ-বৃত্তি প্রবল, তাহারাই অধিক সুন্দর জিনিস দেখিতে পায়। দুঃখের ন্যায় সুন্দর সামগ্রী বোধ করি দ্বিতীয় নাই।

(৮) এই হিসাবে সৌন্দর্য্য মানুষের মনে, বস্তুবিশেষে নহে; এবং এই হিসাবে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনই জগৎকে সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে।

ভরা ভাদরে।

নদী ভরা কূলে কূলে, ক্ষেতে ভরা ধান।
আমি ভাবিতেছি বসে কি গাহিব গান!
কেতকী জলের ধারে
ফুটিয়াছে ঝোপে ঝাড়ে,
নিরাকুল ফুলভারে
বকুল বাগান।
কানায় কানায় পূর্ণ আমার পরাণ।

ঝিলিমিলি করে পাতা, ঝিকিমিকি আলো।
আমি ভাবিতেছি কার আঁখি দুটি কালো!
কদম্বগাছের সার,
চিকন পল্লবে তার
গন্ধে ভরা অন্ধকার
হয়েছে বোয়ালো।
কারে বলিবারে চাহি কারে বাসি ভালো!

অম্লান-উজ্জ্বল দিন, বৃষ্টি অবসান।
আমি ভাবিতেছি আজি কি করিব দান!
মেঘখণ্ড থরে থরে
উদাস বাতাস ভরে
নানা ঠাঁই ঘুরে' মরে
হুতাশ সমান।
সাধ যায় আপনারে করি শত খান!

দিবস অবশ যেন হয়েছে আলসে।
আসি ভাবি আর কেহ কি ভাবিছে বসে'!
তরুশাখে হেলাফেলা
কামিনী ফুলের মেলা,
থেকে থেকে সারাবেলা
পড়ে খসে' খসে'।
কি বাঁশি বাজিছে সদা প্রভাতে প্রদোষে!

পাখীর প্রমোদগানে পূর্ণ বনস্থল।
আমি ভাবিতেছি চোখে কেন আসে জল!
দোয়েল দুলায়ে শাখা
গাহিছে অমৃতমাখা,
নিভৃত পাতায় ঢাকা
কপোত যুগল।
আমারে সকলে মিলে করেছে বিকল!

একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প।

গল্প বলিতে হইবে? কিন্তু আরত পারি না। এখন এই পরিশ্রান্ত অক্ষম ব্যক্তিটিকে ছুটি দিতে হইবে।

এ পদ আমাকে কে দিল বলা কঠিন। ক্রমে ক্রমে একে একে তোমরা পাঁচজন আসিয়া আমার চারিদিকে কখন্ জড় হইলে, এবং কেন যে তোমরা আমাকে এত অনুগ্রহ করিলে এবং আমার কাছে এত প্রত্যাশা করিলে, তাহা বলা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। অবশ্যই সে তোমাদের নিজগুণে; ওতাদৃষ্টক্রমে আমার

প্রতি সহসা তোমাদের অনুগ্রহ উদয় হইয়াছিল। এবং যাহাতে সে অনুগ্রহ রক্ষা হয় সাধ্যমত আমার সে চেষ্টার ত্রুটি নাই।

কিন্তু পাঁচজনের অব্যক্ত অনির্দ্দিষ্ট সম্মতিক্রমে যে কার্য্যভার আমার প্রতি অর্পিত হইয়া পড়িয়াছে আমি তাহার যোগ্য নহি। ক্ষমতা আছে কি না আছে তাহা লইয়া বিনয় বা অহঙ্কার করিতে চাহি না; কিন্তু প্রধান কারণ এই যে, বিধাতা আমাকে নির্জ্জন-চর জীবরূপেই গঠিত করিয়াছিলেন, খ্যাতি যশ জনতার উপযোগী করিয়া আমার গাত্রে কঠিন চর্ম্মাবরণ দিয়া দেন নাই; তাঁহার এই বিধান ছিল যে, যদি তুমি আত্মরক্ষা করিতে চাও ত একটু নিরালার মধ্যে বাস করিয়ো।

চিত্তও সেই নিরালা বাসস্থানটুকুর জন্য সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে। কিন্তু পিতামহ অদৃষ্ট পরিহাস করিয়াই হৌক্ অথবা ভুল বুঝিয়াই হৌক, আমাকে একটি বিপুল জনসমাজের মধ্যে উত্তীর্ণ করিয়া এক্ষণে মুখে কাপড় দিয়া হাস্য করিতেছেন, আমি তাঁহার সেই হাস্যে যোগ দিবার চেষ্টা করিতেছি কিন্তু কিছু-তেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছি না।

পলায়ন করাও আমার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয় না। সৈন্য-দলের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছে যাহারা স্বভাবতই যুদ্ধের অপেক্ষা শান্তির মধ্যেই অধিকতর স্ফূর্ত্তি পাইতে পারিত কিন্তু যখন সে নিজের এবং পরের ভ্রমক্রমে যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তখন হঠাৎ দল ভাঙ্গিয়া পলায়ন করা তাহাকে শোভা পায় না। অদৃষ্ট সুবিবেচনা পূর্ব্বক প্রাণীগণকে যথাযোগ্য কর্ম্মে নিয়োগ করেন না, কিন্তু তথাপি নিযুক্ত কার্য্য দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করা মানুষের কর্ত্তব্য।

তোমরা আবশ্যক বোধ করিলে আমার নিকট আসিয়া থাক, এবং সম্মান দেখাইতেও ত্রুটি কর না। আবশ্যক অতীত হইয়া গেলে সেবকাধমের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া কিছু আত্ম-গৌরব অনুভব করিবারও চেষ্টা করিয়া থাক। পৃথিবীতে সাধা-রণতঃ ইহাই স্বাভাবিক, এবং এই কারণেই "সাধারণ" নামক একটি অকৃতজ্ঞ অব্যবস্থিতচিত্ত রাজাকে তাহার অনুচরবর্গ সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে না। কিন্তু অনুগ্রহ নিগ্রহের দিকে তাকাইলে সক-

সময় কাজ করা হইয়া উঠে না। নিরপেক্ষ হইয়া কাজ না করিলে কাজের গৌরব আর থাকে না।

অতএব, যদি কিছু শুনিতে ইচ্ছা করিয়া আসিয়া থাক ত কিছু শুনাইব। শ্রান্তি মানিব না এবং উৎসাহেরও প্রত্যাশা করিব না।

আজ কিন্তু অতি ক্ষুদ্র এবং পৃথিবীর অত্যন্ত পুরাতন একটি গল্প মনে পড়িতেছে; মনোহর না হইলেও সংক্ষেপবশতঃ শুনিতে ধৈর্য্যচ্যুতি না হইবার সম্ভাবনা।

পৃথিবীতে একটি মহানদীর তীরে একটি মহারণ্য ছিল। সেই অরণ্যে এবং সেই নদীতীরে একটি কাঠঠোক্‌রা এবং একটি কাদা-খোঁচা পক্ষী বাস করিত।

ধরাতলে কীট যখন সুলভ ছিল তখন ক্ষুধা নিবৃত্তিপূর্ব্বক সন্তুষ্টচিত্তে উভয়ে ধরাধামের যশোকীর্ত্তন করিয়া পুষ্ট কলেবরে বিচরণ করিত।

কালক্রমে দৈবযোগে পৃথিবীতে কীট দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল।

তখন নদীতীরস্থ কাদাখোঁচা শাখাসীন কাঠঠোক্‌রাকে কহিল, "ভাই কাঠঠোকরা, বাহির হইতে অনেকের নিকট এই পৃথিবী নবীন শ্যামল সুন্দর বলিয়া মনে হয় কিন্তু আমি বলিতেছি ইহা আদ্যোপান্ত জীর্ণ।"

শাখাসীন কাঠঠোকরা নদীতটস্থ কাদাখোঁচাকে কহিল, "ভাই কাদাখোঁচা, অনেকে এই অরণ্যকে সতেজ শোভন বলিয়া বিশ্বাস করে কিন্তু আমি বলিতেছি ইহা একেবারে অন্তঃসারবিহীন।"—

তখন উভয়ে মিলিয়া তাহাই প্রমাণ করিয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। কাদাখোঁচা নদীতীরে লম্ফ দিয়া পৃথিবীর কোমল কর্দ্দমে অনবরতই চঞ্চু বিদ্ধ করিয়া বসুন্ধরার জীর্ণতা নির্দ্দেশ করিতে লাগিল এবং কাঠঠোকরা বনস্পতির কঠিন শাখায় বার-ম্বার চঞ্চু আঘাত করিয়া অরণ্যের অন্তঃশূন্যতা প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইল।

বিধিবিড়ম্বনায় উক্ত দুই অধ্যবসায়ী পক্ষী সঙ্গীতবিদ্যায় বঞ্চিত; অতএব কোকিল যখন ধরাতলে নব নব বসন্ত সমাগম

পঞ্চমস্বরে ঘোষণা করিতে লাগিল, এবং শ্যামা যখন অরণ্যে নব নব প্রভাতোদয় কীর্ত্তন করিতে নিযুক্ত রহিল; তখন এই দুই ক্ষুধিত অসন্তুষ্ট মূক পক্ষী অশ্রান্ত উৎসাহে আপন প্রতিজ্ঞা পালন করিতে লাগিল।

এ গল্প তোমাদের ভাল লাগিল না? ভাল লাগিবার কথা নহে। কিন্তু ইহার সর্ব্বাপেক্ষা মহৎগুণ এই যে, পাঁচ সাত পারাগ্রাফেই সম্পূর্ণ।

এ গল্পটা যে পুরাতন তাহাও তোমাদের মনে হইতেছে না? তাহার কারণ পৃথিবীর ভাগ্যদোষে এ গল্প অতি পুরাতন হইয়াও চিরকাল নূতন রহিয়া গেল। বহুদিন হইতেই অকৃতজ্ঞ কাঠঠোকরা পৃথিবীর দৃঢ় কঠিন অমর মহত্ত্বের উপর ঠক্‌ঠক্ শব্দে চঞ্চুপাত করিতেছে এবং কাদাখোঁচা পৃথিবীর সরস উর্ব্বর কোমলত্বের মধ্যে খচ্‌খচ্ শব্দে চঞ্চু বিদ্ধ করিতেছে আজও তাহার শেষ হইল না, মনের আক্ষেপ এখনও রহিয়া গেল।

গল্পটার মধ্যে সুখদুঃখের কথা কি আছে জিজ্ঞাসা করিতেছ? ইহার মধ্যে দুঃখের কথাও আছে সুখের কথাও আছে। দুঃখের কথা এই যে, পৃথিবী যতই উদার এবং অরণ্য যতই মহৎ হউক্ ক্ষুদ্র চঞ্চু আপনার উপযুক্ত খাদ্য না পাইবামাত্র তাহাদিগকে আঘাত করিয়া আসিতেছে। এবং সুখের বিষয় এই যে, তথাপি শত সহস্র বৎসর পৃথিবী নবীন এবং অরণ্য শ্যামল রহিয়াছে। যদি কেহ মরে ত সে ঐ দুটি বিদ্বেষবিষজর্জ্জর হতভাগ্য বিহঙ্গ, এবং জগতে কেহ সে সংবাদ জানিতেও পায় না।

তোমরা এ গল্পের মধ্যে মাথামুণ্ডু অর্থ কি আছে কিছু বুঝিতে পার নাই? তাৎপর্য্য বিশেষ কিছুই জটিল নহে, হয় ত কিঞ্চিৎ বয়স প্রাপ্ত হইলেই বুঝিতে পারিবে।

যাহাই হউক্ সর্ব্বসুদ্ধ জিনিষটি তোমাদের উপযুক্ত হয় নাই?

তাহার ত কোন সন্দেহমাত্র নাই।

সাধনা।

প্রাচীন উড়িষ্যা।

উড়িষ্যার গৌরবের দিন গিয়াছে। সে কেশরী রাজবংশও নাই, সে নিপুণ শিল্পীও নাই, সে ব্রাহ্মণ্যও নাই, সে শ্রমণ সম্প্রদায়ও নাই। আর অভ্রভেদী মস্তক তুলিয়া নিত্য নূতন মন্দির উঠে না, ধূপগন্ধে ঘণ্টাধ্বনিতে দশদিক্ পূর্ণ করিয়া শত গিরি-নদী প্রান্তরভূমি হইতে প্রতি সন্ধ্যায় ধর্ম্মের নাম তেমন উত্থিত হয় না; পথপ্রান্তে, বালুতটে, পরিত্যক্ত গিরিশৃঙ্গে সহস্র জীর্ণ মন্দির মঠ পড়িয়া আছে, তাহারা কেবল সেই পুরাতন অতীতের সাক্ষী—দূর হইতে পথিকহৃদয়ে প্রাচীন গৌরব সঞ্চার করিয়া দেয় মাত্র।

দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত উড়িষ্যার ইহাই এখন একমাত্র সম্বল। এইসকল প্রাচীন ভগ্নাবশেষ যুগযুগান্তরের বহু বিপ্লবের মধ্য দিয়া বহু প্রাচীনকালের একটি অনির্ব্বচনীয় সুন্দর স্মৃতি রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। শুধু ধর্ম্ম নহে, শুধু ব্রাহ্মণ্যের গর্ব্ব অথবা বৌদ্ধ সন্ন্যাসমাহাত্ম্য নহে, শুধু একটা বিপ্লবের ইতিহাস নহে; কিন্তু এই দেবমন্দিরের ভাস্কর্য্যে এদেশের প্রশান্ত প্রাচীন সভ্যতার একটি অখণ্ড চিত্র, একটি সম্পূর্ণ মহিমা চিরদিনের মত মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। পাষাণে খোদিত শত নারীমূর্ত্তির কত বিভিন্ন প্রকারের কেশবিন্যাস, কত বিচিত্র বেশভূষা, হর্ম্ম্যে কত বিস্মৃত

প্রাচীন যন্ত্র, গঠনে কি মায়ামন্ত্র, ভঙ্গীতে কি অবলীলা-মাধুরী! শত নিশ্চল দেবতা বিবিধ সজ্জায়, বহুবিধ শিরস্ত্রাণে, আজানু উপানতে সভা উজ্জ্বল করিয়াছেন। এখানে সেখানে নানাবিধ ফলস, পানপাত্র, দীপাধান, শয্যা, আসন, গদা, অসি, খাঁড়া, ঢাল, ধ্বজা, দণ্ড—প্রাচীন সভ্যতার বিবিধ বিলাস-উপকরণ।—চক্ষের সমক্ষে মন্দিরে খোদিত একখানি সুবৃহৎ প্রাচীন গ্রন্থ—হে দূরাগত পান্থ, এইখানে আসিয়া একবার তোমার পূর্ব্বপুরুষের সমাজচিত্র দেখিয়া যাও।

বর্ত্তমান উৎকলের সহিত ইহার কিছুই মিলে না। কোথায় সে নিত্য নব কবরীর শোভা, কোথায় সে বিচিত্র কেশবিন্যাসের সহিত সুশোভন বিবিধ অলঙ্কার, কোথায় সে মৃণালভুজে চারু বলয়কঙ্কণ! উড়িষ্যাসুন্দরী হরিদ্রারঞ্জিতদেহে একখানি আজানু-লম্বিত শাড়ী জড়াইয়া গুরুভার কাংস্যালঙ্কারে মৃণালবাহুর মণিবন্ধাবধি অর্দ্ধাংশ নরলোকের দৃষ্টি হইতে আড়াল করিয়া রাখেন এবং মাথায় ঝুঁটি বাঁধিয়া ও সীমন্তে সিন্দূর লেপন করিয়া কেশবিন্যাসনৈপুণ্যের প্রতি অনেক পরিমাণে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। —তাই বলিয়া সুকেশিনীগণের মধ্যে তখনকার সকল ফেসান একেবারে লোপ পায় নাই। ভুবনেশ্বরের ভাস্কর্য্যে কেশবিন্যাসের যে সকল ফেসান দেখা যায় তাহার কোন কোনটি অদ্যাবধি উড়িষ্যার নর্ত্তকীদিগের মস্তকের শোভা সম্পাদন করে এবং কোন কোনটি মান্দ্রাজ অঞ্চলে এখনও বিশেষ প্রচলিত। সচরাচর আমরা যাহাকে মান্দ্রাজী খোপা বলি—মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে গুচ্ছীকৃত বেণীবন্ধনহীন কেশকলাপ—তাহা অনেকটা এই পাষাণ-খোদিত খোপারই অনুরূপ। কেবল, সেকালে এই খোপার সহিত যে সকল গহনা ব্যবহার ছিল এখন তাহা আর দেখা যায় না।

ভুবনেশ্বরে এই মান্দ্রাজী ধরণের খোপারও আবার নানা বিভিন্ন কেশীন দৃষ্ট হয়। খোপা কখনও মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত, কখনও বা বামপার্শ্বে ঈষৎ হেলান', কখনও কেশগুচ্ছকে বিভক্ত করিয়া দুই পার্শ্বে দুইটি স্বতন্ত্র খোপার মত করিয়া দেওয়া, এবং কোন কোনটিতে এই খোপার উপর গুটি-কতক কুঞ্চিত কুন্তল ও ললাটদেশ বাহিয়া দুইটি সুন্দর ঝাপ্টা। মস্তকের উপরিভাগেও অনেক সময় খোপা স্থাপিত হইত—কখনও বামপার্শ্বে কর্ণদেশের উপরিভাগে ঈষৎ বঙ্কিম ঝুঁটির মত, কখনও একটু চেপ্‌টা বেল্লনাকার এবং তাহারই মধ্যস্থলে একটি চারু গোলক, কখনও বা কর্ণ হইতে কর্ণান্তর অবধি শ্রেণীবদ্ধ ঊর্দ্ধফণা ভুজঙ্গিনীবৎ; কেশবিন্যাসের অন্ত নাই এবং বৈচিত্র্যও অশেষ।

এখন যাহা পাষাণে খোদিত মাত্র, একসময়ে এ সকলি জীবন্ত ছিল। কুলনারীরা প্রাসাদের নিভৃত বাতায়নসম্মুখে বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত সুখাসনোপরি উপবেশন করিয়া কেশ এলাইয়া দিতেন; দীর্ঘ কেশগুচ্ছ কেদারার মকরমুখশোভিত পৃষ্ঠদেশ ছাইয়া পড়িত এবং সুন্দরী পরিচারিকা কঙ্কতিকা হস্তে পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কেশের পরিচর্য্যা করিত। পার্শ্বে সুনির্ম্মিত টীপায়ের উপরে পানের বাটা, সম্মুখের পাদপীঠে দুইখানি অলক্তকরঞ্জিত কোমল পদপল্লব।

কেশবন্ধনাদি সমাপনান্তে বেশভূষার পালা। কঞ্চুলিকাবদ্ধ অঙ্গোপরি লঘু অঙ্গিকা এবং কোঁচা দিয়া পরা মনোহর শাড়ী। খোপায় মুক্তার মালা; ললাটের উপরিদেশে সিঁথি; কর্ণে দুটি দুল; কণ্ঠে হীরককণ্ঠী বা মুক্তাহার; বাহুতে তাবিজ, বাজু বা তাড়; প্রকোষ্ঠে বলয়, কঙ্কণ বা শাঁখা; কটিদেশে চন্দ্রহার; চরণে নূপুর, কিঙ্কিণী, গুজরী।

অলঙ্কার ব্যবহার পুরুষদিগের মধ্যেও নিতান্ত বিরল ছিল না। সম্ভ্রান্ত পুরুষদিগের কটিদেশে প্রায়ই এক একটি চন্দ্রহার শোভা পাইত। এবং কারুকার্য্যখচিত রেশমী ধুতির উপরে তাহারই উজ্জ্বল আভা পড়িয়া যুবতীজনের চিত্ত হরণ করিত। ইহা ভিন্ন, হস্তে বলয়, কর্ণে বীরবৌলি, গলায় হার এ সকলও কঠিন পুরুষ-দেহের শোভা সম্পাদনে অনাবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইত না। এবং উচ্চজনের ধনগৌরব ও পদমর্য্যাদার সহিত ইহার খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল বলিয়া বোধ হয়।

শুধু অলঙ্কার নহে, বেশবিন্যাসেরও বিশেষ একটু পারিপাট্য ছিল। এবং ধুতি ভিন্ন পায়জামা, জামা, চাপকান, উষ্ণীষ প্রভৃতিও ব্যবহৃত হইত। রাজসভায় এক বেশ, এবং দেবমন্দিরে এক বেশ; রণক্ষেত্রে যে বেশ, প্রিয়জনকক্ষে সে বেশ নহে। —খণ্ডগিরি ও ভুবনেশ্বরের পাষাণশিল্পে এই বেশবৈচিত্র্যের একটি সুন্দর চিত্রাভাস পাওয়া যায়। এবং ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সেই বহু প্রাচীনকালেও ভারতবর্ষীয় সভ্যতা আদিম অবস্থা হইতে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল।

জীবনস্রোত ভারতবর্ষে তখনও মন্দীভূত হইয়া আসে নাই। জীবনে সুখও ছিল, সখও ছিল।—সুরম্য হর্ম্ম্যমধ্যে সুসজ্জিত কক্ষে প্রমদাগণ দুগ্ধফেননিভ শয্যায় বসিয়া প্রিয়জনের সহিত সুখে প্রেমালাপ করিতেন; অনতিউচ্চ মঞ্চোপরি সরক ও পানপাত্র থাকিত, এবং সুন্দরীর পাণ্ডু কপোলদেশ বারুণীরাগসঞ্চারে অরুণিম শোভা ধারণ করিত। কলাবিদ্যার তখন বিশেষ প্রাদুর্ভাব। বীণার তারে তারে নাচিয়া নাচিয়া তন্বঙ্গীর চম্পক-অঙ্গুলি সৌদামিনীর মত খেলিয়া বেড়াইত এবং প্রিয়জন সেই চঞ্চল অঙ্গুলিচালনার মধ্যে পথ খুঁজিয়া পাইতেন না। কেবল, সেই

মধুর বীণাধ্বনি, সুন্দরীর অঙ্গরাগসৌরভ ও চঞ্চল রূপের তরঙ্গ মিলিয়া মলয়সেবিত চন্দ্রালোকস্নিগ্ধ নিশাকে স্বপ্নের মত মনোহর করিয়া তুলিত।

দীর্ঘ প্রাচীরবেষ্টিত উদ্যানে দিগন্তবিস্তৃত নীল চন্দ্রাতপতলে পুষ্পশয্যা রচনা করিয়া সুন্দরীগণ কত নিশি প্রিয়জনের আগমন প্রতীক্ষা করিতেন। দূর হইতে গন্ধবহ কেতকীসৌরভ বহন করিয়া আনিত, এবং চূতশাখায় বসিয়া পাপিয়া জ্যোৎস্নাপুলকিত-কণ্ঠে মনের খেদ মিটাইত। প্রিয়জন এখানে আসিয়াই প্রেয়সীর কেশপাশে বহুযত্নগ্রথিত বকুলমালা জড়াইয়া দিয়া অনঙ্গের মনো-বেদনা দূর করিতেন।

উৎকলের সে সকল দিন গত। মাল্য এখনও গ্রথিত হয়, কিন্তু তাহার সে পূর্ব্বাদর নাই; বীণা নীরব হইয়াছে; সুসঙ্গীতও বড় শুনা যায় না। উৎসবের সময়ে উড়িষ্যার গৃহে গৃহে শুধু এক অত্যন্ত বেসুরা সানাই প্রাণপণে কাঁদিয়া কাঁদিয়া সঙ্গীতের কলঙ্ক রটনা করে মাত্র; এবং পথক্লিষ্ট পথিক তাললয়সুরহীন দারুণ চীৎকারে মধ্যে মধ্যে কর্ণজ্বর উপস্থিত করে।

সহজেই সন্দেহ হয় যে, এই উৎকলীয়েরা কি সেই কলাকুশল-দিগের বংশধর? ইহাদের পিতৃপুরুষেরাই কি স্থাপত্যে ও ভাস্কর্য্যে বিলাসকলার এমন অক্ষয় স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন? অথবা গঙ্গা ও যমুনার দেশ হইতে এক উন্নত প্রবলপ্রতাপ আর্য্যজাতি আসিয়া এইখানে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন? এবং উৎকলী-য়েরা তাঁহাদের অধীনে জন খাটিত মাত্র?

কারণ, বিলাস অবশ্য সমস্ত দেশ জুড়িয়া ছিল না। দেশে দরিদ্রও বিস্তর ছিল। এবং বিলাস সমুচ্চ প্রাসাদ ছাড়িয়া দরি-দ্রের গৃহে পদার্পণ করিতে কুণ্ঠিত হইত। সেখানে চিরদিন যেমন

হইয়া থাকে, স্ত্রী গৃহকার্য্য করে, স্বামী মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়া আনে। মাটির ঘরে গুটিকতক হাঁড়ি কলসী এবং একটি চারপাই মাত্র হয়ত দম্পতির ইহজীবনের সম্বল। ইহার উপর, অতিরিক্ত খাটিয়া কোনরূপে স্ত্রীর হাতের দুইগাছি রূপার খাড়ু গড়াইয়া দিতে পারিলেই পতির জীবন সার্থক।

এবং তাহাও নিতান্ত দুর্লভ ছিল না। কাজ যথেষ্ট ছিল। তন্তুবায় তাঁত বুনিত, স্বর্ণকার গহনা গড়িত, কর্ম্মকারের ঘরে অস্ত্রের ফরমাস বারোমাসই ছিল। রাজবাড়ী হইতে মধ্যে মধ্যে যেদিন পাগ্‌ড়ী-আঁটা প্রহরী আসিয়া তাগাদা করিত, কর্ম্মকার-পত্নী বাপু বাছা কহিয়া প্রহরীকে খুসী করিয়া দিত, স্বর্ণকার প্রহরীগৃহিণীর জন্য রূপার দুইটি গুঁজি গড়িয়া দিয়া বলিত, মহারাজ, এখন কিছুকাল অব্যাহতি দাও, এবং তন্তুবায় গোপনে প্রহরীকে ঘরে লইয়া গিয়া দেখাইত, প্রহরিণী মাসীর কাপড় হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই।

এমনি দেখিতে দেখিতে ধানকাটার দিন আসিত। সোণার ধানে ক্ষেত ভরিয়া উঠিয়াছে। কৃষকেরা দলে দলে ধান কাটিতে বাহির হইয়াছে; কৃষকাঙ্গনারা গান গাহিতে গাহিতে ধানের আঁটি বাঁধিতেছে। গৃহে গৃহে উৎসব। দেবতামন্দিরে পূজার ভারি ধুম। সিংহাসন হইতে রাজা নামিয়া আসিয়াছেন, প্রাসাদ হইতে অমাত্যের দল উপস্থিত, পশ্চাতে সমস্ত প্রজাপুঞ্জ; মন্দিরের প্রাঙ্গণ হইতে বাহিরের দিগন্ত অবধি লোকারণ্য। উজ্জ্বল নীলাকাশতলে বিচিত্র উজ্জ্বল বর্ণের বেশভূষা—ময়ূরকণ্ঠী ধূপছায়া লাল নীল সোণালী গোলাপী বেগুনী নানাবর্ণের তরঙ্গ; মণিমুক্তা জরী জহরৎ ঝক্‌মক্ করিতেছে। পট্টবস্ত্রপরিহিত ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রপাঠ করিতেছেন; হোমাগ্নিতে অনবরত ঘৃতাহুতি ও

লাজাঞ্জলি প্রদত্ত হইতেছে; স্তূপাকার পুষ্পরাশিতে দেবতা দুর্নিরীক্ষ্য; বাহিরে নহবৎ বসিয়াছে, ভিতরে কাঁসর ঘণ্টা শঙ্খধ্বনির বিরাম নাই; আবালবৃদ্ধবনিতা রাজা হইতে ভিক্ষুক অবধি নতশিরে দেবতার আশীষ গ্রহণ করিতেছেন।

এখনকার কালের মত রাজা প্রজায় তখন এতটা দূর সম্পর্ক ছিল না। রাজা পিতার মত ছিলেন—পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজাদিগকে পালন করিতেন। প্রজারাও সুখে দুঃখে রাজদ্বারে গিয়া দাঁড়াইত—তাহাতে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইত না। শাসনতন্ত্র তখন এত জটিল হয় নাই, সুচারুও হয় নাই বটে; কিন্তু দুর্ব্বহ প্রজাপুঞ্জের স্কন্ধদেশে তাহা একটা দুর্ব্বহ গুরুভারের মত চাপিয়া ছিল না। রাজার অধীনে সমস্ত দেশ যেন একটি বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবার; তাহার ত্রুটি সহস্র, কিন্তু সেখানে সহৃদয়তারও অসদ্ভাব নাই। স্বদেশীয় রাজা সহজেই দেশের সুখদুঃখ বুঝিতেন, এবং তাঁহার সমস্ত হৃদয় দেশের সহিতই বাঁধা ছিল।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে রাজকার্য্য সম্পন্ন হইত। বৃহৎ সভামণ্ডপ বিবিধ বর্ণের উষ্ণীষে শোভিত। স্বর্ণসিংহাসনোপরি হেমমুকুটশিরে রাজা; দণ্ডধর দণ্ড ধরিয়া দাঁড়াইয়া, ছত্রধর মুক্তাঝালরশোভিত ছত্র ধারণ করিয়া আছে, দুইদিক হইতে দুইজন পরিচারক চামর ব্যজন করিতেছে। সিংহাসনতলে পদমর্য্যাদানুসারে সভাসদ্‌গণের আসন নির্দ্দিষ্ট। শুক্লকেশ প্রবীণেরা শুভ্র বেশ পরিধান করিয়াছেন—আজানুলম্বিত চাপকান, মস্তকে শুভ্র উষ্ণীষ। নবীনদিগের বেশভূষায় বর্ণবৈচিত্র্যের অন্ত নাই—বিবিধ বর্ণের বহুমূল্য চীনাংশুকবসন এবং তদুপরি নানাবিধ সূক্ষ্ম কারুকার্য্য। এখনকার মত আপাদমস্তক কুয়াশার দেশের কৃষ্ণ আবরণে আচ্ছাদিত করা তখনকার ফেসান ছিল না। ভারত-

বর্ষের উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণে স্বভাবতই বিবিধ উজ্জ্বল বর্ণের বেশ-ভূষার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল।

মধ্যাহ্নশঙ্খধ্বনি শুনা পর্য্যন্ত এই উজ্জ্বল রাজসভা পরিপূর্ণ থাকিত। প্রজা বেদনা জানাইতে আসিয়াছে, রাজা বিচার করিতেছেন। বৈদেশিক দূত উপঢৌকন লইয়া আসিয়াছেন, যথাযোগ্য সৎকার সহকারে উপঢৌকন গ্রহণপূর্ব্বক রাজা তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন। মন্ত্রীগণ রাজকার্য্যের উপদেশ লইতেছেন; ব্রাহ্মণেরা দেবকার্য্যের উপদেশ দিতেছেন; রাজ্যের তুচ্ছতম কর্ত্তব্য অবধি এখানে উপেক্ষিত হয় না।

রাজা যদি কর্ত্তব্যে অবহেলা করেন, প্রজাগণ দেবদ্বারে আসিয়া দাঁড়ায়। রাজার উপরে এক দেবতা, আর ব্রাহ্মণ। দেবতার চরণতলে উৎসৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ্য দেবতুল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার এক অভিশাপে সহস্র সিংহাসন নিমেষে ধূলিসাৎ হইয়া যায়, বাসুকীর সহস্র শির বিচলিত হইয়া উঠে, সৃষ্টি সেই আদিম অন্ধকারের মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া আসে। দেবতা আর ব্রাহ্মণ একই। যে ব্রাহ্মণকে প্রসন্ন করিতে পারে, সে দেবতার প্রসাদ লাভ করে; যে দেবতাকে সন্তুষ্ট রাখিয়া চলে, সে ব্রাহ্মণেরও প্রিয়। সেই ব্রাহ্মণ মনুর বিধি লঙ্ঘন করা রাজারও অসাধ্য। যদি করেন, সমস্ত ব্রাহ্মণ্য ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, দেবতা বিমুখ হইয়া দাঁড়ান, রাজ্য উৎসন্ন যায়। সুতরাং রাজার অত্যাচারের প্রতীকার এই দেবমন্দিরেই সম্ভব—যেখানে দেবতা এবং দেবতার অন্তরঙ্গ ব্রাহ্মণ নিয়ত বিরাজ করিতেছেন।

কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের তাড়নে ব্রাহ্মণ্য তখন কতকটা দুর্ব্বল হইয়াও পড়িয়াছিল। যদিও বৌদ্ধ রাজসভায় ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা শ্রমণ অপেক্ষা হীন ছিল না এবং বৌদ্ধ রাজগণ দানাদি কার্য্যে

ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের প্রতি সমান ব্যবহার করিতেন, তথাপি চিরন্তন অদ্বিতীয়ত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণেরা বুঝিয়াছিলেন যে, এই জাতিনাশী ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্যের প্রধান শত্রু এবং ইহার যতই প্রচার হয় ব্রাহ্মণ্যের ততই সঙ্কট দশা। সেই জন্য তাঁহাদের স্বধর্ম্মনিষ্ঠ রাজশক্তির বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণেরা সহজে উত্তেজিতও হইতেন না।—রাজশক্তিও ব্রাহ্মণ্যকে মানিয়া চলিত। তখনও চাণক্যের নাম কেহ ভুলে নাই। রাজা বুঝিতেন যে, ঐ প্রশস্ত ললাট তীক্ষ্ণ নাসাগ্র দিয়া যাহাকে বিঁধে তাহার আর নিস্তার নাই।

এই সন্ধিস্থাপনে ব্রাহ্মণ্যও প্রবল হইয়া উঠিল এবং রাজন্যও প্রাধান্য লাভ করিল। ব্রাহ্মণদিগের সহস্র অনুষ্ঠান-আড়ম্বরে রাজা প্রাণপণে সহায়তা করেন, এবং রাজা যখন আবশ্যকমত শূদ্রকণ্ঠে যজ্ঞোপবীত দিয়া একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ গড়িয়া লয়েন, ব্রাহ্মণেরাও তখন তাদৃশ আপত্তি করেন না। এবং এই ব্রাহ্মণ্যের অনুগ্রহ-বিধিতে সাধারণ্যেও সকলি নির্ব্বিবাদে চলিয়া যায়।

প্রাচীন উড়িষ্যা এইরূপ ছিল। ব্রাহ্মণ্যের পক্ষপুটচ্ছায়ায় রাজন্যের পরিপোষণে ধর্ম্ম কর্ম্ম আচার অনুষ্ঠান বেশভূষা শিল্প-কলা পুঞ্জীভূত হইয়া কেমন একটি শান্ত সমগ্রতা লাভ করিয়াছিল। ইহাই সভ্যতা। এবং প্রাচীন উড়িষ্যার ইহাই গৌরব। এখন শুধু ভগ্নাবশেষ ভাস্কর্য্যে এই গৌরবকাহিনী কথঞ্চিৎ মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে মাত্র। নহিলে, সে সভ্যতার কিছুই নাই; সে বেশভূষাও নাই, চাপকানও নাই, উষ্ণীষও নাই, বিবিধ আগুল্ফ আজানু উপানৎও নাই। প্রাচীনকালে সোকা কোট

কেদারার ন্যায় বিবিধ-নাম যে সকল আসনাদি ও গৃহসজ্জার বহুবিধ আস্‌বাব ছিল তাহাও এখন দুর্লভ। উড়িষ্যার ভাস্কর্য্যেও তাহার শ্রেষ্ঠ নমুনা অল্পই পাওয়া যায়। সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ব-পণ্ডিত রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গ্রন্থে অমরাবতী-ভাস্কর্য্যের যে গুটিকতক চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার আসনাদি বর্ত্তমান সভ্যতানুমোদিত গৃহসজ্জার আস্‌বাবের এত অনুরূপ যে, দেখিলে বিস্ময় জন্মে। ইহা ভিন্ন, প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদির বর্ণনা পাঠে ও পুরাতত্ত্ববিষয়ক চিত্রাদি দর্শনে সময় সময় আশ্চর্য্য হইয়া থাকিতে হয়—সেকালে কি এসব ছিল! এবং এইসকল হইতেই প্রাচীন ভারতবর্ষে একটি সুন্দর পরিপাটি সংস্কৃত সভ্যতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয় থাকে না; এবং সেই বহু প্রাচীন-কালের মহিমায় আচ্ছন্ন হইয়া ক্ষণিকের জন্য আমরা বর্ত্তমান দুঃখ দৈন্য হইতে দূরে থাকি।

সমাপ্তি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অপূর্ব্বকৃষ্ণ বি, এ পাস্ করিয়া কলিকাতা হইতে দেশে ফিরিয়া আসিতেছেন।

নদীটি ক্ষুদ্র। বর্ষা অন্তে প্রায় শুকাইয়া যায়। এখন শ্রাবণের শেষে জলে ভরিয়া উঠিয়া একেবারে গ্রামের বেড়া ও বাঁশ-ঝাড়ের তলদেশ চুম্বন করিয়া চলিয়াছে।

বহুদিন ঘনবর্ষার পরে আজ মেঘমুক্ত আকাশে রৌদ্র দেখা দিয়াছে।

নৌকায় আসীন অপূর্ব্বকৃষ্ণের মনের ভিতরকার একখানি ছবি যদি দেখিতে পাইতাম তবে দেখিতাম সেখানেও এই যুবকের মানস-নদী নববর্ষায় কূলে কূলে ভরিয়া আলোকে জলজল্ এবং বাতাসে ছলছল্ করিয়া উঠিতেছিল।

নৌকা যথাস্থানে ঘাটে আসিয়া লাগিল। নদীতীর হইতে অপূর্ব্বদের বাড়ির পাকা ছাদ গাছের অন্তরাল দিয়া দেখা যাইতেছে। অপূর্ব্বের আগমন সংবাদ বাড়ির কেহ জানিত না, সেই জন্য ঘাটে লোক আসে নাই। মাঝি ব্যাগ লইতে উদ্যত হইলে অপূর্ব্ব তাহাকে নিবারণ করিয়া নিজেই ব্যাগ হাতে লইয়া আনন্দভরে তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িল।

নামিবামাত্র, তীরে ছিল পিছল, ব্যাগ্‌সমেত অপূর্ব্ব কাদায় পড়িয়া গেল। যেমন পড়া, অম্‌নি কোথা হইতে এক সুমিষ্ট উচ্চকণ্ঠে তরল হাস্যলহরী উচ্ছ্বসিত হইয়া নিকটবর্ত্তী অশথ-গাছের পাখীগুলিকে সচকিত করিয়া দিল।

অপূর্ব্ব অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি আত্মসম্বরণ করিয়া চাহিয়া দেখিল। দেখিল, তীরে মহাজনের নৌকা হইতে নূতন ইঁট রাশীকৃত করিয়া নামাইয়া রাখা হইয়াছে, তাহারই উপরে বসিয়া একটি মেয়ে হাস্যাবেগে এখনি শতধা হইয়া যাইবে এমনি মনে হইতেছে।

অপূর্ব্ব চিনিতে পারিল তাহাদেরই নূতন প্রতিবেশিনীর মেয়ে মৃণ্ময়ী। দূরে বড় নদীর ধারে ইহাদের বাড়ি ছিল, সেখানে নদীর ভাঙ্গনে দেশ ত্যাগ করিয়া বছর দুই তিন হইল এই গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছে।

এই মেয়েটির অখ্যাতির কথা অনেক শুনিতে পাওয়া যায়। পুরুষ গ্রামবাসীরা সেহভরে ইহাকে পাগলি বলে কিন্তু গ্রামের

গৃহিণীরা ইহার উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবে সর্ব্বদা ভীত চিন্তিত শঙ্কান্বিত। গ্রামের যত ছেলেদের সহিতই ইহার খেলা; সমবয়সী মেয়েদের প্রতি অবজ্ঞার সীমা নাই। শিশুরাজ্যে এই মেয়েটি একটি ছোট-খাটো বর্গির উপদ্রব বলিলেই হয়।

বাপের আদরের মেয়ে কি না সেই জন্য ইহার এতটা দুর্দ্দান্ত প্রতাপ। এই সম্বন্ধে বন্ধুদের নিকট মৃণ্ময়ীর মা স্বামীর বিরুদ্ধে সর্ব্বদা অভিযোগ করিতে ছাড়িত না, অথচ, বাপ ইহাকে ভালবাসে, বাপ কাছে থাকিলে মৃণ্ময়ীর চোখের অশ্রুবিন্দু তাহার অন্তরে বড়ই বাজিত ইহাই মনে করিয়া প্রবাসী স্বামীকে স্মরণপূর্ব্বক মৃণ্ময়ীর মা মেয়েকে কিছুতেই কাঁদাইতে পারিত না।

মৃণ্ময়ী দেখিতে শ্যামবর্ণ। ছোট কোঁকড়া চুল পিঠ পর্য্যন্ত পড়িয়াছে। ঠিক যেন বালকের মত মুখের ভাব। মস্ত মস্ত দুটি কালো চক্ষুতে না আছে লজ্জা, না আছে ভয়, না আছে হাবভাবলীলার লেশমাত্র। শরীর দীর্ঘ পরিপুষ্ট সুস্থ সবল, কিন্তু তাহার বয়স অধিক কি অল্প সে প্রশ্ন কাহারও মনে উদয় হয় না; যদি হইত, তবে এখনো অবিবাহিত আছে বলিয়া লোকে তাহার পিতামাতাকে নিন্দা করিত। গ্রামের বিদেশী জমিদারের নৌকা কালক্রমে যেদিন ঘাটে আসিয়া লাগে সেদিন গ্রামের লোকেরা সম্ভ্রমে শশব্যস্ত হইয়া উঠে, ঘাটের মেয়েদের মুখরঙ্গভূমিতে অকস্মাৎ নাসাগ্রভাগ পর্য্যন্ত যবনিকা পতন হয়, কিন্তু মৃণ্ময়ী কোথা হইতে একটা উলঙ্গ শিশুকে কোলে লইয়া কোঁকড়া চুলগুলি পিঠে দোলাইয়া ছুটিয়া ঘাটে আসিয়া উপস্থিত। যে দেশে ব্যাধ নাই বিপদ নাই সেই দেশের হরিণ-শিশুর মত নির্ভীক কৌতূহলে দাঁড়াইয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে থাকে, অবশেষে আপন দলের বালক-সঙ্গীদের নিকট ফিরিয়া গিয়া এই

নবাগত প্রাণীর আচারব্যবহার সম্বন্ধে বিস্তর বাহুল্য বর্ণনা করে।

আমাদের অপূর্ব্ব ইতিপূর্ব্বে ছুটি উপলক্ষে বাড়ি আসিয়া এই বন্ধনবিহীন বালিকাটিকে দুই চারিবার দেখিয়াছে এবং অবকাশের সময় এমন কি অনবকাশের সময়ও ইহার সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছে। পৃথিবীতে অনেক মুখ চোখে পড়ে কিন্তু এক একটি মুখ বলাকহা নাই একেবারে মনের মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হয়। সে কেবল সৌন্দর্য্যের জন্য নহে, আর একটা কি গুণ আছে। সে গুণটি বোধ করি স্বচ্ছতা। অধিকাংশ মুখের মধ্যেই মনুষ্যপ্রকৃতিটি আপনাকে পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ করিতে পারে না; যে মুখে সেই অন্তরগুহাবাসী রহস্যময় লোকটি অবাধে বাহির হইয়া দেখা দেয়, সে মুখ সহস্রের মধ্যে চোখে পড়ে এবং এক পলকে মনে মুদ্রিত হইয়া যায়। এই বালিকার মুখে চক্ষে একটি দুরন্ত অবাধ্য নারীপ্রকৃতি উন্মুক্ত বেগবান অরণ্যমৃগের মত সর্ব্বদা দেখা দেয়, খেলা করে, সেইজন্য এই জীবনচঞ্চল মুখখানি একবার দেখিলে আর সহজে ভোলা যায় না।

পাঠকদিগকে বলা বাহুল্য মৃণ্ময়ীর কৌতুকহাস্যধ্বনি যতই সুমিষ্ট হউক্ দুর্ভাগা অপূর্ব্বের পক্ষে কিঞ্চিৎ ক্লেশদায়ক হইয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি মাঝির হাতে ব্যাগ সমর্পণ করিয়া রক্তিমমুখে দ্রুতবেগে গৃহ অভিমুখে চলিতে লাগিল।

আয়োজনটি অতি সুন্দর হইয়াছিল। নদীর তীর, গাছের ছায়া, পাখীর গান, প্রভাতের রৌদ্র, কুড়ি বৎসর বয়স; অবশ্য ইষ্টের স্তূপটা তেমন উল্লেখযোগ্য নহে, কিন্তু যে ব্যক্তি তাহার উপর বসিয়াছিল সে এই শুষ্ক কঠিন আসনের প্রতিও একটি মনোরম শ্রী বিস্তার করিয়াছিল। হায়, এমন দৃশ্যের মধ্যে

প্রথম পদক্ষেপমাত্রেই, যে, সমস্ত কবিত্ব প্রহসনে পরিণত হয় ইহা অপেক্ষা অদৃষ্টের নিষ্ঠুরতা আর কি হইতে পারে!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সেই ইষ্টকশিখর হইতে প্রবহমান হাস্যধ্বনি শুনিতে শুনিতে চাদরে ও ব্যাগে কাদা মাখিয়া গাছের ছায়া দিয়া অপূর্ব্ব বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইল।

অকস্মাৎ পুত্রের আগমনে তাহার বিধবা মাতা পুলকিত হইয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ ক্ষীর দধি রুইমাছের সন্ধানে দূরে নিকটে লোক দৌড়িল এবং পাড়া প্রতিবেশীর মধ্যেও একটা আন্দোলন উপস্থিত হইল।

আহারান্তে মা অপূর্ব্বর বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। অপূর্ব্ব সে জন্য প্রস্তুত হইয়া ছিল। কারণ, প্রস্তাব অনেক পূর্ব্বেই ছিল কিন্তু পুত্র নব্যতন্ত্রের নূতন ধুয়া ধরিয়া জেদ করিয়া বসিয়াছিল যে, বি, এ, পাস না করিয়া বিবাহ করিব না। এতকাল জননী সেই জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলেন অতএব এখন আর কোনরূপ ওজর করা মিথ্যা। অপূর্ব্ব কহিল, আগে পাত্রী দেখা হউক তাহার পর স্থির হইবে। মা কহিলেন, পাত্রী দেখা হইয়াছে, সে জন্য তোকে ভাবিতে হইবে না। অপূর্ব্ব ঐ ভাবনাটা নিজে ভাবিতে প্রস্তুত হইল এবং কহিল মেয়ে না দেখিয়া বিবাহ করিতে পারিবে না। মা ভাবিলেন এমন সৃষ্টিছাড়া কথাও কখনো শোনা যায় নাই, কিন্তু সম্মত হইলেন।

সে রাত্রে অপূর্ব্ব প্রদীপ নিবাইয়া বিছানায় শয়ন করিলে পর বর্ষানিশীথের সমস্ত শব্দ এবং সমস্ত নিস্তব্ধতার পরপ্রান্ত হইতে বিজন বিনিদ্র শয্যায় একটি উচ্ছ্বসিত উচ্চ মধুর কণ্ঠ

হাস্যধ্বনি তাহার কানে আসিয়া ক্রমাগত বাজিতে লাগিল। মন নিজেকে কেবলি এই বলিয়া পীড়া দিতে লাগিল যে, সকাল-বেলাকার সেই পদস্খলনটা যেন কোন একটা উপায়ে সংশোধন করিয়া লওয়া উচিত। বালিকা জানিল না যে, আমি অপূর্ব্বকৃষ্ণ অনেক বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছি, কলিকাতায় বহুকাল যাপন করিয়া আসিয়াছি, দৈবাৎ পিছলে পা দিয়া কাদার উপর পড়িয়া গেলেও আমি উপহাস্য উপেক্ষণীয় একজন যে-সে গ্রাম্য যুবক নহি।

পরদিন অপূর্ব্ব কনে দেখিতে যাইবে। অধিক দূর নহে, পাড়াতেই তাহাদের বাড়ি। একটু বিশেষ যত্নপূর্ব্বক সাজ করিল। ধুতি ও চাদর ছাড়িয়া সিল্কের চাপকান জোব্বা, মাথায় একটা গোলাকার পাগড়ি, এবং বার্ণিশকরা নূতন একযোড়া জুতা পায়ে দিয়া সিল্কের ছাতা হস্তে সে প্রাতঃকালে বাহির হইল।

সম্ভাবিত শ্বশুরবাড়িতে পদার্পণ করিবামাত্র মহা সমারোহ সমাদরের ঘটা পড়িয়া গেল। অবশেষে যথাকালে কম্পিত-হৃদয় মেয়েটিকে ঝাড়িয়া মুছিয়া রঙ করিয়া খোপায় রাঙতা জড়াইয়া একখানি পাৎলা রঙীন কাপড়ে মুড়িয়া বরের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করা হইল। সে এক কোণে নীরবে মাথা প্রায় হাঁটুর কাছে ঠেকাইয়া বসিয়া রহিল এবং এক প্রৌঢ়া দাসী তাহাকে সাহস দিবার জন্য পশ্চাতে উপস্থিত রহিল। কনের এক বালক ভাই তাহাদের পরিবারের মধ্যে এই এক নূতন অনধিকার-প্রবেশোদ্যত লোকটির পাগড়ি, ঘড়ির চেন এবং নবোদ্গত শ্মশ্রু একমনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অপূর্ব্ব কিয়ৎকাল গোঁফে তা দিয়া দিয়া অবশেষে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাস

করিল, তুমি কি পড়? বসনভূষণাচ্ছন্ন লজ্জাস্তূপের নিকট হইতে তাহার কোন উত্তর পাওয়া গেল না। দুই তিনবার প্রশ্ন এবং প্রৌঢ়া দাসীর নিকট হইতে পৃষ্ঠদেশে বিস্তর উৎসাহজনক করতাড়নের পর বালিকা মৃদুস্বরে এক নিঃশ্বাসে অত্যন্ত দ্রুত বলিয়া গেল, চারুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ, ব্যাকরণসার প্রথম ভাগ, ভূগোল বিবরণ, পাটিগণিত, ভারতবর্ষের ইতিহাস। এমন সময় বহির্দেশে একটা অশান্ত গতির ধুপ্‌ধাপ্ শব্দ শোনা গেল এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে দৌড়িয়া হাঁপাইয়া পিঠের চুল দোলাইয়া মৃণ্ময়ী ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। অপূর্ব্বকৃষ্ণের প্রতি দৃক্‌পাত-মাত্র না করিয়া একেবারে কনের ভাই রাখালের হাত ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিল। রাখাল তখন আপন পর্য্য-বেক্ষণ শক্তির চর্চ্চায় একান্তমনে নিযুক্ত ছিল, সে কিছুতেই উঠিতে চাহিল না। দাসীটি তাহার সংযত কণ্ঠস্বরের মৃদুতা রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যথাসাধ্য তীব্রভাবে মৃণ্ময়ীকে ভৎ-সনা করিতে লাগিল। অপূর্ব্বকৃষ্ণ আপনার সমস্ত গাম্ভীর্য্য এবং গৌরব একত্র করিয়া পাগ্‌ড়ি-পরা মস্তকে অভ্রভেদী হইয়া বসিয়া রহিল এবং পেটের কাছে ঘড়ির চেন নাড়িতে লাগিল। অব-শেষে সঙ্গীটিকে কিছুতেই বিচলিত করিতে না পারিয়া তাহার পিঠে একটা সশব্দ চপেটাঘাত করিয়া এবং চট্ করিয়া কনের মাথার ঘোমটা টানিয়া খুলিয়া দিয়া ঝড়ের মত মৃণ্ময়ী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। দাসীটি গুমরিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং ভগ্নীর অকস্মাৎ অবগুণ্ঠন মোচনে রাখাল খিল্‌খিল্ শব্দে হাসিতে আরম্ভ করিল। নিজের পৃষ্ঠের প্রবল চপেটাঘাতটি সে অন্যায়-প্রাপ্য মনে করিল না, কারণ, এরূপ দেনা পাওনা তাহাদের মধ্যে সর্ব্বদাই চলিতেছে। এমন কি, পূর্ব্বে মৃণ্ময়ীর চুল কাঁধ ছাড়া

ইয়া পিঠের মাঝামাঝি আসিয়া পড়িত; রাখালই একদিন হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তাহার ঝুঁটির মধ্যে কাঁচি চালাইয়া দেয়। মৃন্ময়ী তখন অত্যন্ত রাগ করিয়া তাহার হাত হইতে কাঁচিটি কাড়িয়া লইয়া নিজের অবশিষ্ট পশ্চাতের চুল ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দে নির্দ্দয়ভাবে কাটিয়া ফেলিল, তাহার কোঁকড়া চুলের স্তবকগুলি শাখাচ্যুত কালো আঙুরের স্তূপের মত গুচ্ছ গুচ্ছ মাটিতে পড়িয়া গেল। উভয়ের মধ্যে এইরূপ শাসনপ্রণালী প্রচলিত ছিল।

অতঃপর এই নীরব পরীক্ষা-সভা আর অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। পিঙ্গাকার কন্যাটি কোন মতে পুনশ্চ দীর্ঘাকার হইয়া দাসী সহকারে অন্তঃপুরে চলিয়া গেল। অপূর্ব্ব পরম গম্ভীরভাবে বিরল গুম্ফরেখায় তা দিতে দিতে উঠিয়া ঘরের বাহিরে যাইতে উদ্যত হইল; দ্বারের নিকট গিয়া দেখে বার্ণিশ-করা নূতন জুতা-যোড়াটি যেখানে ছিল সেখানে নাই এবং কোথায় আছে তাহাও বহুচেষ্টায় অবধারণ করা গেল না।

বাড়ির লোক সকলেই বিষম বিব্রত হইয়া উঠিল এবং অপরাধীর উদ্দেশে গালি ও ভর্ৎসনা অজস্র বর্ষিত হইতে লাগিল। অনেক খোঁজ করিয়া অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া বাড়ির কর্ত্তার পুরাতন ছিন্ন ঢিলা চটিযোড়াটা পরিয়া প্যাণ্টলুন চাপকান পাগড়ি সমেত সুসজ্জিত অপূর্ব্ব কর্দ্দমাক্ত গ্রামপথে অত্যন্ত সাবধানে চলিতে লাগিল।

পুষ্করিণীর ধারে নির্জ্জন পথপ্রান্তে আবার হঠাৎ সেই উচ্চ-কণ্ঠের অজস্র হাস্যকলোচ্ছ্বাস। যেন তরুপল্লবের মধ্য হইতে কৌতুকপ্রিয়া বনদেবী অপূর্ব্বর ঐ অসঙ্গত চটিজুতাযোড়ার দিকে চাহিয়া হঠাৎ আর হাসি ধারণ করিয়া রাখিতে পারিল না।

অপূর্ব্ব অপ্রতিভভাবে থমকিয়া দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ

করিতেছে এমন সময় ঘন বন হইতে বাহির হইয়া একটি নির্লজ্জ অপরাধিনী তাঁহার সম্মুখে নূতন জুতাযোড়াটা রাখিয়াই পলায়নোদ্যত হইল। অপূর্ব্ব দ্রুতবেগে দুই হাত ধরিয়া তাহাকে বন্দী করিয়া ফেলিল।

মৃণ্ময়ী আঁকিয়া বাঁকিয়া হাত ছাড়াইয়া পালাইবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। কোঁকড়া চুলে বেষ্টিত তাহার পরিপুষ্ট সহাস্য দুষ্ট মুখখানির উপরে শাখান্তরালচ্যুত সূর্য্যকিরণ আসিয়া পড়িল। রৌদ্রোজ্জ্বল নির্ম্মল চঞ্চল নির্ঝরিণীর দিকে অবনত হইয়া কৌতূহলী পথিক যেমন নিবিষ্ট দৃষ্টিতে তাহার তলদেশ দেখিতে থাকে অপূর্ব্ব তেমনি করিয়া গভীর গম্ভীর নেত্রে মৃণ্ময়ীর ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত মুখের উপর, তড়িত্তরল দুটি চক্ষুর মধ্যে, চাহিয়া দেখিল এবং অত্যন্ত ধীরে ধীরে মুষ্টি শিথিল করিয়া যেন যথাকর্ত্তব্য অসম্পন্ন রাখিয়া বন্দিনীকে ছাড়িয়া দিল। অপূর্ব্ব যদি রাগ করিয়া মৃণ্ময়ীকে ধরিয়া মারিত তাহা হইলে সে কিছুই আশ্চর্য্য হইত না, কিন্তু নির্জ্জন পথের মধ্যে এই অপরূপ নীরব শান্তির সে কোন অর্থ বুঝিতে পারিল না।

নৃত্যময়ী প্রকৃতির নূপুরনিক্কণের ন্যায় চঞ্চল হাস্যধ্বনিটি সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া বাজিতে লাগিল। এবং চিন্তানিমগ্ন অপূর্ব্বকৃষ্ণ অত্যন্ত ধীর পদক্ষেপে বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অপূর্ব্ব সমস্তদিন নানা ছুতা করিয়া অন্তঃপুরে মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল না। বাহিরে নিমন্ত্রণ ছিল খাইয়া আসিল। অপূর্ব্বর মত এমন একজন কৃতবিদ্য গম্ভীর ভাবুক লোক একটি সামান্য অশিক্ষিতা বালিকার কাছে আপনার লুপ্ত গৌরব উদ্ধার

করিবার, আপনার আন্তরিক মাহাত্ম্যের পরিপূর্ণ পরিচয় দিবার জন্য কেন যে এতটা বেশি উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিবে তাহা বুঝা কঠিন। একটি পাড়াগাঁয়ের চঞ্চল মেয়ে তাঁহাকে সামান্য লোক মনে করিলই বা! সে যদি মুহূর্ত্তকালের জন্য তাঁহাকে হাস্যাস্পদ করিয়া তার পর তাঁহার অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া রাখাল নামক একটি নির্ব্বোধ নিরক্ষর বালকের সহিত খেলা করিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করে তাহাতেই বা তাঁহার ক্ষতি কি? তাহার কাছে প্রমাণ করিবার আবশ্যক কি যে, তিনি বিম্বদীপ নামক মাসিক পত্রে গ্রন্থ সমালোচনা করিয়া থাকেন, এবং তাঁহার তোরঙ্গের মধ্যে এসেন্স, জুতা, রবিনির ক্যাম্বর, রঙীন চিঠির কাগজ এবং "হার্ম্মোনিয়ম শিক্ষা" বহির সঙ্গে একখানি পরিপূর্ণ খাতা নিশীথের গর্ভে ভাবী উষার ন্যায় প্রকাশের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে? কিন্তু মনকে বুঝানো কঠিন এবং এই পল্লিবাসিনী চঞ্চলা মেয়েটির কাছে শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ রায় বি, এ, কিছুতেই পরাভব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে।

সন্ধ্যার সময়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে মা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন রে অপু, মেয়ে কেমন দেখ্‌লি? পছন্দ হয় ত?

অপূর্ব্ব কিঞ্চিৎ অপ্রতিভভাবে কহিল, মেয়ে দেখেছি মা, ওর মধ্যে একটিকে আমার পছন্দ হয়েচে।

মা আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, তুই আবার ক'টি মেয়ে দেখ্‌লি?

অবশেষে অনেক ইতস্তত পর প্রকাশ পাইল প্রতিবেশিনী শরতের মেয়ে মৃণ্ময়ীকে তাঁহার ছেলে পছন্দ করিয়াছে! এত লেখাপড়া শিখিয়া এম্‌নি ছেলের পছন্দ!

প্রথমে অপূর্ব্বর পক্ষে অনেকটা পরিমাণ লজ্জা ছিল, অবশেষে মা যখন প্রবল আপত্তি করিতে লাগিলেন তখন তাহার লজ্জা

ভাঙ্গিয়া গেল। সে রোখের মাথায় বলিয়া বসিল মৃণ্ময়ীকে ছাড়া আর কাহাকেও বিবাহ করিব না। অন্য জড়পুত্তলী মেয়েটিকে সে যতই কল্পনা করিতে লাগিল ততই বিবাহ সম্বন্ধে তাহার বিষম বিতৃষ্ণার উদ্রেক হইল।

দুই তিনদিন উভয়পক্ষে মান অভিমান অনাহার অনিদ্রার পর অপূর্ব্বই জয়ী হইল। মা মনকে বোঝাইলেন যে, মৃণ্ময়ী ছেলে-মানুষ এবং মৃণ্ময়ীর মা উপযুক্ত শিক্ষাদানে অসমর্থ; বিবাহের পর তাঁহার হাতে পড়িলেই তাহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইবে। এবং ক্রমশঃ ইহাও বিশ্বাস করিলেন যে, মৃণ্ময়ীর মুখখানি সুন্দর। কিন্তু তখনি আবার তাহার খর্ব্ব কেশরাশি তাঁহার কল্পনাপথে উদিত হইয়া হৃদয় নৈরাশ্যে পূর্ণ করিতে লাগিল তথাপি আশা করিলেন দৃঢ় করিয়া চুল বাঁধিয়া এবং জবজবে করিয়া তেল লেপিয়া কালে এ ত্রুটিও সংশোধন হইতে পারিবে।

পাড়ার লোকে সকলেই অপূর্ব্বর এই পছন্দটিকে অপূর্ব্ব পছন্দ বলিয়া নামকরণ করিল। পাগ্‌লী মৃণ্ময়ীকে অনেকেই ভালবাসিত কিন্তু তাই বলিয়া নিজের পুত্রের বিবাহযোগ্যা বলিয়া কেহ মনে করিত না।

মৃণ্ময়ীর বাপ ঈশান মজুমদারকে, যথাকালে সংবাদ দেওয়া হইল। সে কোন একটি ষ্টীমার কোম্পানির কেরাণীরূপে দূরে নদীতীরবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র ষ্টেষণে একটি ছোট টীনের ছাদবিশিষ্ট কুটীরে মাল ওঠানো নাবানো এবং টিকিট বিক্রয় কার্য্যে নিযুক্ত ছিল।

তাহার মৃণ্ময়ীর বিবাহ প্রস্তাবে দুই চক্ষু বহিয়া জল পড়িতে লাগিল। তাহার মধ্যে কতখানি দুঃখ এবং কতখানি আনন্দ ছিল পরিমাণ করিয়া বলিবার কোন উপায় নাই।

কন্যার বিবাহ উপলক্ষে ঈশান হেড আফিসের সাহেবের নিকট ছুটি প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত দিল। সাহেব উপলক্ষ্যটা নিতান্তই তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ছুটি নামঞ্জুর করিয়া দিলেন। তখন, পূজার সময় একসপ্তাহ ছুটি পাইবার সম্ভাবনা জানাইয়া সে পর্য্যন্ত বিবাহ স্থগিত রাখিবার জন্য দেশে চিঠি লিখিয়া দিল, কিন্তু অপূর্ব্বর মা কহিল, এই মাসে দিন ভাল আছে আর বিলম্ব করিতে পারিব না।

উভয়তই প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইলে পর ব্যথিতহৃদয় ঈশান আর কোন আপত্তি না করিয়া পূর্ব্বমত মাল ওজন এবং টিকিট বিক্রয় করিতে লাগিল।

অতঃপর মৃণ্ময়ীর মা এবং পল্লির যত বর্ষীয়সীগণ সকলে মিলিয়া ভাবী কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মৃণ্ময়ীকে অহর্নিশি উপদেশ দিতে লাগিল। ক্রীড়াসক্তি, দ্রুতগমন, উচ্চহাস্য, বালকদিগের সহিত আলাপ এবং ক্ষুধা অনুসারে ভোজন সম্বন্ধে সকলেই নিষেধ-পরামর্শ দিয়া বিবাহটাকে বিভীষিকারূপে প্রতিপন্ন করিতে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইল। উৎকণ্ঠিত শঙ্কিতহৃদয় মৃণ্ময়ী মনে করিল তাহার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং তদবসানে ফাঁসির হুকুম হইয়াছে।

সে দুষ্ট পোনি ঘোড়ার মত ঘাড় বাঁকাইয়া পিছু হটিয়া বলিয়া বসিল, আমি বিবাহ করিব না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কিন্তু তথাপি বিবাহ করিতে হইল।

তার পরে শিক্ষা আরম্ভ হইল। একরাত্রির মধ্যে মৃণ্ময়ীর সমস্ত পৃথিবী অপূর্ব্বর মার অন্তঃপুরে আসিয়া আবদ্ধ হইয়া গেল।

শাশুড়ি সংশোধনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। অত্যন্ত কঠিন মুখ করিয়া কহিলেন, দেখ বাছা, তুমি কিছু আর কচি খুঁকি নও, আমাদের ঘরে অমন বেহায়াপনা করিলে চলিবে না।

শাশুড়ি যে ভাবে বলিলেন মৃণ্ময়ী সে ভাবে কথাটা গ্রহণ করিল না। সে ভাবিল এঘরে যদি না চলে তবে বুঝি অন্যত্র যাইতে হইবে। অপরাহ্নে তাহাকে আর দেখা গেল না। কোথায় গেল কোথায় গেল খোঁজ পড়িল। অবশেষে বিশ্বাস-ঘাতক রাখাল তাহাকে তাহার গোপন স্থান হইতে ধরাইয়া দিল। সে বটতলায় রাধাকান্ত ঠাকুরের পরিত্যক্ত ভাঙ্গা রথের মধ্যে গিয়া বসিয়াছিল।

শাশুড়ি, মা এবং পাড়ার সমস্ত হিতৈষিণীগণ মৃণ্ময়ীকে যেরূপ লাঞ্ছনা করিল তাহা পাঠকগণ এবং পাঠিকাগণ সহজেই কল্পনা করিতে পারিবেন।

রাত্রে ঘন মেঘ করিয়া ঝুপ্ ঝুপ্ শব্দে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। অপূর্ব্বকৃষ্ণ বিছানার মধ্যে অতি ধীরে ধীরে মৃণ্ময়ীর নিকট ঈষৎ অগ্রসর হইয়া তাহার কাছে কানে মৃদুস্বরে কহিল, "মৃণ্ময়ী তুমি আমাকে ভালবাস না?"

মৃণ্ময়ী সতেজে বলিয়া উঠিল, "না! আমি তোমাকে কখ্-খনই ভাল বাসব না।" তাহার যত রাগ এবং যত শাস্তিবিধান সমস্তই পুঞ্জীভূত বজ্রের ন্যায় অপূর্ব্বর মাথার উপর নিক্ষেপ করিল।

অপূর্ব্ব ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, "কেন আমি তোমার কাছে কি দোষ করেছি?" মৃণ্ময়ী কহিল, "তুমি আমাকে বিয়ে করলে কেন?"

এ অপরাধের সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দেওয়া কঠিন। কিন্তু

অপূর্ব্ব মনে মনে কহিল, যেমন করিয়া হউক্ এই দুর্বাধ্য মনটিকে বশ করিতে হইবে।

পরদিন শাশুড়ি মৃণ্ময়ীর বিদ্রোহী ভাবের সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া তাহাকে ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিল। সে নূতন পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর মত প্রথম অনেকক্ষণ ঘরের মধ্যে ধড়ফড় করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অবশেষে কোথাও পালাইবার কোন পথ না দেখিয়া নিষ্ফল ক্রোধে বিছানার চাদরখানা দাঁত দিয়া ছিঁড়িয়া কুটি কুটি করিয়া ফেলিল—এবং মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া মনে মনে বাবাকে ডাকিতে ডাকিতে কাঁদিতে লাগিল।

এমন সময়ে ধীরে ধীরে কে তাহার পাশে আসিয়া বসিল। সস্নেহে তাহার ধূলিলুণ্ঠিত চুলগুলি কপোলের উপর হইতে তুলিয়া দিবার চেষ্টা করিল। মৃণ্ময়ী সবলে মাথা নাড়িয়া তাহার হাত সরাইয়া দিল। অপূর্ব্ব কানের কাছে মুখ নত করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "আমি লুকিয়ে দরজা খুলে দিয়েছি। এস আমরা খিড়কির বাগানে পালিয়ে যাই।" মৃণ্ময়ী প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া সতেজে সরোদনে কহিল, "না।" অপূর্ব্ব তাহার চিবুক ধরিয়া মুখ তুলিয়া দিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "একবার দেখ কে এসেছে!" রাখাল ভূপতিত মৃণ্ময়ীর দিকে চাহিয়া হতবুদ্ধির ন্যায় দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। মৃণ্ময়ী মুখ না তুলিয়া অপূর্ব্বর হাত ঠেলিয়া দিল। অপূর্ব্ব কহিল, "রাখাল তোমার সঙ্গে খেলা করতে এসেচে, খেল্‌তে যাবে?" সে বিরক্তি-উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিল, "না।" রাখালও সুবিধা নয় বুঝিয়া কোন মতে ঘর হইতে পালাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। অপূর্ব্ব চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মৃণ্ময়ী কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রান্ত হইয়া

ঘুমাইয়া পড়িল, তখন অপূর্ব্ব গা টিপিয়া বাহির হইয়া দ্বারে শিকল দিয়া চলিয়া গেল।

তাহার পর দিন মৃণ্ময়ী বাপের কাছ হইতে এক পত্র পাইল। তিনি তাঁহার প্রাণপ্রতিমা মৃণ্ময়ীর বিবাহের সময় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই বলিয়া বিলাপ করিয়া নবদম্পতিকে অন্তরের আশীর্ব্বাদ পাঠাইয়াছেন।

মৃণ্ময়ী শাশুড়িকে গিয়া কহিল, "আমি বাবার কাছে যাব।" শাশুড়ি অকস্মাৎ এই অসম্ভব প্রার্থনায় তাহাকে ভৎর্সনা করিয়া উঠিলেন। "কোথায় ওর বাপ থাকে তার ঠিকানা নেই, বলে বাপের কাছে যাব! অনাসৃষ্টি আবদার!" সে উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল। আপনার ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিতান্ত হতাশ্বাস ব্যক্তি যেমন করিয়া দেবতার কাছে প্রার্থনা করে তেমনি করিয়া বলিতে লাগিল, "বাবা, আমাকে তুমি নিয়ে যাও! এখানে আমার কেউ নেই! এখানে থাকলে আমি বাঁচব না।"

গভীর রাত্রে তাহার স্বামী নিদ্রিত হইলে ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া মৃণ্ময়ী গৃহের বাহির হইল। যদিও এক একবার মেঘ করিয়া আসিতেছিল তথাপি জ্যোৎস্না-রাত্রে পথ দেখিবার মত আলোক যথেষ্ট ছিল। বাপের কাছে যাইতে হইলে কোন্ পথ অবলম্বন করিতে হইবে মৃণ্ময়ী তাহার কিছুই জানিত না। কেবল তাহার মনের বিশ্বাস ছিল যে পথ দিয়া ডাকের পত্রবাহক "রানার"গণ চলে সেই পথ দিয়া পৃথিবীর সমস্ত ঠিকানায় যাওয়া যায়। মৃণ্ময়ী সেই ডাকের পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। চলিতে চলিতে শরীর শ্রান্ত হইয়া আসিল রাত্রিও প্রায় শেষ হইল; মনের মধ্যে যখন উসখুস্ করিয়া অনিশ্চিত সুরে [illegible]

পাখী ডাকিবার উপক্রম করিতেছে অথচ নিঃসংশয়ে সময় নির্ণয় করিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ করিতেছে তখন মৃণ্ময়ী পথের শেষে নদীর ধারে একটা বৃহৎ বাজারের মত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। অতঃপর কোন্‌দিকে যাইতে হইবে ভাবিতেছে এমন সময় পরিচিত ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ শুনিতে পাইল। চিঠির থলে কাঁধে করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ডাকের রানার আসিয়া উপস্থিত হইল। মৃণ্ময়ী তাড়াতাড়ি তাহার কাছে গিয়া কাতর শ্রান্তস্বরে কহিল, "কুশীগঞ্জে আমি বাবার কাছে যাব, আমাকে তুমি সঙ্গে নিয়ে চল না!" সে কহিল, "কুশীগঞ্জ কোথায় আমি জানিনে।" এই বলিয়া ঘাটে বাঁধা ডাকনৌকার মাঝিকে জাগাইয়া দিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। তাহার দয়া করিবার বা প্রশ্ন করিবার সময় নাই।

দেখিতে দেখিতে ঘাট এবং বাজার সজাগ হইয়া উঠিল। মৃণ্ময়ী ঘাটে নামিয়া একজন মাঝিকে ডাকিয়া কহিল, "মাঝি, আমাকে কুশীগঞ্জে নিয়ে যাবে?" মাঝি তাহার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই পাশের নৌকা হইতে একজন বলিয়া উঠিল, "আরে কেও? মিনু মা তুমি এখানে কোথা থেকে?" মৃণ্ময়ী উচ্ছ্বসিত ব্যগ্রতার সহিত বলিয়া উঠিল, "বনমালি, আমি কুশীগঞ্জে বাবার কাছে যাব, আমাকে তোর নৌকায় নিয়ে চল্।" বনমালী তাহাদের গ্রামের মাঝি; সে এই উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতি বালিকাটিকে বিলক্ষণ চিনিত, সে কহিল "বাবার কাছে যাবে? সেত বেশ কথা! চল আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্চি।" মৃণ্ময়ী নৌকায় উঠিল।

মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল। মেঘ করিয়া মূষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ভাদ্রমাসের পূর্ণ নদী ফুলিয়া ফুলিয়া নৌকা দোলাইতে লাগিল, মৃণ্ময়ীর সমস্ত শরীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া আসিল; অঞ্চল পাতিয়া সে নৌকার মধ্যে শয়ন করিল, এবং

এই দুরন্ত বালিকা নদী-দোলায় প্রকৃতির স্নেহপালিত শান্ত শিশুটির মত অকাতরে ঘুমাইতে লাগিল।

জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, সে তাহার শ্বশুরবাড়িতে খাটে শুইয়া আছে। তাহাকে জাগ্রত দেখিয়া ঝি বকিতে আরম্ভ করিল। ঝির কণ্ঠস্বরে শাশুড়ি আসিয়া অত্যন্ত কঠিন কঠিন করিয়া বলিতে লাগিলেন। মৃণ্ময়ী বিস্ফারিতনেত্রে নীরবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অবশেষে তিনি যখন তাহার বাপের শিক্ষাদোষের উপর কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, তখন মৃণ্ময়ী দ্রুতপদে পাশের ঘরে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে শিকল বন্ধ করিয়া দিল।

অপূর্ব্ব লজ্জার মাথা খাইয়া মাকে আসিয়া বলিল, "মা বৌকে দুই একদিনের জন্যে একবার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে দোষ কি?"

মা অপূর্ব্বকে ন ভূত ন ভবিষ্যতি ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন, এবং দেশে এত মেয়ে থাকিতে বাছিয়া বাছিয়া এই অস্থিদাহ-কারী দস্যু-মেয়েকে ঘরে আনার জন্য তাহাকে যথেষ্ট গঞ্জনা করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সে দিন সমস্ত দিন বাহিরে ঝড়বৃষ্টি এবং ঘরের মধ্যেও অনুরূপ দুর্য্যোগ চলিতে লাগিল।

তাহার পরদিন গভীর রাত্রে অপূর্ব্ব মৃণ্ময়ীকে ধীরে ধীরে জাগ্রত করিয়া কহিল, "মৃণ্ময়ী, তোমার বাবার কাছে যাবে?"

মৃণ্ময়ী সবেগে অপূর্ব্বর হাত চাপিয়া ধরিয়া সচকিত হইয়া কহিল "যাব।"

অপূর্ব্ব চুপিচুপি কহিল, "তবে এস আমরা দুজনে আস্তে আস্তে পালিয়ে যাই। আমি ঘাটে নৌকা ঠিক করে' রেখেছি।"

মৃণ্ময়ী অত্যন্ত সঙ্কুচিত হৃদয়ে একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। তাহার পর তাড়াতাড়ি উঠিয়া কাপড় ছাড়িয়া বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইল। অপূর্ব্ব তাহার মাতার চিন্তা দূর করিবার জন্য একখানি পত্র রাখিয়া দিয়া দুইজনে বাহির হইল।

মৃণ্ময়ী সেই অন্ধকার রাত্রে জনশূন্য নিস্তব্ধ নির্জ্জন গ্রামপথে এই প্রথম, স্বেচ্ছায় আন্তরিক নির্ভরের সহিত স্বামীর হাত ধরিল; তাহার হৃদয়ের আনন্দ উদ্বেগ সেই সুকোমল স্পর্শযোগে তাহার স্বামীর শিরার মধ্যে সঞ্চারিত হইতে লাগিল!

নৌকা সেই রাত্রেই ছাড়িয়া দিল। অশান্ত হর্ষোচ্ছ্বাস সত্ত্বেও অনতিবিলম্বেই মৃণ্ময়ী ঘুমাইয়া পড়িল। পরদিন কি মুক্তি, কি, আনন্দ! দুইধারে কত গ্রাম, বাজার, শস্যক্ষেত্র, বন, দুইধারে কত নৌকা যাতায়াত করিতেছে। মৃণ্ময়ী প্রত্যেক তুচ্ছ বিষয়ে স্বামীকে সহস্রবার করিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিল। ঐ নৌকায় কি আছে, উহারা কোথা হইতে আসিতেছে, এই জায়গার নাম কি এমন সকল প্রশ্ন যাহার উত্তর অপূর্ব্ব কোন কলেজের বহিতে পায় নাই এবং যাহা তাহার কলিকাতার অভিজ্ঞতায় কুলাইয়া উঠে না। বন্ধুগণ শুনিয়া লজ্জিত হইবেন, অপূর্ব্ব এই সকল প্রশ্নের প্রত্যেকটারই উত্তর করিয়াছিল এবং অধিকাংশ উত্তরের সহিত সত্যের ঐক্য হয় নাই। যথা, সে তিলের নৌকাকে তিসির নৌকা, পাঁচবেড়েকে রায়নগর এবং মুন্সেফের আদালতকে জমিদারী কাছারি বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত বোধ করে নাই। এবং এই সমস্ত ভ্রান্ত উত্তরে বিশ্বস্তহৃদয় প্রশ্নকারিণীর সন্তোষের তিলমাত্র ব্যাঘাত জন্মায় নাই।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় নৌকা কুশীগঞ্জে গিয়া পৌঁছিল। টিনের ঘরে একখানি ময়লা চৌকা কাঁচের লণ্ঠনে তেলের বাতি জ্বালাইয়া ছোট ডেস্কের উপর একখানি চামড়ায় বাঁধা মস্ত খাতা রাখিয়া গা-খোলা ঈশানচন্দ্র টুলের উপর বসিয়া হিসাব লিখিতেছিলেন। এমন সময় নবদম্পতি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মৃণ্ময়ী ডাকিল, "বাবা!" সে ঘরে এমন কণ্ঠধ্বনি এমন করিয়া কখনো ধ্বনিত হয় নাই।

ঈশানের চোখ দিয়া দর্‌দর্ করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। সে কি বলিবে কি করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। তাহার মেয়ে এবং জামাই যেন সাম্রাজ্যের যুবরাজ এবং যুবরাজমহিষী; এই সমস্ত পাটের বস্তার মধ্যে তাহাদের উপযুক্ত সিংহাসন কেমন করিয়া নির্ম্মিত হইতে পারে ইহাই যেন তাহার দিশাহারা বুদ্ধি ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না।

তাহার পর আহারের ব্যাপার—সেও এক চিন্তা। দরিদ্র কেরাণী নিজ হস্তে ডাল ভাতে ভাত পাক করিয়া খায়—আজ এই এমন আনন্দের দিনে সে কি করিবে কি খাওয়াইবে! মৃণ্ময়ী কহিল, "বাবা আজ আমরা সকলে মিলিয়া রাঁধিব।" অপূর্ব্ব এই প্রস্তাবে সাতিশয় উৎসাহ প্রকাশ করিল।

ঘরের মধ্যে স্থানাভাব, লোকাভাব, অন্নাভাব; কিন্তু ক্ষুদ্র ছিদ্র হইতে ফোয়ারা যেমন চতুর্গুণ বেগে উত্থিত হয় তেমনি দারিদ্র্যের সঙ্কীর্ণ মুখ হইতে আনন্দ পরিপূর্ণ ধারায় উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল।

এমনি করিয়া তিন দিন কাটিল। দুই বেলা নিয়মিত ষ্টীমার আসিয়া লাগে, কত লোক কত কোলাহল; সন্ধ্যাবেলায় নদীতীর একেবারে নির্জ্জন হইয়া যায়, তখন কি অবাধ স্বাধীনতা! এবং

তিন জনে মিলিয়া নানা প্রকার যোগাড় করিয়া, ভুল করিয়া, এক করিতে আরেক করিয়া তুলিয়া রাঁধা-বাড়া। তাহার পরে মৃণ্ময়ীর বলয়ঝঙ্কৃত স্নেহ-হস্তের পরিবেশনে শ্বশুর জামাতার একত্রে আহার, এবং গৃহিণীপনার সহস্র ত্রুটি প্রদর্শনপূর্ব্বক মৃণ্ময়ীকে পরিহাস ও তাহা লইয়া বালিকার আনন্দকলহ এবং মৌখিক অভিমান।

অবশেষে অপূর্ব্ব জানাইল আর অধিক দিন থাকা উচিত হয় না। মৃণ্ময়ী করুণস্বরে আরও কিছু দিন সময় প্রার্থনা করিল। ঈশান কহিল কাজ নাই।

বিদায়ের দিন কন্যাকে বুকের কাছে টানিয়া তাহার মাথায় হাত রাখিয়া অশ্রুগদ্‌গদকণ্ঠে ঈশান কহিল, "মা, তুমি শ্বশুর-ঘর উজ্জ্বল করিয়া লক্ষ্মী হইয়া থাকিয়ো। কেহ যেন আমার মীনুর কোন দোষ না ধরিতে পারে!"

মৃণ্ময়ী কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর সহিত বিদায় হইল। এবং ঈশান সেই দ্বিগুণ নিরানন্দ সঙ্কীর্ণ ঘরের মধ্যে ফিরিয়া গিয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস নিয়মিত মাল ওজন করিতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এই অপরাধীযুগল গৃহে ফিরিয়া আসিলে মা অত্যন্ত গম্ভীর-ভাবে রহিলেন, কোন কথাই কহিলেন না। কাহারও ব্যবহারের প্রতি এমন কোন দোষারোপ করিলেন না যাহা সে ক্ষালণ করিবার চেষ্টা করিতে পারে। এই নীরব অভিযোগ এই নিস্তব্ধ অভিমান লৌহভারের মত সমস্ত ঘরকন্নার উপর অটলভাবে চাপিয়া রহিল।

অবশেষে অসহ্য হইয়া উঠিলে অপূর্ব্ব আসিয়া কহিল, "মা, কালেজ খুলেচে এখন আমাকে আইন পড়তে যেতে হবে।"

মা উদাসীন ভাবে কহিলেন "বৌয়ের কি করবে?"

অপূর্ব্ব কহিল "বৌ এখানেই থাক্!"

মা কহিলেন "না বাপু, কাজ নাই! তুমি তাকে তোমার সঙ্গেই নিয়ে যাও।" সচরাচর মা অপূর্ব্বকে তুই সম্ভাষণ করিয়া থাকেন।

অপূর্ব্ব অভিমানক্ষুণ্ণস্বরে কহিল "আচ্ছা!"

কলিকাতা যাইবার আয়োজন পড়িয়া গেল। যাইবার আগের রাত্রে অপূর্ব্ব বিছানায় আসিয়া দেখিল মৃণ্ময়ী কাঁদিতেছে।

হঠাৎ তাহার মনে আঘাত লাগিল। বিষণ্ণ কণ্ঠে কহিল "মৃণ্ময়ী, আমার সঙ্গে কলকাতায় যেতে তোমার ইচ্ছে করচে না?"

মৃণ্ময়ী কহিল—"না।"

অপূর্ব্ব জিজ্ঞাসা করিল "তুমি আমাকে ভালবাস না?" এপ্রশ্নের কোন উত্তর পাইল না। অনেক সময় এই প্রশ্নটির উত্তর অতিশয় সহজ কিন্তু আবার এক এক সময় ইহার মধ্যে মনস্তত্ত্বঘটিত এত জটিলতার সংশ্রব থাকে যে, বালিকার নিকট হইতে তাহার উত্তর প্রত্যাশা করা যায় না।

অপূর্ব্ব প্রশ্ন করিল "রাখালকে ছেড়ে যেতে তোমার মন কেমন করচে?"

মৃণ্ময়ী অনায়াসে উত্তর করিল "হাঁ।"

বালক রাখালের প্রতি এই বি, এ, পরীক্ষোত্তীর্ণ কৃতবিদ্য যুবকের সূচির মত অতি সূক্ষ্ম অথচ অতি সুতীক্ষ্ণ ঈর্ষার উদয়

হইল। কহিল "আমি অনেক কাল আর বাড়ি আসতে পারব না।" এই সংবাদ সম্বন্ধে মৃণ্ময়ীর কোন বক্তব্য ছিল না। "বোধ হয় দু-বৎসর কিম্বা তারো বেশি হতে পারে।" মৃণ্ময়ী আদেশ করিল "তুমি ফিরে আস্‌বার সময় রাখালের জন্যে একটা ভিনমুখো রাজাসের ছুরি কিনে নিয়ে এসো।"

অপূর্ব্ব শয়ান অবস্থা হইতে ঈষৎ উত্থিত হইয়া কহিল "তুমি তা হলে এই খানেই থাক্‌বে?"

মৃণ্ময়ী কহিল "হাঁ, আমি মায়ের কাছে গিয়ে থাক্‌ব।"

অপূর্ব্ব নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল "আচ্ছা, তাই থেকো। যতদিন না তুমি আমাকে আস্‌বার জন্যে চিঠি লিখ্‌বে, আমি আস্‌ব না। খুব খুসি হলে?"

মৃণ্ময়ী এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বাহুল্য বোধ করিয়া ঘুমাইতে লাগিল, কিন্তু অপূর্ব্বর ঘুম হইল না। বালিশ উঁচু করিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়া রহিল।

অনেক রাত্রে হঠাৎ চাঁদ উঠিয়া চাঁদের আলো বিছানার উপর আসিয়া পড়িল। অপূর্ব্ব সেই আলোকে মৃণ্ময়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল। চাহিয়া চাহিয়া মনে হইল যেন রাজকন্যাকে কে রূপার কাঠি ছোঁয়াইয়া অচেতন করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। একবার কেবল সোনার কাঠি পাইলেই এই নিদ্রিত আত্মাটিকে জাগাইয়া তুলিয়া মালা বদল করিয়া লওয়া যায়। রূপার কাঠি হাস্য, আর সোনার কাঠি অশ্রুজল।

ভোরের বেলায় অপূর্ব্ব মৃণ্ময়ীকে জাগাইয়া দিল—"কহিল, মৃণ্ময়ী আমার যাইবার সময় হইয়াছে। চল তোমাকে তোমার মার বাড়ি রাখিয়া আসি।"—

মৃণ্ময়ী শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে অপূর্ব্ব তাহার

দুই হাত ধরিয়া কহিল, "এখন আমার একটি প্রার্থনা আছে। আমি অনেক সময় তোমার অনেক সাহায্য করিয়াছি আজ যাইবার সময় তাহার একটি পুরস্কার দিবে?"

মৃণ্ময়ী বিস্মিত হইয়া কহিল, "কি?"

অপূর্ব্ব কহিল, "তুমি ইচ্ছা করিয়া ভালবাসিয়া আমাকে একটি চুম্বন দাও।"

অপূর্ব্বর এই অদ্ভুত প্রার্থনা এবং গম্ভীর মুখভাব দেখিয়া মৃণ্ময়ী হাসিয়া উঠিল। হাস্য সম্বরণ করিয়া মুখ বাড়াইয়া চুম্বন করিতে উদ্যত হইল—কাছাকাছি গিয়া আর পারিল না, খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল—এমন দুইবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে নিরস্ত হইয়া মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল। শাসনচ্ছলে অপূর্ব্ব তাহার কর্ণমূল ধরিয়া নাড়িয়া দিল।

অপূর্ব্বর বড় কঠিন পণ। দস্যুবৃত্তি করিয়া কাড়িয়া লুঠিয়া লওয়া সে আত্মাবমাননা মনে করে। সে দেবতার ন্যায় সগৌরবে থাকিয়া স্বেচ্ছানীত উপহার চায়, নিজের হাত দিয়া কিছুই তুলিয়া লইবে না। অত্যধিক হৃদয়-রস-লালসায় হৃদয়ের সংযোগ ব্যতীত কোন সামগ্রীই তাহার মুখে রুচে না।

মৃণ্ময়ী আর হাসিল না। তাহাকে প্রত্যূষের আলোকে নির্জ্জন পথ দিয়া তাহার মার বাড়ি রাখিয়া অপূর্ব্ব গৃহে আসিয়া মাতাকে কহিল, "ভাবিয়া দেখিলাম, বৌকে আমার সঙ্গে কলিকাতায় লইয়া গেলে আমার পড়াশুনার ব্যাঘাত হইবে, সেখানে উহারও কেহ সঙ্গিনী নাই। তুমি ত তাহাকে এ বাড়িতে রাখিতে চাও না আমি তাই তাহার মার বাড়িতেই রাখিয়া আসিলাম।"

সুগভীর অভিমানের মধ্যে মাতাপুত্রের বিচ্ছেদ হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মার বাড়িতে আসিয়া মৃণ্ময়ী দেখিল কিছুতেই আর মন লাগিতেছে না। সে বাড়ির আগাগোড়া যেন বদল হইয়া গেছে। সময় আর কাটে না। কি করিবে কোথায় যাইবে কাহার সহিত দেখা করিবে ভাবিয়া পাইল না।

মৃণ্ময়ীর হঠাৎ মনে হইল যেন সমস্ত গৃহে এবং সমস্ত গ্রামে কেহ লোক নাই। যেন মধ্যাহ্নে সূর্য্যগ্রহণ হইল। কিছুতেই বুঝিতে পারিল না, আজ কলিকাতায় চলিয়া যাইবার জন্য এত প্রাণপণ ইচ্ছা করিতেছে কাল রাত্রে এই ইচ্ছা কোথায় ছিল! কাল সে জানিত না যে, জীবনের যে অংশ পরিহার করিয়া যাইবার জন্য এত মন-কেমন করিতেছিল তৎপূর্ব্বেই তাহার সম্পূর্ণ স্বাদ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। গাছের পক্কপত্রের ন্যায় আজ সেই বৃন্তচ্যুত অতীত জীবনটাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক অনায়াসে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিল।

গল্পে শুনা যায়, নিপুণ অস্ত্রকার এমন সূক্ষ্ম তরবারী নির্ম্মাণ করিতে পারে যে, তদ্দ্বারা মানুষকে দ্বিখণ্ড করিলেও সে জানিতে পারে না, অবশেষে নাড়া দিলে দুই অর্দ্ধখণ্ড ভিন্ন হইয়া যায়। বিধাতার তরবারী সেইরূপ সূক্ষ্ম, কখন্ তিনি মৃণ্ময়ীর বাল্য ও যৌবনের মাঝখানে আঘাত করিয়াছিলেন সে জানিতে পারে নাই; আজ কেমন করিয়া নাড়া পাইয়া বাল্য-অংশ যৌবন হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িল এবং মৃণ্ময়ী বিস্মিত হইয়া ব্যথিত হইয়া চাহিয়া রহিল।

মাতৃগৃহে তাহার সেই পুরাতন শয়ন-গৃহকে আর আপনার বলিয়া মনে হইল না, সেখানে যে থাকিত সে হঠাৎ আর নাই।

এখন হৃদয়ের সমস্ত স্মৃতি সেই আর একটা বাড়ি আর একটা ঘর আর একটা শয্যার কাছে গুন্‌গুন্‌ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

মৃণ্ময়ীকে আর কেহ বাহিরে দেখিতে পাইল না। তাহার হাস্যধ্বনি আর শুনা যায় না। রাখাল তাহাকে দেখিলে ভয় করে। খেলার কথা মনেও আসে না।

মৃণ্ময়ী মাকে বলিল, "মা আমাকে শ্বশুর-বাড়ি রেখে আয়।"

এদিকে, বিদায়কালীন্ পুত্রের বিষণ্ণমুখ স্মরণ করিয়া অপূর্ব্বর মার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। সে যে রাগ করিয়া বৌকে বেহানের বাড়ি রাখিয়া আসিয়াছে ইহা তাঁহার মনে বড়ই বিঁধিতে লাগিল।

হেনকালে একদিন মাথায় কাপড় দিয়া মৃণ্ময়ী ম্লানমুখে শাশুড়ির পায়ের কাছে পড়িয়া প্রণাম করিল। শাশুড়ি তৎক্ষণাৎ ছলছলনেত্রে তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে উভয়ের মিলন হইয়া গেল। শাশুড়ি বধূর মুখের দিকে চাহিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। সে মৃণ্ময়ী আর নাই। এমন পরিবর্ত্তন সাধারণতঃ সকলের সম্ভব নহে। বৃহৎ পরিবর্ত্তনের জন্য বৃহৎ বলের আবশ্যক।

শাশুড়ি স্থির করিয়াছিলেন, মৃণ্ময়ীর দোষগুলি একটি একটি করিয়া সংশোধন করিবেন, কিন্তু আর একজন অদৃশ্য সংশোধনকর্ত্তা একটি অজ্ঞাত সংক্ষেপ উপায় অবলম্বন করিয়া মৃণ্ময়ীকে যেন নূতন জন্ম পরিগ্রহ করাইয়া দিলেন।

এখন শাশুড়িকেও মৃণ্ময়ী বুঝিতে পারিল, শাশুড়িও মৃণ্ময়ীকে চিনিতে পারিলেন; তরুর সহিত শাখাপ্রশাখার যেরূপ মিল, সমস্ত ঘরকন্না তেমনি পরস্পর অখণ্ডসম্মিলিত হইয়া গেল।

এই যে একটি গম্ভীর স্নিগ্ধ বিশাল রমণীপ্রকৃতি মৃণ্ময়ীর

সমস্ত শরীরে ও সমস্ত অন্তরে রেখায় রেখায় ভরিয়া ভরিয়া উঠিল ইহাতে তাহাকে যেন বেদনা দিতে লাগিল। প্রথম আষাঢ়ের শ্যামসজল নব মেঘের মত তাহার হৃদয়ে একটি অশ্রুপূর্ণ বিস্তীর্ণ অভিমানের সঞ্চার হইল। সেই অভিমান তাহার চোখের ছায়াময় সুদীর্ঘ পল্লবের উপর আর একটি গভীরতর ছায়া নিক্ষেপ করিল। সে মনে মনে বলিতে লাগিল, আমি আমাকে বুঝিতে পারি নাই বলিয়া তুমি আমাকে বুঝিলে না কেন? তুমি আমাকে শাস্তি দিলে না কেন? তোমার ইচ্ছানুসারে আমাকে চালনা করাইলে না কেন? আমি রাক্ষসী যখন তোমার সঙ্গে কলিকাতায় যাইতে চাহিলাম না তুমি আমাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গেলে না কেন? তুমি আমার কথা শুনিলে কেন, আমার অনুরোধ মানিলে কেন, আমার অবাধ্যতা সহিলে কেন?

তাহার পর, অপূর্ব্ব যেদিন প্রভাতে পুষ্করিণীতীরের নির্জ্জন পথে তাহাকে বন্দী করিয়া কিছু না বলিয়া একবার কেবল তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল সেই পুষ্করিণী সেই পথ সেই তরুতল সেই প্রভাতের রৌদ্র এবং সেই হৃদয়ভারাবনত গভীর দৃষ্টি তাহার মনে পড়িল এবং হঠাৎ সে তাহার সমস্ত অর্থ বুঝিতে পারিল। তাহার পর, সেই বিদায়ের দিনের যে চুম্বন অপূর্ব্বর মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, সেই অসম্পূর্ণ চুম্বন এখন মরুমরীচিকাভিমুখী তৃষার্ত্ত পাখীর ন্যায় ক্রমাগত সেই অতীত অবসরের দিকে ধাবিত হইতে লাগিল কিছুতেই তাহার আর পিপাসা মিটিল না। এখন থাকিয়া থাকিয়া মনে কেবল উদয় হয়, আহা, অমুক সময়টিতে যদি এমন করিতাম, অমুক প্রশ্নের যদি এই উত্তর দিতাম, তখন যদি এমন হইত!

অপূর্ব্বর মনে এই বলিয়া ক্ষোভ জন্মিয়াছিল, যে, মৃণ্ময়ী

আমার সম্পূর্ণ পরিচয় পায় নাই; মৃণ্ময়ীও আজ বসিয়া বসিয়া ভাবে, তিনি আমাকে কি মনে করিলেন, কি বুঝিয়া গেলেন! অপূর্ব্ব তাহাকে যে দুরন্ত চপল অবিবেচক নির্ব্বোধ বালিকা বলিয়া জানিল, পরিপূর্ণ হৃদয়ামৃতধারায় প্রেমপিপাসা মিটাইতে সক্ষম রমণী বলিয়া পরিচয় পাইল না ইহাতেই সে পরিতাপে লজ্জায় ধিক্কারে পীড়িত হইতে লাগিল। চুম্বনের এবং সোহাগের যে ঋণগুলি অপূর্ব্বর মাথার বালিশের উপর পরিশোধ করিতে লাগিল। এমনিভাবে কত দিন কাটিল।

অপূর্ব্ব বলিয়া গিয়াছিল, তুমি চিঠি না লিখিলে আমি বাড়ি ফিরিব না। মৃণ্ময়ী তাহাই স্মরণ করিয়া একদিন ঘরে দ্বাররুদ্ধ করিয়া চিঠি লিখিতে বসিল। অপূর্ব্ব তাহাকে যে সোণালি পাড়-দেওয়া রঙীন্ কাগজ দিয়াছিল তাহাই বাহির করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। খুব যত্ন করিয়া ধরিয়া লাইন বাঁকা করিয়া অঙ্গুলিতে কালি মাখিয়া অক্ষর ছোট বড় করিয়া উপরে কোন সম্বোধন না করিয়া একেবারে লিখিল—তুমি আমাকে চিঠি লেখ না কেন। তুমি কেমন আছ আর তুমি বাড়ি এস। আর কি বলিবার আছে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। আসল বক্তব্য কথা সব গুলিই বলা হইয়া গেল বটে, কিন্তু মনুষ্যসমাজে মনের ভাব আর একটু বাহুল্য করিয়া প্রকাশ করা আবশ্যক। মৃণ্ময়ীও তাহা বুঝিল; এই জন্য আরো অনেকক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া আর কয়েকটী নূতন কথা যোগ করিয়া দিল—এইবার তুমি আমাকে চিঠি লিখো, আর কেমন আছ লিখো, আর বাড়ি এস, মা ভাল আছেন বিশু পুঁটি ভাল আছে, কাল আমাদের কালোগরুর বাছুর হয়েছে।—এই বলিয়া চিঠি শেষ করিল। চিঠি লেফাফায় মুড়িয়া প্রত্যেক অক্ষরটির উপর একটি ফোঁটা করিয়া মনের ভালবাসা

দিয়া লিখিল শ্রীযুক্ত বাবু অপূর্ব্বকৃষ্ণ রায়। ভালবাসা যতই দিক, তবু লাইন সোজা, অক্ষর সুছাঁদ এবং বানান শুদ্ধ হইল না।

লেফাফায় নামটুকু ব্যতীত আরো যে কিছু লেখা আবশ্যক মৃণ্ময়ীর তাহা জানা ছিল না। পাছে শাশুড়ি অথবা আর কাহারো দৃষ্টিপথে পড়ে সেই লজ্জায় চিঠিখানি একটি বিশ্বস্ত দাসীর হাত দিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিল।

বলা বাহুল্য, এ পত্রের কোন ফল হইল না, অপূর্ব্ব বাড়ি আসিল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মা দেখিলেন ছুটি হইল তবু অপূর্ব্ব বাড়ি আসিল না। মনে করিলেন এখনো সে তাঁহার উপর রাগ করিয়া আছে।

মৃণ্ময়ীও স্থির করিল অপূর্ব্ব তাহার উপর বিরক্ত হইয়া আছে। তখন আপনার চিঠিখানি মনে করিয়া সে লজ্জায় মরিয়া যাইতে লাগিল। সে চিঠিখানা যে কত তুচ্ছ, তাহাতে যে কোন কথাই লেখা হয় নাই, তাহার মনের ভাব যে কিছুই প্রকাশ হয় নাই, সেটা পাঠ করিয়া অপূর্ব্ব যে মৃণ্ময়ীকে আরো ছেলেমানুষ মনে করিতেছে, মনে মনে আরো অবজ্ঞা করিতেছে, ইহা ভাবিয়া সে শরবিদ্ধের ন্যায় অন্তরে অন্তরে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। দাসীকে বারবার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে চিঠিখানা তুই কি ডাকে দিয়ে এসেছিস্?" দাসী তাহাকে সহস্রবার আশ্বাস দিয়া কহিল "হাঁগো, আমি নিজের হাতে বাক্সের মধ্যে ফেলে দিয়েছি। বাবু সে এত দিনে কোন্ কালে পেয়েছেন।"

অবশেষে অপূর্ব্বর মা একদিন মৃণ্ময়ীকে ডাকিয়া কহিলেন, "বৌমা, অপু অনেক দিন ত বাড়ি এল না, তাই মনে করচি

একবার কলকাতায় গিয়ে তাকে দেখে' আসি গে। তুমি সঙ্গে যাবে?" মৃণ্ময়ী সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল এবং ঘরের মধ্যে আসিয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া বিছানার উপর পড়িয়া বালিশখানা বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া হাসিয়া নড়িয়া চড়িয়া মনের আবেগ উন্মুক্ত করিয়া দিল; তাহার পর ক্রমে গম্ভীর হইয়া বিষণ্ণ হইয়া আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

অপূর্ব্বকে কোন খবর না দিয়া এই দুটি অনুতপ্তা রমণী তাহার প্রসন্নতা ভিক্ষা করিবার জন্য কলিকাতায় যাত্রা করিল। অপূর্ব্বর মা সেখানে তাঁহার জামাইবাড়িতে গিয়া উঠিলেন।

সেদিন মৃণ্ময়ীর পত্রের প্রত্যাশায় নিরাশ হইয়া সন্ধ্যাবেলায় অপূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া নিজেই তাহাকে পত্র লিখিতে বসিয়াছে। কোন কথাই পছন্দসত হইতেছে না। এমন একটা সম্বোধন খুঁজিতেছে যাহাতে ভালবাসাও প্রকাশ হয় অথচ অভিমানও ব্যক্ত করে; কথা না পাইয়া মাতৃভাষার উপর অশ্রদ্ধা দৃঢ়তর হইতেছে। এমন সময় ভগ্নীপতির নিকট হইতে পত্র পাইল, মা আসিয়াছেন, শীঘ্র আসিবে এবং রাত্রে এইখানেই আহারাদি করিবে। সংবাদ সমস্ত ভাল।—শেষ আশ্বাসসত্ত্বেও অপূর্ব্ব অমঙ্গলশঙ্কায় বিমর্ষ হইয়া উঠিল। অবিলম্বে ভগ্নীর বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল।

সাক্ষাৎমাত্রই মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, সব ভাল ত?" মা কহিলেন, "সব ভাল। তুই ছুটিতে বাড়ি গেলি না, তাই আমি তোকে নিতে এসেচি।"

অপূর্ব্ব কহিল, সে জন্য এত কষ্ট করিয়া আসিবার কি আবশ্যক ছিল; আইন পরীক্ষার পড়াশুনা ইত্যাদি ইত্যাদি।

আহারের সময় ভগ্নী জিজ্ঞাসা করিল, দাদা এবার বৌকে তোমার সঙ্গে আন্‌লে না কেন ?

দাদা গম্ভীরভাবে কহিতে লাগিল—আইনের পড়াশুনা ইত্যাদি।

ভগ্নীপতি হাসিয়া কহিল—ও সমস্ত মিথ্যা ওজর! আমাদের ভয়ে আন্‌তে সাহস হয় না!

ভগ্নী কহিল, ভয়ঙ্কর লোকটাই বটে! ছেলেমানুষ হঠাৎ দেখ্‌লে আচম্‌কা আঁৎকে উঠ্‌তে পারে!

এই ভাবে হাস্য পরিহাস চলিতে লাগিল, কিন্তু অপূর্ব্ব অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া রহিল। কোন কথা তাহার ভাল লাগিতেছিল না। তাহার মনে হইতেছিল, সেই যখন মা কলিকাতায় আসিলেন তখন মৃণ্ময়ী ইচ্ছা করিলে অনায়াসে তাঁহার সহিত আসিতে পারিত। বোধ হয় মা তাহাকে সঙ্গে আনিবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন কিন্তু সে সম্মত হয় নাই। এ সম্বন্ধে সঙ্কোচবশতঃ মাকে কোন প্রশ্ন করিতে পারিল না—সমস্ত মানবজীবন এবং বিশ্বরচনাটা আগাগোড়া ভ্রান্তিসঙ্কুল বলিয়া বোধ হইল।

আহারান্তে প্রবলবেগে বাতাস উঠিয়া বিষম বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

ভগ্নী কহিল, দাদা, আজ আমাদের এখানেই থেকে যাও।

দাদা কহিল, না বাড়ি যেতে হবে; কাজ আছে।

ভগ্নীপতি কহিল, রাত্রে তোমার আবার এত কাজ কিসের? এখানে একরাত্রি থেকে গেলে তোমার ত কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না, তোমার ভাবনা কি?

অনেক পীড়াপীড়ির পর বিস্তর অনিচ্ছাসত্ত্বে অপূর্ব্ব সে রাত্রি থাকিয়া যাইতে সম্মত হইল।

ভগ্নী কহিল, দাদা তোমাকে শ্রান্ত দেখাচ্ছে, তুমি আর দেরি কোরো না, চল শুতে চল।

অপূর্ব্বরও সেই ইচ্ছা। শয্যাতলে অন্ধকারের মধ্যে একলা হইতে পারিলে বাঁচে, কথার উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে ভাল লাগিতেছে না।

শয়নগৃহের দ্বারে আসিয়া দেখিল ঘর অন্ধকার। ভগ্নী কহিল, বাতাসে আলো নিবে গেছে দেখ্‌চি, তা আলো এনে দেব কি দাদা?

অপূর্ব্ব কহিল, না দরকার নেই, আমি রাত্রে আলো রাখিনে।

ভগ্নী চলিয়া গেলে অপূর্ব্ব অন্ধকারে সাবধানে খাটের অভিমুখে গেল।

খাটে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইতেছে এমন সময় হঠাৎ তাহার বক্ষবিলম্বিত একটি সুকোমল বাহুপাশ তাহাকে সুকঠিন বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিল এবং একটি পুষ্পপুটতুল্য ওষ্ঠাধর দস্যুর মত আসিয়া পড়িয়া অবিরল অশ্রুজলসিক্ত আবেগপূর্ণ চুম্বনে তাহাকে বিস্ময় প্রকাশের অবসর দিল না। অপূর্ব্ব প্রথমে চমকিয়া উঠিল তাহার পর বুঝিতে পারিল অনেক দিনের একটি হৃদ্যবাধায় অসম্পন্ন চেষ্টা আজ অশ্রুজলধারায় সমাপ্ত হইল।

ব্যায়াম-বিজ্ঞান।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা ব্যক্তি বিশেষের শারীরিক আবশ্যক বিশেষের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, সাধারণ ভাবে নানা জাতীয় ব্যায়ামের উপকারিতা নির্ণয় করিবার উপায় সম্বন্ধে আলোচনা

করিয়াছিলাম। আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম যে, যে ব্যায়ামগুলিতে প্রত্যেক অঙ্গ নিজ ক্ষমতা অনুসারে খাটে, সেইগুলি শরীর ভাল রাখিবার পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

কিন্তু লোকে যখন ব্যায়াম করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন অনেক সময়ে শরীর ভাল হওয়া ছাড়া আরও কতকগুলি বিশেষ ফল প্রত্যাশা করে। যাহারা মোটা তাহারা রোগা হইতে চাহে। এবং যাহারা ক্ষীণ তাহারা পুষ্ট হইতে চাহে। যাহাদের অতিরিক্ত মস্তিষ্কের পরিশ্রম করিতে হয় তাহারা শারীরিক পরিশ্রমে বিশ্রাম চাহে। এবং যাহাদের আলস্যবশতঃ শরীর মনের জড়তা উপস্থিত হইয়াছে তাহারা উভয়েরই স্ফূর্ত্তি চাহে। এই সকল ভিন্ন রকমের ফল কোন্ জাতীয় পরিশ্রমের সাহায্যে কতদূর পাওয়া যাইতে পারে তাহা এখন দেখা যাক্।

একটি সদ্য-মৃত পশুর কিয়ৎ পরিমাণ মাংসপেশী বাহির করিয়া লইয়া, উহাকে চোখের সামনে সঙ্কুচিত করাইয়া অনেকটা জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়। এই মাংসপেশী যখন শরীরের মধ্যে থাকিয়া কার্য্য করিত, তখন উহা স্নায়ুস্থিত মস্তিষ্কজনিত শক্তির দ্বারা চালিত হইত। এক্ষণে আমরা উহার উপর টান রাখিবার নিমিত্ত একটি ভার ঝুলাইয়া, উহাকে তাড়িৎযন্ত্রের তারের সহিত যোগ করিয়া দিলে, তাড়িৎশক্তির দ্বারা উত্তেজিত করিয়া পরীক্ষা করিতে পারিব। এই অবস্থায় একটি তাড়িতাঘাত দিলে উহা সঙ্কুচিত হইয়া ভারটাকে তুলিবে। কিছুক্ষণ ধরিয়া যতবার এইরূপ তাড়িতাঘাত পাইবে ততবার উক্ত মাংসপেশী ভার তুলিবে। কিন্তু ক্রমাগত এইরকম করিতে থাকিলে একসময় দেখা যাইবে যে, তুলিবার শক্তি কম হইয়া আসিতেছে এবং ক্রমে আমরা পূর্ব্ববৎ তাড়ি-

আঘাত দিলেও উহাতে আর কোনরূপ ক্রিয়া দেখা যাইবে না; তখন কি বুঝিতে হইবে যে, মাংসপেশী একেবারে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে? তাহা নহে, দেখা যাইবে যে, প্রবলতর আঘাত দিলেই উহা পুনরায় সক্রিয় হইয়া উঠিবে এবং ভার তুলিতে সক্ষম হইবে। উহাকে যত বেশীক্ষণ খাটান যাইবে উহা ততই শ্রান্ত হইতে থাকিবে এবং সেই অনুসারে তাড়িতাঘাতের মাত্রা বাড়াইয়া চলিতে হইবে। অবশেষে যখন উহা শ্রান্তির শেষ সীমায় উপস্থিত হইবে তখন যতই প্রবল আঘাত দেওয়া যাক্ না কেন, উহার আর সঙ্কোচনের ক্ষমতা থাকিবে না। শ্রান্তির কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখা যাইবে যে, মাংসপেশীর সঙ্কোচের সময়ে উহার মধ্যে পরিবর্ত্তন হইতে থাকে এবং এক-প্রকার পদার্থ জন্মায় যাহার প্রভাবে উহার সঙ্কোচন-শক্তির হ্রাস হইতে থাকে। ইহার প্রমাণ এই যে, উক্ত পরিবর্ত্তনজনিত পদার্থ লইয়া জীবিত জন্তুর শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলে, সে জন্তুর মাংসপেশীতে শ্রান্তির সকল লক্ষণ দেখা যাইবে। কোন শ্রান্ত মাংসপেশী হইতে এই শ্রান্তিজনক পদার্থ না দূর করিতে পারিলে উহার কার্য্য করিবার ক্ষমতা একেবারেই লোপ পায়। শরীরের মধ্যে থাকিলে শ্রান্ত মাংসপেশী কিছু কাল বিশ্রাম পাইলেই রক্তপ্রবাহের দ্বারা এই পদার্থ স্থানান্তরিত হয় এবং উক্ত মাংসপেশী কার্য্য করিবার ক্ষমতা ফিরাইয়া পায়।

শরীরের মধ্যে থাকিলে কোন মাংসপেশীর সম্পূর্ণ শ্রান্তির অবস্থা ঘটিতে পায় না—নানা কারণে ইহার পূর্ব্বেই উহা কার্য্য বন্ধ করিতে বাধ্য হয়। এক এক কোন এক মাংসপেশী বেশীক্ষণ নড়াচড়া করিলেই উহার পার্শ্ববর্ত্তী সহযোগী মাংসপেশী ও স্নায়ুসকল প্রবল সংঘর্ষণের দ্বারা ক্রমে বিকৃত হইয়া পড়ে

এবং সেই নিমিত্ত সে স্থানে ব্যথা বোধ হওয়াতে লোকে কার্য্য বন্ধ করে। ব্যথা অগ্রাহ্য করিয়া যদি কার্য্য চালান হয়, তাহা হইলেও মাংসপেশী শ্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই মানসিক শ্রান্তির নিমিত্ত কার্য্য স্থগিত হয়।

আমরা দেখিয়াছি যে, মাংসপেশীকে উত্তেজিত করিতে হইলে ক্রমে তাড়িতাঘাতের মাত্রা বাড়াইয়া চলিতে হয়। শরীরের ভিতরেও সেইরূপ ইচ্ছাশক্তিজনিত স্নায়বীয় আঘাত ক্রমে বাড়াইয়া চলিতে হয়। সুতরাং মাংসপেশী যতই শ্রান্ত হইতে থাকে, ইচ্ছাশক্তি, নিজ ক্ষমতা প্রচার করিবার নিমিত্ত, মস্তিষ্কের মধ্যে ততই প্রবলরূপে আন্দোলন উপস্থিত করায়। এই ইচ্ছাশক্তির আন্দোলনকে আমরা সচরাচর "মনের জোর করা" বলিয়া থাকি। আমরা যখন বলি যে, আমাদের কোন অঙ্গ শ্রান্ত হইয়াছে, তখন বাস্তবিক মাংসপেশী শ্রান্ত হইয়া থাকিলে, মনের জোর করিয়া কোন ফল হইত না—উহা মনের শ্রান্তি বলিয়াই আমরা মনের জোর করিয়া শ্রান্তিসত্ত্বেও কিছুকাল কার্য্য করিতে পারি।

এই কথার প্রমাণস্বরূপ দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, হাত তুলিয়া অধিকক্ষণ সম্মুখে প্রসারিত ভাবে রাখা বড়ই কঠিন, কিছুক্ষণ বাদে খুব জোয়ান লোকেরও মনে হইবে যে, হাত নিতান্তই শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে; এই অবস্থায় যদি হাতের মাংসপেশীর মধ্যে দিয়া একটি তাড়িৎ-প্রবাহ চালান যায় তাহা হইলে মনে হইবে যেন সকল শ্রান্তি দূর হইয়া গেল। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, ইচ্ছাশক্তির উত্তেজনার হ্রাস হওয়াতেই শ্রান্তি অনুভব হইতেছিল। যুদ্ধে হারিয়া যখন সৈন্যদল যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসে তখন

যুদ্ধের উৎসাহটা চলিয়া যাওয়াতে সকলের বড়ই শ্রান্তি বোধ হয়—মনে হয় যেন পায়ের মাংসপেশীর মোটেই কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই। এই সময়ে যদি রব ওঠে যে, বিপক্ষ দল তাড়া করিয়াছে, তাহা হইলে শ্রান্তি কোথায় চলিয়া যায়! প্রাণভয় নামক প্রবল ইচ্ছার দ্বারা চালিত হইয়া হাত পা দ্বিগুণবলে পলায়নের সাহায্য করিতে থাকে। আর একটা মস্ত প্রমাণ এই যে, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন প্রভৃতি যে সকল শারীরিক কার্য্যের ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভর নহে, তাহারা অত শীঘ্র শ্রান্ত হয় না। মেরুদণ্ডের অন্তরস্থিত মস্তিষ্কের ন্যায় পদার্থ ইহাদের চালক। ইচ্ছাশক্তির ন্যায় আমাদের ভিতরকার কোন শক্তি আবশ্যক করে না, বাহ্যিক ঘটনাই ইহাদের উত্তেজক।

আমাদের শরীরের সকল স্থানে দুই দল স্নায়ুর সমাবেশ দেখা যায়। এক দল বাহিরের বার্ত্তাবহ, অপর দল মস্তিষ্কের এবং মেরুদণ্ডগত স্নেহপদার্থের আদেশপ্রেরক। মনে কোন ইচ্ছা উপস্থিত হওয়া ব্যতীত মস্তিষ্ক কোন কার্য্যের আদেশ দিতে পারে না। কিন্তু মেরুমজ্জার কার্য্য করিবার প্রণালী অন্যরূপ। উহাতে যখন কোন বাহ্যিক ঘটনার খবর একটি আঘাতের আকারে আসে তখন সেই আঘাতই রূপান্তরিত হইয়া অন্য স্নায়ুর মধ্য দিয়া আদেশরূপে উপযুক্ত স্থানে গিয়া পৌঁছে। যথা—পেটে খাবার পড়িয়াছে এ খবর মেরুমজ্জার নিকট আসিয়া একটি আঘাত দিলেই অমনি সেই আঘাতই অন্য স্নায়ুর দ্বারা পরিপাকের যন্ত্রের উত্তেজনার নিমিত্ত চালান হইয়া যায়। এই সকল যন্ত্রবৎ কার্য্যে বাহিরের আঘাত যতক্ষণ আসিতে থাকে, ততক্ষণ, মাংসপেশীর পরিশ্রান্তি পর্য্যন্ত, কার্য্য চলিবার কোন বাধা থাকে না।

অভ্যাসে কার্য্য সহজ ও অপেক্ষাকৃত অল্প শ্রান্তিজনক হইবার কারণ ইহা হইতে পাওয়া যায়; অভ্যস্ত কার্য্য ইচ্ছা-শক্তির এবং মস্তিষ্কের ডিপার্টমেণ্ট ছাড়িয়া মেরুমজ্জার অধীন হয়। আমরা যখন প্রথম চলিতে শিখি তখন কতকটা নিম্ন-লিখিতমত ব্যাপার ঘটে। মেরুমজ্জার নিকট মস্তিষ্ক হইতে ইচ্ছাশক্তির আদেশ আসিল যে, একটি পা মাটি ছাড়িয়া উঠুক্। উপযুক্ত স্নায়ুর দ্বারা আদেশ যথাস্থানে প্রেরণ করা হইল, কিন্তু পা উঠিবামাত্র মেরুমজ্জার নিকট খবর আসিল যে, ভারসামঞ্জস্য আর থাকে না, শরীর পড়-পড়। এ খবর মস্তিষ্কের নিকট পাঠান হইল, মস্তিষ্ক বিবেচনা করিয়া কোন্ কোন্ মাংসপেশীর দ্বারা শরীরের কোন্ কোন্ স্থানে টান রাখিতে হইবে, তাহা বলিয়া পাঠাইল। প্রথম প্রথম মস্তিষ্ক নিজেই ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না, তাহার ফলে সকলেরই ছেলেবেলা অনেক আছাড় খাইতে হয়। অবশেষে দুই চার বার বিপদ ঘটিবার পর কিরূপ আদেশ পাঠাইলে কার্য্য ভাল রকম উদ্ধার হইবে মস্তিষ্ক তাহা বুঝিয়া লয়, তখন অবশ্য প্রত্যেকবারেই সেই একই আদেশ যায়। কিছুকাল ক্রমাগত একই আদেশ পাইয়া মেরুমজ্জা কার্য্য শিখিয়া লয় এবং তাহার পর যখন শরীরকে ঠিক রাখা আবশ্যক হইয়া পড়ে তখন সে খবর আর মস্তিষ্কের নিকট না পাঠাইয়া নিজেই তাহার উপযুক্ত বিধান করিয়া পাঠায়। সেই সঙ্গে মেরুমজ্জার ইহাও ধারণা হইয়া যায় যে, একটি পা তুলিয়া ফেলিবার পর অপরটিও তুলিয়া ফেলিতে হইবে, সুতরাং সমস্ত হাঁটার কার্য্যটাই মস্তিষ্কের আদেশ না লইয়া করা হয়। এরূপ অবস্থা হইলে আমরা বলি যে, হাঁটা অভ্যাস হইয়াছে।

অভ্যাস হইলে আর মস্তিষ্কের কোন খাটুনি হয় না। তাহার

প্রমাণ এই যে, চলিতে চলিতে (যদি পথ নির্জ্জন এবং জমি সমান হয়) আমরা অক্লেশে নানা বিষয়ে চিন্তা করিতে পারি। আমরা এইমাত্র দেখিয়াছি যে, আমরা সচরাচর যে শ্রান্তি অনুভব করি তাহা মনেরই শ্রান্তি, মাংসপেশীর নহে; সুতরাং অভ্যস্ত কার্য্যে মনের খাটুনি বাদ যাওয়াতে অপেক্ষাকৃত অল্প শ্রান্তি বোধ হয়।

অভ্যাসে আর এক উপায়েও শ্রান্তি লাঘব হয়। যাঁহারা জিম্নাষ্টিক্‌স্ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন এবং যাঁহারা করেন নাই তাঁহারা অনায়াসে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন যে, হরিণটাল বারের উপর হাত দিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে, সামনের দিকে গা ঘুরাইয়া বারের উপর তোলা সর্ব্বপ্রথম চেষ্টায় বড়ই কঠিন। কিন্তু অভ্যাসের পর অতি দুর্ব্বল লোকেও সে কার্য্য অনায়াসেই করিতে পারে। ইহার কারণ এই যে, এরূপ কার্য্য নিতান্ত অনভ্যস্ত এবং অস্বাভাবিক হওয়াতে মস্তিষ্ক প্রথমটা ভাবিয়া পায় না যে, কোন্ কোন্ মাংসপেশীকে সঙ্কোচ করিবার আদেশ পাঠাইলে এ কার্য্য সুসিদ্ধ হইবে। প্রথম দুই এক পরীক্ষায় ভুল আদেশ যাওয়াতে হাত পা নানাদিকে নড়ে চড়ে, কিন্তু অভিলষিত কার্য্যের কোনই সুবিধা হয় না। তাহার পর হয় ত অনুপযুক্ত মাংসপেশীকে হুকুম দেওয়াতে আবশ্যকের অধিক বলপ্রয়োগ করিতে হয়। কতকবার ভুলের পর এক সময়ে হঠাৎ ঠিক স্থানে আদেশ গিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহার পর হইতে কার্য্যটা নিতান্ত সহজ বলিয়া বোধ হয়।

যে সকল জ্ঞান লাভ করা গেল তাহা এক্ষণে খাটাইবার চেষ্টা করা যাক্। প্রত্যেক প্রচলিত শরীরচালনার বিষয়ে স্বতন্ত্র করিয়া বিবেচনা না করিয়া মোটামুটি দেখিলেই সুবিধা হইবে।

ব্যায়ামসকলকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—বলপ্রধান, বেগপ্রধান এবং ধৈর্য্যপ্রধান।

যে সকল ব্যায়ামে অনেকগুলি মাংসপেশী সজোরে অথচ মন্দগতিতে কার্য্য করিতে থাকে সেইগুলিকে আমরা বলপ্রধান বলিতেছি। যথা, কুস্তি, * ভারি ডম্বেল ভাঁজা ইত্যাদি। কিন্তু জিম্‌ন্যাষ্টিক্সের অধিকাংশ খেলাকে এ দলভুক্ত করা যায় না, কারণ, আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, উহাতে মস্তিষ্কের খাটুনিই বেশীর ভাগ। প্রত্যেক খেলার বিশেষ ফন্দি আছে, সেটি অভ্যাস করিয়া ফেলিলেই কার্য্যটা সহজ হইয়া যায়। বলপ্রধান ব্যায়ামগুলিতে শরীরের সকল স্থানে এবং হৃৎপিণ্ড ফুসফুস প্রভৃতি যন্ত্রে বিশেষরূপ চাড় লাগে, সেই জন্য, যাহাদের সকল শারীরিক যন্ত্র এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি বেশ সুস্থ অবস্থায় নাই তাহাদের এ জাতীয় ব্যায়ামের উপকারিতা হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইবে। নহিলে কোন দুর্ব্বল স্থানে অতিরিক্ত চাড় লাগিয়া বিপদ ঘটিতে পারে। এই বলপ্রধান ব্যায়ামগুলিতে মাংসপেশীর ক্ষয় খুব হয় বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে ততোধিক পুষ্টিও হয়। কারণ, উহারা সজোরে সঙ্কোচ করার দরুণ উহাদের দিকে খুব অধিক পরিমাণে রক্ত ধাবিত হয় এবং কার্য্য ধীরে ধীরে সম্পন্ন হওয়াতে উহাদের নিকট রক্ত অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়; সুতরাং ইহারা সার শোষণ করিবার যথেষ্ট সুবিধা পায়। এ সকল ব্যায়াম যাহারা নিয়মিত করে তাহাদের ওজন খুব বাড়িয়া উঠিতে দেখা যায়।

---

* কুস্তিকে একটু নিম্ন স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য, কারণ, উহাতে অনেকটা প্যাঁচের উপর নির্ভর করাতে, কতকটা মানসিক পরিশ্রমও আসিয়া পড়ে; তাহা ছাড়া উহাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার দরুণ পরিমাণ রক্ষা করিয়া চলা বড় কঠিন।

কিন্তু একটি বিষয়ে সাবধান থাকা উচিত। মাংসপেশীগুলির খুব জোরে সঙ্কোচ করা উচিত বটে কিন্তু দুইবার সঙ্কোচনের মধ্যে একটু করিয়া বিশ্রামের অবসর থাকা আবশ্যক। কারণ, মাংসপেশী শ্রান্ত হইতে আরম্ভ হইলে মস্তিষ্কের খাটুনি বাড়ান আবশ্যক হইয়া পড়ে এবং মস্তিষ্কের খাটুনি বেশী হইলে আর ক্ষয়ের অধিক পুষ্টি হইবে না। রক্ত তখন স্নায়ু প্রভৃতি লইয়া অনেকটা ব্যস্ত থাকিবে এবং স্নায়ু যতক্ষণ শ্রান্ত অবস্থায় থাকিবে ততক্ষণ ঘুম, হজম প্রভৃতি শারীরিক ক্রিয়াসকলের ব্যাঘাত হওয়াতে মাংসপেশীর পুষ্টিকার্য্যে বিশেষ বাধা ঘটিবে। শরীর পুষ্ট না হইয়া ক্রমে ক্ষীণ হইতে থাকিবে। এই নিমিত্ত নিজের সহজসাধ্যের অতীত কখনো চেষ্টা করা উচিত নহে।

এতগুলি বাধাবিঘ্ন না থাকিলে বলপ্রধান ব্যায়ামগুলিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারিত। তবে সাবধান হইয়া পরিশ্রমের মাত্রা অল্প অল্প করিয়া বুঝিয়া বুঝিয়া বাড়াইতে পারিলে এ সকল দোষ অনেক পরিমাণে এড়ান যায়।

যে সকল ব্যায়ামে মাংসপেশীগুলি দ্রুতবেগে অথচ অল্প পরিমাণে কার্য্য করিতে থাকে সেগুলিকে বেগপ্রধান বলা যাইতেছে। সমতল জমিতে দৌড়ান ইহার এক প্রধান দৃষ্টান্ত। প্রতি পদক্ষেপে অল্পই পরিশ্রম হয় কিন্তু দ্রুতবেগ বশতঃ শীঘ্রই অনেকখানি পরিশ্রম হইয়া উঠে। এই ব্যায়ামগুলিতে স্নায়ুর খাটুনিই অধিক। মস্তিষ্ক হইতে যখন মাংসপেশীদের প্রতি সঙ্কোচ করিবার আদেশ যায় তখন সে আদেশ তৎক্ষণাৎ পালিত হয় না। তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে মাংসপেশীর একটু সময় লাগে। আঘাতের তীব্রতার উপর এই বিলম্বের পরিমাণ নির্ভর করে। তাই দ্রুতবেগে কার্য্য করাইতে হইলে মস্তিষ্কের খুব প্রবল রক্ত

আঘাত প্রেরণ করিতে হয়, যে পরিমাণে মাংসপেশী খাটিতেছে মস্তিষ্ককে তাহার অধিক খাটিতে হয়। মাংসপেশীগুলি অল্প খাটাতে অল্প রক্ত আকর্ষণ করে এবং স্নায়ু প্রভৃতি গুলি অধিক খাটাতে পুষ্টিকার্য্যের ব্যাঘাত হয়।

বেগপ্রধান ব্যায়ামগুলির হাঁপধরাটাও আর একটি প্রধান অঙ্গ; হাঁপাইবার সময়ে অধিক অম্লজান শরীরে প্রবেশ করিয়া বাজে পদার্থ সকল পুড়াইয়া ফেলে। শরীরের বাজে পদার্থ আমরা কোন্‌গুলাকে বলিতেছি তাহা বুঝান আবশ্যক। আমরা যদি ঠিক যতটা আবশ্যক ততটা আহার করিতাম তাহা হইলে খাদ্যের সমস্ত সারাংশ কোন-না-কোন কাজে লাগিয়া যাইত—কিন্তু সেইরূপ পরিমাণ বুঝিয়া খাওয়াটা নাকি সম্ভব নহে তাই শরীরের মধ্যে চর্ব্বি প্রভৃতি দুই চার প্রকার বাজে পদার্থ জন্মে। আহারের অভাব হইলে যাহাদের এ পদার্থ বেশী আছে তাহারা বেশীক্ষণ টিঁকিতে পারে—তা'ছাড়া এ পদার্থগুলি অন্য কোন কাজে আসে না, বরং মাংসপেশীগুলির চতুর্দ্দিকে জমিয়া কার্য্যে বাধা দেয়। এইগুলাকে তাড়ান ব্যায়ামের এক প্রধান কার্য্য। উহার প্রভাবে রক্তের সহিত অধিক পরিমাণে অম্লজান মিশ্রিত থাকাতে এই বাজে পদার্থ সকল পুড়িয়া যায়।

চর্ব্বি পুড়িয়া অঙ্গারক অম্ল গ্যাসে পরিণত হইয়া প্রশ্বাসের সহিত বাহির হইয়া যায়। এই কারণে মোটা মানুষের অধিক পরিমাণে হাঁপ ধরে, তাহার অল্প পরিশ্রমেই শরীরের মধ্যে এত অধিক অঙ্গারক অম্ল গ্যাস জন্মায় যে, খুব দ্রুতবেগে নিশ্বাস না ফেলিলে তাহা বাহির করিতে পারে না।

অন্যান্য বাজে পদার্থসকল নানা আকার ধারণ করিয়া মূত্রগ্রন্থির সাহায্যে শরীর ত্যাগ করে। এইগুলির প্রভাবে

অধিক পরিশ্রম করিবার পর গা হাত পা কামড়ায় এবং শরীর জড়বৎ হইয়া থাকে, কারণ, এগুলি অঙ্গারক অম্ল গ্যাসের ন্যায় শীঘ্র শরীর হইতে বাহির হইতে না পারায় ইহাদের কুফল করিবার যথেষ্ট সময় থাকে। নিয়মিত পরিশ্রম করিলে এ বাজে পদার্থগুলি জমিতে পায় না, কিছু দিন বসিয়া থাকিলেই জমে, সেই জন্য, কিছু দিন বসিয়া থাকিবার পর পরিশ্রম করিলে শরীরের জড়ত্ব বেশী পরিমাণে দেখা যায়।

যাহা দেখা হইল তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, এই বেগপ্রধান ব্যায়ামগুলি মোটা মানুষকে রোগা করিবার পক্ষে বিশেষ রূপে উপযোগী। তবে যাঁহারা উক্ত উদ্দেশ্যে এই জাতীয় ব্যায়ামে উৎসাহপূর্ব্বক নিযুক্ত হন তাঁহাদের সাবধান থাকা কর্ত্তব্য যে, চর্ব্বি প্রভৃতি অনাবশ্যক পদার্থের সহিত নিদ্রা, পরিপাক-শক্তি প্রভৃতি আবশ্যকীয় জিনিষগুলিও না লোপ পায়।

যে যে ব্যায়ামে বেগ এ বং বল দুই আবশ্যক হয়—যথা দ্রুতবেগে ভার লইয়া সিঁড়ি-ওঠা বা পাহাড়ে চড়া—সেগুলাকে কোন হিসাবেই উপকারীদলভুক্ত করা যায় না। এমন কি, খুব অল্প শরীরই এত মজবুত যে, এ সকল ব্যায়ামে ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়া বরদাস্ত করিতে পারে।

যে সকল ব্যায়ামে অনেকক্ষণ ধরিয়া ধীরে ধীরে অল্প অল্প করিয়া পরিশ্রম করিতে হয়, সে গুলিকে ধৈর্য্যপ্রধান বলা যাইতেছে। ইহার দৃষ্টান্ত আস্তে আস্তে অনেকক্ষণ ধরিয়া হাঁটা। এই ব্যায়ামে বহুক্ষণ পরে দেখা যায় যে, অনেকখানি পরিশ্রম করা হইয়াছে কিন্তু কোন এক সময়ের পরিশ্রম গায়ে লাগে না।

কাহিল রোগীকে কড়া ঔষধ দিতে হইলে বৈদ্য অনেক সময়ে ঔষধের পূর্ণমাত্রা একেবারে দিতে সাহস করেন না,

অল্প অল্প করিয়া দুই তিন বারে খাওয়াইবার ব্যবস্থা করেন, তাহাতে উহার উপকারিতা প্রায় পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যায় অথচ অপকারিতা অধিকাংশটা চলিয়া যায়। ধৈর্য্যপ্রধান ব্যায়ামগুলির ব্যবস্থাও সেইরূপ। যাঁহারা হৃৎপিণ্ডের বা ফুস্‌ফুসের বা ঐরূপ কোন প্রধান শারীরিক যন্ত্র বা অঙ্গের কোন গোলযোগ থাকাতে বলপ্রধান ব্যায়াম হইতে বঞ্চিত, অথচ যাঁহাদের রোগী হইবার কোন আবশ্যক বা ইচ্ছা নাই তাঁহাদের এই ধৈর্য্য-প্রধান ব্যায়ামগুলি একমাত্র অবলম্বন।

ইহার দ্বারা ব্যায়ামের সাধারণ উপকার সকল পাওয়া যায় কিন্তু শরীরের কোন পরিবর্ত্তন সম্ভবে না। রক্ত-চলাচল অল্পই বৃদ্ধি হয়, কাজেই কোন অঙ্গবিশেষের বিশেষরূপ পুষ্টি লক্ষিত হয় না। বলপ্রধান এবং বেগপ্রধান ব্যায়ামগুলিতে নিশ্বাসপ্রশ্বাসের মাত্রা বিলক্ষণ বাড়িয়া যায় এবং ফুস্‌ফুস্‌গুলি ক্রমাগত কার্য্য করিয়া খুব উন্নতি লাভ করে, তাহার চিহ্নস্বরূপ বুক প্রশস্ত হইয়া উঠে। ধৈর্য্যপ্রধান ব্যায়ামের দ্বারা ঐরূপ ফল আশা করা যাইতে পারে না।

তবে ইহাও সত্য যে, যদিও পনের মিনিট দৌড়ান এবং এক ঘণ্টা আস্তে আস্তে হাঁটা সমান পরিশ্রম, তথাপি পূর্ব্বোক্ত পনের মিনিটে যে পরিমাণ বায়ু রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে, শেষোক্ত এক ঘণ্টায় তাহা অপেক্ষা অধিক বায়ু রক্তের সহিত মিশিয়া যায়। অল্পে অল্পে আসাতে ফুস্‌ফুসের বিশেষ উন্নতি হয় না, কিন্তু রক্ত তেজাল হওয়াতে শারীরিক ক্রিয়াসকল ভালরূপ সম্পন্ন হইয়া থাকে।

উপসংহারে শ্রান্ত মস্তিষ্কে শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা কি পরিমাণে বিশ্রাম দেওয়া যাইতে পারে তাহা একবার দেখা

যাক্। আমরা পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছি তাহা হইতে ইহার মীমাংসা খুবই সহজ হইয়া পড়িয়াছে। জিম্‌ন্যাষ্টিক্‌সের ন্যায় যে ব্যায়ামে ইচ্ছাশক্তির এবং মানসিক পরিশ্রমের সহিত বেশী যোগ সেগুলি একেবারেই বর্জ্জনীয়। যে খেলাগুলিতে মনোযোগের ভাগ অধিক, যথা, টেনিস, ক্রিকেট তাহাও বড় ভাল নহে; হাঁটা, দ্বিচক্র ত্রিচক্র চড়া, আস্তে আস্তে দাঁড়টানা, সাঁতার দেওয়া, প্রভৃতি যে গুলাতে একটু অভ্যাস হইলে মানসিক পরিশ্রমের ভাগ অনেকটা কম সেগুলাই বিশেষরূপে অবলম্বনীয়।

এখানে কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, অভ্যাসে যদি মস্তিষ্কের খাটুনি কমিয়া যায় তাহা হইলে যে কোন ব্যায়াম অভ্যাস করিয়া ফেলিলে ত সমান ফল পাইবার কথা, কিন্তু সকল ব্যায়াম কিছু অভ্যাসের অধীন নহে। যে গুলিতে কোন নিয়ম পাওয়া যায় সেই কার্য্যগুলিই মেরুমজ্জা শিখিয়া লইতে পারে, যে গুলিতে প্রত্যেক বার নূতন চালনার আবশ্যক তাহার জন্য প্রত্যেক বার স্বতন্ত্র বিবেচনাও আবশ্যক। শুধু নিয়ম হইলেই যে হয় তাহা নহে—যে ব্যায়ামগুলিতে খাটুনির মাত্রা অধিক তাহাতে মস্তিষ্কের উত্তেজনার সাহায্য আবশ্যক হয়। বাহিরের ঘটনায় উত্তেজনা যথেষ্ট হয় না।

শেষোক্ত ব্যায়ামগুলিতে যে মোটে মানসিক খাটুনি নাই তাহা নহে, পথ ঘাট দেখিয়া চলিতে যেটুকু মনোযোগ লাগে তাহা উহাতে আবশ্যক কিন্তু তাহাতে অপকার নাই বরং জন্য বিরক্তি বা শ্রান্তিজনক ভাবনাকে স্থান না দিয়া উপকারই করে।

আমরা এ পর্য্যন্ত জিম্‌ন্যাষ্টিক্ জাতীয় ব্যায়ামকে (ইহার মধ্যে লাঠিখেলা প্রভৃতি অস্ত্রবৎও ধরা যাইতে পারে) নিতান্ত হেয়জ্ঞান করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু যাহারা নিতান্ত অলস

ভাবে দিন কাটায়, তাহাদের পক্ষে এইগুলই আবার বিশেষ উপকারী। কারণ, ইহাতে শরীর মন উভয়েরই পরিশ্রম হওয়াতে আলস্যজনিত জড়তা অনেক পরিমাণে নিবারণ হয়।

পাঠক ইহাও মনে রাখিবেন যে, আমরা কেবল স্বাস্থ্যের হিসাবে এই ব্যায়ামগুলিকে দেখি দিতেছি। বিপদ্‌কালে দড়ি ধরিয়া উঠিতে নামিতে পারার বিশেষ উপকারিতা আছে এবং মারামারির মধ্যে পড়িয়া গেলে লাঠিখেলাটা জানা থাকা খুবই ভাল এ কথা আমরা অস্বীকার করিতেছি না। আমরা এ কথাও বলি যে, ছেলেবেলার অন্য দিকে মস্তিষ্কের খাটুনি কিছু কমাইয়া দিয়া এসব দিকে তাহা কাজে লাগাইলে আমাদের দেশের অনেকটা উন্নতি হইবার সম্ভাবনা।

এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, আজকাল ইস্কুলের ছেলে-দের যে ব্যায়াম-চর্চ্চা করাইবার দিকে একটা ঝোঁক হইয়াছে তাহা মূলে ভাল হইলেও ঠিক প্রণালীতে কার্য্য করা হইতেছে না। ছেলেদের যতক্ষণ রীতিমত পড়াশুনা করিতে হইতেছে ততক্ষণ জিম্ন্যাষ্টিক্স্ বা ড্রিল করিলে তাহাদের কোন উপকার না হইয়া অপকার হইবে। ব্যায়ামের মধ্যে আমরা যন্ত্রচালন-বৎ বলিয়া যেগুলির নির্দ্দেশ করিয়াছি সেইগুলি করা কর্ত্তব্য। তবে যদি জিম্ন্যাষ্টিক্স্ প্রভৃতি রাখাটা আবশ্যক বোধ হয় তাহা হইলে সেই পরিমাণে পড়াশুনা এবং মস্তিষ্কের খাটুনি যাহাতে কম হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখা খুবই উচিত।

ব্যায়াম-বিজ্ঞান বিষয়টা কিছু গুরুতর এবং আমাদের স্থান কিছু সঙ্কীর্ণ, কাজেই আমরা অনেক কথা বলিতে পারিলাম না, যাহা বলা হইয়াছে তাহাও মোটামুটি রকম। এ বিষয়ে দুই তিন বৎসরের মধ্যে য়ুরোপীয় ভাষায় কতকগুলি ভাল ভাল

পুস্তক বাহির হইয়াছে। পূর্ব্বে এ বিষয়ে বড় একটা আলোচনা হইত না। অন্যান্য বইয়ের মধ্যে আমরা ডাক্তার লাগ্রাঁজের Physiology of Bodily Exercise (International Scientific Series) বইখানি পড়িয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি।

শৈশবে ধর্ম্ম-শিক্ষা।

বৎসরান্তে আবার সেই শরৎ ফিরিয়া আসিল—আবার সেই দুর্গাপূজা আসিতেছে। কিন্তু বাঙ্গলার ঘরে ঘরে কই সে পূজার আয়োজন? কই সে দরিদ্রের আশা, প্রবাসীর প্রিয়-মিলন, বালকের উল্লাস? কই সে ঘরে ঘরে আগমনী কই? বিশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল, তাহার সহিত তুলনা করিবারও বড় আবশ্যক নাই, গত বৎসরের সহিত তুলনা করিলেও আমরা দেখিতে পাইব যে, গত বৎসরেও যে উৎসব ছিল, যতগুলি প্রতিমা হইয়াছিল এ বৎসর তাহাও নাই। গৃহস্থে আর কেহ দুর্গাপূজা করেন না। অবস্থাপন্ন ধনীদিগের কাহারও কাহারও গৃহে পূজা হয়, কিন্তু তাহাতে ধর্ম্মভাবের অভাবই দেখা যায়। সেই পূজার মধ্যে পূজা নাই, কেবলমাত্র উৎসবটুকু আছে। গত বৎসর যাহার গৃহে পূজা হইয়াছিল এবৎসর দেখিবে হয় ত সেই পূজার দালান বিভক্ত হইয়া গিয়াছে; দুই ভ্রাতা তাঁহাদের পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইয়াছেন; সঙ্গে সঙ্গে পূজার দালানের মাঝেও পাঁচিল পড়িয়াছে—একজনের রান্নাঘর হইয়াছে—একজন তাঁহার নিজের অংশের দালান ভাঙ্গিয়া বৈঠকখানা বানাইতেছেন।

পূজা শেষ হইল। পল্লীগ্রামের বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা পড়িয়া আছে; অধিবাসীরা কলিকাতায় বাসা করিয়া রহিয়াছেন—দেশের জল বায়ু অসহ্য, ছেলেরা কলিকাতায় লেখাপড়া করে, কর্ত্তাকে সদাসর্ব্বদা মামলা মকদ্দমার জন্য কলিকাতায় না থাকিলে নয়—সুতরাং সমস্ত পরিবারই কলিকাতায়। গৃহের শালগ্রামশিলার নিত্য পূজা রীতিমত পুরোহিত করিয়া থাকেন, দুর্গাপূজার সময় কর্ত্তার বৃদ্ধা মাতা দেশে গিয়া "দালানটী কাঁকু দিতে নাই" বলিয়া; অমনি অমনি পূজাটী সারিয়া আসেন। কোন বৎসর হয় ত ছেলেপিলে বধূ সমস্ত পরিবার পূজার সময় দেশে যান, কিন্তু সে কেবল একটু বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য, পূজার জন্য নহে। যদি দেশের জল বায়ু ঐ সময়ে অস্বাস্থ্যকর থাকে তবে কেহই আর দেশমুখো হয়েন না। আপিস স্কুল হইতে পূজার ছুটী পাইয়া, কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া পূজার সময় প্রায় সকলেই ভ্রমণে বাহির হয়েন। পূজার কথা তখন আর মনে থাকে না, পিতৃপুরুষের ক্রিয়াকলাপ কোন মতে সারিয়া লইতে বলেন। গৃহস্থঘরে আনন্দোচ্ছ্বাস দূরে থাক্, কর্ত্তা গৃহিণী ভাবিয়া অস্থির হইতেছেন যে, কিরূপে সংবৎসরের দেনা মিটাইব, কিরূপেই বা সন্তানদিগকে এক একখানি কাপড় বা পোষাক দিব। কাপড়ের দোকানে নানাবিধ কাপড় সাজান হইতেছে, দর্জির দোকানে লাল নীল সবুজ জরী-দেওয়া ফুল-কাটা ইত্যাদি পোষাক ঝুলিতেছে; জুতার দোকানে আলমারীভরা জুতা তবুও মুচিদিগের বিরাম নাই—ঘাড় হেঁট করিয়া জুতা সেলাই করিতেছে। দেখিয়া শুনিয়া নিরুপায় নিশ্বাস ফেলিয়া যাইতেছেন, অবস্থাপন্ন দরিদ্র [illegible] কাহারও ঐ সকল "খেলো বাজারে" [illegible] ভাল করিয়া

তৈরি করিয়া দিবার জন্য বায়না দিতেছেন। দোকানী পসারি ক্রেতা বিক্রেতা সকলেরই মনে এক ভাবনা কিরূপে দু পয়সা উপার্জ্জন হয়, কি রূপে পূজাটী মানে মানে কেটে যায়। এখন বাঙ্গলার সর্ব্বত্রই দ্রব্যসামগ্রী মহার্ঘ্য হইয়াছে, আয়ে আর কুলায় না—গৃহস্থ ধার করিয়া বৎসর চালাইতেছেন; সকলকে আশা দিয়াছেন পূজার সময় মিটাইবে। হায়! পূজা ত আসিল, কিসে যে কি হইবে, কি দিয়া যে দেনা মিটাইবেন তাহার উপায় নাই!

কিন্তু সঙ্গতিহীনতাই কিছু ধর্ম্মের অভাব নহে, আর দুর্গা-পূজাই কিছু একমাত্র হিন্দুধর্ম্ম নহে। আমাদের যে মনুষ্যত্বের সার সামগ্রী প্রেম, ইহা আমরা কাহাকেও অর্পণ করিতে পারিতেছি না। ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, তাঁহার অস্তিত্ব লোপ হইতেছে। তাঁহাকে বিশ্বাস না করিলে তাঁহার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, কিন্তু আমরা কি লইয়া এ জীবন বহন করিব? প্রেমহীন জীবন নিয়তই সুখশান্তিবিহীন হইবে!

অনেকে বলেন যে, ইংরাজি শিক্ষার ফলে আমাদের যত কিছু দুরবস্থা। ধর্ম্মভাবের অভাব, ইংরাজি অনুকরণ, বিদেশী দ্রব্যে স্পৃহা সকলি ইংরাজি শিক্ষার ফল। একথা যদি সত্য হয় তবে একি ইংরাজি শিক্ষার দোষ, না আমাদের জাতির দোষ! আমি ত যতটা অনুভব করি সেকালেও আমাদের সাধারণের মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষার অভাব ছিল। শিশুকালে আমাদিগকে কোনরূপ ধর্ম্মের বিষয় জানান হইত না, এখন ও হয়ই না। বালক-কালে আমরা প্রতিমা-পূজার কেবলমাত্র উৎসবটুকু উপভোগ করিতাম। পূজা করিবার কোন অধিকার আমরা পাইতাম না—দেবদেবী স্পর্শেও শূদ্রের অধিকার নাই। ব্রাহ্মণ আসি-

যেন, তিনি পূজা করিবেন; দেবতাকে পূজা করিবার অধিকার সাধারণের নাই; "দেখিস্ যেন ঠাকুর ছুঁস্‌নে, দেখিস্ যেন পূজার সামগ্রী ছুঁস্‌নে", এই কথাই শুনিয়া আসিতেছি। পাঁঠা বলির সহিত বালকে কিছুই পূজার সম্পর্ক গ্রহণ করিতে পারে না; কোমল-প্রকৃতির বালক হইলে ভয়ে সারা হয়, পাঁঠা বলির সময় নিভৃতে লুকাইয়া থাকে; নিষ্ঠুরপ্রকৃতি হইলে আনন্দে নাচিয়া নাচিয়া বেড়ায়। পুষ্পাঞ্জলির সহিতও বালকদের কোন সম্বন্ধ নাই— পূজার তাহারা এইমাত্র জানে দুর্গাঠাকুর আমাদের মত চাল কলা ও পাঁঠা খেয়ে থাকেন। তবে প্রভেদের মধ্যে আমরা রেঁধে খাই, আর ওঁর কাছে কাঁচা ও জীবন্তটাকেই ধরিয়া বলি দিলেই ওঁর খাওয়া হয়। অন্য কথা কি কহিব, দুর্গাপূজার সাধারণ ভাব এই যে, বৎসরান্তে উমা তাঁহার পুত্রকন্যাগুলিকে লইয়া একবার তিন দিনের জন্য পিত্রালয়ে আসেন তাই সেই কয়-দিন আমরাও একটু আমোদ-আহ্লাদ করিয়া লই। গৃহে যে নিত্য নিয়মিত শালগ্রামশিলা পূজা হয় তাহার সহিত আমা-দের কোন সম্বন্ধ নাই। পুরোহিত আসিয়া পূজা করেন, ঠাকুরমা স্নান করিয়া পূজার আয়োজন করিয়া দেন। বালক যদি ঠাকুর-ঘরের চৌকাট মাড়াইল ত সর্ব্বনাশ! "হাঁ হাঁ করিস্ কি করিস্ কি—এখন যা এখন যা, পূজো হোয়ে যাক্ তখন দুটী ছোলা দেব এখন।" বালকের ধর্ম্মের সঙ্গে সম্বন্ধ ঐ ছোলাগুলি পর্য্যন্ত। বালক বালিকারা যে সকল জিনিস্ হাতে না পায় তাহার প্রতি তাহাদের অধিক আকর্ষণ হয়, সুবিধা পাইলে বালক নিত্য করিয়া শালগ্রামশিলা লইয়া খেলা করিতে ছাড়ে না। তার পর যখন দেখে যে, তাহার জন্য অতিশয় তিরস্কৃত হয়, এবং ঠাকুর ছুঁলে হাত বেঁকে যাবে এই শিক্ষালাভ করে তখন

তাহার ঠাকুরের প্রতি স্নেহভক্তি কিছুমাত্র থাকে না। ঠাকুর ও ঠাকুর আছেন, সুবিধার মধ্যে মাঝে মাঝে ছোলা কলা পাওয়া যায় তাও আবার পুরুত ঠাকুরই অধিকাংশ নিয়ে যান্, নইলে দুটী বেশি পাওয়া যেত।

এই ত নিত্য পূজার সারসংগ্রহ। তার পর পার্ব্বণ পূজার অর্থ এই যে, কেবল "হে ঠাকুর আমাকে অমুক দাও, হে ঠাকুর অমুক দাও"। সরস্বতী পূজার পূর্বদিন দোয়াতগুলি ধুইয়া রাখা হইয়াছে, সেদিন দোয়াত ছুঁইলে আর বিদ্যা হবে না, বালক পূজা করিতেছে;—

আইলেন সরস্বতী নির্ম্মল বরণে
হস্তে কঙ্কণ নূপুর চরণে,
গলায় গজমতি মুক্তার হার
দাও মা সরস্বতী বিদ্যার ভার।

বালিকা মহেশ্বর পূজা করিতেছে;—

হর হর শঙ্কর তুমি দীননাথ
কখনও না পড়ি যেন মূর্খের হাত।

সেঁজুতির ব্রত করিতেছে—

ময়না ময়না ময়না
সতীন যেন হয়না,
হাতা হাতা হাতা
খাই সতীনের মাথা।

শুধু দেবতার কাছে চাহিতেছে তুমি আমাকে দাও। তুমি আমাদিগকে ভালবাস, তুমি আমাদের সকলের চেয়ে বড়, সকলের চেয়ে ভাল; তোমার কাছে অসত্য নাই অবিচার নাই অন্যায় নাই, তুমি আমাদের মায়ের অপেক্ষা স্নেহময়ী পিতার অপেক্ষা মঙ্গলময়, এমন পূজা প্রাচীন কাল হইতে এখনো পর্য্যন্ত

আমরা শিশুদিগকে শিক্ষা দিই নাই। আমাদের পূজার মধ্যে শিশুরা শুধু উৎসব এবং ভিক্ষা শিক্ষা করিয়া আসিতেছে মাত্র। বাটীতে কোনরূপ বিপদাশঙ্কা উপস্থিত হইলে শিশুরা দেখে যে, নারায়ণকে তুলসীদান ও শিব স্বস্ত্যয়নের জন্যে পুরোহিত ঠাকুর আসেন। শুদ্ধ যে ঈশ্বরের নিকট ভিক্ষা করিতে হয় তাহা নয়, তাহাও আবার আমরা নিজেরা পারি না, তাহার জন্য আবার মধ্যস্থ চাই!

শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর দিবস শিশুরা সকলে মিলিয়া কবতাল লইয়া নাচিয়া নাচিয়া গাইয়া বেড়ায়;—

ব্রহ্মা নাচে বিষ্ণু নাচে আর নাচে ইন্দ্র
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ।

কিন্তু সেই কৃষ্ণ কে? না, সেই যে মা খোকাকে ঘুম পাড়ান আর শ্লোক বলেন;—

ও ললিতে চাঁপ কলিতে হেথা এসো দেখ্‌সে
রাধার ঘরে চোর ঢুকেছে চূড়ো বাঁধা মিন্‌সে,
চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে কদম-তলায় কে?—
নন্দের বেটা কেষ্ট ঠাকুর ঘোমটা টেনে দে।

এই সকল শ্লোকেতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শিশুদিগের মনে কিরূপে স্নেহভক্তির উদ্রেক হইতে পারে? খৃষ্টানগণ তাঁহাদের যীশু-খৃষ্টকে সাধারণের চক্ষে কেমন সুন্দর করিয়া দাঁড় করাইয়াছেন। নিতান্ত দরিদ্রাবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়াও তাঁহার কি এক অলৌকিক মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইয়াছিল। খৃষ্টানেরা অন্য অন্য শিক্ষার সহিতই ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া থাকে। শিশুগণ মায়ের মুখের দিকে মুগ্ধ-নেত্রে চাহিয়া গল্প শুনে যে, তাহাদের মতন ছোট শিশুদিগকে যীশুখৃষ্ট বড় ভালবাসেন, তিনি যখন আসিয়াছিলেন তখন যে সময়ের সকল শিশুকে তিনি কোলে লইতেন। এই যীশু তাহা-

দের এত ভালবাসেন, তিনি এই সমস্ত মানবের জন্য তাঁহার হৃদয়ের রক্তদান করিয়াছেন, সেই জন্য আমরা তাঁর পূজা করি, এবং বৎস, তুমিও তাঁহাকে ভালবাস। শিশুকাল হইতে এই বিশ্বাস এই অলৌকিক মহত্ত্বের আদর্শে তাহারা বর্দ্ধিত হয়, আমাদের মত তাহাদের দেবতা অন্বেষণ করিয়া ঘুরিতে হয় না।

সমাজ যে স্রোতে চলিতেছে, তাহাতে উজান বহান অসাধ্য। জোর করিয়া কেবল আবশ্যক বুঝিয়া কোন মতেই প্রতিমাপূজায় দৃঢ়া ভক্তি উদ্রেক করান অসম্ভব। এখন স্বহস্তে রচিত দেবতায় কাহারও বিশ্বাস হয় না, সেই জন্য পূজার নিমন্ত্রণ রক্ষার অর্থ কেবল ঋণাৎ করিয়া টাকা দেওয়া মাত্র। প্রতিমার সম্মুখে হাত যোড় করিয়া ঘাড় হেঁট করিতে যুবকসম্প্রদায় নিতান্ত অনিচ্ছুক—প্রতিমায় ভক্তি নাই দেবতায় বিশ্বাস নাই। সেইজন্য বাটীর সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রটীই পূজায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া থাকে। তাহারা জানে—টাকা দেব সন্দেশ পাব—ওদের বাড়ি দুর্গা-পূজা। সেকালে বালিকাদের মধ্যে যাহা কিছু ব্রত নিয়ম মহাদেবপূজা ছিল, কিন্তু বালকদিগের কোনরকম ব্রত নিয়ম পূজা-বন্ধন ছিল না। শুনিয়াছি বালিকারা যখন বা ব্রত করিত তখন বালকেরা তাহাদিগকে উপহাস করিয়া বড়ই বিব্রত করিত। বালকেরা বালিকাদিগের ব্রত নিয়মের মধ্যে কিছুমাত্র পবিত্রতা অনুভব করিত না—মেয়েগুলো সতীনের মাথা খাচ্ছে চল্ ভাই দেখে আসি, ইহাই তাহারা সার জানিত। এই সকল বালক যখন বড় হইয়া কেহ মেজেষ্টর কেহ ডাক্তার হইলেন, তখন তাঁরা নিজের মেয়েদের ব্রত করিতে দেখিলে বলিবেন, "যা যা সতীনের মাথা খেতে হবে না, ঘরে সন্দেশ আছে খেগে—বেলা হোয়েচে পিত্তি পোড়বে।" "যাও মা পড়া করগে—

স্কুলে যাও।" গৃহিণীর ইচ্ছা থাকিলেও কখনই কর্ত্তার অমতে সেই প্রাচীন প্রথা রক্ষা করা যায় না। এই সকল কারণে বিশ্বাসের ভিত্তি জীর্ণ হওয়াতে প্রাচীন প্রথা সকল লোপ পাইতেছে কিন্তু তাহার স্থলে যে নূতন ধর্ম্মশিক্ষা আবশ্যক ইহা কেহ কখনো ভাবেন না। বহু দূরদেশ হইতে ইংরেজ আসিয়া মস্ত মস্ত ইংরাজি স্কুল কালেজ স্থাপন করিল, ইংরাজি শিখিলে মোটা মোটা মাহিনার চাকরি মিলিবে—আমরাও অমনি পায়ে জুতা, মাথায় ছাতা, স্লেট হস্তে দলে দলে স্কুল অভিমুখে ছুটিয়াছি। মিসনরী পাদরীরা খৃষ্টান করিবার অভিপ্রায়ে পাড়ায় পাড়ায় বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে। স্কুলের মাহিনা দিতে হয় না। একটা ঝি আসিয়া সঙ্গে করিয়া মেয়েদের লইয়া যায়। গৃহিণী কহিলেন, "ঝিয়ে আর মেয়েগুলোকে স্কুলে ভর্ত্তি কোরে, দুপুর বেলা আটকাল' থাক্‌বে; যা হোক্ খগা বগা শিখবে আর পাড়ায় পাড়ায় রোদে রোদে বেড়িয়ে হাড় জালাতন কোরবে না।" মেয়েরা বিদ্যাশিক্ষা করিতে যাইতেছে, শিখিতেছে কি না কতকগুলি খৃষ্টানী গান ও যীশুখৃষ্টের কথা, কিন্তু তাহাও অশ্রদ্ধার সহিত ঘৃণার সহিত। বালিকাদিগের যীশুখৃষ্টের প্রতি ভক্তি নাই ভালবাসাও নাই। পাখিপড়ার মত অদ্ভুত বাঙ্গলা ভাষায় কতকগুলি বুলি তাহারা শেখে এবং তাহার সহিত খৃষ্টানদের ঘৃণা করিতে শেখে। কারণ, বাড়িতে গেলেই তাহাদের কাপড় ছাড়িতে হয় এবং মেম ছুঁইয়াছে বলিয়া গঙ্গাজল স্পর্শ করিতে হয়। এইরূপ ছয় সাত বৎসর বয়স হইতে জোর দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বিদ্যাসাভ করিয়া বালিকারা বিদুষী হইয়া উঠে। শৈশবকালে তাহারা কিছুমাত্র ধর্ম্মের ধার ধারে না—মাতা হইয়া তাহারা নিজ পুত্রকন্যাদিগকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছুই শিক্ষা দিতে পারে না।

আমাদের প্রবাদ আছে;—

"আপ (আত্ম) রেখে ধর্ম্ম তবে পিতৃপুরুষের কর্ম্ম।

তা' এ কথাটা শুধু কি আমাদেরই? সকল জাতিরই তাই।

ইংরেজ আমাদের জন্য যে বীজ বপন করিয়াছে এখন আমরা যদি ভাল করিয়া তাহার তদ্বির করি তবে তাহা হইতে শুভ ফল পাইতে পারি। সেটা আমাদের হাত। আমরাও এখন নিজেরা স্কুল কালেজ করিতে শিখিয়াছি—কিরূপ শিক্ষা দিলে বালকবালিকার মঙ্গল হইবে, কিরূপে শৈশব হইতেই তাহারা ধর্ম্ম আলোচনা করিতে পাইবে, কিরূপে তাহাদের দেবতাকে তাহারা স্নেহময় কল্যাণময় বলিয়া জানিবে, বিদ্যাশিক্ষার সহিত এই শিক্ষা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। শৈশবে মাতা রূপকথার সহিত মহাভারত রামায়ণের পুণ্যময় কথা শিশুদিগের নিকট গল্প করিতে পারেন। রামের কর্ত্তব্যপরায়ণতা, কৃষ্ণের বিপন্নসহায়তা, ভরত লক্ষ্মণের ভ্রাতৃস্নেহ, কর্ণ অর্জ্জুনের বীরত্ব, ধ্রুব প্রহ্লাদের দেবভক্তি, শিশুর মনে ধর্ম্মের সহিত উদারতা শিক্ষা-দান করিবে। উদ্দালকের গুরুভক্তি শুনিয়া তাহারা নিজ নিজ শিক্ষককে ভালবাসিতে শিখিবে, শিক্ষক অস্পৃশ্য, শিক্ষক ছুঁইলে অশুচি হইতে হয় এই ভাব তাহাদের মন হইতে দূর হইবে।

এ ভাব মনে থাকিলে কখনই সেই শিক্ষকের শিক্ষা হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় না। যদি খৃষ্টান শিক্ষকের কাছে বিদ্যাশিক্ষা করিতে হয় তবে প্রথমে ঘৃণার পরিবর্ত্তে শিক্ষককে ভালবাসিতে শেখান উচিত। শুদ্ধ ব্রাহ্মণেই এখন গুরু হন না, সকল জাতিই শিক্ষা-গুরু। ব্রাহ্মণে শূদ্রে আর বিশেষ প্রভেদ নাই, আর ব্রাহ্মণের প্রতি সেরূপ ভক্তিও নাই। দেবতা পূজা করিয়া, শিক্ষাদান করিয়া আর ব্রাহ্মণের চলে না, দেশীয় ভাষায় উপার্জ্জনের কোন সহায়তা

করে না, ব্রাহ্মণেও ইংরাজের দাস হইয়াছে। গুরু এসেচেন বলিয়া আর কেহ ভয়ে তটস্থ হয় না, গুরুর অভিশাপে আর ভয় নাই, কারণ, গুরুঠাকুর হয় ত রেলির বাড়ির বেরারী, দিব্য ইংরাজি জুতা পায়ে, শার্ট-পরা, একটি অতি ক্ষুদ্র শিখা টেরির পশ্চাতে অতি সংক্ষেপে প্রচ্ছন্ন ভাবে রহিয়াছে, অথবা মোটেই নাই—এই গুরু আসিলে আর কাহাকেও ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না।

ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলেই এখন পরস্পর পরস্পরকে সমকক্ষই বিবেচনা করে। সুতরাং কেবলমাত্র পূজক ব্রাহ্মণকে দেবপূজার অধিকার দিয়া সাধারণে সন্তুষ্ট নহেন। একে দেবতায় বিশ্বাস নাই তাহাতে ব্রাহ্মণে ভক্তি নাই, তবে কেবল উৎসব আর টাকা খরচ ছাড়া পূজার আবশ্যকতা কেহ বুঝিতে পারেন না। এদিকে দেবতা অভাবে মন হু হু করিতেছে, পৃথিবী অসার মনে হইতেছে। সামান্য কারণে আত্মহত্যা করিতে কেহ ভীত হয় না, ইহকালের বন্ধন নাই পরকালের ভয় নাই।

রবিবর্ম্মা।

ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে আমাদের মধ্যে সাহিত্যের যেরূপ অনুশীলন হইয়াছে, কলাবিদ্যার অন্যান্য অঙ্গের তাহার শতাংশের একাংশও আদর হয় নাই। বিশেষতঃ চিত্রকলা এদেশে তাহার সেই আদিম রঙ্-লেপা বর্ব্বর অবস্থা হইতে অল্পই অগ্রসর হইয়াছে। ইংরাজিশিক্ষিতদের নিকট র‍্যাফেল টিশিয়ান প্রভৃতি

বড় বড় পাশ্চাত্য চিত্রকরদিগের বৃত্তান্ত অবিদিত নাই এবং কাহারও কাহারও ভাগ্যে ঐ সকল চিত্রশিল্পীদিগের রচনা দর্শনও ঘটিয়াছে, কিন্তু র‍্যাফেল টিশিয়ানের মাহাত্ম্য অনুভব অপেক্ষা অনুমানের দ্বারাই আমরা প্রধানতঃ আয়ত্ত করি। এক ত আমাদের দেশে চিত্রশিল্পের তাদৃশ অনুশীলন অভাবে আমাদের চিত্রসৌন্দর্য্য উপভোগের বৃত্তিগুলিই সম্যক্ উন্মেষিত হয় নাই; দ্বিতীয়তঃ য়ুরোপীয় চিত্রশিল্পে আমাদের ভাবের, দেশীয় কল্পনার, পৌরাণিক সৌন্দর্য্যের কোনরূপ বিকাশ লক্ষিত হয় না—সুতরাং তাহা তেমন সহজে অবিলম্বে আমাদের অন্তরের অন্তরঙ্গ হইয়া উঠে না। সেইজন্য, পৌরাণিকী কল্পনাকে তুলিকার স্পর্শে মূর্ত্তিমতী করিয়া তুলিতে পারেন আমাদের মধ্যে এইরূপ এক প্রতিভার আবশ্যক হইয়াছে। ভাবায় যাহা কতকটা বর্ণনায় কতকটা আভাসে, কতকটা লেখকের রচনায় কতকটা পাঠকের মনে মনে গঠিত হইয়া পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, সেই সুন্দর ভাবগুলিকে সমগ্রভাবে—যে অংশ ব্যক্ত ও যে অংশ অস্ফুট মিলাইয়া—রেখায় রেখায় অনুবাদ করিতে হইবে। এই নব চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার ইহাই কার্য্য।

আমাদের কলিকাতার আর্টষ্টুডিয়ো কতকটা এই ভাবেই পরিচালিত বোধ হয়। কিন্তু আর্টষ্টুডিয়ো হইতে বৎসর বৎসর যে সকল পৌরাণিক চিত্রাবলী বাহির হয় কালীঘাটের পয়সা পটের সহিত—কাগজের উৎকর্ষতা ও বর্ণবিচিত্র্যের অধিকতর ঘনঘটা ভিন্ন—তাহার প্রভেদ অল্পই; এবং তাহা দেখিয়া মনে বড় আশার সঞ্চার হয় না। কারণ, ঐ সকল বিচিত্রবর্ণ চিত্রে কোথাও কোনও ভাবের বিকাশ হয় নাই, শরীরের কোনরূপ গঠনপারিপাট্য প্রকাশ পায় নাই, এবং বর্ণবিন্যাসে সৌন্দর্য্য-

বোধ আভাসেও আপনাকে ব্যক্ত করে নাই। করালকালিকার ভীষণ-গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া মন কোথায় ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িবে, না, আর্ট ষ্টুডিয়োর চিত্র মনে কেবল একটা ভাব-বিহীন কুৎসিৎ কাষ্ঠপুত্তলিকার মূর্ত্তি স্থাপনা করে এবং তাহাতে বিরক্তি ভিন্ন মনে কোনপ্রকার সাধুভাবের সঞ্চার হয় না। সরস্বতীর মুখে চোখে প্রতিভার দীপ্তি দেখিয়া হৃদয় কোথায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে, না, আর্ট ষ্টুডিয়োর চিত্রকর বহু পরিশ্রমে সকল ভাব বর্জ্জনপূর্ব্বক একটি অতি নির্ব্বোধবৎ নিষ্প্রভ মুখ-মণ্ডল রচনা করিয়াছেন—সকল কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সহিত তাঁহাদের যে সপ্ত জন্মে মুখ-দেখাদেখি নাই তাহাতে ইহাই প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র। চৈতন্যের দারুণ পীতকান্তি চিত্র দেখিলে ধারণা জন্মে যে, চিত্রকরের দৃষ্টিপথে যকৃৎ-রোগী ভিন্ন কখনও কোনও সুস্থদেহ মনুষ্যবংশীয় পতিত হয় নাই; এবং তাঁহার নেত্র-নীরপতন দেখিলে মনে হয়, মস্তকমুণ্ডনের ন্যায় চক্ষে ক্ষীর-লেপনও বুঝি নবদ্বীপে একসময়ে কেদান ছিল এবং আবশ্যকমত সভাস্থলে বৈষ্ণবদিগের চক্ষু হইতে বিন্দু বিন্দু তাহাই ক্ষরিত। সুতরাং আর্ট ষ্টুডিয়োর উদ্দেশ্য সাধু হইলেও দুঃখের সহিত তাহার ভরসা ছাড়িতে হয়।

দাক্ষিণাত্য এবিষয়ে বঙ্গদেশ অপেক্ষা সৌভাগ্যশালী। সেখানে ঠিক যাহা আবশ্যক তাহাই মিলিয়াছে—সভা নহে, সমিতি নহে, কোম্পানী নহে, কলিকাতার মত আর্টষ্টুডিয়ো নহে—একটি যথার্থ চিত্রকরী প্রতিভা, যে কেবল কপি না করিয়া সৌন্দর্য্য অনুভব ও প্রকাশ করিতে পারে, যে মধুপের মত পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে উড়িয়া গিয়া সৌন্দর্য্য চয়ন করিয়া আনে এবং সেই সৌন্দর্য্যের চাক বাঁধিয়া চিত্ত হরণ করিতে জানে। এই

প্রতিভা রবিবর্ম্মা। তিনি পৌরাণিক এবং অন্যান্য নানাবিষয়ক অনেকগুলি চিত্র রচনা করিয়াছেন। এবং এই সকল চিত্রে তাঁহার সৌন্দর্য্যবোধ ও রসগ্রাহিতার বিশেষ বিকাশ হইয়াছে। তাঁহার সর্ব্বাবয়বসম্পূর্ণা নায়ার রূপসীর চিত্র, শ্যামাঙ্গী গোপাঙ্গনার সুডৌল নিটোল গঠন ও নয়ন ও অধরের ভাব, লালা রুখ্, রামসীতার পরিণয়, বা সুভদ্রার্জ্জুনের প্রণয়দৃশ্য কাহার না চিত্ত হরণ করে? তাঁহার শান্তনুর নিকট হইতে পুত্রসহ গঙ্গার পলায়ন, বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গার্থে প্রেরিত মেনকা, শান্তনুর প্রশ্ন-জিজ্ঞাসায় সরলা সত্যবতীর সলজ্জ অথচ মুক্ত অকপট ভাব, কোন্‌টি না সুন্দর? যশোদার গোদোহন ও হৃষ্টপুষ্ট গোপালের চিত্র, পূতনাবধান্তে মঙ্গলাচরণকালে শিশু নন্দদুলালের ভাবমাধুর্য্য, এবং কুঞ্জবনে শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ হইতে গিয়া রাধিকাকে প্রেমভরে আক্রমণ, কোন্‌টিতে না আমাদের অন্তরে একটি পৌরাণিক আনন্দ সঞ্চার করিয়া দেয়? হয় ত ইহার মধ্যে এমন কিছু ত্রুটি থাকিলেও থাকিতে পারে যাহা আর্টসমালোচক ভিন্ন অপরের চক্ষে প্রতিভাত হয় না—এবং এই বাঙ্গালা দেশের আর্ট ষ্টুডিয়ো ও কালীঘাটের পটের চতুঃসীমা মধ্যে বর্দ্ধিত আমাদের সে সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র—কিন্তু চিত্রগুলির মধ্যে যে একটি মনোহর ভাব আছে এবং সেই ভাবটুকু ভারতবর্ষের অন্তরতম হৃদয় স্পর্শিত হইয়া উঠিয়াছে, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। পৌরাণিক চিত্র এমন সুন্দর ভাবে এদেশে ইতিপূর্ব্বে কখনও অঙ্কিত হয় নাই। এবং খুঁটিনাটি ত্রুটি থাকিলেও রবিবর্ম্মাই এদেশের প্রথম প্রতিভাশালী চিত্রকর।

রামসীতার পরিণয়চিত্রটি তিনি কি সুন্দরই আঁকিয়াছেন!

রাম তখন বালকমাত্র এবং সীতা বালিকা—ঈষৎ উন্মেষিত সুকুমার কুসুমকোরকবৎ দুইখানি কচি মুখ, তাহাতে যে কি পুণ্য মাধুরী তাহা বর্ণনা করিয়া উঠা যায় না। রামচন্দ্রের দক্ষিণ পাণিমধ্যে সীতার নবনীসুকোমল পাণিতল সমর্পিত; এবং সেই স্বভাববিনম্র মুখে ও চারু আনতনেত্রে একটি অনির্ব্বচনীয় মহিমা দীপ্তি পাইতেছে। তাতগণ ও মাতৃকুলের দৃষ্টিতে কি স্নেহ! সমস্ত পরিজন ও অনুচরবর্গের মুখে কি ভাব! এমন বিবাহ বুঝি পৃথিবীতে আর কখনও ঘটে নাই।

তখন কে জানিত, এই শুভ উৎসবদিনের কি পরিণাম! কে জানিত, এই মূর্ত্তিমতী আনন্দের কপালে কত দুঃখ আছে! রাজার নন্দিনী, রাজার বধূ হইয়া বনে বনেই তাঁহার চিরদিন কাটিবে কে মনে করিয়াছিল! রাক্ষস হরণ করিল, স্বামী বনবাস দিলেন, পরীক্ষার পর পরীক্ষা; নারীর কোমল হৃদয়ে এত সহে না। সভামধ্যে দাঁড়াইয়া পতিব্রতা ডাকিলেন, বসুন্ধরে, বিদীর্ণ হও; রসাতল ভেদ করিয়া স্নেহময়ী ধরিত্রী আপনি বাহির হইয়া আসিলেন; বলিলেন, আয় মা আয়, তুই আমার রাণী, আমার কোলে আয়।—রাখ রাখ, ফির ফির।—কে ফিরিবে? জননী আপন বক্ষে বাঁধিয়া সীতাকে লইয়া গেলেন।

রবিবর্ম্মার এই পাতালপ্রবেশটিও সুন্দর চিত্র। পরিণয়চিত্রের সমকক্ষ না হইলেও লক্ষ্মণের অশ্রুম্লান অধোবদন, রামের উদ্বেল ব্যাকুলতা, কুশলবের ভয়বিস্ময়বেদনাবিমিশ্রিত ভাব, রামের প্রতি সীতার সকরুণ বদ্ধদৃষ্টি, ধরিত্রীর বিষাদঘন মুখ, সমস্ত মিলিয়া পাতালপ্রবেশ দৃশ্যে একটি মনোহর যাথার্থ্য অর্পণ করিয়াছে।

কিন্তু অর্জ্জুন ও সুভদ্রার প্রেমচিত্রের মত ভাবের গৌরব বুঝি

কোনটিতেই নাই। সুভদ্রা ঈষৎ হেলিয়া দাঁড়াইয়া, দক্ষিণ করতল প্রস্তরবেদীর উপরে রক্ষিত, শাড়ীর কোঁচার ভাঁজে ভাঁজে ছায়া আলোকের খেলা; খোপায় ফুলের মালা, ললাটে টিপ, আনত নেত্রপল্লবে হ্রীর আবেশ ও চারু অধরপুটে শুভ্র হাসির মত মৃদু লজ্জা। অর্জ্জুন বাম দক্ষিণ করে সুভদ্রার বাম হস্ত ধারণ করিয়াছেন এবং অপর হস্তে সুমধুর স্নেহভরে সুভদ্রাকে প্রায় বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছেন—যেন পুরুষহৃদয়ের সমস্ত স্নেহ প্রেম করুণা ঐ বাহুপাশে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রশস্ত ললাটে উদার দীপ্তি, নয়নে নিবিষ্ট প্রেম, সুগঠিত অধরপ্রান্তে সুসংযত স্মিত মাধুরী এবং ঈষৎ আনমিত অর্দ্ধবেষ্টনে একটি পরম শরণ ভাব।

এই প্রণয়দৃশ্যে সংযমী অর্জ্জুনের চরিত্রগৌরব যেন সম্যক্ ব্যক্ত হইয়াছে—সেই গভীর হৃদয়ের সমস্ত প্রেম, সেই করুণ হৃদয়ের সমস্ত করুণা, সেই নির্ভীক স্বভাবের ত্রিভুবনবিজয়ী তেজস্বিতা এবং সেই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ অবিচলিত ধী। আলঙ্কারিকদিগের মতে মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের প্রাধান্য হইলেও, অর্জ্জুনের চরিত্র এই সকল গুণে সকল পাণ্ডবদিগের মধ্যে সমধিক উজ্জ্বল। অর্জ্জুনের পার্শ্বে যুধিষ্ঠির অতি মৃদু। হয়ত নীতিবিধান অনুসারে তাঁহার প্রেম অর্জ্জুনের ভালবাসা হইতেও উচ্চতর—কারণ, দ্রৌপদীই তাঁহার একমাত্র প্রেয়সী এবং রূপসীর সমস্ত অনাবৃত সৌন্দর্য্য হয়ত তাঁহাকে বিচলিত করে না; কিন্তু সে অটল নীতিও নারীর হৃদয় তেমন আকর্ষণ করিতে পারে না, অর্জ্জুনের প্রেমদৃষ্টিতে তাহা যেমন সহজে আকৃষ্ট হয়। যুধিষ্ঠিরের অস্খলিতপদ সংসারযাত্রা প্রবীণদিগের দুর্লভ প্রশংসা আকর্ষণ করে; কিন্তু অর্জ্জুনের সংস্পর্শ যেমন হৃদয় হইতে হৃদয়ে তড়িৎ সঞ্চার করিয়া দেয়, তাঁহার সমস্ত শাস্ত্রানুসারী ধীরতা হৃদয়ে সে উদ্দীপনা জাগাইয়া

ভুলিতে পারে না। অর্জ্জুনের চরিত্রে মানবপ্রকৃতির অনেকগুলি বিভিন্ন ভাবের সুন্দর সমাবেশ হইয়াছে; তাঁহার দয়া এত যে, শত্রুকে বধ করিতেও অন্তরে ব্যথা লাগে, আবার তেজ এমনি যে, গাণ্ডীবের সামান্য নিন্দামাত্রও সহে না; যুধিষ্ঠিরের মত অবিচলিত ধীরতার সহিত সকল সহ্য করিতে তিনি অক্ষম, ভীমের মত বৈরনির্যাতনে তাঁহার একটা বর্ব্বর উল্লাসও নাই। সবশুদ্ধ তাঁহার চরিত্রে প্রতিভার এমন একটি মহিমা আছে, ভাবে এমন একটি অবলীলাসুশোভনতা আছে যাহাতে তিনি হৃদয়ের অত্যন্ত নিকট হইয়া উঠেন। এবং রবিবর্ম্মার চিত্রে তাঁহার এই সংযত গম্ভীর প্রসন্ন সুরসিক আবেগপূর্ণ সুন্দর ভাবটি অতি সুন্দররূপে ফুটিয়াছে।

মহাভারতীয় বিষয় লইয়া রবিবর্ম্মা অনেকগুলি চিত্র আঁকিয়াছেন—কীচকমন্দিরে সৈরন্ধ্রী, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, নলদময়ন্তী, শকুন্তলার লিপিরচনা, আরও গুটিকতক আছে; কিন্তু অর্জ্জুন ও সুভদ্রার প্রণয়দৃশ্যে অর্জ্জুন যেমন কেবলমাত্র প্রণয়ীরূপে নহে কিন্তু তাঁহার চরিত্রের সম্পূর্ণ গৌরবে ফুটিয়াছেন, অন্য চিত্রগুলি ভাল হইলেও কোন চরিত্রকে তেমন করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছে কি না সন্দেহ। হয়ত সে সকল চরিত্রের গৌরবও অর্জ্জুনের সমকক্ষ নহে। এবং এত করিয়া ফুটাইবার আবশ্যকও নাই।

নলদময়ন্তী উপাখ্যানের প্রধান চিত্র কলির প্রভাবে [illegible] নল প্রাণপ্রিয়া পত্নীকে কিরূপে ত্যাগ করিয়া যান। [illegible] চরিত্রের সহিত ইহার বড় সম্পর্ক নাই। সেই [illegible] বাহুপরি নিদ্রিতা দময়ন্তীর চিত্র এবং [illegible] পলায়নোদ্যত রাজা নলের কলিপেষিত ভাবটি ফুটাইয়া [illegible]

পারিলেই দর্শকের মনে উপাখ্যানটি নিঃশব্দে সম্পূর্ণ হইয়া আসে এবং দময়ন্তীর দুঃখে হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠে। রবিবর্ম্মা তাহা ঠিক ধরিয়াছেন এবং সেই অন্ধকার দৃশ্যপটে এই শোচনীয় ঘটনাটি এমনি মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন যে, তাহা বুঝিতে কালবিলম্ব হয় না।

হিমালয়ের পাদদেশে ব্যাঘ্রচর্ম্মোপরি বসিয়া ললাটন্তপবদ্ধদৃষ্টি বিশ্বামিত্র একাগ্রমনে তপস্যা করিতেছেন; অদূরে স্বচ্ছ শ্বেত-ধারায় পর্ব্বতের গাত্র ধৌত করিয়া বেগবতী নির্ঝরিণী গম্ভীর নিনাদে অবিরাম ঝরিতেছে। এই মনোহর শৈলদৃশ্যের মধ্যে মেনকা রূপযৌবনমাধুর্য্যচেষ্টিতভঙ্গিতভাষিতের দ্বারা বিশ্বামিত্রের মনোহরণ করিতে আসিয়াছেন। মুখে কোনরূপ চাপল্য নাই, মোহাবেশী কৃষ্ণতারক নেত্রযুগলে একটি স্নিগ্ধ মৃদু গাঢ়তা, বিশ্বা-মিত্রের পার্শ্বে বসিয়া কত সকরুণ দৃষ্টিতে যেন তাঁহার ধ্যানভঙ্গের প্রতীক্ষা করিতেছেন। এমন কোমল, এমন করুণ, এমন উজ্জ্বল মধুর কমনীয় ভাব! বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গের জন্যই যেন এ রূপ সৃষ্ট হইয়াছে।

বাস্তবিক রবিবর্ম্মা পৌরাণিক ভাবগুলির মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিয়াছেন; সেই জন্যই চিত্রে তিনি এমন সুন্দর ভাববিকাশ করিতে পারেন। তাঁহার কীচকমন্দিরে প্রেরিত সৈরন্ধ্রীর মুখে রমণীজনোচিত ভীতিভাবের সঙ্গে দেবতার উপরে কেমন অটল নির্ভর প্রকাশ পাইয়াছে। বস্ত্রহরণ চিত্রে তেজস্বিনীর পাণ্ডব-দিগের প্রতি সাশ্রু তীব্রদৃষ্টি এবং আত্মসম্ভ্রমরক্ষণে প্রাণপণচেষ্টা, পাণ্ডবদিগের প্রতিজনের ভিন্ন ভিন্ন মুখভাব, ধৃতরাষ্ট্রের নতশির, [illegible] উল্লসিত গর্ব্ব, সকলই কেমন যথাযথ! আমরা [illegible] মহাভারতকারের সেই অতুল্য প্রতিভার ছায়া

কিন্তু শকুন্তলার লিপিরচনা চিত্রে চিত্রকর তপোবনের বিরহ-কৃশাঙ্গী শকুন্তলাকে আঁকিতে পারেন নাই। উন্মুক্ত বনচারিণী মৃগাঙ্গনার মত তাঁহার শরীরে সুন্দর সুকুমার লাঘবতা প্রকাশ পায় নাই; অন্তঃপুরপালিতা অতিপুষ্টা যুবতীর মত তাঁহার দেহখানি গুরুভারকাতর দেখাইতেছে। কালিদাসের শকুন্তলা মধুরাকৃতি ও তন্বী—এবং লতা ও কুসুমের সহিতই তাঁহার দেহ ও যৌবনের যাহা কিছু সাদৃশ্য। প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যে এই কৃশমধ্যা তন্বঙ্গীই রূপসীর শ্রেষ্ঠ আদর্শ। সৌন্দর্য্যপিপাসা তখন মেদস্ফীত পীবর স্থাবরতার প্রতি ধাবিত হইত না এবং তুরস্ক প্রথানুসারে স্ত্রী-গুলিকে বহুযত্নে ঘৃতনবনীক্ষীরসরের সাহায্যে পিণ্ডীকৃত করিয়া তোলা হইত না। এ আইডিয়াল এদেশে অপেক্ষাকৃত আধুনিক—কতদিন নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না, বোধ হয় মুসলমান আমলের।

কিন্তু আমাদের এই দেশীয় চিত্রশালায় প্রবেশ করিয়া প্রথম আনন্দের উচ্ছ্বাসে নিন্দার কথা আর মুখে আনিতে ইচ্ছা করে না। যখন ভারতবর্ষে অনেক চিত্রকরের অভ্যুদয় হইবে এবং আমাদের চিত্রসম্পদ অজস্র হইয়া উঠিবে তখন আমরা সূক্ষ্ম বিচারের অধিকারী হইব। এখন যাহা পাওয়া যায় তাহাই পরম লাভ বলিয়া মনে হয়। চিত্রকলার কতটা দূর পর্য্যন্ত স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে তাহাও আমাদের জানা নাই। আমরা হয়ত বালকের মত আকাশের চাঁদ প্রত্যাশা করিয়া বসিব। ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের চিত্রে আমরা ক্ষত্রতেজ ও ব্রহ্মতেজের যে সম্মিশ্রণ দেখিতে চাই তাহা হয়ত রেখায় ও বর্ণে প্রকাশ করা অসাধ্য। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ দৃশ্যে তেজস্বিনী অবমানিতা দ্রৌপদীর লজ্জা ক্রোধ অভিমান বিস্ময় একত্রে পাইতে চাই; আমরা দেখিতে চাই, অপমানিত হইয়াও দ্রৌপদী আমাদের নিকট অপ-

মানিত হইতেছেন না, বরঞ্চ প্রজ্বলিত তেজোরাশির দীপ্তিতে তিনি আমাদের চক্ষে আরও দিগুণ মহীয়সী হইয়া উঠিয়াছেন—কিন্তু এ সকল হয়ত আমাদের কল্পনার দুরাশা মাত্র।

যেখানে চিত্রের সহিত আমাদের কল্পনার বিরোধ উপস্থিত হয় সেখানেও আমরা একটা মহৎ ফললাভ করি। চিত্রকরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমাদের চিত্ত নব উদ্যমে মানসপটে আপনার ভাবকে পরিস্ফুটতর করিয়া আঁকিতে চেষ্টা করে। সেটাকে অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয়, মনে মনে তুলি ধরিয়া তাহা সম্পূর্ণ করিবার একটা প্রয়াস চলিতে থাকে ইহাতেও আমাদের বড় একটি শিক্ষা ও আনন্দ লাভ হয়।

ডায়ারি।

আমি এখন বাঙ্গলা দেশের একপ্রান্তে যেখানে বাস করিতেছি এখানে কাছাকাছি কোথাও পুলিশের থানা, ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারি নাই। রেলোয়ে ষ্টেশন অনেকটা দূরে। যে পৃথিবী কেনাবেচা বাদানুবাদ মামলা মকদ্দমা এবং আত্মগরিমার বিজ্ঞাপন প্রচার করে, কোন একটা প্রস্তরকঠিন পাকা বড় রাস্তার দ্বারা তাহার সহিত এই লোকালয়গুলির যোগস্থাপন হয় নাই। কেবল একটি ছোট নদী আছে। যেন সে কেবল এই কয়খানি গোরেই ঘরের ছেলেমেয়েদের নদী। অন্য কোন বৃহৎ নদী সুদূর সমুদ্র অপরিচিত গ্রামনগরের সহিত যে তাহার সতীয়াত আছে তাহা এখানকার গ্রামের লোকেরা যেন জানিতে পারে নাই,

তাই তাহারা অত্যন্ত সুমিষ্ট একটা আদরের নাম দিয়া ইহাকে নিতান্ত আত্মীয় করিয়া লইয়াছে।

এখন ভাদ্রমাসে চতুর্দ্দিক জলমগ্ন—কেবল ধান্যক্ষেত্রের মাথাগুলি অল্পই জাগিয়া আছে। বহুদূরে দূরে এক একখানি তরুবেষ্টিত গ্রাম উচ্চভূমিতে দ্বীপের মত দেখা যাইতেছে।

এখানকার মানুষগুলি এমনি অনুরক্ত ভক্তস্বভাব এমনি সরল বিশ্বাসপরায়ণ যে, মনে হয় আডাম ও ইভ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইবার পূর্ব্বেই ইহাদের বংশের আদিপুরুষকে জন্মদান করিয়াছিলেন। সেই জন্য সয়তান যদি ইহাদের ঘরে আসিয়া প্রবেশ করে তাহাকেও ইহারা শিশুর মত বিশ্বাস করে এবং মান্য অতিথির মত নিজের আহারের অংশ দিয়া সেবা করিয়া থাকে।

এই সমস্ত মানুষগুলির স্নিগ্ধ হৃদয়াশ্রমে যখন বাস করিতেছি এমন সময়ে আমাদের পঞ্চভূত-সভার কোন একটি সভ্য আমাকে কতকগুলি খবরের কাগজের টুক্‌রা কাটিয়া পাঠাইয়া দিলেন। পৃথিবী যে ঘুরিতেছে স্থির হইয়া নাই তাহাই স্মরণ করাইয়া দেওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি লণ্ডন হইতে প্যারিস্ হইতে গুটিকতক সংবাদের ঘূর্ণাবাতাস সংগ্রহ করিয়া ডাকযোগে এই জলনিমগ্ন সুকোমলশ্যাম ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

একপ্রকার ভালই করিয়াছেন। কাগজগুলি পড়িয়া আমার অনেক কথা মনে উদয় হইল যাহা কলিকাতায় থাকিলে আমার ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম হইত না।

আমি ভাবিতে লাগিলাম, এখানকার এই যে সমস্ত নিরক্ষর নির্ব্বোধ চাষাভূষার দল—থিওরিতে আমি ইহাদিগকে অসভ্য বর্ব্বর বলিয়া অবজ্ঞা করি, কিন্তু কাছে আসিয়া প্রত্যক্ষভাবে আমি ইহাদিগকে আত্মীয়ের মত ভালবাসি। এবং ইহাও দেখিয়াছি

আমার অন্তঃকরণ গোপনে ইহাদের প্রতি একটি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে।

কিন্তু লণ্ডন প্যারিসের সহিত তুলনা করিলে ইহারা কোথায় গিয়া পড়ে! কোথায় সে শিল্প, কোথায় সে সাহিত্য, কোথায় সে বিজ্ঞান, কোথায় সে রাজনীতি! দেশের জন্য প্রাণ দেওয়া দূরে থাক্ দেশ কাহাকে বলে তাহাও ইহারা জানে না।

এ সমস্ত কথা সম্পূর্ণরূপে মনের মধ্যে পর্য্যালোচনা করিয়াও আমার মনের মধ্যে একটি দৈববাণী ধ্বনিত হইতে লাগিল—তবু এই নির্ব্বোধ সরল মানুষগুলি কেবল ভালবাসার নহে, শ্রদ্ধার যোগ্য।

কেন? আমি কেন ইহাদিগকে শ্রদ্ধা করি তাই ভাবিয়া দেখিতেছিলাম। দেখিলাম ইহাদের মধ্যে যে একটি সরল বিশ্বাসের ভাব আছে তাহা অত্যন্ত বহুমূল্য। এমন কি তাহাই মনুষ্যত্বের চিরসাধনার ধন। যদি মনের ভিতরকার কথা খুলিয়া বলিতে হয় তবে এ কথা স্বীকার করিব আমার কাছে তাহা অপেক্ষা মনোহর আর কিছু নাই।

সেই সরলতাটুকু চলিয়া গেলে সভ্যতার সমস্ত সৌন্দর্য্যটুকু চলিয়া যায়। কারণ স্বাস্থ্য চলিয়া যায়। সরলতাই মনুষ্য-প্রকৃতির স্বাস্থ্য।

যতটুকু আহার করা যায় ততটুকু পরিপাক হইলে শরীরের স্বাস্থ্যরক্ষা হয়। মসলা দেওয়া যতপক্ক সুস্বাদু চর্ব্ব্যচোষ্যলেহ্য পদার্থকে স্বাস্থ্য বলে না।

সমস্ত জ্ঞান ও বিশ্বাসকে সম্পূর্ণ পরিপাক করিয়া স্বভাবের সহিত একীভূত করিয়া লওয়ার অবস্থাকেই বলে সরলতা, তাহাই মানসিক স্বাস্থ্য। বিবিধ জ্ঞান ও বিচিত্র মতামতকে মনের স্বাস্থ্য বলে না।

এখানকার এই নির্ব্বোধ গ্রাম্য লোকগণ যে সকল জ্ঞান ও বিশ্বাস লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে সে সমস্তই ইহাদের প্রকৃতির সহিত এক হইয়া মিশিয়া গেছে। যেমন নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস রক্তচলাচল আমাদের হাতে নাই তেমনি এ সমস্ত মতামত রাখা না রাখা তাহাদের হাতে নাই। তাহারা যাহা কিছু জানে যাহা কিছু বিশ্বাস করে নিতান্তই সহজে জানে ও সহজে বিশ্বাস করে। সেই জন্য তাহাদের জ্ঞানের সহিত বিশ্বাসের সহিত কাজের সহিত মানুষের সহিত এক হইয়া গিয়াছে।

একটা উদাহরণ দিই। অতিথি ঘরে আসিলে ইহারা তাহাকে কিছুতেই ফিরায় না। আন্তরিক ভক্তির সহিত অক্ষুণ্ণ মনে তাহার সেবা করে। সে জন্য কোন ক্ষতিকে ক্ষতি কোন ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়া তাহাদের মনে উদয় হয় না। আমিও আতিথ্যকে কিয়ৎ-পরিমাণে ধর্ম্ম বলিয়া জানি কিন্তু তাহাও জানে বলি বিশ্বাসে জানি না। অতিথি দেখিবামাত্র আমার সমস্ত চিত্তবৃত্তি তৎক্ষণাৎ তৎপর হইয়া আতিথ্যের দিকে ধাবমান হয় না। মনের মধ্যে নানারূপ তর্ক ও বিচার করিয়া থাকি। এ সম্বন্ধে কোন বিশ্বাস আমার প্রকৃতির সহিত ঐক্য হইয়া যায় নাই।

কিন্তু স্বভাবের ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য ঐক্যই মনুষ্যত্বের চরম লক্ষ্য। নিম্নতম জীবশ্রেণীর মধ্যে দেখা যায় তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেদন করিলেও, তাহাদিগকে দুই চারি অংশে বিভক্ত করিলেও কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না, কিন্তু জীবগণ যতই উন্নতি লাভ করিয়াছে ততই তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর ঐক্য স্থাপিত হইয়াছে।

মানবস্বভাবের মধ্যেও জ্ঞান বিশ্বাস ও কার্য্যের বিচ্ছিন্নতা উন্নতির নিম্নপর্য্যায়গত। ভিন্নের মধ্যে অভেদ সংযোগই চরম উন্নতি।

কিন্তু যেখানে জ্ঞান বিশ্বাস কার্য্যের বৈচিত্র্য নাই সেখানে এই ঐক্য অপেক্ষাকৃত সুলভ। ফুলের পক্ষে সুন্দর হওয়া যত সহজ জীবশরীরের পক্ষে তত নহে। জীবদেহের বিবিধ কার্য্যোপযোগী বিচিত্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমাবেশের মধ্যে তেমন নিখুঁৎ সম্পূর্ণতা বড় দুর্লভ, জন্তুদের অপেক্ষা মানুষের মধ্যে অসম্পূর্ণতা আরো দুর্লভ। মানসিক প্রকৃতি সম্বন্ধেও এ কথা খাটে।

আমার এই ক্ষুদ্র গ্রামের চাষাদের প্রকৃতির মধ্যে যে একটি ঐক্য দেখা যায় তাহার মধ্যে বৃহত্ত্ব জটিলতা কিছুই নাই। এই ধরাপ্রান্তে ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে সামান্য গুটিকতক অভাব মোচন করিয়া জীবনধারণ করিতে অধিক দর্শন বিজ্ঞান সমাজতত্ত্বের প্রয়োজন হয় না। যে গুটিকয়েক আদিম পরিবার-নীতি গ্রাম-নীতি এবং প্রজা-নীতির আবশ্যক, সে কয়েকটি অতি সহজেই মানুষের জীবনের সহিত মিশিয়া জীবন্তভাব ধারণ করিতে পারে।

তবু ক্ষুদ্র হইলেও ইহার মধ্যে যে একটি সৌন্দর্য্য আছে তাহা চিত্তকে আকর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারে না। এবং এই সৌন্দর্য্যটুকু অশিক্ষিত ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্য হইতে পদ্মের ন্যায় উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিয়া সমস্ত গর্ব্বিত সভ্যসমাজকে একটি আদর্শ দেখাইতেছে। সেই জন্য লণ্ডন প্যারিসের তুমুল সভ্যতা-কোলাহল দূর হইতে সংবাদপত্রযোগে কাণে আসিয়া বাজিলেও আমার গ্রামটি আমার হৃদয়ের মধ্যে অদ্য প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে।

আমি অন্য কোন এক স্থানে ছন্দোবদ্ধ ভাষায় এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছি যে, প্রত্যেক ক্ষুদ্র সৌন্দর্য্য জগতের মধ্যে এক একটি আদর্শভাবে বিরাজ করিতেছে। তানপুরা যেমন ক্রমাগত একটি সুর দিতে থাকে, সেই সুরে বিচিত্র তানলয়কে বাঁধিয়া

লইবার জন্য; তেমনি জগতের প্রত্যেক সুন্দর দ্রব্য ক্রমাগতই মানুষের মনে একটি সুর দিতেছে। তাহার জীবনের সমস্ত বেসুরা জটিলতাকে একটি পঞ্চম স্বরে একটি সুন্দর ঐক্যে বাঁধিয়া লইবার জন্য অশ্রান্ত ধৈর্য্যে অহর্নিশি অনুরোধ করিতেছে। কোকিল যে, লোকালয়ের তরুশাখায় বসিয়া শতসহস্র বৎসর ধরিয়া মাঝে মাঝে একটি পরিপূর্ণ সুন্দর কুহুসুর দিয়াছে, মানবের কোলাহলময় জীবনযাত্রার মধ্যে সেই একটি মধুর সুর, সুন্দর প্রকৃতির সেই একটি করুণ মিনতি যে, অলক্ষিতভাবে কতটা শৃঙ্খলা ও শোভা আনয়ন করিয়াছে তাহা কোন সাংখ্যপ্রমাণের দ্বারা দেখান অসম্ভব কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, প্রত্যেক সুন্দর জিনিষ কেবল মাঝে মাঝে কাণের মধ্যে আঘাত দিয়া, এবং শুভ অবসরক্রমে হৃদয়ের মধ্যে স্থানলাভ করিয়া মানুষকে পশুত্বপাশ হইতে অল্প অল্প মুক্ত করিয়াছে। মানুষ যে কত পাখীকে তীর দিয়া বন্দুক দিয়া বধ করিয়াছে তাহার হিসাব মেলা শক্ত, আর পাখী যে মানুষকে কতখানি মানুষ করিয়া তুলিয়াছে তাহারও হিসাব করা যায় না।

প্রিয়বন্ধু ক্ষিতি এ সকল কথাকে নিতান্তই কাল্পনিক বাক্যবিন্যাস বলিয়া আপত্তি করিবেন; আমিও তাহার কোন পরিষ্কার সদুত্তর দিতে পারিব না, কিন্তু আমার নিজের অভিজ্ঞতা নির্ভরে জোরের সহিত বলিবার অধিকার আছে। আমি বলিতে পারি আমার নানাচিন্তাবিক্ষিপ্ত চিত্তের কাছে এই ছোট পল্লিটি তানপুরের পঞ্চম সুরের মত একটি নিত্য আদর্শ আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। সে বলিতেছে আমি বৃহৎ নহি বিস্ময়জনক নহি, কিন্তু আমি ছোটর মধ্যে সম্পূর্ণ সুতরাং অন্য সমস্ত অভাব সত্ত্বেও আমার যে একটি মাধুর্য্য তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমি

ছোট বলিয়া তুচ্ছ কিন্তু সম্পূর্ণ বলিয়া সুন্দর এবং এই সৌন্দর্য্য তোমাদের জীবনের আদর্শ।

কেবল ক্ষিতি কেন আরও দুই পাঁচ জন লোক আমার কথায় হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না কিন্তু তবু আমার বলা উচিত এই মূঢ় চাষাদের সুষমাহীন মুখের মধ্যে আমি একটি সৌন্দর্য্য অনুভব করি যাহা রমণীর সৌন্দর্য্যের মত। আমি নিজেই তাহাতে বিস্মিত হইয়াছি এবং চিন্তা করিয়াছি এ সৌন্দর্য্য কিসের। আমার মনে তাহার একটা উত্তরও উদয় হইয়াছে।

যে লোক বহুদিন ধৈর্য্য সহকারে একটি দুঃখ বহন করিয়া আসিতেছে তাহার মুখে বিষণ্ণ হৃদয়ের একটি স্থায়ী সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়। যে মা অচল স্নেহে সন্তানকে ভালবাসে তাহার মুখে একটি হৃদয়গুণ স্থায়ী হইয়া মাধুর্য্য বিকাশ করে। ঈশ্বরে যাহার ভক্তি অচল, ভক্তি তাহার মুখে একটি জ্যোতি বিকীর্ণ করিতে থাকে।

আকারের সৌন্দর্য্যের উপরেও একটি ভাবের সৌন্দর্য্য আছে। যাহার প্রকৃতি কোন একটি বিশেষ স্থায়ী ভাবকে অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহার মুখে সেই ভাব ক্রমশঃ একটি স্থায়ী লাবণ্য অঙ্কিত করিয়া দেয়।

আমার এই গ্রাম্য লোকসকল জন্মাবধি কতকগুলি স্থির-ভাবের প্রতি স্থির দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সেই কারণে সেই ভাবগুলি ইহাদের দৃষ্টিতে আপনাকে অঙ্কিত করিয়া দিবার সুদীর্ঘ অবসর পাইয়াছে। সেই জন্য ইহাদের দৃষ্টিতে একটি সকরুণ জিজ্ঞাসা ইহাদের মুখে একটি নির্ভরপরায়ণ বৎসলভাব স্থিরভাবে প্রকাশ পাইতেছে।

যাহারা সকল বিষয়েরই প্রশ্ন করে এবং নানা বিপরীত

ভাবকে সরস করিয়া করিয়া দেখে তাহাদের মুখে একটা বুদ্ধির তীব্রতা এবং সন্ধানপরতার পটুত্ব প্রকাশ পায় কিন্তু ভাবের গভীর স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য হইতে সে অনেক তফাৎ।

আমি যে ক্ষুদ্র নদীটিতে নৌকা লইয়া আছি ইহাতে স্রোত নাই বলিলেও হয়, সেই জন্য এই নদী কুমুদে কহ্লারে পদ্মে শৈবালে সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে। সেইরূপ একটা স্থায়িত্বের অবলম্বন না পাইলে ভাবসৌন্দর্য্যও আপনাকে বিকশিত করিবার অবসর পায় না।

প্রাচীন য়ুরোপ নব্য আমেরিকার প্রধান অভাব অনুভব করে সেই ভাবের। তাহার ঔজ্জ্বল্য আছে, চাঞ্চল্য আছে, কাঠিন্য আছে কিন্তু ভাবের গভীরতা নাই। সে বড়ই বেশি-মাত্রায় নূতন, তাহাতে ভাব জন্মাইবার সময় পায় নাই। এখনো সে মানুষের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়া মানুষের হৃদয়ের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া উঠে নাই। সত্য মিথ্যা বলিতে পারি না এইরূপ ত শুনা যায় এবং অ্যামেরিকার প্রকৃত সাহিত্যের বিরলতায় এইরূপ অনুমান করাও যাইতে পারে। প্রাচীন য়ুরোপের ছিদ্রে ছিদ্রে কোণে কোণে অনেক শ্যামল পুরাতন ভাব অঙ্কুরিত হইয়া তাহাকে বিচিত্র লাবণ্যে মণ্ডিত করিয়াছে, অ্যামেরিকায় সেই লাবণ্যটি নাই। বহুস্মৃতি জনপ্রবাদ বিশ্বাস ও সংস্কারের দ্বারা এখনো তাহাতে জীবনের রঙ ধরিয়া যায় নাই।

আমার এই চাষাদের মুখে প্রকৃতির সেই রঙ ধরিয়া গেছে। সারল্যের সেই পুরাতন শ্রীটুকু সকলকে দেখাইবার জন্য আমার বড় একটি আকাঙ্ক্ষা হইতেছে। কিন্তু সেই শ্রী এতই সুকুমার যে, কেহ যদি বলেন দেখিলাম না এবং কেহ যদি হাস্য করেন, তবে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া আমার সাধ্যায়ত্ত হইবে না।

এই খবরের কাগজের টুক্‌রাগুলি পড়িতেছি আর আমার মনে হইতেছে, যে, বাইবেলে লেখা আছে, যে নম্র সেই পৃথিবীর অধিকার প্রাপ্ত হইবে। আমি যে নম্রতাটুকু এখানে দেখিতেছি ইহার একটি স্বর্গীয় অধিকার আছে। পৃথিবীতে সৌন্দর্য্যের অপেক্ষা নম্র আর কিছু নাই—সে বলের দ্বারা কোন কাজ করিতে চায় না—একসময় পৃথিবী তাহারই হইবে। এই যে গ্রামবাসিনী সুন্দরী সরলতা আজ একটি নগরবাসী নবসভ্যতার পোষ্যপুত্রের মন অতর্কিতভাবে হরণ করিয়া লইতেছে এককালে সে এই সমস্ত সভ্যতার রাজরাণী হইয়া বসিবে। এখনো হয় ত তার অনেক বিলম্ব আছে। কিন্তু অবশেষে সভ্যতা সরলতার সহিত যদি সম্মিলিত না হয় তবে সে আপনার পরিপূর্ণতার আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্থায়িত্বের উপর ভাবসৌন্দর্য্যের নির্ভর। পুরাতন স্মৃতির যে সৌন্দর্য্য তাহা কেবল অপ্রাপ্যতা নিবন্ধন নহে; হৃদয় বহুকাল তাহার উপর বাস করিতে পারে বলিয়া সহস্র সজীব কল্পনাসূত্র প্রসারিত করিয়া তাহাকে আপনার সহিত একীকৃত করিতে পারে, সেই কারণেই তাহার মাধুর্য্য। পুরাতন ইতিহাস, পুরাতন বংশ, পুরাতন গৃহ, পুরাতন দেবমন্দিরের প্রধান সৌন্দর্য্যের কারণ এই যে, বহুকালের স্থায়িত্ববশতঃ তাহারা মানুষের সহিত অত্যন্ত সংযুক্ত হইয়া গেছে, তাহারা অবিশ্রামে মানবহৃদয়ের সংস্রবে সর্ব্বাংশে সচেতন হইয়া উঠিয়াছে—সমাজের সহিত তাহাদের সর্ব্বপ্রকার বিচ্ছেদ দূর হইয়া তাহারা সমাজের অঙ্গ হইয়া গেছে, এই ঐক্যেই তাহাদের সৌন্দর্য্য। মানব-সমাজে স্ত্রীলোক সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন; পুরুষ নানা কার্য্য নানা অবস্থা নানা পরিবর্ত্তনের মধ্যে সর্ব্বদাই চঞ্চলভাবে প্রবাহিত

হইয়া আসিতেছে; স্ত্রীলোক স্থায়ীভাবে কেবলি জননী এবং পত্নীরূপে বিরাজ করিতেছে, কোন বিপ্লবেই তাহাকে বিক্ষিপ্ত করে নাই; এই জন্য সমাজের মর্ম্মের মধ্যে নারী এমন সুন্দর-রূপে সংহতরূপে মিশ্রিত হইয়া গেছে; কেবল তাহাই নহে, সেই জন্য সে তাহার ভাবের সহিত কাজের সহিত শক্তির সহিত সবসুদ্ধ এমন সম্পূর্ণ এক হইয়া গেছে—এই দুর্লভ সর্ব্বাঙ্গীন ঐক্য-লাভ করিবার জন্য তাহার দীর্ঘ অবসর ছিল।

সেইরূপ যখন দীর্ঘকালের স্থায়িত্ব আশ্রয় করিয়া তর্ক যুক্তি জ্ঞান ক্রমশঃ সংস্কারে বিশ্বাসে আসিয়া পরিণত হয় তখনই তাহার সৌন্দর্য্য ফুটিতে থাকে। তখন সে স্থির হইয়া দাঁড়ায় এবং ভিতরে যে সকল জীবনের বীজ থাকে সেইগুলি মানুষের বহু-দিনের আনন্দালোকে ও অশ্রুজলবর্ষণে অঙ্কুরিত হইয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

য়ুরোপে সম্প্রতি যে এক নব সভ্যতার যুগ আবির্ভূত হই-য়াছে এ যুগে ক্রমাগতই নব নব জ্ঞান বিজ্ঞান মতামত স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে; যন্ত্রতন্ত্র উপকরণসামগ্রীতেও একেবারে স্থানা-ভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবিশ্রাম চাঞ্চল্যে কিছুই পুরাতন হইতে পাইতেছে না।

কিন্তু দেখিতেছি এই সমস্ত আয়োজনের মধ্যে মানবহৃদয় কেবলই ক্রন্দন করিতেছে, য়ুরোপের সাহিত্য হইতে সহজ আনন্দ সরল শান্তির গান একেবারে নির্ব্বাসিত হইয়া গিয়াছে। হয় প্রমোদের মাদকতা, নয় নৈরাশ্যের বিলাপ, নয় বিদ্রোহের অট্ট-হাস্য।

তাহার কারণ মানবহৃদয় যতক্ষণ এই বিপুল সভ্যতাস্তূপের মধ্যে একটি সুন্দর ঐক্য স্থাপন করিতে না পারিবে ততক্ষণ

কখনই ইহার মধ্যে আরামে ঘরকন্না পাতিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না। ততক্ষণ সে কেবল অস্থির অশান্ত হইয়া বেড়াইবে। আর সমস্তই জড় হইয়াছে, কেবল এখনো স্থায়ী সৌন্দর্য্য, এখনো নবসভ্যতার রাজলক্ষ্মী আসিয়া দাঁড়ান নাই। জ্ঞান বিশ্বাস ও আর্য্য পরস্পরকে কেবলি পীড়ন করিতেছে—ঐক্যলাভের জন্য নহে, অরলাভের জন্য পরস্পরের মধ্যে সংগ্রাম বাধিয়া গিয়াছে।

কেবল যে প্রাচীন স্মৃতির মধ্যে সৌন্দর্য্য তাহা নহে, নবীন আশার মধ্যেও সৌন্দর্য্য, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে য়ুরোপের নূতন সভ্যতার মধ্যে এখনো আশার সঞ্চার হয় নাই। বৃদ্ধ য়ুরোপ অনেকবার অনেক আশায় প্রতারিত হইয়াছে; যে সকল উপায়ের উপর তাহার বড় বিশ্বাস ছিল সে সমস্ত একে একে ব্যর্থ হইতে দেখিয়াছে। ফরাসী বিপ্লবকে একটা বৃহৎ চেষ্টার বৃথা পরিণাম বলিয়া অনেকে মনে করে। এক সময় লোকে মনে করিয়াছিল আপামর সাধারণকে ভোট দিতে দিলেই পৃথিবীর অধিকাংশ অমঙ্গল দূর হইবে—এখন সকলে ভোট দিতেছে অথচ অধিকাংশ অমঙ্গল বিদায় লইবার জন্য কোনরূপ ব্যস্ততা দেখাইতেছে না। কখনো বা লোকে আশা করিয়াছিল ষ্টেটের দ্বারা মানুষের সকল দুর্দ্দশা মোচন হইতে পারে, এখন আবার পণ্ডিতেরা আশঙ্কা করিতেছেন ষ্টেটের দ্বারা দুর্দ্দশা মোচনের চেষ্টা করিলে হিতে বিপরীত হইবারই সম্ভাবনা। কয়লার খনি কাপড়ের কল এবং বিজ্ঞানশাস্ত্রের উপরও কাহারও কাহারও কিছু কিছু বিশ্বাস আছে কিন্তু তাহাতেও দ্বিধা ঘোচে না; অনেক বড় বড় লোক বলিতেছেন কলের দ্বারা মানুষের পূর্ণতা সাধন হয় না। আধুনিক য়ুরোপ বলে, আশা করিয়ো না, বিশ্বাস করিয়ো না, কেবল পরীক্ষা কর।

নবীনা সভ্যতা যেন [illegible] বিস্তার করিয়াছে, তাহার সমৃদ্ধি আছে কি[illegible]য়ে সহস্র পূর্ব অভিজ্ঞতার দ্বারা জীর্ণ। [illegible] প্রণয় হইতেছে না—গৃহের মধ্যে কেবল অগ্নি।

এই সমস্ত আলোচনা করিয়া আমি এই পল্লীর ক্ষুদ্র সম্পূর্ণতার সৌন্দর্য্য নিষ্কণ্টক আনন্দে সম্ভোগ করিতেছি।

তাই বলিয়া আমি এমন অন্ধ নহি যে, য়ুরোপীয় সভ্যতার মর্য্যাদা বুঝি না। প্রভেদের মধ্যে ঐক্যই ঐক্যের পূর্ণ আদর্শ—বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই সৌন্দর্য্যের প্রধান কারণ। সম্প্রতি য়ুরোপে সেই প্রভেদের যুগ পড়িয়াছে, তাই এত বিচ্ছেদ বৈষম্য; যখন ঐক্যের যুগ আসিবে তখন এই বৃহৎ স্তূপের মধ্যে অনেক ঝরিয়া গিয়া পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া একখানি সমগ্র সুন্দর সভ্যতা দাঁড়াইয়া যাইবে। ক্ষুদ্র পরিণামের মধ্যে পরিসমাপ্তি লাভ করিয়া সন্তুষ্টভাবে থাকার মধ্যে একটি শান্তি সৌন্দর্য্য ও নির্ভরতা আছে সন্দেহ নাই—আর, যাহারা মনুষ্যপ্রকৃতিকে ক্ষুদ্র ঐক্য হইতে মুক্তি দিয়া বিপুল বিস্তারের দিকে লইয়া যায় তাহারা অনেক অশান্তি অনেক বিঘ্নবিপদ সহ্য করে, বিপ্লবের রণক্ষেত্রের মধ্যে তাহাদিগকে অশ্রান্ত সংগ্রাম করিতে হয়—কিন্তু তাহারাই পৃথিবীর মধ্যে বীর এবং তাহারা যুদ্ধে পতিত হইলেও অক্ষয় স্বর্গ লাভ করে। এই বীর্য্য এবং সৌন্দর্য্যের মিলনেই যথার্থ সম্পূর্ণতা। উভয়ের বিচ্ছেদে অর্দ্ধসভ্যতা। তথাপি আমরা সাহস করিয়া য়ুরোপকে অর্দ্ধসভ্য বলি না, বলিলেও কাহারও গায়ে বাজে না। য়ুরোপ আমাদিগকে অর্দ্ধসভ্য বলে; এবং বলিলে আমাদের গায়ে বাজে, কারণ, সে আমাদের কর্ণধার হইয়া বসিয়াছে।

আমি এই পল্লীপ্রান্তে বসিয়া আমার মাদ্রাসিয়া তামপুরাটা

চারটি তারের গুটিচারেক সুন্দর সুরসন্নিশ্রণের সহিত মিলাইয়া য়ুরোপীয় সভ্যতাকে বলিতেছি, তোমার সুর এখনো ঠিক মিলিল না এবং তানপুরাটিকেও বলিতে হয় তোমার ঐ গুটিকয়েক সুরের পুনঃপুনঃ ঝঙ্কারকেও পরিপূর্ণ সঙ্গীত জ্ঞান করিয়া সন্তুষ্ট হওয়া যায় না। বরঞ্চ আজিকার ঐ বিচিত্র বিশৃঙ্খল স্বরসমষ্টি কাল প্রতিভার প্রভাবে মহা সঙ্গীতে পরিণত হইয়া উঠিতে পারে, কিন্তু হায়, তোমার ঐ কয়েকটি তারের মধ্যে হইতে মহৎ মূর্ত্তিমান সঙ্গীত বাহির করা প্রতিভার পক্ষেও দুঃসাধ্য।

স্বরলিপি।

যোগিয়া বিভাস—একতালা।

৩।৩

আজি শরত তপনে প্রভাত স্বপনে
কি জানি পরাণ কি যে চায়!
ওই শেফালির শাখে কি বলিয়া ডাকে
বিহগ বিহগী কি যে গায়!
আজি মধুর বাতাসে হৃদয় উদাসে
রহে না আবাসে মন হায়!
কোন্ কুসুমের আশে, কোন্ ফুলবাসে
সুনীল আকাশে মন ধায়!

আজি কে যেন গো নাই এ প্রভাতে তাই
জীবন বিফল হয় গো!
তাই চারিদিকে চায় মন কেঁদে গায়
"এ নহে, এ নহে, নয় গো!"

কোন্ স্বপনের দেশে আছে এলোকেশে,
কোন্ ছায়াময়ী অমরায়!
আজি কোন্ উপবনে বিরহবেদনে
আমারি কারণে কেঁদে যায়!

আমি যদি গাঁথি গান অধির পরাণ
সে গান শুনাব কারে আর!
আমি যদি গাঁথি মালা লয়ে ফুলডালা
কাহারে পরাব ফুলহার!
আমি আমার এ প্রাণ যদি করি দান
দিব প্রাণ তবে কার পায়!
সদা ভয় হয় মনে পাছে সযতনে
মনে মনে কেহ ব্যথা পায়!

সা সা ॥ রমা -া মা। পা পদা পদপা।
আ জি ॥ শর — ত। ত প নে।

। দপদা পা মঃ পমঃ। গা গমা গমপা। গমপা মপমা গা।
। প্র- ভা ভঁ — । স্ব প নে । কি জা নি।

।গরসা সরা -গমা। গমগা গরা সা। -া ॥ পা -া।
। প রা- ণ। কি যে চা। -য় ও ই।

। পধা -া ধর্সা। র্সাঃ র্সঃ র্সর্রা। র্সর্রগা র্রগর্রা র্সা।
। শেফা— লি । -র শা খে । কি ব লি।

। ধধা ধা ধপধা। -ধপা পা পা। পপা -া দা।
। ভা ভা কে । বি হ গ। বিহ — গী।

। পা দা পদপা। -া দপদা -পা। পদপা মা গা।
। কি যে গা — । য় গো — । কি জা নি।

। গরসা সরা -গমা। গমগা গরা সা। -া সা সা॥
। প্ রা ণ্। কি যে চা। ম্র আ জি॥

। পা পা। পা ধা ধর্সা। র্সা র্সা নর্সর্র্গা। র্গা র্র্সা র্সা।
। আ জি। ম ধু র। বা তা সে। হ্ব দ য়।

। র্সাঃ র্সঃ র্সা। র্সর্সা -নর্সর্রা র্রা। র্রর্রা-া -র্সর্র্গা।
। উ দা সে। রহে — না। আবা— —।

। র্গা র্র্সা র্সর্র্সা। নর্সনা -ধনা পধা। ধা র্রা র্সর্র্সা।
। সে — মন। হা য় কোন্। কু সু মে।

। -া র্সা র্সা। নর্সর্রা -র্সা র্সনা। নধাঃ ধঃ ণঞ্চধা।
। র্ আ শে। কো ন্ ফু। ল বা সে।

। ধপা পা পা। পা পা দা। পা দা পদঞ্চা।
। স্থ নী ল। আ কা শে। ম ন ধা।

। -া দঞ্চদা -পা। পদপা মপমা গা। গরসা সরা -গমা।
। য় গো —। কি জা নি। প রা ণ্।

। গরগা গরা সা। -া সা সা॥ সা সা। মমা মা পা।
। কি যে চা। য় আ জি॥ আ জি। কে মে ন।

। পদা পদঞ্চাঃ -দপঃ। পদঞ্চা দপা মপা। গা গমপা -া।
। গো না ই। এ প্র ভা। তে তা ই।

। মমপা মগা গা। গরসা সরা -গমা। পদপঃ -রঃ সা।
। ঘ ন। বি ফ ল। হ ই গো।

।-ণ পা -ণ।.পা ধা ধর্সা। র্সা র্সা -ণ। নর্সর্রা র্সর্রর্সা র্সনা।
।—তা ই। চা রি দি । কে চা য়। ম ন কেঁ।

।নধা ধাঃ-ঞধঃ। ধপা পা পা। পাঃ পঃ দা।
।দে গা য়। "এ ন হে। এ ন হে।

।পা দা পদা। -ঞা দঞদা পা। পদপা মগা গা।
।ন য় গো"। — তা ই। জী ব ন।

।গরসা সরা -গমা। গা রগরা সা। -ণ পা -ণ। পা ধা ধা।
।বি ফ ল। হ য় গো। —কো ন্। স্ব প নে।

।-র্সা র্সা নর্সর্রা। র্রর্সা র্সা র্সা। র্সাঃ র্সঃ র্সা।
।র্ দে শে। আ ছে এ। লো কে খে।

।র্সা -নর্সর্রা র্রর্রা।-সর্রর্গা র্গর্গা-র্রর্সা।র্সা নর্সর্রা র্সর্রর্সা।
।কো ন্ ছায়া। — ময়ী —।অ ম য়া।

।-নধা ধনধা পধা। ধা -র্রর্সা র্সা। র্সা র্সা র্সা।
।য় গো আজি। কো ন্ উ। প ব নে।

।নর্সর্রা র্সা নধা। ধা ধা ধঞধা। ধপা পা পা।
।বি র হ। যে দ নে। আ মা য়ি।

।পা পা দা। পা দা পদঞা। -ণ দঞদা -পা।
।কা র ণে। কেঁ দে যা। য় গো —।

।পদা পদপা মা। গরা সরা গমা। গরগা গরা সা।
।কি জা নি। প রা ণ্। কি যে চা।

।-ন সা সা ॥ সা সা। রমা মা মপা। পদা পদঞ্চাঃ-দপঃ।
।-র আ জি ॥ আ মি। য় দি গাঁ। -থি গা ন্ ।

।পঞ্চা দঞ্চদা পমা। গা গমা -পা। গমপা মা -গা।
।অ থি র। প রা ণ্ সে গা ন্।

।গরসা সরগমা গা। গা রগরা সা। -ন পা পা।
।শু না ব। কা রে আ। র্ আ মি।

।পধা -ন ধর্সা। র্সা র্সা র্সা। নর্সর্রা র্সর্রর্সা র্সনা।
।যদি — গাঁ। থি মা লা। লু রে ফু ।

।নধা ধা ধঞ্চধা। ধপা পা পা। পপা -ন দা। পা দা পদঞ্চা।
।ল ডা লা। কা হা রে। পরা — ব। ফু ল হা ।

।-ন দঞ্চদা -পা। পদা পদপা মগা। গরসা সরগমা গা।
।র্ গো —। কা হা রে। প রা ব।

।গা রগরা সা। -ন পা পা। পা ধা -র্সা। র্সা নর্সা- -র্রর্গা।
।ফু ল হা। র্ আ মি। আ মা র্। এ প্রা ণ্।

।র্রর্গা র্রর্সা র্সা। র্সা র্সা -। র্সর্সা -নর্সর্রা র্রা।
।য দি ক। রি দা ন্। দিব — প্রা।

।-ন র্রা র্রর্গা। র্সর্রা -র্রর্গা র্রর্গর্রা। -র্সনা ধনা পধা।
।ণ্ ত বে। কা র্ পা ।য় গো সদা।

।ধা র্রা র্সর্রর্সা। -ন র্সা র্সা। নর্সর্রা র্সনা নধা। ধা ধা ধঞ্চধা।
।ভ য় হ ।য় ম্ নো পা ছে অ। য ত নে ।

। ঋপা পা পা। পাঃ পঃ দা। পা দা পদঞা।
। ম নে ম। নে কে হ। ব্য থা পা।

। -া দঞদা -পা। দপাঃ -মঃ গা। গরদা সরা -গমা।
। র গো — । কিজা — নি। প রা ণ্।

। গমগা গরা সা। -া সা সা॥
। কি বে চা। ম আ জি॥

ব্যাখ্যা।

১। দ=কোমল ধা; ঞ=কোমল নি।

২। অর্দ্ধ মাত্রার চিহ্ন বিসর্গ। দুইটি সংযুক্ত স্বরাক্ষরের পর যদি বিসর্গ চিহ্ন থাকে তবে তাহার অর্থ এই, দুইটি স্বর অর্দ্ধমাত্রার মধ্যে উচ্চারিত হইবে; অর্থাৎ, তাহার প্রত্যেক স্বর সিকিমাত্রায় উচ্চারিত হইবে। যথা;—"ঃ পমঃ"। ইহার মধ্যে 'মঃ' অর্দ্ধমাত্রা কালস্থায়ী এবং "পমঃ" অর্দ্ধমাত্রা কালস্থায়ী, সমস্ত মিলিয়া একমাত্রা কালস্থায়ী। কখন কখন তিনটি স্বর একত্রে দেড়মাত্রার মধ্যে উচ্চারিত হয়। যথা, "পদঞাঃ -দপঃ"। এস্থলে 'প', 'দ', 'ঞ,' এই তিন স্বর দেড়মাত্রার মধ্যে উচ্চারিত হইবে এবং 'দ', 'প', এই দুই স্বর অর্দ্ধমাত্রার মধ্যে উচ্চারিত হইবে;—সমস্ত মিলিয়া সুতরাং দুই মাত্রার মধ্যে উচ্চারিত হইবে। এক মাত্রার চিহ্ন=।।

কালিদাস ও অশ্বঘোষ।

কালিদাসের গৌরবে সংস্কৃত সাহিত্য ও আর্য্যজাতি গৌরবান্বিত। কালিদাসের প্রতিভা, উদ্ভাবনী প্রতিভা, জগদ্বিখ্যাত। সুতরাং কালিদাস কাহারও নিকট ঋণগ্রস্ত শুনিলে আমাদের কষ্ট

হয়। তবে ঋণদাতা যদি ভারতবর্ষীয় এবং আর্য্যজাতীয় হয়েন তাহা হইলে কষ্টের কিছু লাঘব হয়।

খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী হইতে খৃষ্টপর সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত কালিদাসের আবির্ভাব কাল অনুমিত হইয়াছে। পরন্তু খৃষ্টের পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে কালিদাস জীবিত ছিলেন না ইহাই এখন পণ্ডিতগণ একরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

অশ্বঘোষ একজন বৌদ্ধ কবি। হুয়েন সাং ও ইসিঙ ভারতবর্ষের ভ্রমণবৃত্তান্তে তাঁহাকে প্রাচীন কবি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাঁরা সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতে আইসেন। বুদ্ধের নির্ব্বাণের পাঁচশত বৎসর পরে কণিষ্কের রাজত্বকালে শ্রাবস্তীনগরে অশ্বঘোষের আবির্ভাব হয়। তিনি পার্শ্বের শিষ্য। কণিষ্ক খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে পঞ্জাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিতেরা অনুমান করেন।

সুতরাং অশ্বঘোষ কালিদাসের পূর্ব্বতন। কে কাহার পূর্ব্বতন সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিলেও উভয়ের রচনার মধ্যে মধ্যে এমন সাদৃশ্য আছে যে, পড়িলেই দেখা যায় যে, একজনের নিকট অন্যে উপকৃত।

পূর্ব্বে ভারতবর্ষে শক্রধ্বজ বা ইন্দ্রধ্বজের পূজা হইত। বাঙ্গলা বা বিহারে এ পূজা এখন নাই। পূর্ব্বে বিহারে এ পূজা প্রচলিত ছিল। বর্ষাকালে ভাদ্র শুক্লদ্বাদশী তিথিতে প্রজাগণের শ্রীবৃদ্ধির জন্য রাজা একটী বৃহৎ ধ্বজা প্রোথিত করিয়া ইন্দ্রের উদ্দেশে পূজা করিতেন। ইন্দ্রধ্বজ-পূজা পশ্চিমাঞ্চলে মহাসমারোহে সাধিত হইত। অদ্যাপি মহারাষ্ট্রদেশে গুড়িচা পাড়বা নামে ধ্বজ-পূজা হইয়া থাকে। কিন্তু চৈত্র শুক্লপ্রতিপদে উহা হইয়া থাকে। ইহাই শক্রধ্বজ-পূজা কি না বলা যায় না। ভারতবর্ষের

অন্য কোথাও এ পূজা প্রচলিত আছে কি না জানিতে পারি নাই। ভবিষ্যোত্তর পুরাণে লিখিত হইয়াছে বৃষ্টি হইলে প্রজার মঙ্গল হয়, না হইলে সমূহ ক্ষতি। এজন্য রাজা বৃষ্টি কামনায় শক্রধ্বজ পূজা করিতেন ;—

চতুরস্রম্ ঋজ্বাকারং রাজদ্বারে প্রতিষ্ঠিতং
আহুঃ শক্রধ্বজং নাম পৌরলোকে সুখাবহং।

কালিদাসের জন্মভূমি নিরূপিত না হইলেও তিনি জীবনের অধিকাংশ যে, মালবদেশে অতিবাহিত করিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন রাজসভায় নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি ভারতবর্ষের অনেক দেশ দর্শন করিয়াছিলেন ; সুতরাং শক্রধ্বজ-পূজা তিনিও লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশে শক্রধ্বজ পূজার বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল ; বিহারে এ পূজা প্রচলিত না থাকিলেও অশ্বঘোষ ভ্রমণক্রমে অন্যত্র ইহা দেখিয়া থাকিবেন।

অশ্বঘোষ তাঁহার বুদ্ধচরিত মহাকাব্যে লিখিতেছেন—বুদ্ধের জন্ম কথা শুনিয়া বৃদ্ধ আচার্য্য অসিত তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন;—

শ্রুত্বা বচস্তচ্চ মনশ্চ যুক্ত্বা জ্ঞাত্বা নিমিত্তৈশ্চ ততোঽভ্যুপেতঃ
দিদৃক্ষয়া শাক্যকুলধ্বজস্য শক্রধ্বজস্যেব সমুচ্ছ্রিতস্য।

অনোমাতটে বুদ্ধ ছন্দকের হস্তে কটককে সমর্পণ করিয়া জন্মের মত বিদায় হইলেন। ছন্দক কটককে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কপিলবাস্তুতে আসিয়া প্রবেশ করিল। কুমারকে হারাইয়া ছন্দক ফিরিয়া আসিয়াছে শুনিয়া রাজা শুদ্ধোদন—

নিশম্য চ ছন্দক কন্থকাবুভৌ হৃতস্য সংশ্রুত্য চ নিশ্চয়ং স্থিরং
পপাত শোকাভিহতো মহীপতিঃ শচীপতে র্বৃত্রইবোৎসবে ধ্বজঃ

কালিদাস রঘুবংশে লিখিয়াছেন

পুরন্দরশ্রীরসহোঢ়মুর্জ্জয়ং তমোরয়ন্ পঙ্কজয়োনিসম্ভবঃ
নবাতপোত্থান দর্শিনো নবন্দুঃ সপ্রজাঃ প্রজাঃ

যখন দুইজন কবিরই শক্রধ্বজ-পূজা দেখিবার সম্ভাবনা ছিল তখন একজন অপরের নিকট একথাটী শুনিয়াছেন ইহা অনুমান করিবার কোন কারণ নাই। হয় ত অন্য কত প্রাচীন কবি শক্রধ্বজ-পূজার উল্লেখ করিয়া থাকিবেন। প্রাকৃতিক বা ঐতিহাসিক ঘটনা হইতে আদান প্রদান অনুমান করা যায় না। যেখানে কল্পনার লীলা, সেখানে সবিশেষ সাদৃশ্য দৃষ্ট হইলে সন্দেহ জন্মে। আমরা এখন সেইরূপ সাদৃশ্য দেখাইব।

স্বয়ম্বরে ভোজ্যার পাণিগ্রহণ করিয়া অজ রাজা নগরপথে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য পুরনারীরা বাতায়ন-পথে দৌড়িয়া গিয়াছেন। কালিদাসের রঘুবংশ যাঁহারা একবার পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা সে দৃশ্যটী কখন ভুলিতে পারিবেন না।

ততস্তদালোকনতৎপরাণাং
সৌধেষু চামীকরজালবৎসু
বভূবুরিথং পুরসুন্দরীণাং
ত্যক্তান্যকার্য্যাণি বিচেষ্টিতানি॥

আলোকমার্গং সহসা ব্রজন্ত্যা
কয়াচিদুদ্বেষ্টনবান্তমাল্যঃ
বন্ধুং সম্ভাবিত এব তাবৎ
করেণ রুদ্ধোপিচ কেশপাশঃ

প্রসাধিকালম্বিতমগ্রপাদ
মাক্ষিপ্য কাচিৎ ত্বরয়াজগাম

আকারের একটী হস্তি দেখিলাম। আমার বন্ধুকে বলিলাম, "এই তোমাদের ব্যাঘ্র ও হস্তি!" এই চতুষ্পদ মহাশয়দিগকে দেখিয়া যে কিছুমাত্র ভীত বা আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম না ইহাতে বন্ধুবর বোধ হয় কিছু ক্ষুণ্ণিত হইয়া থাকিবেন। এখানে মহাত্মা লিংকলনের এক প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে।

নিউইয়র্ক হইতে সিকাগো রেলগাড়ীতে আসিলাম। মিসিগানের ধার দিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল।

সিকাগোর নিকটস্থ হইলে আগ্রহ সহকারে চারিদিক দেখিতে লাগিলাম।

সহরে পড়িয়াই দক্ষিণ দিকে নানাবর্ণের পতাকাযুক্ত একটী বৃহৎ স্থান দেখিয়া বুঝিলাম যে, এইটী মহামেলার স্থান। তাহা ছাড়িয়া প্রায় সাত মাইল গিয়া জলপূর্ণ সহরের মধ্যস্থিত ষ্টেসনে উপনীত হইলাম। আমার জন্য যে স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহা এক্‌জিবিসনের অতি নিকটে। জিজ্ঞাসা করিয়া একটী গাড়ী লইয়া তথায় উপস্থিত হইলাম। আমেরিকাবাসীরা যে কিরূপ উদারচরিত, বিশেষতঃ বিদেশী লোকের প্রতি যে কিরূপ কৃপাবান তাহার পরিচয় এখানে পাইলাম। যেস্থানে আমার যাওয়ার আবশ্যক ছিল তাহা আমি জানিতাম না। পথে একজন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি নিজেও সেস্থান কোথায় জানিতেন না। তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বলিলেন, "আপনি দেখিতেছি বিদেশী সুতরাং সে স্থান অনুসন্ধান করিয়া স্থির করা আপনার পক্ষে বড় কঠিন হইবে, আমি যতক্ষণ স্থির করিয়া না দিতে পারি ততক্ষণ আপনার সঙ্গে যাইতে চাই।" এই কথা বলিয়া আমার সঙ্গে আসিলেন। কতকদূর গিয়া একজন পোষ্টম্যানকে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সমস্ত অবগত হইয়া আমাকে

একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া দিয়া গাড়োয়ানকে বলিয়া দিলেন, "ইনি ভিন্নদেশীয় লোক বিশেষ যত্ন করিও।" আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে তিনি বলিলেন, "ইহা আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম।" আমি আরও অনেক স্থানে এইরূপ সাহায্য লাভ করিয়াছি।

নিরূপিত স্থানে উপস্থিত হইয়া আমার বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম; এবং তাঁহার বাটীতেই কিছু আহারাদি করিয়া একেবারে মেলাস্থানে উপস্থিত হইলাম। প্রবেশদ্বারে একজন ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কোন্ দেশীয় লোক?" এই সময়ে আমার চোগা, চাপকান ও পাগড়ী পরা ছিল। আমি বলিলাম, "হিন্দুস্থানে আমার বাড়ী ও আমি হিন্দু।" এরূপ বলিবার কারণ আছে; ইণ্ডিয়া ও ইণ্ডিয়ান বলিলে ইঁহারা ভারতেই ইণ্ডিয়ানদিগকে বুঝিয়া থাকেন। আমি হিন্দু বলাতে তিনি বুঝিতে পারিলেন ও আমাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন।

বাল্যকাল হইতেই স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আমার স্বভাব। সুতরাং প্রথমেই স্ত্রীজাতির গৃহ বা "উইমেন্স্ বিল্ডিং" দেখিতে গেলাম। এই গৃহ যে, কেবল আমেরিকার মহিলাকীর্ত্তিস্তম্ভ তাহা নহে; এখানে ব্রিটিশ, ফরাসী, জার্ম্মা... সভ্যজাতীয় মহিলারা তাঁহাদের স্বহস্তনির্ম্মিত নানাপ্রকার শিল্প প্রদর্শনার্থ পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমাদের রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার কন্যা ও পুত্র-বধূরা তাঁহাদের নিজকৃত ... পাঠাইয়াছেন। দেখিয়া মনে আনন্দ হইল। আমাদের ... ধনাঢ্য মহিলারা কেবল আলস্যপরবশ হইয়া বৃথা সময় নষ্ট করেন। এই বাড়ীটী দেখিতে ঠিক আমাদের মিউজিয়মের মত। উহা অপেক্ষা আকারে কিছু ছোট হইতে পারে কিন্তু গঠন-

সিকাগো মহামেলা।

১৪৯২ খৃষ্টাব্দে মহাবীর কলম্বস নূতন মহাদেশ আবিষ্কার করিয়া ভূমণ্ডলে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন; তৎপরে এই অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই মহাদেশ যে দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে ধাবিত হইতেছে তাহা বঙ্গকবি হেমচন্দ্র গাহিয়াছেন—

"হেথা আমেরিকা নব অভ্যুদয়,
পৃথিবী গ্রাসিতে করিছে আশয়,
হ'য়েছে অধৈর্য্য নিজ বীর্য্যবলে,
হুহুঙ্কার রবে ভূমণ্ডল টলে।"

বাস্তবিকও এইদেশে পদার্পণ করিলেই ইহার স্বাধীনতা, উন্নতি, সমৃদ্ধি দেখিয়া অবাক হইয়া থাকিতে হয়।

এই চারিশত বৎসরে আমেরিকার যে কিরূপ উন্নতি হইয়াছে তাহা প্রদর্শনার্থে যুক্তরাজ্যের লোকেরা উৎসুক হইয়া উঠিলেন। বিগত ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সভা হইয়া স্থির হইল যে, এক রাজসূয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া পৃথিবীর সমস্ত সভ্যজাতিকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে হইবে। এ মহৎ ব্যাপার সম্পাদন করিবার উদ্দেশে ওয়াশিংটন নগরে এক রাজকীয় ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হইল। তৎপরে যুক্তরাজ্যের কোন্ নগরে এই মহামেলা স্থাপিত হইবে তদ্বিষয়ে তর্ক উপস্থিত হইল; অধিকাংশ লোকের মত লইয়া সিকাগো সহরে মেলা খুলিতে হইবে বলিয়া স্থির হইল। [illegible] স্থানের কথা উঠিয়াছিল ও তাহাতে যেরূপ [illegible] তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল:—

সিকাগো	১১৫ ভোট
নিউইয়র্ক	৭২ ,,

সেণ্টলুইস্	৬১ ভোট
ওয়াশিংটন্	৫৬ ,,

সিকাগো সহরের পক্ষে ভোট অধিক হওয়াতে, এইস্থানেই মেলা আরম্ভ করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইল। সমুদায় স্থির হইয়া গেলে জ্যাক্‌সন্ পার্ক নামক স্থানে মেলার উদ্যোগ হইতে লাগিল। সিকাগো সহরের পূর্ব্ব-দক্ষিণ প্রান্তে মিসিগান নামক হ্রদবক্ষে জ্যাক্‌সন্ পার্ক; ইহা নামে উদ্যান [illegible] শোভাতে ইহাকে নরক বলিলেও অত্যুক্তি হয় [illegible] ক্ষুদ্র জলাশয় এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বৃক্ষশ্রেণী [illegible] করিয়া আছে; আমাদের দেশ হইলে এইস্থান [illegible] প্রমোদকাননরূপে পরিণত হইত। সিকাগো [illegible] বর্ত্তী স্থানসমূহে ব্যাঘ্রাদির পদধূলি কখন [illegible] হয় না। এখানকার অধিবাসীদিগের নিকট শুনিলাম যে, ইহারা এদেশকে তুচ্ছ মনে করিয়া থাকে; এখানে [illegible] প্রমাণও কিছু প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। কোন বন্ধুর সহিত সিকাগো সহরের লিংকন পার্কে বেড়াইতে গিয়াছি [illegible] যাইবার অগ্রেই বলিলেন, "এই স্থানে ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি চতুষ্পদগণকে দেখিতে পাইবেন।" লিংকন্ পার্ক [illegible] আলিপুরের জুলজিকেল গার্ডেন। এখানে [illegible] দেখিয়া মন প্রফুল্ল হইল;—বৃহৎ উদ্যানের [illegible] সম্মুখে তরঙ্গিত হ্রদ মিসিগান; হ্রদের [illegible] পরিষ্কৃত রাস্তা; উদ্যান মধ্যে [illegible] কিন্তু যে অভিপ্রায়ে আমার বন্ধু [illegible] করিয়াছিলেন তাহা দেখিয়া [illegible] স্থান অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড়

তরল কল্লোলে ; অর্দ্ধমগ্ন বালুচর
চুম্বে আছে পড়ি,' যেন দীর্ঘ জলচর
রৌদ্র পোহাইছে ; তাহা উচ্চতীর ;
ঘনচ্ছায়াপূর্ণ তরু ; প্রচ্ছন্ন কুটীর ;
বক্র সীর্ণ পথখানি দূর গ্রাম হতে
শস্যক্ষেত্র পার হয়ে নামিয়াছে স্রোতে
তৃষার্ত্ত জিহ্বার মত ; গ্রামবধূগণ
অঞ্চল ভাসায়ে জলে আকণ্ঠ-মগন
করিছে কৌতুকালাপ ; উচ্চ মিষ্ট হাসি
জলকলস্বরে মিশি' পশিতেছে আসি'
কর্ণে মোর ; বসি এক বাঁধা নৌকা পরি'
বৃদ্ধ জেলে গাঁথে জাল নতশির করি'
রৌদ্রে পিঠ দিয়া ; উলঙ্গ বালক তার
আনন্দে ঝাঁপায়ে জলে পড়ে বারম্বার
কলহাস্যে ; ধৈর্য্যময়ী মাতার মতন
পদ্মা সহিতেছে তার স্নেহজালাতন।

তরী হতে সম্মুখেতে দেখি দুই পার ;
স্বচ্ছতম নীলাভ্রের নির্ম্মল বিস্তার ;
মধ্যাহ্ন আলোকপ্লাবে জলে স্থলে বনে
বিচিত্র বর্ণের রেখা ; আতপ্ত পবনে
তীর-উপবন হতে কভু আসে বহি'
আম্রমুকুলের গন্ধ, কভু রহি' রহি'
বিহঙ্গের শ্রান্ত স্বর।
আজি বহিতেছে
প্রাণে মোর শান্তিধারা ; মনে হইতেছে

সুখ অতি সহজ সরল, কাননের
প্রস্ফুট ফুলের মত, শিশু-আননের
হাসির মতন,—পরিব্যাপ্ত, নিষ্কলঙ্ক;
উন্মুখ অধরে ধরি' চুম্বন-অমৃত
চেয়ে আছে সকলের পানে, বাক্যহীন
শৈশব-নিশ্বাসে, চিররাত্রি চিরদিন।
বিশ্ব-বীণা হতে উঠি' গানের মতন
রেখেছে নিমগ্ন করি নিখর গগন;
সে সঙ্গীত কি ছন্দে গাঁথিব; কি করিয়া
শুনাইব, কি সহজ ভাষায় ধরিয়া
দিব তারে উপহার ভালবাসি যারে,
রেখে দিব ফুটাইয়া কি হাসি আকারে
নয়নে অধরে, কি প্রেমে জীবনে তার
করিব বিকাশ? সহজ আনন্দখানি
কেমনে সহজে তারে তুলে ধরে আনি
প্রফুল্ল সরস?—কঠিন আগ্রহভরে
ধরি তারে প্রাণপণে, মুঠির ভিতরে
টুটি যায়;—হেরি তারে তীব্রগতি ধায়
অন্ধবেগে বহুদূরে লঙ্ঘি' চলি' যাই
আর তার না পাই উদ্দেশ।
চারিদিকে
রেখে' আজি পূর্ণপ্রাণে মুগ্ধ অনিমিখে
এই স্তব্ধ নীলাম্বর স্থির শান্ত জল,
মনে হল সুখ অতি সহজ সরল!

না; আবুবেয়া লোকে অকপটভাবে, বিবেচনাপূর্ব্বক রাজনীতি আলোচনা করে। যে জাতি এতগুলি স্থির বিশ্বাস ও গম্ভীর দীনতা রক্ষা করতে পেরেছে তাদের সম্বন্ধে নিরাশ হওয়া উচিত না।

আজ, ২২শে জানুয়ারি, সবুাইম পর্টের গম্ভীর অধিবেশনে, এই রাজ্যের মন্ত্রীগণ ও বড় বড় ওমরাহগণ একবাক্যে স্থির করেছেন যে, ইউরোপের প্রস্তাবসকল, যার উপর তাঁরা পবিত্র ক্ষষিয়ার ছাপ দেখতে পাচ্চেন, সেগুলি তাঁরা অগ্রাহ্য করবেন। যে লোকেরা এই আশাহীন সংকল্পে মন বেঁধেছে তাদের কাছে সাম্রাজ্যের সকল স্থান থেকেই অভিনন্দন-পত্র আসছে।

এই সভাতে জাতীয় উৎসাহ অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছিল,—সেখানে এই অভূতপূর্ব্ব এবং আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখা গিয়েছিল; মুসলমানের পার্শ্বে খৃষ্টান আসীন; দর্ব্বিশ ও সেখ-উল-ইস্‌লামের নিকট গ্রীসীয় ও আরমানী পুরোহিত; এবং মুসলমানদের মুখে সর্ব্বপ্রথম এই অশ্রুতপূর্ব্ব বাক্য শোনা গিয়েছিল,—"আমাদের খৃষ্টান ভ্রাতাগণ।"

একই সাধারণ বিপদের মুখে তখন অটমান সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে এক প্রবল ভ্রাতৃভাব এবং ঐক্যের বন্ধন স্থাপিত হয়েছিল, এবং আরমানী-ক্যাথলিক পুরোহিতটি উক্ত সভাতে এই আশ্চর্য্য সাময়িক বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন:—

"এফেন্দিগণ! আমাদের সকলেরই পিতৃপুরুষগণের দেহভস্ম পঞ্চশতাব্দী যাবৎ এই মাতৃভূমির মাটিতে নিহিত রহিয়াছে। এই যে ভূমির উত্তরাধিকারী আমরা হইয়াছি, তাহা রক্ষা করাই আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য। প্রকৃতির একটি নিয়মের বলে মৃত্যু হয়। ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই বড় বড় রাজ্য জগৎপটে বারম্বার

আবির্ভূত এবং অন্তর্হিত হইয়াছে। যদি বিধাতার অভিপ্রায়-ক্রমে আমাদের স্বদেশের পরমায়ু শেষ হইয়া থাকে, তবে তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করা ব্যতীত আমাদের উপায় নাই; কিন্তু হীনভাবে নির্ব্বাপিত হওয়া এক, আর মহানভাবে শেষ করা আর। যদি হন্ত্যাকারী গুলি খাইয়া আমাদের মরিতে হয় ত সে গুলি পৃষ্ঠে না লইয়া বক্ষমধ্যে লইবার সম্মান যেন না হারাই; তাহা হইলে তবু আমাদের দেশের নাম ইতিহাসে জলন্ত অক্ষরে লেখা থাকিবে। কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা কেবলমাত্র একটি অসাড় দেহ ছিলাম; কিন্তু সম্প্রতি আমরা যে অধিকার-পত্র পাইয়াছি, তাহাতে এই দেহ সঞ্জীবিত ও সম্বদ্ধ হইয়াছে। আজ, এই প্রথমবার, আমরা এই মন্ত্রীসভায় আহূত হইয়াছি; সে জন্য সুলতানকে এবং সব্লাইম পর্টের মন্ত্রীগণকে ধন্যবাদ দেওয়া হউক। এখন থেকে ধর্ম্মের প্রসঙ্গ যেন মনের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। মুসলমান তাহার মস্‌জিদে, এবং খৃষ্টান তাহার গির্জ্জেতে যাক্; কিন্তু আমাদের সকলেরই হিতার্থে, আমাদেরই শত্রুর সম্মুখে, আইস আমরা সকলে এক হই এবং এক থাকি।"

সুখ।

আজি মেঘমুক্ত দিন; প্রসন্ন আকাশ
হাসিছে বন্ধুর মত; সুমন্দ বাতাস
মুখে চক্ষে বক্ষে আসি লাগিছে মধুর,—
অদৃশ্য অঞ্চল যেন সুপ্ত দিগ্বধূর
উড়িয়া পড়িছে গায়ে; ভেসে যায় তরী
প্রশান্ত পদ্মার স্থির বক্ষের উপরি

আকাশে তখনো রক্তিম ভাব ধারণ করে' ছিল, আমরাও জানালায় দাঁড়িয়ে তার প্রতি বন্দুক ছুঁড়তে লাগলুম!

১১টার কাছাকাছি আহম্মদ আমাকে জাগিয়ে খবর দিলে যে, চিকিৎসার ফল হয়েছে; চন্দ্র "এয়ু য়াপিল্‌মিশ," (সেরে গেছে)। বাস্তবিক চন্দ্র, সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করে' একটি চমৎকার নীল আলোর মত প্রাচ্যদেশের সুন্দর আকাশে জ্বলছিল।

তুরস্ক কফিশালায়, সুলুইমান কাফিজির ওখানে যখন আমি সামুয়েল ও আহম্মদকে নিয়ে সন্ধ্যাবেলায় যাই, তখন আগুনের চারিদিকে যারা ঘিরে থাকে তারা চক্রটা বাড়িয়ে আমাদের বসবার জায়গা করে দেয়। আমি উপস্থিত সকলের হাতে হাত দিই, তার পরে শীতকালের রাত্রির কথকের গল্প শুনতে বসি (সে দীর্ঘ গল্প আটদিন ধরে চলে, এবং তাতে দৈত্যদানব ও জিনের কথা থাকে)। সেখানে বিনা শ্রান্তি ও বিনা অনুতাপে সময় কেটে যায়; আমি তাদের মধ্যে বেশ আরামে থাকি, ও কিছু মাত্র প্রবাসের কষ্ট অনুভব করিনে।

আরিফ ও লোটি দুই অত্যন্ত বিভিন্ন ব্যক্তি হওয়াতে, যে দিন "জীয়রহাউণ্ড"* চলে যাবে, সে দিন আরিফ তার বাড়িতে থাকলেই হবে; সেখানে নিশ্চয়ই কেউ তাকে খুঁজতে আসবে না; কেবল লোটি চিরদিনের মত অন্তর্হিত হবে। এই কল্পনাটা এক এক সময়ে আশ্চর্য্য সম্ভবপর ভাবে আমার মনে উদয় হয়।

সমুদ্রতীরস্থ কোন তুরস্ক গ্রামে থাকা; রৌদ্রে ও খোলা বাতাসে প্রমজীবীদের মত সুস্থজীবন যাপন করা; কোন রকমে গ্রাসাচ্ছাদন চালানো, পাওনাদারহীন ও ভবিষ্যতের ভাবনাবিহীন! আমার জীবনের চেয়ে এইরকম জীবনের পক্ষেই

* লোটির জাহাজের নাম।

আমি বেশি উপযুক্ত; শরীর ও মাংসপেশীর পরিশ্রম ব্যতীত আর সকলপ্রকার পরিশ্রমের প্রতি আমার প্রবল বিতৃষ্ণা আছে; সকলপ্রকার বিজ্ঞানশাস্ত্র আমার পক্ষে অতীব অপ্রিয়; আমাদের পাশ্চাত্যদেশের সকলপ্রকার প্রচলিত অনুশাসন ও সামাজিক কর্ত্তব্য আমি দুচক্ষে দেখতে পারিনে। জরির কতুই পরে' তুরস্কদেশের দক্ষিণে কোন জায়গায় মাঝিগিরি করা,—যেখানে আকাশ সর্ব্বদা পরিষ্কার, ও সূর্য্যকিরণ সর্ব্বদা উত্তপ্ত .....এটা সম্ভব হলেও হতে পারে, আর আমি অন্য জায়গার চেয়ে সেখানে বড় সুখে থাকব।

আয়ুব, ২০শে জানুয়ারি ১৮৭৭।

কাল অন্তর্জাতীয় সম্মিলনীর তামাসা বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়ায় সমাপ্ত হ'ল। ব্যাপারটা ফস্কে যাওয়াতে মহামহোপাধ্যায় মহাশয়গণ প্রস্থান করলেন, প্রতিনিধিবর্গও বোচ্‌কা বাঁধলেন, এবং তুর্কিরা এখন আইনের বা'র হয়ে গেল।

এই সব লোকের "শান্তানুকূল পবন শ্চ শিব শ্চ পন্থা" হোক! সুবিধের মধ্যে আমরা ত এইখানেই রইলুম। আয়ুবে সকলে অতি প্রশান্ত এবং যথেষ্ট স্থিরপ্রতিজ্ঞ। সব তুরস্ক কফিশালায়, এমন কি, খুব সামান্যগুলিতেও, সন্ধ্যার সময়ে, বড়মানুষ ও গরীব লোক, পাশা ও চাষা, সকলে অবস্থা নির্ব্বিশেষে সম্মিলিত হয়—(হে সাম্য! আমাদের প্রজাপ্রধান জাতিতে, আমাদের পাশ্চাত্য সাধারণতন্ত্রে তুমি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত!) একজন পণ্ডিত সেখানে থাকে যে, দৈনিকপত্রের দুর্ব্বোধ লিখন উপস্থিত মণ্ডলীকে পড়ে' শোনায়; প্রত্যেকে নীরবে, দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে শ্রবণ করে। আমাদের দেশের সাধারণ খাদ্যালয়ে লোকে যেরকম মদ খেয়ে কোলাহলপূর্ণ বচসা করে, এখানে সেরকম কিছুই হয়

একদিন একটি সমুজ্জ্বল সুন্দর সন্ধ্যায়, আমরা উন-কাপানের সিঁড়ি নাবছিলুম।

ইস্তাম্বুল এক প্রকার অনভ্যস্ত নূতন ভাব ধারণ করেছিল; সব মিনারে ছোক্রাগণ অপরিচিত সুরে অজানা স্তব গাচ্ছিল; অতি উচ্চ থেকে এই তারকণ্ঠস্বর রাত্রে অসময়ে নিঃসৃত হওয়াতে কল্পনাকে উদ্ভ্রান্ত করে দিচ্ছিল; এবং মুসলমানগণ তাদের বাড়ির দরজায় দলবদ্ধ হয়ে যেন সকলে আকাশের কোন এক ভীষণ স্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল। আহম্মদ তাদের দৃষ্টি অনুসরণ করে' ভয়ে আমার হাত চেপে ধরলে; কিছুক্ষণ পূর্ব্বে আমরা সেণ্ট-সফায়ার গম্বুজের উপর যে চন্দ্রকে এত উজ্জ্বল দেখেছিলুম, সে এখন ঐ উর্দ্ধে অনন্ত আকাশে নির্ব্বাপিত হয়ে গিয়েছিল; একটি লাল, নিস্তেজ, রক্তিম দাগ ছাড়া তার আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।

আকাশ-লক্ষণে যেমন স্তম্ভিত করে এমন আর কিছুতে না; আমারও মনে প্রথমেই বিদ্যুতাপেক্ষা ক্ষণস্থায়ী ভয়ের সঞ্চার হল। অনেক দিন পাঁজি না দেখাতে এ ঘটনাটা আমি প্রতীক্ষা করিনি। আহম্মদ আমাকে বোঝাতে লাগল ব্যাপারটা কতদূর গুরুতর এবং অলক্ষণে; তুরস্ক সংস্কার অনুসারে এই সময়ে একটি রাক্ষস চাঁদকে গ্রাস করবার চেষ্টা করাতে দুজনের লড়াই চলছে। কিন্তু আল্লার নিকট প্রার্থনা করলে এবং রাক্ষসটার প্রতি বন্দুকের গুলি ছুঁড়লে চাঁদকে উদ্ধার করা যেতে পারে। [illegible] মস্‌জিদে কালোপযোগী নমাজ পড়া হচ্ছিল, এবং [illegible] ছোঁড়া আরম্ভ হয়েছিল। এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার শুভ পরিণাম সাধনের উদ্দেশ্যে সব জানলা ও ঘর ছাদ থেকে চাঁদকে লক্ষ্য করে বন্দুক ছুঁড়ছিল।

আমরা বাড়ি যাবার জন্যে ফানারে একটি গাড়ীক নিলুম; পথে বাধা পেলুম। স্বর্ণশৃঙ্গের মাঝখানে "জাপ্‌টিয়ে"দের নৌকা আমাদের গতিরোধ করলে; গ্রহণের রাত্রে কাগীকে বেড়ানো নিষেধ। কিন্তু আমরা ত আর রাস্তায় শুতে পারিনে; আমরা জাপ্‌টিয়ে মহাশয়দের সঙ্গে তর্কবিতর্ক ও বোঝাপড়া করতঃ খুব উঁচু চালে চলতে লাগলুম, এবং আস্ফালনের জোরে বারান্তর নিস্তার পেলুম। * * *

কুকুররা আবার চাঁদের দিকে তাকিয়ে বিষম আর্ত্তনাদ করছে, তাতে করে' ব্যাপারটা আরও জটিল হয়ে উঠেছে। আহম্মদ আমাকে গম্ভীরভাবে জ্ঞাপন করলে যে, কুকুররা কোন কোন অসাধারণ গুরুতর ঘটনাকালে আল্লার কাছ থেকে একপ্রকার বিশেষ গোপন রুটি পায়, সেটা মানুষে দেখতে পায় না, সেই ভিক্ষা করবার জন্যে ওরা এরকম চীৎকার করে।

বন্দুক ছোঁড়া সত্ত্বেও গ্রহণ অগ্রসর হতে লাগল; বাতাসের কোন বিশেষ অবস্থার দরুণ সমস্ত চক্রটা আবার আশ্চর্য্যরকম স্পষ্ট লাল রঙের দেখাচ্ছিল। আমি ইস্কুলের পুরাতন পদ্ধতি অনুসারে একটা কমলালেবু, একটা আয়না, ও একটি বাতি নিয়ে এই অবস্থাটার কারণ বোঝাতে চেষ্টা করলুম। কিন্তু আমার যুক্তিশক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল তবু আমার ছাত্ররা বুঝতে পারলে না। * *। আমি ইস্কুল মাষ্টারের স্বরূপ ধারণ করতে লাগলুম, কি ভয়ানক কল্পনা! আমার অত্যন্ত হাসি এল; কমলালেবুটা খেয়ে ফেলুম, এবং বোঝানোর চেষ্টা ত্যাগ করলুম। এই নিরর্থক বিজ্ঞান নিয়ে কি হবে, আর যে বিশ্বাসগুলিতে এদের আরও মনোহর করে, সেগুলি কেন আমি অপহরণ করতে যাব; সুতরাং যে চাঁদ, উজ্জ্বল তারকার মধ্যে যার-পর-নাই পোষমানা

একত্র হয়েছিলেন। এই বন্দোবস্তটি মৎলব করেই করা হয়েছিল; সাফবৎ পাশা প্রতিনিধিদের যে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তার মধ্যে এই কামানের শব্দ শুনা গিয়ে তাঁর বাগ্মীতার সাহায্য হবার কথা।

এই রাত্রে সেরাগ্লিয়েরার বৃহৎ ক্ষেত্রে যে দৃশ্য হয়েছিল তা আমি কখনো ভুলব না। ইস্তাম্বুলের মধ্যবর্ত্তী উচ্চভূমিতে এই প্রশস্ত ক্ষেত্রের বিস্তার, সেখান থেকে সেরালিওর বাগানের উপর দিয়ে দৃষ্টি একেবারে দূর দূরান্তর ভেদ করে আসিয়ার পর্ব্বত পর্য্যন্ত পৌঁছোয়। আরবী ছাঁদের পর্টিকোগুলি এবং অট্টরাজির উচ্চস্তম্ভটি মহোৎসবের রাত্রির মত দীপালোকিত হয়েছিল। দিনের অবিরাম বৃষ্টি এই স্থানটিকে রীতিমত হ্রদ করে তুলেছিল, তাতে এই সকল দীপশ্রেণী প্রতিবিম্বিত হচ্ছিল; বিশাল দিগন্তের চতুর্দ্দিকে মস্‌জিদের গম্বুজ এবং সূক্ষ্ম মিনারগুলি ঘিরে দাঁড়িয়েছিল, এক একটি মিনার যেন এক একটি লম্বা শাখা, তার অগ্রভাগে গগণবিহারী আলোকের মুকুট স্থাপিত।

এই স্থানটিতে মৃত্যুসম নীরবতা বিরাজ করছিল; যেন প্রকৃত মরুভূমি। বাতাস গায়ে লাগছিল না, কিন্তু পরিষ্কার আকাশে দুই সার কালো মেঘ উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তার উপর চন্দ্রমা তাঁর নীলাভ লেখা স্থাপন করেছিলেন। কোন জাতির ইতিহাসে যখন কোন সুবৃহৎ ঘটনা সম্পন্ন হবার উপক্রম হয় সেই সময়ে প্রকৃতি যেমন একটি স্বতন্ত্র মূর্ত্তি ধারণ করেন মনে হয়, আজও সেই রকম হয়েছিল।

এক সময়ে মহা গোলমাল শোনা গেল, মানুষের গলার ও পায়ের শব্দ; মধ্যের দ্বারগুলি দিয়ে একদল সভ্য প্রবেশ করলে, হাতে লণ্ঠন ও নিশান; তারা উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগল, "সুলতান

নের জয়! মিথাৎ পাশার জয়! শাসনপ্রণালীর জয়! যুদ্ধের জয়।" তারা যেন নিজেদের স্বাধীন মনে করে' মাতালের মত হয়ে গিয়েছিল; কেবল কতকগুলি বৃদ্ধ তুর্কী, যাদের অতীত-কালের কথা স্মরণ ছিল, তারা এই উন্মত্ত জনতার দৌড়ঝাপ দেখে মাথা নাড়তে লাগল।

সফতারা বল্লে—"চল মিথাৎ পাশাকে অভিবাদন করতে যাই," বলে' তারা বাঁ দিকে ফিরে ছোট ছোট নির্জ্জন রাস্তা দিয়ে এই মহৎ উজীরের সামান্য বাটীর উদ্দেশে চ'ল্ল, যিনি তখন এত ক্ষমতা-শালী ছিলেন, কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পরে নির্ব্বাসিত হয়েছিলেন।

আন্দাজ দু'হাজার সফতা একসঙ্গে বড় মস্‌জিদে (সুলইমানেতে) নমাজ পড়তে গেল, এবং সেখান থেকে স্বর্ণশৃঙ্গ পার হ'য়ে আব-দুল হামিদকে অভিনন্দন করবার জন্যে ডল্‌মা-বাগচীতে গেল। নিয়মাধীন সুলতানকে উচ্ছ্বসিত ধন্যবাদ দিবার জন্যে প্রাসাদের গরাদের সামনে সকলপ্রকার দলের প্রতিনিধিবর্গ এবং অসংখ্য লোক স্বতই সম্মিলিত হয়েছিল। এই লোকমণ্ডলী পেরার বড় রাস্তা দিয়ে ইস্তাম্বুলে প্রত্যাবর্ত্তণ করলে এবং পথে লর্ড সল্‌স্‌-বেরিকে (যিনি পরে শীঘ্রই এত অপ্রিয় হয়ে পড়েছিলেন) এবং ব্রিটিশ ও ফরাসী প্রতিনিধিদের জয়জয়কার করলে।

হোজাগণ প্রজাদের বক্তৃতা দিতে লাগল;—"আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ, যাঁরা কেবলমাত্র কয়েক শত প্রাণী ছিলেন, চার শতাব্দী আগে এই দেশ জয় করেছিলেন। আমরা কত শত সহস্র লোক আছি, আমরা কি এই দেশকে বিদেশী দ্বারা আক্রান্ত হ'তে দেব? অন্যায় অপমানজনক প্রস্তাবে সম্মত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যু ভাল, এস আমরা সকলে, খৃষ্টান এবং মুসলমান অটমান, স্বদেশ নিমিত্ত প্রাণ সমর্পণ করি!"

চটিজুতা নিয়ে যত শীঘ্র পারে ছুটে যাচ্ছিল। রাস্তায় মহা গোলমাল, এবং ভীড়ের মধ্যে মহা ঠেলাঠেলি চলছিল; বৃষ্টির জল একেবারে মুষলধারে পড়ছিল।

আমার চতুর্দ্দিকস্থ বৃদ্ধদের নিরীক্ষণ করতে লাগলুম; তাদের পরিচ্ছদে সেকালের নিখুঁৎ পারিপাট্য দেখা যাচ্ছিল; তাদের পরণে যা কিছু ছিল, তাদের বড় বড় রূপোর চশমা পর্য্যন্ত, এমন কি তাদের প্রবীণ মুখমণ্ডলের পার্শ্বরেখা, সবই "এস্কি" ছিল। "এস্কি" কথাটা শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারিত হয়, তার মানে বহুপ্রাচীন; —তুরস্কদেশে এ কথাটা পুরাতন পরিচ্ছদ, পুরাতন ছাঁদের বেশ, বা পুরাতন কাপড় সম্বন্ধে সমভাবে ব্যবহৃত হয়। তুর্কীগণ অতীতকালের ভক্ত, তারা নিশ্চলতা ও বদ্ধতা ভালবাসে।

সহসা কামানের আওয়াজ শোনা গেল, সেরাস্কিয়েরা থেকে এক পত্তন গোলাবর্ষণ হ'ল; বৃদ্ধদের মধ্যে অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত ও বিদ্রূপাত্মক হাসি চলতে লাগল।

একজন কৃত্রিম অভিবাদনকরতঃ বল্লে—"সিধাৎ পাশার শাসনপ্রণালীর জয়!"

আর একজন পুরোণো সবুজ পগ্‌গধারী বিড় বিড় করে' বলতে লাগল—"প্রতিনিধি! অধিকার পত্র! সেকালের খলিফগণ ও প্রজাদের মতামত নেওয়া আবশ্যক বোধ করতেন না।"

—"ভয়ি, ভয়ি, ভয়ি, আল্লা!—আর আমাদের মেয়েরা তখন সূক্ষ্ম ঘোমটা পরে' বেড়াত না; আর ভক্তগণ আরও নিয়মিত নমাজ পড়ত; আর মস্কাউদের এত আস্পর্দ্ধা ছিল না!"

এই গোলাবর্ষণ দ্বারা তুর্কীদের জ্ঞাপন করা হ'ল যে, পাদিশা তাদের একটা নিয়মতন্ত্র শাসনপ্রণালী দিলেন যা সব ইউরোপীয় শাসনপ্রণালী অপেক্ষা উদার ও বৃহৎ; কিন্তু এই বৃদ্ধ তুর্কীগণ

তাদের সুলতানের এই
না। এই ঘটনা সকলে
যদিও ইগ্নাটীফ * যথাস
সময় থেকে রুষিয়া ও
ভিতরে ভিতরে স্থির ধ
সোৎসাহে যুদ্ধের আয়ো
তখন তুরস্ক ঘড়িয়ে
নূতন শাসনপ্রণালীর
কথা, আমি সেই ঝুপঝু
উজির, পাশা, সেন
সকলে জমকালো জরিখ
ক্ষেত্রে সমবেত হয়েছি
উপস্থিত ছিল।
আকাশের কালো
এই জনতাকে একেবা
প্রাঙ্গনের মধ্যেই সমাগ
বলী পড়ে শোনানো হ
যে সকল প্রাচীন রুক
বোধ হয় ইস্তাম্বুলের
তাতে অত্যন্ত আশ্চর্য্যা
জয়জয়কার, বাদ্য
তান সমাপ্ত হ'ল, এবং
গোলেমালে ছড়িয়ে পড়
অপর প্রান্তে আড্‌মিরা

* রুষিয়ার সম্রাট।

অভিবাদন হয়; মাটি পর্য্যন্ত নুয়ে পিছু হটতে হটতে বিদায় গ্রহণ করতে হয়।

বন্ধুবর্গের অভিমুখী একটি মস্ত কামরায় কফি খাওয়ানো হয়। অবনত-জানু ভৃত্যগণ অতিথিদের জন্য চার পাঁচ হাত লম্বা সিবুক * জ্বালিয়ে দেয়, সেগুলির মুখনল অম্বরনির্ম্মিত, সর্ব্বাঙ্গে অহরৎভূষিত এবং ভাসানুকুণ্ড রূপার থালার উপর স্থাপিত হয়।

জার্কগুলি, (অর্থাৎ কফি-পেয়ালার পায়াগুলি) খোদিত রূপা-নির্ম্মিত, এবং বড় বড় উৎকৃষ্ট হীরকখণ্ড ও বহুমণিমাণিক্য-বেষ্টিত।"

গ্রন্‌কেট নামক একটি বন্ধু লোটির সত্য সত্য ছিল কিম্বা আছে কি না তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু লোটির অনেক গ্রন্থে তাঁহার উল্লেখ পাওয়া যায়। "আজিয়াদে"তেও তাঁহার উদ্দেশে কয়েকখানি পত্র সন্নিবেশিত আছে, তাহার মধ্যে একখানিতে তুরস্ক রাজনীতি সম্বন্ধে কথা আছে বলিয়া এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। এখন থেকে লোটির ডায়ারিতে প্রায়ই মধ্যে মধ্যে রাজনীতি বিষয়ক বর্ণনা দেখা যায়। এই সময়ে যে তুরস্ক দেশে একটা রাজনৈতিক বিপ্লব হয় তাহা আগেই বলিয়াছি, কিন্তু লোটির নিকট হইতে তাহার সূত্রপাতের আভাস পাওয়া যায় মাত্র; কেন এবং কিরূপে কি ঘটিয়াছিল তাহা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিরাই বলিতে পারেন, এখানে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা অনাবশ্যক।

আয়ুব, ২৭ শে সেপ্টেম্বর ১৮৭৬।

"ভাই গ্রন্‌কেট

এই দেখ তুরস্কদেশেও নিয়মতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রচারিত

* খুব লম্বা ডাণ্ডিওয়ালা তুরস্ক পাইপ।

হল। আমাদের হচ্ছে কি ভাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করি? কি অশুভ কালে জন্মগ্রহণ করা গেছে? নিয়মাধীন সুলতান, সে ত ও ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমার সকলপ্রকার ধারণার সম্পূর্ণ বিরোধী।

এই ঘটনায় আয়ুবের সকলে উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠেছে; সব ভাল মুসলমানেরা ভাবছে যে, আল্লা তাদের পরিত্যাগ করেছেন, এবং সাদিশার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। আমি ত সব গুরুতর বিষয়কে এবং বিশেষতঃ রাজনীতিকে, তামাসা মনে করি; আমার এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, নিজত্ব এবং বিশেষত্বের হিসাবে ধরতে গেলে, এই নূতন ব্যবস্থাপ্রয়োগে তুরস্কদেশের বিস্তর ক্ষতি হবে।

আমি আজ কতকগুলি দর্ব্বিশের সঙ্গে মহামহিম সলিমানের সমাধিমন্দিরে বসে'ছিলুম। আমরা কোরাণের টীকা করতে করতে একটু-আধটু রাজনীতিও অলোচনা করছিলুম এবং বলছিলুম যে, যে মহৎ সুলতান তাঁর ছেলে মুস্তাফাকে তাঁর সামনে গলা টিপে মেরে ফেলতে বলেছিলেন, কিম্বা তাঁর স্ত্রী রক্সেলানা, যিনি এক অভিনব যন্ত্রণা দিবার উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন, তাঁরা কেহই কখনো এই শাসন-প্রণালীর অনুমোদন করবেন না; এই প্রজাতন্ত্রবিধানে তুরস্ক দেশ অধঃপাতে যাবে তার সন্দেহ নেই।

ইস্তাম্বুল ২৭শে সেপ্টেম্বর, ৭ই জি-ইল-ইজ্জে, ১২৯৩ হেজিরা। আমি এক পস্‌লা বৃষ্টির নিবৃত্তির অপেক্ষায়, বায়াজিদের মস্‌জিদের নিকটস্থ একটি তুরস্ক কফিশালায় প্রবেশ করেছিলুম। সেখানে কেবলমাত্র প্রাচীন পাগড়ি এবং প্রাচীন শ্বেতশ্মশ্রু ছিল। কতকগুলি বৃদ্ধ (হাজি বাবা) বসে' বসে' খবরের কাগজ পড়ছিল, অথবা ধোঁয়াটে সার্সির ভিতর দিয়ে দেখছিল রাস্তার লোকে বৃষ্টিতে দৌড়চ্ছে। তুরস্ক রমণীগণ, সহসা বৃষ্টি দ্বারা আক্রান্ত হ'য়ে

ও প্রাচীনতার ছাপ, এবং বাহ্যবস্তুর উপর পুরাতন তুরস্কদেশের ভীষণ কাহিনী লিখিত।

যখন আমরা আয়ুবে এসে পৌঁছই তখন প্রায়ই রাত্রিকাল উপস্থিত; তার আগে যেখানে হয়, কোন ছোট তুরস্ক খাদ্যালয়ে খেয়ে নিই, সেখানে আহার্য্যসামগ্রীর পরিচ্ছন্নতা ও রন্ধন বিষয়ে আহম্মদ নিজে তত্ত্বাবধান করে। তার পরে আমরা বাড়ি যাবার জন্য লণ্ঠন জ্বালাই, আমাদের নিরালা শান্তিময় বাড়িটি, যার দূরত্বই তার একটি গুণের মধ্যে।

আমার বন্ধু আহম্মদের বয়স তার বুড় বাপ ইব্রাহিমের হিসাবমতে কুড়ি বৎসর; তার বুড়ি মা ফতেমার হিসাবমতে বাইশ; তুর্কীরা কখনো নিজেদের বয়স জানে না। তার শরীরের আকৃতি বেশ মজার, মাথায় ছোট, এবং হরক্যুলিসের ছাঁদে গঠিত। তাকে না জানলে তার শীর্ণ শ্যামল মুখমণ্ডল দেখে দুর্ব্বল শরীর মনে হতে পারে;—খুব ছোট টিঁকোলো নাক, খুব ছোট ঠোঁট; ছোট চক্ষুদ্বয় কখনো বিষণ্ণ মধুরভাবে পূর্ণ, কখনো রঙ্গ ও কৌতুকে জাজ্বল্যমান। সবসুদ্ধ মিলে একটি স্বকীয় আকর্ষণী শক্তি আছে।

অদ্ভুত ছেলেটি, পাখীর মত আমুদে স্বভাব;—মজার রকম মনের ভাব সম্পূর্ণ অভিনব ধরণে ব্যক্ত করে; সম্ভ্রম ও নম্রতা সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত মতামত আছে। পড়তে জানে না, ও অশ্বপৃষ্ঠে জীবনযাপন করে। হাত ও মন দুইই সমান দরাজ; তার আদ্ধেক আয় পথের বৃদ্ধ ভিক্ষুকদের বিতরণ করে। তার সম্পত্তির মধ্যে কেবলমাত্র দুটি ঘোড়া ভাড়া দিয়ে জীবিকানির্ব্বাহ করে।

* * *

একদিন সে আমাকে বল্লে—"তোমার ঐ সুন্দর ছোকরাটি

চোর এবং অপরিষ্কার, তার বদলে আমাকে চাকর কর; তুমি ওকে যা দাও তাই আমাকে দিও, যদি নিতান্তই কিছু দিতে চাও; আমি বড় একটা কাজের চাকর হব না, কিন্তু তোমার বাড়িতে থাকব, তাতে আমার আমোদ হবে।" তার পরদিন যুদফকে বিদায় করে দিলুম, এবং আহম্মদ তার জায়গা দখল করলে।

এক মাস পরে আমি একটু লজ্জিতভাবে আহম্মদকে ছুটো মোজা দিতে গেলুম, সে একেবারে ধৈর্য্য মূর্ত্তিমান; কিন্তু সে ভয়ানক রেগে গেল, আর ছুটো সার্ট ভেঙ্গে ফেল্লে, সেগুলি আবার পরদিন নিজের খরচে সারিয়ে দিলে। তার মাহিনার বিষয়টা এইরূপে নিষ্পত্তি হয়ে গেল।

আজ, ১০ই ডিসেম্বর, পাদিশার দর্শনার্থে গমন।

জলমা-বাগচীর প্রাসাদের প্রাঙ্গণে সবই ধব্‌ধবে সাদা, জমি পর্য্যন্ত; মার্ব্বলের দেউড়ি, মার্ব্বলের টালি, মার্ব্বলের সিঁড়ি; সুলতানের রক্ষকবর্গের লাল কাপড়; বাজনদারদের নীল জরির কাপড়, এবং ভৃত্যদের সবুজ ও হলদে কাপড়ের উজ্জ্বল রঙ এই সামান্য ধবলতার সঙ্গে বৈষম্য সাধন করে।

প্রাসাদের কার্ণিস ও আলসেতে সারস, গাঙ্‌চিল প্রভৃতি নানারকম পক্ষীর দল আশ্রয় গ্রহণ করে।

বাড়ির ভিতরে সবই অত্যন্ত জমকালো। মাথায় বড় পালক-গুচ্ছ পরে' তলোয়ারধারীগণ সিঁড়ির দুধারী সারবন্দী হয়ে দাঁড়ায়; নিশ্চল, যেন গিল্টিকরা সুরক্ষিত মৃতদেহ। রক্ষকবর্গের কর্ত্তা-গণ, কতকটা আল্লাদিনের বেশে সজ্জিত, ইঙ্গিত দ্বারা তাদের হুকুম করেন।

সুলতান গম্ভীর, পাণ্ডুবর্ণ, শ্রান্ত এবং অবসন্ন।

আমার সঙ্গে তিনি অল্পক্ষণ আলাপ করলেন, দুদিকে প্রণত

পিয়ের লোটি ও ইস্তাম্বুল।

(২)

"এই নভেম্বরের রাতগুলিতে আয়ুব দেশটা বড়ই ম্লান গম্ভীর; এই নির্জ্জনে আমি যে প্রথম কয় রাত্রি কাটিয়েছিলুম, তাতে আমার মন ভারি বিষণ্ণ ও বিচিত্র ভাবে পরিপূর্ণ হয়েছিল। যখন দরজাটি বন্ধ করে' আমার ক্ষুদ্র গৃহ প্রথমবার সন্ধ্যার অন্ধকারে ছেয়ে গেল, তখন এক গভীর বিষাদ যেন মৃত্যু-আশঙ্কার মনের ন্যায় আমার উপর বিস্তৃত হল।

বাহিরে যাব মনে করে আমার লণ্ঠন জ্বালালুম। (ইস্তাম্বুলের রাস্তায় সঙ্গে লণ্ঠন না থাকলে জেলে ধরে নিয়ে যায়)। কিন্তু সন্ধ্যা সাতটা বেজে গেলে আয়ুবে সকলি বন্ধবন্ধ এবং নিস্তব্ধ; তুর্কীগণ সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে শুতে যায় ও দরজার কুলুপ এঁটে দেয়।

মাঝে-মাঝে যদি কোন বাড়ির আলোতে রাস্তার উপরে একটি জানালার গরাদের ছায়া পড়ে, তার ভিতরে যেন চেয়ে দেখো না; সেটা মৃত্যুর আলো, কেবলমাত্র পাগড়িমুকুটিত বড় বড় কবরে আলোক দান করে। এই গরাদে-দেওয়া জানালার সম্মুখে কেউ তোমার গলা কেটে ফেলতে পারে, তবু সেখান থেকে কোন মনুষ্যের সাহায্য পাবে না। এই যে কম্পিত দীপশিখাগুলি সকাল পর্য্যন্ত জ্বলে, সেগুলি অন্ধকার অপেক্ষা ভয়ঙ্কর।

ইস্তাম্বুলে সব রাস্তার কোণে এই সবগৃহ দেখা যায়।

আর আমাদের বাড়ির কাছেই, যেখানে রাস্তা শেষ হয়, বড় বড় গোরস্থান প্রসারিত; সেখানে দলে দলে বহুসংখ্যক ঘুঘু

বেড়ায়, তারা একজন লোকের জিনিষপত্র চুরি করে', মেরে ফেলে' সেইখানেই পুঁতে রেখে যেতে পারে, তবু তুরস্ক পুলিশ কখনো কোন রকম হস্তক্ষেপ করতে আসবে না।

একজন প্রহরী আমার বেড়াবার কারণ জিজ্ঞাসা-পূর্ব্বক আমাকে বাড়ি ফিরে যেতে বল্লে; আমার এই বেড়ানোটা তার নিতান্ত অর্থহীন এবং একটু সন্দেহজনকও বোধ হয়েছিল। * *

আমার সেই প্রাচ্যদেশীয় জীবন কে আমাকে ফিরে দেবে,—সেই মুক্তবাতাসে স্বাধীন জীবন, সেই লক্ষ্যহীন দীর্ঘ ভ্রমণ, এবং ইস্তাম্বুলের কলরব?

সকালবেলা আত্মদান থেকে বেরিয়ে রাত্রে আয়ুবে ফিরে আসা; জপমালা হাতে করে' মস্‌জিদে মস্‌জিদে ঘুরে বেড়ানো; প্রত্যেক কফিশালা, স্নুভিমন্দির, স্নানাগার, ও খোলা জায়গায় থেমে থেমে যাওয়া; তামার পায়াবিশিষ্ট অতি ক্ষুদ্র নীল পেয়ালাতে তুরস্ক কফি খাওয়া; রোদ্দুরে বসে' নারগিলের তামাকে ধীরে ধীরে আত্মবিস্মৃত হওয়া; দরিদ্র অথবা পথিকদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কওয়া; নিজে এই আলোকপূর্ণ সচঞ্চল চিত্রের একটি অংশ হওয়া; স্বাধীন, ভাবনাহীন, এবং অপরিচিত * * * *

আমার বন্ধু আহম্মদ ও কি চমৎকার পথের সঙ্গী, উৎফুল্ল বা স্বপ্নশীল,—জানপদেরই দলভুক্ত, অত্যন্ত কবিত্বপূর্ণ, প্রতিমুহূর্ত্তেই হাস্যোন্মুখ, এবং আমরণ অনুরক্ত ভক্ত!

যতই পুরাতন ইস্তাম্বুলে প্রবেশ করা যায়, যতই আয়ুবের পুণ্য অঞ্চল ও বড় বড় গোরস্থানের নিকটবর্ত্তী হওয়া যায়, ততই এই দৃশ্যপট মলিন হয়ে' আসে। তখনো মর্ম্মরা সমুদ্রের নীল জল ও আসিয়ার দ্বীপ বা পর্ব্বত মাঝে মাঝে দৃষ্টি পথে পড়ে কিন্তু লোকজন অল্প, এবং লোকালয় অকিঞ্চিৎকর;—সর্ব্বত্র রহস্য

দর্শন অনুসারে পুরুষ অব্যক্তের ব্যঞ্জনা করে। কিরূপে কার্য্য তাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা একপ্রকার বুঝা যায়। কিন্তু ঈশ্বর অব্যক্তকে কিরূপে ব্যঞ্জনা করিবেন তাহা বুঝা দুষ্কর। যদি ঈশ্বর স্বীয় জ্ঞানের দ্বারা ঐ কার্য্য সাধন করিলেন বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে ঈশ্বরের জ্ঞানের আদি স্বীকার করিতে হয়—সে বড় বিষম কথা!

তবে যদি এমন অর্থ হয় যে, ঈশ্বর পুরুষের সহিত প্রকৃতির জ্ঞ-জ্ঞের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করিয়া অব্যক্তের ব্যঞ্জনা সাধন করিলেন, তাঁহারই শক্তিবশাৎ প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগসাধন হইলে মহৎ হইতে মহাভূত পর্য্যন্ত অভিব্যক্ত হইল, তাহা হইলে অর্থ পাওয়া যায় সন্দেহ নাই; কিন্তু মূলে এরূপ ভাব পরিষ্কার নহে।

ফলতঃ মনুসংহিতা লেখক নয় সাংখ্য নয় বেদান্তী। কেন না, তিনি পরক্ষণেই আবার বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি ও ঈশ্বর অভিন্ন!!! ঈশ্বর চিন্তা করিয়া স্বীয় শরীর হইতে সমুদায় পদার্থ সৃষ্টি করিলেন। একবার বলেন আপন শরীর হইতে অপ্ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে বীজ পরিত্যাগ করিলেন, তাহাতে এক সুবর্ণের অণ্ড উৎপন্ন হইল; আবার বলেন ঈশ্বর মহৎ অহঙ্কারাদি সৃষ্টি করিলেন। আমাদের শাস্ত্রে সাংখ্য বেদান্ত লইয়া এইরূপই খিঁচুড়ী পাকানো হইয়াছে।

প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগের কারণ কি? সাংখ্যেরা বলেন অদৃষ্ট। এই কথা লইয়া আবার এক গোলযোগ। অবিবেচক লোকে বুঝিল তবে "অদৃষ্ট" বুঝি না জানি কি একটা শক্তি বা দেবতা। ভাষা কথায় অদৃষ্ট এই হইতেই আবির্ভূত হইয়াছে। পণ্ডিতেরা যে কার্য্যের দর্শনশাস্ত্রসম্মত কারণ নির্দ্দেশ করিতে

অদৃষ্ট তাহাকে বলেন অদৃষ্টের কার্য্য এবং সেই কারণকে বলেন অদৃষ্ট। ইহা তাঁহারা শক্তি বিশেষ বা দৈব বিশেষ বলিয়া ভাবেন না। কিন্তু মূর্খলোকে অদৃষ্ট শব্দ দৈব নিশ্চয় করিয়া লইয়াছে। সাংখ্যেরা ঈশ্বর স্বীকার করেন না, বেদান্তীরা তাঁহাদিগকে বলেন, "তোমরা প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ স্বীকার কর, কিন্তু সেই সংযোগের কারণ নির্দ্দেশ করিতে পার না; সেই কারণকেই ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার কর না কেন?" সাংখ্যেরা বলেন—"যাহা জানি না তাহা ঈশ্বর বলিব কিরূপে? আমরা এপর্য্যন্ত বলিতে পারি সে কারণ আমাদের দর্শনশাস্ত্রের অনির্দ্দেশ্য। আমরা তাহা অদৃষ্ট ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারি না।"

ফলতঃ দর্শনশাস্ত্রের সীমা ছাড়াইয়া গিয়া প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগের কারণকে যদি ঈশ্বরই বলা যায়, তবে সেই সংযোগকেই বা সৃষ্টি বলা যায় কিরূপে? সেই রূপ সংযোগ ত অহর্নিশ দেশে দেশে বার সম্পন্ন হইতেছে। প্রত্যেক নরনারীর জন্মে সেই ঘটনা ঘটিতেছে। তাহাকে সংসারের সৃষ্টি বলা যায় না। তাহাকে বরং জীবসৃষ্টি বলা যায়। সাংখ্য পরিভাষা অবলম্বন করিয়া সৃষ্টি-তত্ত্বের লিখিতে গিয়া মনুসংহিতা লেখক কি বিপদে পড়িয়াছেন এক্ষণে পাঠকবৃন্দ তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। মহৎ অহঙ্কারাদির অভিব্যক্তিকে অতঃপর আর কেহ যেন সংসারসৃষ্টির বিবরণ বলিয়া পরিগ্রহ না করেন।

ও "ব্যক্ত"। যাহা অব্যক্ত তাহা নিত্য, যাহা ব্যক্ত তাহা ক্ষণিক। সেই নিত্য অব্যক্ত সংসারকে ঈশ্বর সৃষ্টি করেন; এবং ব্যক্ত সংসার সেই অব্যক্তের জ্ঞান হইতে আবির্ভূত হয়; তাহাকে মনুষ্য ব্যঞ্জনা করে। ঈশ্বর প্রাকৃতিক পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা; মনুষ্য স্থূলভূতের "ব্যঞ্জন"কর্ত্তা।

ফলতঃ ঈশ্বর প্রাকৃতিক পদার্থসকল কিরূপে কেন সৃষ্টি করিলেন ইহা সাংখ্যদর্শনের আলোচ্য বিষয় নহে। এমন কি সাংখ্যেরা বলেন দর্শনশাস্ত্রের প্রমাণে তাদৃশ সৃষ্টিকর্ত্তার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে এখানে মনুসংহিতার সৃষ্টির কথা কেন উঠে? তাহার কারণ এই যে, মনুসংহিতা লেখক হয় সাংখ্যের সৃষ্টির মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই, না হয় সাংখ্যের পরিভাষা অবলম্বন করিয়া প্রাকৃতিক পদার্থের সৃষ্টিবর্ণনা করিতে গিয়া একটি মহা গোলযোগ ঘটাইয়াছেন। উপরি-উল্লিখিত সৃষ্টি ও ব্যঞ্জনার ভেদ না বুঝিলে কি গোলযোগ ঘটে মনুর সৃষ্টির কথাতে তাহার উদাহরণ পাওয়া যায়।

মনুসংহিতা লেখক লেখেন;—

"আসীদিদং তমোভূতম্
অপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যম্ অবিজ্ঞেয়ং
প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥"

ভাষ্যকারেরা বলেন যে, অব্যক্ত অবস্থায় অবস্থিত প্রকৃতির নাম "তমস্"। যদি মূলের কোনও অর্থ থাকে তবে তাহা এই যে, একদা প্রকৃতি নামক পদার্থপুঞ্জের সহিত পুরুষ নামক পদার্থের কোনও প্রকার সম্পর্ক ছিল না। তদানীং পুরুষের সহিত প্রকৃতির জ্ঞ-জ্ঞেয় সম্বন্ধ ছিল না—সুতরাং এই তমোভূত (অব্যক্ত

অবস্থাপন্ন) সংসার পুরুষ কর্তৃক অপ্রজ্ঞাত ছিল; কাজে কাজেই ইহার কোন লক্ষণ ছিল না। কেবল যে অপ্রজ্ঞাত ছিল তাহাই নহে, ইহা একবারে অবিজ্ঞেয় ছিল। পুরুষেরা যে ইহাকে জানিতে পারিবে তাহার কোনও উপায় ছিল না। অপিচ ইহা অপ্রতর্ক্য ছিল, পুরুষেরা তর্ক করিয়াও ইহার অস্তিত্ব নিরূপণে অক্ষম ছিল। এ পর্য্যন্ত একরকম বুঝা যায়। তাহার পর একটি রূপক—"ইহা যেন চারিদিকে নিদ্রিতের ন্যায় ছিল।" চেতন পদার্থই নিদ্রা যায়; অচেতন প্রকৃতি কিরূপে নিদ্রিতের ন্যায় থাকিবে তাহা বুঝা দুষ্কর। লেখকের বোধ হয় অভিপ্রায় এই যে, তদানীং প্রকৃতির কোনও প্রকার ক্রিয়া থাকিলেও তাহা না থাকার মত ছিল, কেন না তাহা জ্ঞানের অতীত ছিল। অতএব সেকালে প্রকৃতিকে একপ্রকার নিশ্চেষ্ট বা নিদ্রিত থাকার মত ধরিয়া লওয়া যায়। তাহার পর লেখেন——

"ততঃ স্বয়ম্ভুর্ভগবান্
অব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদং।
মহাভূতাদি বৃত্তৌজাঃ
প্রাদুরাসীৎ তমোনুদঃ॥"

সাংখ্যদর্শনে অব্যক্ত শব্দ পারিভাষিকরূপে "প্রকৃতি" এই অর্থ প্রকাশ করে। এখানে তাহা ঈশ্বরের বিশেষণ *। অর্থ এই—মহাভূত বা স্থূলভূতাদি (বাহ্যরূপাদি) বৃত্ত বা ঘটনা যাঁহার শক্তি দ্বারা নিষ্পন্ন হয় সেই ভগবান্ এই অব্যক্ত প্রকৃতিকে ব্যক্ত করিয়া প্রকৃতির "তমস্"(অব্যক্ত) অবস্থা অপসারিত করিয়া প্রাদুর্ভূত হইলেন। এস্থলে অর্থের বড়ই গোলযোগ। সাংখ্য-

* আমার সন্দেহ হয় এস্থলে প্রকৃত পাঠ "অব্যক্তো" না হইয়া "অব্যক্তং" হইবে।

সংযোগবশতঃ পরস্পরের উপর পরস্পরের ক্রিয়াবশতঃ আবির্ভূত হইয়া থাকে।

ব্যক্ত অব্যক্ত ও জ্ঞ, এই তিনের মধ্যে অব্যক্ত ও জ্ঞ নিত্যপদার্থ, ব্যক্ত অনিত্য ও জন্য পদার্থ। এই অনিত্য পদার্থ যাহাকে সাধারণতঃ জগৎ বা সংসার বলিয়া লোকে পরিগ্রহ করে তাহা অপর দুই নিত্যপদার্থের এক আশ্চর্য্য সম্পর্কবশাৎ, তাহার মধ্যে একটি (জ্ঞ) হইতে অভিব্যক্ত হয় ইহাই সমীচীন সাংখ্যমত। ব্যক্ত সম্পূর্ণ জ্ঞানময়; অব্যক্ত সেই জ্ঞানের চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া আমাদের প্রতীতির বিষয় হয়; কিন্তু তত্তৎ প্রকার জ্ঞানোৎপাদক ব্যতিরেকে স্বরূপতঃ তাহা কি তাহা চিরকাল আমাদের নিকট অব্যক্ত থাকিয়া যায়।

১২। মনুসংহিতার সৃষ্টি ও সাংখ্যদর্শনের সৃষ্টি।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে বৈদিক বা পৌরাণিক "সৃষ্টি"র সহিত দার্শনিক "সৃষ্টি"র কোন সম্বন্ধ নাই। আমরা ইতস্ততঃ যে সকল পদার্থকে দেখিতেছি শুনিতেছি আস্বাদ করিতেছি আঘ্রাণ করিতেছি স্পর্শ করিতেছি বলিয়া অনুভব করি, সেই সকল পদার্থ ক্রমশঃ কি প্রকারে কি পর্য্যায়ে আমাদের বোধ বা জ্ঞান হইতে আবির্ভূত বা অভিব্যক্ত হয়, কিরূপে আমাদেরই জ্ঞান বাহ্যপদার্থ বা স্থূলভূত হইয়া দাঁড়ায়, তাহার নাম দার্শনিক সৃষ্টি। এই সৃষ্টির অভিনয় প্রত্যেক নরনারীর দ্বারা অহরহ নির্ব্বাহ হইতেছে। ইহাতে ঈশ্বরের হস্ত কিছুই দেখা যায় না। ইহা তর্কের দ্বারা প্রমাণ করা যায়, বিচার করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এই মত অনুসারে তোমার জগৎ তুমি সৃষ্টি করিয়াছ, আমার জগৎ আমি সৃষ্টি করিয়াছি। প্রত্যেক মনুষ্যের সৃষ্টি-

ক্রিয়া তাহার জীবনের সহিত আরম্ভ হয়, তাহার মৃত্যুর সহিত শেষ হয়। মনুষ্যজীবনের পূর্ব্বের কোনও ঘটনার সহিত এই সৃষ্টিব্যাপারের কোনও সম্পর্ক নাই। পক্ষান্তরে যাহাকে বৈদিক বা পৌরাণিক সৃষ্টি বলা যায়, তাহা মনুষ্যজীবনের পূর্ব্বের ঘটনা বিশেষ। দর্শনশাস্ত্রে যে পদার্থশ্রেণীকে "অব্যক্ত" বা "প্রকৃতি" বলা যায়, সেই স্বাধীন সত্তাবান পদার্থসকল কিরূপে উৎপন্ন হইল অথবা কিরূপে তাহারা বর্ত্তমান আকার ধারণ করিল, তাহাদিগকে উৎপন্ন করিবার অথবা বর্ত্তমান আকার প্রদান করিবার হেতু বা অভিপ্রায় কি— এই সকল কথার আন্দোলন বা মীমাংসার নাম বৈদিক বা পৌরাণিক সৃষ্টি। এই দুইটি বিষয় এতই স্বতন্ত্র যে, উভয়কেই সৃষ্টি বলাতে বিষম গোলযোগের সম্ভাবনা; শুদ্ধ সম্ভাবনা কেন বিষম গোলযোগই দাঁড়াইয়াছে। অনেকেই সাংখ্যসৃষ্টিকে বৈদিক সৃষ্টির সহিত অভিন্ন জ্ঞান করেন। তাহা যে বিষম ভ্রম তাহা সাংখ্যসৃষ্টির প্রক্রিয়া আলোচনা করিলে আর সন্দেহ থাকে না। আদি সৃষ্টি বোধ, বোধ হইতে অহংপ্রত্যয়, অহংপ্রত্যয় হইতে সূক্ষ্ম বা জ্ঞানময় রূপরসাদির পৃথক জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়শক্তির অনুভব, তাদৃশ জ্ঞান ও অনুভব হইতে স্থূল বা বাহ্য রূপরসাদির আবির্ভাব এ সমুদায়ই তোমার আমার ও প্রত্যেক মনুষ্যের আধ্যাত্মিক ব্যাপার ও প্রক্রিয়া। ইহাকে সৃষ্টি নাম না দিয়া একটি অপর নাম দিলে ভাল হয়। আমি প্রস্তাব করি অতঃপর ইহাকে "ব্যঞ্জনা" বলা হউক। সংসারের "সৃষ্টি", আর সংসারের "ব্যঞ্জনা"; অর্থাৎ ঈশ্বর সংসারকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা "অব্যক্ত"। মনুষ্য স্বীয় বোধের দ্বারা সেই অব্যক্ত সংসারের "ব্যঞ্জনা" সাধন করে, তখন তাহা "ব্যক্ত" এই নামে অভিধেয়। এতাবতা সংসার বা জগৎ দ্বিবিধ—"অব্যক্ত"

বৈশেষিকী মতে সমাকুল হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। অনেক লোকের মত বিশিষ্ট বিবেচনা ব্যতিরেকে একত্র কোন শাস্ত্রে নিবদ্ধ হইলে যেরূপ বিসম্বাদ ঘটনা সম্ভব এস্থলে তাহাই ঘটিয়াছে।

মহৎ অর্থাৎ বোধ বা বুদ্ধি। তাহা কি কখনও জড়ের ধর্ম্ম হইতে পারে, না জড় হইতে অভিব্যক্ত হইতে পারে? যদি তাহাই সম্ভব হয় তবে আর স্বতন্ত্র আত্মা বা পুরুষ স্বীকার করার কোন আবশ্যকতা থাকে না।

আদিম সাংখ্য পরিভাষা আলোচনা করিলে দেখা যায় পুরুষ বা আত্মার নাম "জ্ঞ"। জ্ঞানই আত্মার লক্ষণ। সংসারে কি আছে, ইহার উত্তরে সকল পদার্থেরই অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায়, কিন্তু জ্ঞানের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। জ্ঞানই দর্শনশাস্ত্রের মূলভিত্তি। যে ব্যক্তি ঘোরতর নাস্তিক সেও জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করে। সাংখ্য দার্শনিক জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়াই এক-দিকে "জ্ঞ" বা বিজ্ঞাতা পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, অপর দিকে "অজ্ঞ" অথচ বিজ্ঞাতা প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করেন। বোধ ও জ্ঞানের মধ্যে কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। "মহৎ" শব্দের অর্থও জ্ঞান। এই মহৎ বা জ্ঞান যে, "জ্ঞ" পদার্থ হইতে অভিব্যক্ত না হইয়া "অজ্ঞ" পদার্থ হইতে অভিব্যক্ত হইবে ইহা কিরূপে সম্ভব। এক যদি "জ্ঞ" পদার্থের অস্তিত্ব একবারে অস্বীকার কর তাহা বুঝা যায়; চার্ব্বাকেরা বলে যদিও ভিন্ন ভিন্ন জড়পদার্থ স্বভাবতঃ অজ্ঞ, অর্থাৎ পরস্পর স্বতন্ত্র অবিযুক্ত অবস্থায় [illegible], তাহারা মিশ্রিত হইলে তাহা হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে। এই মত সত্য হউক না হউক তাহা বুঝা যায়। কিন্তু জ্ঞানকে অজ্ঞ অচেতন প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া বলিলে আর আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়।

অর্ব্বাচীন সাংখ্যেরা দুইপ্রকার জ্ঞানের কথা বলেন; কেবল জ্ঞান ও বিকৃত জ্ঞান। যতদূর বুঝা যায় তাহাতে তাঁহাদের এইরূপ মত বোধ হয় যে, কেবল জ্ঞানই আত্মার স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান। কেবল জ্ঞানে অহঙ্কারের সত্তা নাই; "নাস্মি ন মে নাহমিতি কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানং"—অর্থাৎ আত্মা যখন প্রকৃতি হইতে আপনাকে ভিন্ন বলিয়া পরিগ্রহ করে তখন (অর্ব্বাচীন সাংখ্যেরা বলেন) আমি বিদ্যমান নহি, আমার নহে, আমি নয়, এইরূপ আকারের একপ্রকার জ্ঞান জন্মে। ইহাকেই কেহ কেহ কৈবল্য অর্থাৎ কেবল জ্ঞানের অবস্থা বা মোক্ষ বলেন; বোধ হয় ইহাকেই বৌদ্ধেরা পরে নির্ব্বাণ বলিয়া গ্রহণ করেন। তাহাতে কেবল জ্ঞান ও বিকৃত জ্ঞানের এইরূপ প্রভেদ দেখা যায়—একটি অহঙ্কার-সংযুক্ত অপরটি অহঙ্কারবিযুক্ত। কিন্তু যদি তাহাই হয় তবে আদিম সাংখ্যাচার্য্যগণের "মহৎ" নামক জ্ঞানকে কেবল জ্ঞান বলিবে, না বিকৃত জ্ঞান বলিবে? তাহাতেও ত অহঙ্কারের লেশ নাই? ইহাতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে যে, কেবল ও বিকৃত জ্ঞানের ভেদ কপিলসম্মত ও অনুমোদিত নহে; ইহা পরবর্ত্তী সাংখ্য পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সাংখ্য বিজ্ঞানে প্রক্ষিপ্ত।

যদি এই ভেদ স্বীকার করা না যায়, জ্ঞানমাত্রই মূলে এক-জাতীয় পদার্থ বলিয়া ধরা যায়, এবং যদি "জ্ঞ" নামক স্বতন্ত্র স্বাধীন নিত্যপদার্থের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় তাহা হইলে জ্ঞানকে প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বলা যায় না। আমার বিবেচনায় প্রাচীন সাংখ্যাচার্য্যদের মতে "মহৎ" প্রভৃতি প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ জন্য পুরুষ হইতে আবির্ভূত জ্ঞান; প্রকৃতি হইতে নহে। সংসারের সৃষ্টি (অর্থাৎ দার্শনিক সৃষ্টি) প্রকৃতি পুরুষের

কার করেন না। তাদৃশ ঈশ্বর তাঁহারা স্বীকার করেন না, তাঁহারা তাহাকে কেবল অব্যক্ত বলিয়াই ক্ষান্ত; ইহাতে তাঁহারা বিশেষ বুদ্ধিমত্তা এবং পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন।

সংক্ষেপে মায়াবাদ ও প্রকৃতিবাদে সাদৃশ্য এই যে, উভয়েই প্রতীয়মান সংসারকে জ্ঞানের পরিণাম বলিয়া অঙ্গীকার করে; এবং প্রভেদ এই যে, সেই প্রতীয়মানের মূলে যে পদার্থ আছে তাহাকে মায়াবাদে বলে ঈশ্বর, প্রকৃতিবাদে বলে প্রকৃতি। ঈশ্বর চৈতন্যময়, প্রকৃতি জড়; ঈশ্বর এক ও অখণ্ড, প্রকৃতি বহু ও খণ্ডিত; ঈশ্বর নির্গুণ বা গৌণ পদার্থে অবিভাজ্য, প্রকৃতি সগুণ বা গৌণ পদার্থে বিভাজ্য। পরস্পরের মধ্যে এই যে অনৈক্য তাহা সামঞ্জস্যের অতীত; যিনি সাংখ্যের প্রকৃতিবাদকে অঙ্গীকার করিবেন তিনি আর বেদান্তের মায়াবাদ অঙ্গীকার করিতে পারেন না; করিলে পরস্পরের বিরুদ্ধ মতকে অবলম্বন করা হয়।

এক্ষণে ভরসা করি আমরা পূর্ব্বে সাংখ্যমতের যেরূপ বিবরণ দিয়াছি তাহাকে আর কেহই একপ্রকার মায়াবাদ বলিয়া মনে করিবেন না।

১১। মহৎ অহঙ্কার প্রভৃতি তত্ত্ব পুরুষ হইতে অভিব্যক্ত হয়, না প্রকৃতি হইতে?

আমার বিবেচনায় এই বিষয়ে প্রাচীন সাংখ্যাচার্য্যদের সহিত অর্ব্বাচীন সাংখ্যদের ঐকমত্য ছিল না। অর্ব্বাচীন সাংখ্যেরা বলেন;

"মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতি-বিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতি র্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ॥"

ইহাতে মহৎ অহঙ্কার প্রভৃতিকে স্পষ্টাক্ষরে প্রকৃতির বিকৃতি

বলা হইয়াছে। যাহা প্রকৃতির বিকার তাহা অবশ্যই প্রকৃতি হইতে অভিব্যক্ত; পুরুষ হইতে নহে। "প্রকৃতে র্মহান্" ইত্যাদি কারিকাতেও প্রকৃতি হইতে মহৎ অভিব্যক্ত বলিয়া উল্লিখিত দেখা যায়।

প্রবাদ এই যে, কপিল নামক একজন ঋষি সাংখ্যদর্শনের আদি আচার্য্য। কপিল স্বীয় মত আসুরি নামক এক শিষ্যকে প্রদান করেন। সেকালে গুরুশিষ্যপরম্পরায় বিদ্যা পরিরক্ষিত হইত, গুরু আপনার ছাত্রবৃন্দের মধ্যে যাহাকে সমধিক বুদ্ধিমান বোধ করিতেন তাহাকে বিশিষ্টরূপে আপন মত বুঝাইয়া দিয়া মরণান্তে আপনার প্রতিনিধি স্থির করিয়া যাইতেন। আচার্য্য আসুরির নিকট হইতে অন্যান্য শিষ্যপরম্পরায় কপিলের প্রবর্ত্তিত দর্শনশাস্ত্র লোকে রক্ষিত ও প্রচারিত হইয়া আসিয়াছে। এই শিষ্যপরম্পরা মধ্যে পঞ্চশিখাচার্য্য ও ঈশ্বরকৃষ্ণ বিশেষ বিখ্যাত। আদি সাংখ্যাচার্য্য কপিল ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন না বলিয়া প্রবাদ; তাহা কতদূর সত্য বলা যায় না। সম্ভবতঃ অবিবেকী লোকে ঈশ্বরের যে রূপ গুণ কল্পনা করে কপিল তাহার প্রতিবাদ করিতেন, তাহাতেই তাঁহার "নিরীশ্বর" বলিয়া খ্যাতি হইয়া থাকিবে। কিন্তু ইহাও শুনা যায় যে, কপিল বেদ মানিতেন। যিনি বেদ মানেন তিনি যে ঈশ্বর মানেন না ইহা অসম্ভব। সে যাহা হউক এক্ষণে যাহা কপিলের মত বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহা তাঁহার পরকালবর্ত্তী শিষ্যপরম্পরা দ্বারা অনেক সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। উপরে যে কারিকা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকা। ঈশ্বরকৃষ্ণের মতে মহৎ প্রভৃতি প্রকৃতি হইতে অভিব্যক্ত। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ইহা কোন মতে সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। অর্ব্বাচীন সাংখ্যদর্শন নানাবিধ

মাত্র, তাহা যে মূল বা স্থায়ীপদার্থ নহে, তাহা যে অলীক ও মিথ্যা ইহা আমরা কদাচ বিস্মৃত হই না।

এতাবতা যাহা সত্য না হইয়াও সত্যের মত দেখায়, যাহা সত্যের ভ্রম জন্মায় বটে, কিন্তু বাস্তবিক মিথ্যা বা অলীক, তাহাও ক্রমশঃ মায়া শব্দের বাচ্য হইয়াছে। মায়া একপ্রকার মিথ্যা আকৃতিমাত্র; তাহা যেরূপ দেখায় প্রকৃত সেরূপ নহে; তাহা মনে কেবল ভ্রম জন্মায়।

পক্ষান্তরে যাহা সত্য বা স্থায়ী, যাহা কেবল আঁখা নয় প্রকৃত, তাহার নাম প্রকৃতি বা মূল বা মূলপ্রকৃতি। ইহা নিত্য, কাহারও দ্বারা রচিত নহে। ইহার পরিবর্ত্তন ক্ষয় বা বিনাশ নাই; ইহা সর্ব্বদাই একরূপ; ইহা অচল, অটল, কূটস্থ। ইহাতে মনে কোনও প্রকার ভ্রান্তি উৎপাদন করে না।

বেদান্ত মায়াবাদ; অর্থাৎ বেদান্তে বলে যে, জগৎ ভ্রান্তিজ্ঞান মাত্র। সূর্য্যচন্দ্র তরুলতা প্রভৃতি যাহা "আছে" বলিয়া আমরা মনে করি বাস্তবিক তাহা কিছুমাত্র নাই, সে সব অলীক; আমরা নিদ্রিত অবস্থায় যেমন স্বপ্ন দেখি জাগ্রৎ অবস্থাতেও সেইরূপ একপ্রকার স্বপ্ন দেখি মাত্র। উভয়প্রকার স্বপ্নই মিথ্যা।

সাংখ্য প্রকৃতিবাদ; অর্থাৎ সাংখ্য বলে না জগৎ ভ্রান্তি-জ্ঞানমাত্র; সূর্য্যচন্দ্র তরুলতা প্রভৃতি যাহা আছে বলিয়া মনে করি বাস্তবিক তাহা সকলই আছে, তাহা মিথ্যা নহে তাহা প্রকৃত; নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নে ও জাগ্রৎ অবস্থায় জ্ঞানে মহৎ প্রভেদ; উভয়ই তুল্য অলীক নহে।

এই বিচারস্থলে সাংখ্যেরা জগৎসংসারকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন—"ব্যক্ত" জগৎ যাহা প্রত্যক্ষগম্য; আর "অব্যক্ত" জগৎ

যাহা প্রকৃত বা প্রকৃতি। আমরা এই উভয়ের ভেদ পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি, পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

সাংখ্যেরা "মায়া" শব্দ আদৌ ব্যবহার করেন না; না করিয়া ভালই করিয়াছেন। রূপকমূলক শব্দ তর্কশাস্ত্রে বড়ই অনর্থের মূল। তাঁহারা "মায়াময়" এই শব্দের পরিবর্ত্তে "ব্যক্ত" এই শব্দ ব্যবহার করেন। বেদান্তী যখন বলেন, এই সংসার "মায়াময়" সাংখ্য তখন বলেন ইহা "ব্যক্ত"। এ পর্য্যন্ত উভয়ের অর্থ অনেকটা সমান; উভয়েই সংসারকে জ্ঞানের পরিণাম বলিয়া স্বীকার করেন; কিন্তু বেদান্তীর ন্যায় সাংখ্য তাদৃশ সংসারকে অলীক বা ভ্রমজ্ঞান বলিতে চান না; তিনি অলীকের পরিবর্ত্তে বলেন ক্ষণিক; ভ্রমজ্ঞানের পরিবর্ত্তে বলেন তাহা প্রকৃতির নিত্য বা পরিচায়ক চিহ্ন। যে সূর্য্যকে আমরা দেখিতেছি বলিয়া মনে করি তাহা যদি প্রকৃতি বা প্রকৃত সূর্য্য নয় তত্রাচ তাহা অলীক নহে, তাহাও একপ্রকার পদার্থ, তবে তাহা ক্ষণিক; এবং তাহাতে প্রকৃত সূর্য্য কিরূপ তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

বেদান্ত ও সাংখ্যের মধ্যে ঘোরতর বিবাদের স্থান এই যে, বেদান্তে বলে "মায়ার" অর্থাৎ প্রতীয়মান জগতের পশ্চাতে "ঈশ্বর," সাংখ্য বলে "ব্যক্তের" অর্থাৎ প্রতীয়মান জগতের পশ্চাতে ঈশ্বর নহে "প্রকৃতি"। সংসারের জ্ঞানকে বেদান্তে রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের ন্যায় বা শুক্তিতে রজতজ্ঞানের ন্যায় ভ্রমজ্ঞান বলিয়া বর্ণনা করা হয়; কিন্তু সর্পের স্থানে যে একটা রজ্জু আছে এবং রজতের স্থানে যে একটা শুক্তি আছে তদ্বৎ সংসারের স্থানে যে একটা কিছু আছে তাহা বেদান্ত অঙ্গীকার করিতে বাধ্য হন; এবং সেই একটা কিছুকে বলেন ইহা ঈশ্বর। সাংখ্যেরা সেই একটা কিছুকে ঈশ্বর বলিয়া অঙ্গী-

সুদীর্ঘ অবসর লইয়া আত্মোন্নতি সাধন পূর্ব্বক তাহার পর নির্জ্জন হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আপনার গুরুপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন তেমনি আমাদের যিনি গুরু হইবেন তাঁহাকেও বহুকাল খ্যাতিহীন নিভৃত আশ্রমে অজ্ঞাতবাস যাপন করিতে হইবে, পরম ধৈর্য্যের সহিত গভীর চিন্তায় নানা দেশের জ্ঞান বিজ্ঞানে আপনাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, সমস্ত দেশ অনিবার্য্য বেগে অন্ধভাবে যে আকর্ষণে ধাবিত হইয়া চলিয়াছে সেই আকর্ষণ হইতে বহু যত্নে আপনাকে দূরে রক্ষা করিয়া পরিষ্কার সুস্পষ্টরূপে হিতাহিত জ্ঞানকে অর্জ্জন ও মার্জ্জন করিতে হইবে—তাহার পরে তিনি বাহির হইয়া আসিয়া যখন আমাদের চিরপরিচিত ভাষায় আমাদিগকে আহ্বান করিবেন আদেশ করিবেন, তখন আর কিছু না হৌক্ সহসা চৈতন্য হইবে এতদিন আমাদের একটা ভ্রম হইয়াছিল, আমরা একটা স্বপ্নের বশবর্ত্তী হইয়া চোখ বুজিয়া সঙ্কটের পথে চলিতেছিলাম। যেটাকে সম্মানের শৈলশিখর জ্ঞান করিয়াছিলাম সেইটাই পতনের উপত্যকা।

আমাদের সেই গুরুদেব আজিকার দিনের এই উদ্‌ভ্রান্ত কোলাহলের মধ্যে নাই; তিনি মান চাহিতেছেন না, পদ চাহিতেছেন না, ইংরাজি কাগজের রিপোর্ট চাহিতেছেন না, তিনি সমস্ত মত্ততা হইতে প্রলোভন হইতে মূঢ় জনস্রোতের আবর্ত্ত হইতে আপনাকে সযত্নে রক্ষা করিতেছেন; কোন একটি বিশেষ পলিটিস সংশোধন করিয়া বা বিশেষ সভায় স্থান পাইয়া আমাদের দেশের কোন যথার্থ দুর্গতি দূর হইবে আশা করিতেছেন না। তিনি নিভৃতে শিক্ষা করিতেছেন এবং একান্তে চিন্তা করিতেছেন; তিনি আপনার জীবনকে মহোচ্চ আদর্শে অটল উন্নত করিয়া তুলিয়া চারিদিকের জনমণ্ডলীকে অলক্ষ্যে আক-

র্ষণ করিতেছেন। তিনি চতুর্দ্দিককে যেন উদার বিশ্বগ্রাহী হৃদয় দিয়া নীরবে শোষণ করিয়া লইতেছেন; এবং বঙ্গলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি স্নেহদৃষ্টিপাত করিয়া দেবতার নিকট একান্তমনে প্রার্থনা করিতেছেন যেন এখনকার দিনের মিথ্যা তর্ক ও বাঁধি কথায় তাঁহাকে কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট না করে এবং দেশের লোকের বিশ্বাস-হীন নিষ্ঠাহীনতায়, উদ্দেশ্যসাধন অসাধ্য বলিয়া তাঁহাকে নিরুৎসাহ করিয়া না দেয়। অসাধ্য বটে, কিন্তু এদেশের যিনি উন্নতি করিবেন অসাধ্য সাধনই তাঁহার ব্রত।

সাংখ্যদর্শন।

১০। প্রকৃতিবাদ ও মায়াবাদ।

কোনও কুশল শিল্পী যখন কোনও একটি মনুষ্যের চিত্র অঙ্কিত করেন বা প্রতিমূর্ত্তি গঠন করেন তখন আদর্শের সহিত চিত্র বা প্রতিমূর্ত্তির সৌসাদৃশ্য দেখিয়া আমরা মোহিত হই, এবং কতই প্রশংসা করি; সেই অনুকরণ-বিদ্যার নাম "মায়া"; কেন না, শিল্পী মাপজোখ করিয়া তাদৃশ চিত্র রচনা করেন। মা=মাপকরণ, বা সংখ্যাবিস্তারের পরিচ্ছেদ-করণ। হাত যদি এত বড় হয় পা কত বড় হইবে শিল্পশাস্ত্রে তাহার পরিমাণ নির্দ্দেশ করা আছে। সেই পরিমাণ অনুসারে রচিত হয় বলিয়া শিল্পের নাম মায়া। কিন্তু আমরা মায়াকে যতই প্রশংসা করি না কেন, মায়ারচিত অনুকরণ যে অনুকরণ

ঠকিতে হইবে। যাহা হউক্ সে ভবিষ্যতের ভয় দেখাইয়া ইংরাজকে সতর্ক করিবার চেষ্টা করা আমাদের মত ক্ষুদ্রপ্রাণীর পক্ষে ধৃষ্টতামাত্র কিন্তু আমার স্বজাতীয়কে এ কথা বলিতে পারি যে, পরের প্রতি অভিমান করিয়া নিজের ক্ষতি করা নিতান্ত ছেলেমানুষী।

অতএব সকল দিক পর্য্যালোচনা করিয়া রাজাপ্রজার বিদ্বেষ-ভাব শমিত রাখিবার প্রকৃষ্ট উপায় এই দেখা যাইতেছে ইংরাজ হইতে দূরে থাকিয়া আমাদের নিকট-কর্ত্তব্য সকল পালনে একান্তমনে নিযুক্ত হওয়া। কেবলমাত্র ভিক্ষা করিয়া কখনই আমাদের মনের যথার্থ সন্তোষ হইবে না। আজ আমরা মনে করিতেছি ইংরাজের নিকট হইতে কতকগুলি অধিকার পাইলেই আমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে। ভিক্ষা স্বরূপে সমস্ত অধিকার-গুলি যখন পাইব তখনো দেখিব অন্তর হইতে লাঞ্ছনা কিছুতেই দূর হইতেছে না—বরং যতদিন না পাইয়াছি ততদিন যে সান্ত্বনা-টুকু ছিল সে সান্ত্বনাও আর থাকিবে না। আমাদের অন্তরের শূন্যতা না পূরাইতে পারিলে কিছুতেই আমাদের শান্তি নাই। আমাদের স্বভাবকে সমস্ত ক্ষুদ্রতার বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারিলে তবেই আমাদের যথার্থ দৈন্য দূর হইবে এবং তখন আমরা তেজের সহিত সম্মানের সহিত রাজসাক্ষাতে যাতায়াত করিতে পারিব।

আমি এমন বাতুল নহি যে, আশা করিব সমস্ত ভারতবর্ষ পদচিন্তা, প্রভাবচিন্তা, ইংরাজের প্রসাদচিন্তা ত্যাগ করিয়া, বাহ্য আস্ফালন বাহ্য যশখ্যাতি পরিহার করিয়া, ইংরাজ-আকর্ষণের প্রবল মোহ হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া, নিবিষ্টমনে অবিচলিত চিত্তে চরিত্রবল সঞ্চয় করিবে, জ্ঞান বিজ্ঞান অর্জ্জন করিবে, স্বাধীন

বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইবে, পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া লোকব্যবহার শিক্ষা করিবে, পরিবার ও সমাজের মধ্যে সত্যাচরণ সত্যানুষ্ঠান প্রচার করিবে, মানুষ যেমন আপন মস্তক সহজে বহন করে তেমনি কন্যারাশি তেমনি স্বভাবতই আপনার সম্মান ঊর্দ্ধে বহন করিয়া রাখিবে, লালায়িত লোলজিহ্বায় পরের কাছে দান যাচ্ঞা করিতে যাইবে না এবং ধর্ম্মোরক্ষতি রক্ষিতঃ এই কথাটির সুগভীর তাৎপর্য্য সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবে। এ কথা সুবিদিত যে, সুবিধার ঢালু যে দিকে, মানুষ অলক্ষিতে ধীরে ধীরে সেই দিকে গড়াইয়া যায়; যদি হ্যাট্‌কোট্‌ পরিয়া, ইংরাজি ভাষা অবলম্বন করিয়া, ইংরাজের দ্বারস্থ হইয়া, ইংরাজিতে নিজেকে বড় বড় অক্ষরে তর্জ্জমা করিয়া কোন সুবিধা থাকে তবে অল্পে অল্পে লোকে হ্যাট্‌কোট্‌ ধরিবে, সন্তানদিগকে বহুচেষ্টায় বাঙ্গলা ভুলিতে দিবে এবং নিজের পিতা ভ্রাতার অপেক্ষা সাহেবের দ্বারবান্‌ সহলে বেশি আত্মীয়তা স্থাপন করিবেই। এ প্রবাহ রোধ করা দুঃসাধ্য।

দুঃসাধ্য, তবু মনের আক্ষেপ পুষ্টি করিয়া ব্যক্ত করিয়া বলা আবশ্যক। যদি অরণ্যে রোদনও হয় তবু বলিতে হইবে, যে, ইংরাজি ফলাইয়া কোন ফল নাই, স্বভাষায় শিক্ষার মূলভিত্তি স্থাপন করিয়াই দেশের স্থায়ী উন্নতি; ইংরাজের কাছে আদর কুড়াইয়া কোন ফল নাই, আপনাদের মনুষ্যত্বকে সচেতন করিয়া তোলাতেই যথার্থ গৌরব, অন্যের নিকট হইতে ফাঁকি দিয়া আদায় করিয়া কিছু পাওয়া যায় না, প্রাণপণ নিষ্ঠার সহিত ত্যাগস্বীকারেই প্রকৃত কার্য্যসিদ্ধি।

শিখদিগের শেষগুরু গুরুগোবিন্দ যেমন বহুকাল জনহীন দুর্গম স্থানে বাস করিয়া নানা জাতির নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া

আরো একটা কারণ আছে। ইংরাজের অনুগ্রহকে কেবল গৌরব মনে করিয়া কেবল নিস্বার্থভাবে ভোগ করাও আমাদের পক্ষে কঠিন। কারণ আমরা দরিদ্র এবং জঠরানল কেবল সম্মান-বর্ষণে শান্ত হয় না। আমরা অনুগ্রহটিকে সুবিধায় ভাঙাইয়া লইতে চাহি। কেবল অনুগ্রহ নহে সেই সঙ্গে কিছু অন্নেরও প্রত্যাশা রাখি। কেবল শেক্‌হ্যাণ্ড্‌ নহে চাকরিটা বেতন বৃদ্ধিটাও আবশ্যক। প্রথম দুই দিন যদি সাহেবের কাছে বন্ধুর মত আনাগোনা করি ত, তৃতীয় দিনে ভিক্ষুকের মত হাত পাতিতে লজ্জা বোধ করি না। সুতরাং সম্বন্ধটা বড়ই হীন হইয়া পড়ে। এ দিকে অভিমান করি, যে, ইংরাজ আমাদিগকে সমকক্ষ ভাবের সম্মান দেয় না ওদিকে তাহাদের দ্বারস্থ হইয়া ভিক্ষা করিতেও ছাড়ি না।

ইংরাজ আমাদের দেশী সাক্ষাৎকারীকে উমেদার, অনুগ্রহ-প্রার্থী অথবা টাইটেল্‌-প্রত্যাশী না মনে করিয়া থাকিতে পারে না। কারণ, ইংরাজের সঙ্গে ত আমাদের দেখাশুনার কোন সম্বন্ধই নাই। তাহাদের ঘরের দ্বার রুদ্ধ, আমাদের কপাটে তালা। তবে আজ হঠাৎ ঐ যে লোকটা পাগ্‌ড়ি চাপকান পরিয়া শঙ্কিত গমনে আসিতেছে, অপ্রস্তুত অভদ্রের মত অনভ্যস্ত অশোভন ভাবে সেলাম করিতেছে, কোথায় বসিবে ভাবিয়া পাইতেছে না এবং থতমত খাইয়া কথা কহিতেছে উহার সহসা এত বিরহ-বেদনা কোথা হইতে উৎপন্ন হইল যে, দ্বারীকে কিঞ্চিৎ পারিতোষিক দিয়াও সাহেবের মুখচন্দ্রমা দেখিতে আসিয়াছে?

যাহার অবস্থা হীন সে যেন বিনা আমন্ত্রণে বিনা আদরে সৌভাগ্যশালীর সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে না যায়—তাহাতে কোন পক্ষেরই মঙ্গল হয় না। ইংরাজ এ দেশে আসিয়া ক্রমশই নূতন

স্ফূর্ত্তি ধারণ করিতে থাকে তাহার অনেকটা কি আমাদেরই হীনতা-বশতঃ নহে? সেইজন্যও বলি, অবস্থা যখন এতই মন্দ তখন আমাদের সংশ্রব সংঘর্ষ হইতে ইংরাজকে রক্ষা করিলে উহাদেরও চরিত্রের এমন দ্রুত বিকৃতি হইবে না। সে উভয় পক্ষেরই লাভ।

এই ত শুনিয়া বলিলাম, যে, যাহারা ঘরে আসিতে নিষেধ করে তাহাদের দ্বারস্থ হইতে আর প্রবৃত্তি হয় না—তা নিজের জন্যই হোক্ আর দেশের জন্যই হোক্। কিন্তু এই অপ্রবৃত্তি ছাড়া আরো একটা উচ্চতর কারণ আছে।

ইংরাজের সাহিত্য ইতিহাস হইতে আমাদের অনেক শিক্ষা করিবার আছে। ইংরাজের কাছ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে না সরিয়া গেলে আমাদের সেই শিক্ষার ব্যাঘাত হইতেছে। ইংরাজের গ্রন্থেই যথার্থ শ্রেষ্ঠ ইংরাজের সঙ্গ পাওয়া যায়। জীবন্ত ইংরাজের সংঘাতে আমাদের মনে কেবল সন্দেহ এবং বিরাগ উপস্থিত করে। ইংরাজের প্রতি বিদ্বেষ আমাদিগকে ইংরাজি শিক্ষা অন্তরে গ্রহণ করিতে নিরস্ত করিতেছে। আজকাল ইংরাজি শিক্ষা ও সভ্যতার প্রতি আমাদের মনের আর সেরূপ বিশুদ্ধ নিষ্প্রেম ভাব নাই, আমরা সর্ব্বদাই তাহাকে অপমানিত করিবার [illegible] করিতেছি—তাহাতে ইংরাজের কোন ক্ষতি নাই [illegible]

কারণ, পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ যদি উন্নতির চরম [illegible]

বীরেরা যে সকল গুণে আজ জগতের শীর্ষস্থ[illegible]

সকল গুণ শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সহিত গ্রহণ করিবার [illegible] দের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। যেখানে অসম্পূর্ণতা [illegible] বিনাশের বীজ। যদি ভারতবর্ষীয়ের এমন সকল বিশেষ গুণ থাকে যাহা ইংরাজের নাই আমি বলিব সেইখানেই ইংরাজের দুর্ব্বলতা—নিশ্চয়ই ভবিষ্যতের হিসাবে সেখানেই ইংরাজের

সম্ভাবনা নাই সে দিকটা অন্ধকারে, অনাদরে আবর্জ্জনার আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। সে দিকের কোনরূপ সংশোধনে হাত দিতে আলস্য বোধ হয়।

মানুষকে দোষ দিতে পারি না; অকিঞ্চন অপমানিতের পক্ষে এ প্রলোভন বড় স্বাভাবিক। সৌভাগ্যবানের প্রসন্নতায় তাহাকে বিচলিত না করিয়া থাকিতে পারে না।

আজ আমি বলিতেছি, ভারতবর্ষের দীনতম মলিনতম কৃষক-ককেও আমি ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিব আর ঐ যে রাঙা সাহেব টম্‌টম্‌ হাঁকাইয়া আমার সর্ব্বাঙ্গে কাদা ছিটাইয়া চলিয়া যাইতেছে উহার সহিত আমার কানাকড়ির সম্পর্ক নাই।

ঠিক এমন সময়টিতে যদি উক্ত রাঙা সাহেব হঠাৎ টম্‌টম্‌ থামাইয়া আমারই দরিদ্র কুটীরে পদার্পণ করিয়া বলে—"বাবু তোমার কাছে দেশালাই আছে?" তখন ইচ্ছা করে দেশের পঞ্চবিংশতি কোটি লোক সারি সারি কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া দেখিয়া যায় যে, সাহেব আজ আমারই বাড়িতে দেশালাই চাহিতে আসিয়াছে। এবং দৈবাৎ ঠিক সেই সময়টিতে যদি আমার দীনতম মলিনতম কৃষক ভাইটি মা ঠাকরুণকে প্রণাম করিবার জন্য আমার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয় তখন সেই কুৎসিৎ দৃশ্যটিকে ধরণীতলে বিলুপ্ত করিয়া দিতে ইচ্ছা করে; পাছে সেই বর্ব্বরের সহিত আমার কোন যোগ কোন সংস্রব কোন সুদূর ঐক্য বড় সাহেবের কল্পনাপথে উদিত হয়!

আমি অদ্য যে সমাজের সদয় আহ্বানে এই সভায় বক্তৃতা করিবার সম্মানিত অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাঁহাদের কর্ত্তৃপক্ষ-দিগকে জিজ্ঞাসা করিলে বোধ হয় জানিতে পাইব, যে, অনেকে যাঁহারা প্রথমে এ সমাজে যোগ দিতে অবজ্ঞা অনুভব করিয়া-

ছিলেন, বড় বড় সাহেব-সমাগমের পর তাঁহাদের হৃদয়েও অকস্মাৎ উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে। এবং যাঁহারা সভাসমিতি অথবা কোন বৃহৎ অনুষ্ঠান লইয়া কাজ করিয়াছেন তাঁহারা বোধ হয় সকলেই জানেন, সাহেবের নামের টোপ ফেলিলে বাঙ্গলার বড় বড় মাছ যেমন সহজে ধরা পড়ে, এমন, দেশের হিত ও সমাজের মঙ্গলের দোহাই দিলে হয় না। কান না টানিলে মাথা আসে না; সাহেব আমাদের কান হইয়াছে; কিন্তু এই কান টানিয়া শুভকার্য্যে প্রবৃত্ত করা বড় অপমান।

অতএব, যখন মনে মনে বলি সাহেবের কাছে আর ঘেঁষিব না তখন অহঙ্কারের সহিত বলি না, বড় বিনয়ের সহিত বড় আশঙ্কার সহিত বলি। জানি যে, সেই সৌভাগ্যগর্ব্বেই আমার সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বনাশ হইবে—আমি আর নিভৃতে বসিয়া আপনার কর্ত্তব্যপালন করিতে পারিব না, মনটা সর্ব্বদাই উড়ু-উড়ু করিতে থাকিবে এবং আপনাদের দরিদ্র স্বজনের খ্যাতিহীন গৃহটাকে বড়ই বেশি শূন্য বলিয়া বোধ হইবে। যাহাদের জন্য জীবন উৎসর্গ করা আমার কর্ত্তব্য তাহাদের সহিত নিকট-আত্মীয়ের মত ব্যবহার করিতে আমার লজ্জা বোধ হইবে।

ইংরাজ তাহাদের আমোদপ্রমোদ আহারবিহার আসঙ্গপ্রসঙ্গ বন্ধুত্ব প্রণয় হইতে আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে বহিষ্কৃত করিয়া দ্বার রুদ্ধ রাখিতে চাহে তবু আমরা নত হইয়া প্রণত হইয়া ছল করিয়া ফল করিয়া একটুখানি প্রবেশাধিকার পাইলে, রাজসমাজের একটু ঘ্রাণমাত্র পাইলে এত কৃতার্থ হই যে, আপনার দেশের লোকের আত্মীয়তা সে গৌরবের নিকট তুচ্ছ বোধ হয়, এমন স্থলে, এমন দুর্ব্বল মানসিক অবস্থায় সেই সর্ব্বনাশী অনুগ্রহমদ্যকে অপেয়মস্পর্শং বলিয়া সর্ব্বথা পরিহার করাই কর্ত্তব্য।

আবার আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে ইংরাজও অনেকগুলি বিষয়ে কিছু স্থূলদৃষ্টি। ভারতবর্ষীয়ের মধ্যে যে বিশেষ গুণগুলি আছে এবং যেগুলি বিশেষ সমাদরের যোগ্য তাহা তাহারা ভালাইয়া গ্রহণ করিতে পারে না; অবজ্ঞাভরেই হৌক বা যে কারণেই হৌক্ তাহারা বিদেশী আবরণ ভেদ করিতে পারে না বা চাহে না। তাহার একটা দৃষ্টান্ত দেখ—বিদেশে থাকিয়া জর্মান্ যেমন একাগ্রতার সহিত আমাদের সংস্কৃতশাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছে স্বক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া ইংরাজ তেমন করে নাই। শেভ্রিয়োঁ নামক একজন ফরাসী ভ্রমণকারী আপনার চির-সংস্কারকে দূরে রাখিয়া আমাদের ধর্ম্ম ও দর্শনের যেমন মর্ম্ম-স্থানে প্রবেশ করিয়াছেন এমন অনেক বহুদর্শী ইংরাজ পণ্ডিতের সাধ্যায়ত্ত নহে। ইংরাজ ভারতবর্ষে জীবনযাপন করে এবং দেশটাকে সম্পূর্ণই দখল করিয়াছে কিন্তু দেশী ভাষাটা দখল করিতে পারে নাই। "বাবু ইংলিশ" লইয়া তাঁহারা অনেক কৌতুক করিয়া থাকেন, সাহেবী বাঙ্গলা লইয়া আমরাও প্রচুর আমোদ ভোগ করিতে পারিতাম; করি না যে তাহার কারণ, আমরা আশা করি না একজন বিদেশী আমাদের ভাষা বিশুদ্ধ-রূপে আয়ত্ত করিতে পারে। কিন্তু যতটুকু আশা করা যাইতে পারে ইংরাজ সেটুকুও পূর্ণ করে না।

অতএব ইংরাজ ভারতবর্ষীয়কে ঠিক ভারতবর্ষীয় ভাবে বুঝিতে এবং শ্রদ্ধা করিতে অক্ষম। এইজন্য আমরা অগত্যা ইংরাজকে ইংরাজী ভাবেই মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছি। মনে মনে যাহা জানি মুখে তাহা বলি না, কাজে যাহা করি কাগজে তাহা লজ্জাইয়া লিখি। জানি, যে, ইংরাজ পীপ্‌ল্ নামক একটা আকার আয়তনহীন অনির্দ্দেশ্য পদার্থকে জুজুর মত দেখে

আমরাও সেই জন্য কোন মতে পাঁচ জনকে জড় করিয়া পীপ্‌ল্‌ সাজিয়া গলা গম্ভীর করিয়া ইংরাজকে ভয় দেখাই। পরস্পরকে বলি, কি করিব ভাই, এমন না করিলে উহারা যদি কোন কথায় কর্ণপাত না করে তবে কি করা যায়! উহারা কেবল নিজের দস্তুরটাই বোঝে।

এইরূপে ইংরাজের স্বভাবগুণেই আমাদিগকে ইংরাজের মত ভাণ করিয়া আড়ম্বর করিয়া তাহাদের নিকট সম্মান এবং কাজ আদায় করিতে হয়। কিন্তু তবু আমি বলি, সর্ব্বাপেক্ষা ভাল কথা এই যে, আমরা সাজিতে পারিব না। না সাজিলে কর্ত্তারা যদি আমাদিগকে একটুখানি অধিকার বা আধটুকরা অনুগ্রহ না দেন ত নাই দিলেন!

কর্তৃপক্ষের প্রতি অভিমান করিয়া যে একথা বলা হইতেছে তাহা নহে। মনে বড় ভয় আছে। আমরা মৃৎপাত্র ঐ কাংস্য-পাত্রের সহিত বিবাদ চুলায় যাউক্‌ আত্মীয়তাপূর্ব্বক শেক্‌হ্যাণ্ড্‌ করিতে গেলেও আশঙ্কার সম্ভাবনা জন্মে।

কারণ, এত অনৈক্যের সংঘাতে আত্মরক্ষা করা বড় কঠিন। আমরা দুর্ব্বল বলিয়াই ভয় হয় যে, সাহেবের কাছে যদি একবার ঘেঁসি, সাহেব যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রতি কিছু সুপ্রসন্ন হাস্য বর্ষণ করে তাহার প্রলোভন আমার কাছে বড় বেশি—এত বেশি, যে, সে অনুগ্রহের তুলনায় আমাদের যথার্থ হিত আমরা ভুলিয়া যাইতে পারি। সাহেব যদি হাসিয়া বলিয়া বসে, বাঃ বাবু, তুমি ত ইংরাজি মন্দ বল না; তাহার পর হইতে বাঙ্গলার চর্চ্চা করা আমার পক্ষে বড়ই কঠিন হইয়া উঠে। যে বাহিরংশে ইংরাজের অনুগ্রহ-দৃষ্টি পড়ে সেই অংশেরই চাকচিক্য-সাধনে প্রবৃত্তি হয়, যে দিকটা য়ুরোপের চক্ষুগোচর হইবার

কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার আরম্ভে এই পণ করিয়া রাখিতে হইবে যে, যতদিন না সুযোগ্য হইব ততদিন অজ্ঞাতবাস অবলম্বন করিয়া থাকিব।

নির্ম্মাণ হইবার অবস্থায় গোপনের আবশ্যক। বীজ মৃত্তিকার নিম্নে নিহিত থাকে, ভ্রূণ গর্ভের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে রক্ষিত হয়। শিক্ষাবস্থায় বালককে সংসারে অধিক পরিমাণে মিশিতে দিলে সে প্রবীণ সমাজের মধ্যে গণ্য হইবার দুরাশায় প্রবীণদিগের অযথা অনুকরণ করিয়া অকালপক্ব হইয়া যায়। সে মনে করে সে একজন গণ্যমান্য লোক হইয়া গিয়াছে। তাহার আর রীতিমত শিক্ষার প্রয়োজন নাই—বিনয় তাহার পক্ষে বাহুল্য।

পাণ্ডবেরা পূর্ব্বগৌরব গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে অজ্ঞাতবাসে থাকিয়া বল সঞ্চয় করিয়াছিলেন। সংসারে উদ্যোগপর্ব্বের পূর্ব্বে অজ্ঞাতবাসের পর্ব্ব।

আমাদেরও এখন আত্মনির্ম্মাণ জাতিনির্ম্মাণের অবস্থা, এখন আমাদের অজ্ঞাতবাসের সময়।

কিন্তু এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা বড়ই বেশি প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছি। আমরা নিতান্ত অপরিপক্ক অবস্থাতেই অধীরভাবে ডিম্ব ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছি, এখন প্রতিকূল সংসারের মধ্যে এই দুর্ব্বল অপরিণত শরীরের পুষ্টিসাধন বড় কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

আমরা আজ পৃথিবীর রণভূমিতে কি অস্ত্র লইয়া আসিয়া দাঁড়াইলাম? কেবল বক্তৃতা এবং আবেদন? কি বর্ম্ম পরিয়া আত্মরক্ষা করিতে চাহিতেছি? কেবল ছদ্মবেশ? এমন করিয়া কতদিনই বা কাজ চলে এবং কতটুকুই বা ফল হয়?

একবার নিজেদের মধ্যে অকপটচিত্তে সরলভাবে স্বীকার

করিতে দোষ কি, যে, এখনও আমাদের চরিত্রবল জন্মে নাই। আমরা দলাদলি ঈর্ষা ক্ষুদ্রতায় জীর্ণ। আমরা একত্র হইতে পারি না, পরস্পরকে বিশ্বাস করি না, আপনাদের মধ্যে কাহারও নেতৃত্ব স্বীকার করিতে চাহি না। আমাদের বৃহৎ অনুষ্ঠানগুলি বুহদ্ বুদ্বুদের মত ফাটিয়া যায়; আরম্ভে ব্যাপারটা খুব তেজের সহিত উদ্ভিন্ন হইয়া উঠে দুই দিন পরেই সেটা প্রথমে বিচ্ছিন্ন, পরে বিকৃত, পরে নির্জ্জীব হইয়া যায়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না যথার্থ ত্যাগস্বীকারের সময় আসে ততক্ষণ আমরা ক্রীড়াসক্ত বালকের মত একটা উদ্যোগ লইয়া উন্মত্ত হইয়া থাকি; তার পরে কিঞ্চিৎ ত্যাগের সময় উপস্থিত হইলেই আমরা নানমন্ ছুতায় স্বস্ব গৃহে পরিয়া পড়ি। আত্মাভিমান কোন কারণে তিলমাত্র ক্ষুণ্ণ হইলে উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের আর কোন জ্ঞান থাকে না। যেমন করিয়া হৌক্ কাজ আরম্ভ হইতে না হইতেই তপ্ত তপ্ত নামটা চাই। বিজ্ঞাপন, রিপোর্ট, ধুমধাম এবং খ্যাতিটা যথেষ্ট পরিমাণে হইলেই আমাদের এমনি পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি বোধ হয় যে, তাহার পরেই প্রকৃতিটা নিদ্রালস হইয়া আসে; ধৈর্য্যসাধ্য শ্রমসাধ্য নিষ্ঠাসাধ্য কাজে হাত দিতে আর তেমন গা লাগে না।

এই দুর্ব্বল অপরিণত শতজীর্ণ চরিত্রটা লইয়া আমরা কি সাহসে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি তাহাই বিস্ময় এবং ভাবনার বিষয়।

এরূপ অবস্থায় অসম্পূর্ণতা সংশোধন না করিয়া অসম্পূর্ণতা গোপন করিতেই ইচ্ছা যায়। একটা কোন আত্মদোষের সমালোচনা করিতে গেলেই সকলে মিলিয়া মুখ চাপিয়া ধরে, বলে, আরে চুপ্‌চুপ্, ইংরাজেরা শুনিতে পাইবে—তাহারা কি মনে করিবে!

ত্রুটি খুঁজিয়া পায় না কিন্তু তথাপি য়ুরোপ আপনার বিদ্যাবুদ্ধির এই সর্দ্দার পোড়োটিকে বিদেশী বেশভূষা আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিতে দেখিলেই বিমুখ না হইয়া থাকিতে পারে না; জাপান নিজের এই অদ্ভুত রুচিকে, এই হাস্যজনক অসঙ্গতি সম্বন্ধে নিজে একেবারেই অন্ধ; কিন্তু য়ুরোপ এই ছদ্মবেশী আসিয়াবাসীকে দেখিয়া বিপুল শ্রদ্ধাসত্ত্বেও না হাসিয়া থাকিতে পারে না।

আর আমরা কি য়ুরোপের সহিত অন্য সমস্ত বিষয়েই এতটা দূর একাত্ম হইয়া গিয়াছি যে, বাহ্য অনৈক্য বিলোপ করিয়া দিলে অসঙ্গতি নামক গুরুতর রুচিদোষ ঘটিবে না?

এই ত গেল একটা কথা। দ্বিতীয় কথা এই যে, এই [redacted] লাভ চুলায় যাক্, মূলধনেরই ক্ষতি হয়। ইংরাজের সহিত অনৈক্য ত আছেই আবার স্বদেশীয়ের সহিত অনৈক্যের সূচনা হয়। আমি যদি আজ ইংরাজের মত হইয়া ইংরাজের নিকট মান কাড়িতে যাই তবে আমার যে ভ্রাতারা ইংরাজের মত সাজে নাই তাহাদিগকে আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দিতে স্বভাবতই কিছু সঙ্কোচ বোধ হয়ই। তাহাদের জন্য লজ্জা অনুভব না করিয়া থাকিবার যো নাই। আমি যে নিজগুণে ঐ সকল মানুষের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র জাতিভুক্ত হইয়াছি এইরূপ পরিচয় দিতে প্রবৃত্তি হয়।

ইহার অর্থই এই—জাতীয় সম্মান বিক্রয় করিয়া আত্মসম্মান ক্রয় করা। ইংরাজের কাছে এরকম করিয়া বলা, যে, সাহেব, ঐ বর্ব্বরদের প্রতি যেমন ব্যবহারই কর আমি যখন কতকটা তোমাদের মত চেহারা করিয়া আসিয়াছি তখন মনে বড় আশা আছে, যে, আমাকে তুমি দূর করিয়া দিবে না।

মনে করা যাক্ যে, এইরূপ কাঙালবৃত্তি করিয়া কিছু প্রসাদ

পাওয়া যায় কিন্তু ইহাতেই কি আপনার কিম্বা স্বজাতির সম্মান রক্ষা করা হয় ?

কর্ণ যখন অশ্বত্থামাকে বলেন, যে, তুমি ব্রাহ্মণ, তোমার সহিত কি যুদ্ধ করিব, তখন অশ্বত্থামা বলিয়াছিলেন আমি ব্রাহ্মণ সেই জন্যই তুমি আমার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে না ! আচ্ছা, তবে আমার এই পৈতা ছিঁড়িয়া ফেলিলাম।

সাহেব যদি সেক্‌হ্যাণ্ড্ পূর্ব্বক বলে এবং এক্কোরার যোজনা পূর্ব্বক দেখে, যে, আচ্ছা, তুমি যখন তোমার জাতীয়ত্ব যথা-সম্ভব ঢাকিয়া আসিয়াছ তখন এবারকার মত তোমাকে আমাদের ক্লাবের সভ্য করা গেল, আমাদের হোটেলে স্থান দেওয়া গেল, এমন কি, তুমি দেখা করিলে এক আধবার তোমার "কল্ রিটার্ণ" করা যাইতেও পারে—তবে কি তৎক্ষণাৎ আপনাকে পরম সম্মানিত জ্ঞান করিয়া পুলকিত হইয়া উঠিব, না বলিব—ইহারই জন্য আমার সম্মান ! তবে এ ছদ্মবেশ আমি ছিঁড়িয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম ! যতক্ষণে না আমার সমস্ত স্বজাতিকে আমি যথার্থ সম্মানযোগ্য করিতে পারিব ততক্ষণ আমি রঙ মাখিয়া এক্সেপ্‌শন্ সাজিয়া তোমাদের দ্বারে পদার্পণ করিব না।

আমি ত বলি সেই আমাদের একমাত্র ব্রত। সম্মান বঞ্চনা করিয়া লইব না সম্মান আকর্ষণ করিব। নিজের মধ্যে সম্মান অনুভব করিব। সে দিন যখন আসিবে তখন পৃথিবীর যে সভার ইচ্ছা প্রবেশ করিব—ছদ্মবেশ, ছদ্মনাম, ছদ্মব্যবহার এবং যাচিয়া মান কাঁদিয়া সোহাগের কোন প্রয়োজন থাকিবে না।

উপায়টা সহজ নহে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি সহজ উপায়ে কোন্ দুঃসাধ্য কাজ হইয়াছে ! বড় কঠিন কাজ সেই জন্য অন্য সমস্ত ফেলিয়া তাহারই প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিতে হইবে।

দেহ সভ্যতার জ্বলন্ত চিতায় সমর্পণ করিয়া লোকান্তর ও রূপান্তর প্রাপ্তি হওয়াই সদ্গতি।

আমাদের মধ্যে সাধারণের সম্মানভাজন এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন তাঁহারা বর্ত্তমান সমস্যার সহজ একটা মীমাংসা করিতে চান। তাঁহাদের ভাবখানা এইঃ—

ইংরাজের সহিত আমাদের অনেকগুলি বাহ্য অমিল আছে; সেই বাহ্য অমিলই সর্ব্বপ্রথম চক্ষে আঘাত করে এবং তাহা হইতেই বিজাতীয় বিদ্বেষের সূত্রপাত হইয়া থাকে। অতএব সেই বাহ্য অনৈক্যটা যথাসম্ভব দূর করা আবশ্যক। যে সমস্ত আচার ব্যবহার এবং দৃশ্য চিরাভ্যাসক্রমে ইংরাজের সহজে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে সেইগুলি দেশে প্রবর্ত্তন করা দেশের পক্ষে হিতজনক। বসনভূষণ ভাবভঙ্গী, এমন কি, ভাষাটা পর্য্যন্ত ইংরাজি হইয়া গেলে দুই জাতির মধ্যে মিলনসাধনের একটি প্রধান অন্তরায় চলিয়া যায় এবং আমাদের আত্মসম্মান রক্ষার একটি সহজ উপায় অবলম্বন করা হয়।

আমার বিবেচনায় একথা সম্পূর্ণ শ্রদ্ধেয় নহে। বাহ্য অনৈক্য লোপ করিয়া দেওয়ার একটি মহৎ বিপদ এই যে, অনভিজ্ঞ দর্শকের মনে একটি মিথ্যা আশার সঞ্চার করিয়া দেওয়া হয় এবং সেই আশাটি রক্ষা করিবার জন্য অলক্ষিতভাবে মিথ্যার শরণাপন্ন হইতে হয়। ইংরাজদিগকে জানাইয়া দেওয়া হয় আমরা তোমাদেরই মত, এবং যেখানে অন্যমত কিছু বাহির হইয়া পড়ে সেখানে তাড়াতাড়ি যেনতেন প্রকারে চাপাচুপি দিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করে। আডাম্ এবং ঈভ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইবার পূর্ব্বে যে সহজ বেশে ভ্রমণ করিতেন তাহা অতি শোভন ও পবিত্র কিন্তু জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইবার পরে যে পর্য্যন্ত না পৃথিবীতে দর্জ্জির

দোকান বসিয়াছিল সে পর্য্যন্ত তাহাদের বেশভূষা অশ্লীলতা-নিবারিণী সভার নিন্দার্হ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। আমাদেরও নব-আবরণে লজ্জা নিবারণ না করিয়া লজ্জা বৃদ্ধি করিবারই সম্ভব। কারণ, সমস্ত দেশটাকে ঢাকিবার মত দর্জ্জির এষ্টাব্লিশমেণ্ট এখনো খোলা হয় নাই। ঢাকিতে গিয়া ঢাকা পড়িবে না এবং তাহার মত বিড়ম্বনা আর কিছুই নাই। যাঁহারা লোভে পড়িয়া সভ্যতা-বৃক্ষের এই ফলটি খাইয়া বসিয়াছেন তাঁহাদিগকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকিতে হয়। পাছে ইংরাজ দেখিতে পায় আমরা হাতে করিয়া খাই, পাছে ইংরাজ জানিতে পায় আমরা আসনে চৌকা হইয়া বসি, এজন্য কেবলি তাঁহাদিগকে পর্দা টানিয়া বেড়াইতে হয়। এটিকেট্ শাস্ত্রে একটু ত্রুটি হওয়া, ইংরাজি ভাষায় স্বল্প স্খলন হওয়া তাঁহারা পাতকস্বরূপে গণ্য করেন এবং স্বসম্প্রদায়ের পরস্পরের মধ্যে সাহেবি আদর্শের ন্যূনতা দেখিলে লজ্জা ও অবজ্ঞা অনুভব করিয়া থাকেন। ভাবিয়া দেখিলে অনাবরণ অপেক্ষা এই অসম্পূর্ণ আবরণে, এই আবরণের নিষ্ফল চেষ্টাতেই প্রকৃত অশ্লীলতা—ইহাতেই যথার্থ আত্মাবমাননা।

কতকটা পরিমাণে ইংরাজি ছদ্মবেশ ধারণ করিলে বৈসাদৃশ্যটা আরো বেশি জাজ্বল্যমান হইয়া উঠে। তাহার ফলটা বেশ সুশোভন হয় না। সুতরাং রুচিতে দ্বিগুণ আঘাত দেয়। ইংরাজের মনটা অভ্যাসকুহকে নিকটে আকৃষ্ট হওয়াতেই আপনাকে অন্যায় প্রতারিত জ্ঞান করিয়া দ্বিগুণ বেগে [illegible]।

নব্য জাপান য়ুরোপীয় সভ্যতায় রীতিমত দীক্ষিত হইয়াছে। তাহার শিক্ষা কেবল বাহ্যশিক্ষা নহে। [illegible] শাসন-প্রণালী বিদ্যাবিস্তার সমস্ত সে নিজের [illegible] চালাইতেছে। তাহার পটুতা দেখিয়া য়ুরোপ বিস্মিত হয় এবং কোথাও কোন

তাহাকে কেবলমাত্র নাসাগ্রভাগে নিবিষ্ট করিয়া রাখিলাম। তোমরা কাছারি কর, আপিস কর, দোকান কর, নাচ, খেল, মার ধর, হুটোপাটি কর এবং সিমলার শৈলশিখরে বিলাসের স্বর্গপুরী নির্ম্মাণ করিয়া সভ্যতাযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়া থাক।

দরিদ্র বঞ্চিত মানব আপনাকে এইরূপে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে। যে শ্রেষ্ঠতার সহিত প্রেম নাই সে শ্রেষ্ঠতা সে কিছুতেই বহন করিতে সম্মত হয় না। কারণ, তাহার অন্তরে একটি সহজ জ্ঞান আছে তদ্দ্বারা সে জানে, যে, এইরূপ শুষ্ক শ্রেষ্ঠতা মাথা হইয়া বহন করিতে হইলে ক্রমশঃ ভারবাহী মূঢ় পশুর সমতুল্য হইয়া যাইতে হইবে।

কিন্তু কে বলিতে পারে এই মানসিক বিদ্রোহই বিধাতার অভিপ্রেত নহে! তিনি ক্ষুদ্র পৃথিবীকে যেরূপ প্রচণ্ড সূর্য্যের প্রবল আকর্ষণ হইতে রক্ষা করিতেছেন, তাহার অন্তরে একটি প্রতিকূল শক্তি নিহিত করিয়া দিয়াছেন, সেই শক্তির বলে সে সূর্য্যের আলোক উত্তাপ ভোগ করিয়াও আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে এবং সূর্য্যের ন্যায় প্রতাপশালী হইবার চেষ্টা না করিয়া আপনার অন্তর্নিহিত স্নেহশক্তি দ্বারা শ্যামলা শস্যশালিনী কোমলা মাতৃরূপিণী হইয়া উঠিয়াছে, বিধাতা বোধ করি সেইরূপ আমাদিগকেও ইংরাজের বৃহৎ আকর্ষণের কবল হইতে রক্ষা করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন। বোধ করি তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, আমরা ইংরাজি সভ্যতার জ্ঞানালোকে নিজের স্বাতন্ত্র্যকেই সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিব।

তাহার লক্ষণও দেখা যায়। ইংরাজের সহিত সংঘর্ষ আমাদের অন্তরে যে একটি উত্তাপ সঞ্চার করিয়া দিয়াছে তদ্দ্বারা আমাদের মুমূর্ষ জীবনী শক্তি পুনরায় সচেতন হইয়া উঠিতেছে। আমা-

দের অন্তরের মধ্যে আমাদের যে সমস্ত বিশেষ ক্ষমতা অন্ধ ও জড়বৎ হইয়া অবস্থান করিতেছিল তাহারা নূতন আলোকে পুনরায় আপনাকে চিনিতে পারিতেছে। স্বাধীন যুক্তি তর্ক বিচারে আমাদের মানসভূমি আমাদের নিকট নবাবিষ্কৃত হইতেছে। দীর্ঘ প্রলয়-রাত্রির অবসানে অরুণোদয়ে, যেন আমরা আমাদেরই দেশ আবিষ্কার করিতে বাহির হইয়াছি। স্মৃতিশ্রুতি কাব্য পুরাণ ইতিহাস দর্শনের প্রাচীন গহন অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি —পুরাতন গুপ্তধনকে নূতন করিয়া লাভ করিবার ইচ্ছা। আমাদের মনে যে একটা ধিক্কারের প্রতিঘাত উপস্থিত হইয়াছে তাহাতেই আমাদিগকে আমাদের নিজের দিকে পুনরায় সবলে নিক্ষেপ করিয়াছে। প্রথম আক্ষেপে আমরা কিছু অন্ধভাবে আমাদের মাটি ধরিয়া পড়িয়াছি—আশা করা যায়, একদিন স্থিরভাবে অক্ষুব্ধচিত্তে ভালমন্দ বিচারের সময় আসিবে এবং এই প্রতিঘাত হইতে যথার্থ গভীর শিক্ষা এবং স্থায়ী উন্নতি লাভ করিতে পারিব।

একপ্রকারের কালী আছে যাহা কাগজের গায়ে কালক্রমে অদৃশ্য হইয়া যায় অবশেষে অগ্নির কাছে কাগজ ধরিলে পুনর্ব্বার রেখায় রেখায় ফুটিয়া উঠে। পৃথিবীর অধিকাংশ সভ্যতা সেই কালীতে লেখা; কালক্রমে লুপ্ত হইয়া যায় আবার শুভ দৈবক্রমে নব সভ্যতার সংস্রবে নবজীবনের উত্তাপে তাহা পুনরায় ফুটিয়া উঠা অসম্ভব বোধ হয় না। আমরা ত সেইরূপ আশা করিয়া আছি। এবং সেই বিপুল আশায় উৎসাহিত হইয়া আমাদের সমুদয় প্রাচীন পুঁথিপত্রগুলি সেই উত্তাপের কাছে আনিয়া ধরিতেছি,—যদি পূর্ব্ব অক্ষর ফুটিয়া উঠে তবেই পৃথিবীতে আমাদের গৌরব রক্ষিত হইতে পারে—নচেৎ বৃদ্ধ ভারতের জরাজীর্ণ

কেবল সেই অগ্নিতেই আহুতি দিবেন? এখনো কি নম্রতা শিক্ষা ও প্রেমচর্চ্চার সময় হয় নাই? সৌভাগ্যের উন্নততম শিখরে অধিরোহণ করিয়া এখনো কি ইংরাজ কবি কেবল আত্মঘোষণা করিবেন? কবির এখন এই কথা স্বজাতিকে শোনানো উচিত—যে, তোমরা বলের দ্বারা জয় করিয়াছ এখন প্রেমের দ্বারা রক্ষা করিতে হইবে।

কিন্তু আমাদের মত অবস্থাপন্ন লোকের মুখে এ সকল কথা তেমন শোভন হয় না, সেইজন্য বলিতেও লজ্জা বোধ হয়। দায়ে পড়িয়া প্রেম ভিক্ষা করার মত দীনতা আর কিছু নাই; এবং এ সম্বন্ধে দুই এক কথা আমাদিগকে মাঝে মাঝে শুনিতেও হয়।

মনে পড়িতেছে কিছুদিন হইল ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের এক পত্রের উত্তরে লণ্ডনের স্পেক্টেটর পত্র বলিয়াছিলেন নব্য বাঙ্গালীদের অনেকগুলা ভাল লক্ষণ আছে কিন্তু একটা দোষ দেখিতেছি সিম্প্যাথি-লালসাটা তাহাদের বড় বেশি হইয়াছে।

এ দোষ স্বীকার করিতে হয় এবং এতক্ষণ আমি যে ভাবে কথাগুলা বলিয়া আসিতেছি তাহাতে এ দোষ হাতে হাতে প্রমাণ হয়। ইংরাজের কাছ হইতে আদর পাইবার ইচ্ছাটা আমাদের কিছু অস্বাভাবিক পরিমাণে বাড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার কারণ, আমরা স্পেক্টেটরের ন্যায় স্বাভাবিক অবস্থায় নাই। আমরা যখন "তৃষার্ত্ত হইয়া চাহি এক ঘটি জল" আমাদের রাজা তখন "তাড়াতাড়ি এনে দেয় আধখানা বেল!" আধখানা বেল সময় বিশেষে অত্যন্ত উপাদেয় হইতে পারে কিন্তু তাহাতে ক্ষুধা-তৃষ্ণা দুই এক সঙ্গে দূর হয় না। ইংরাজের সুনিয়মিত সুবি-

ভারিত গবর্মেণ্ট অত্যন্ত উত্তম এবং উহাদের কিন্তু তাহাতে প্রজার হৃদয়ের তৃষ্ণা মোচন না হইতেও পারে, এমন কি, গুরুপাক প্রচুর ভোজনের ন্যায় তদ্দ্বারা তৃষ্ণা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিতেও আটক নাই। স্পেক্টেটর দেশ দেশান্তরের সকলপ্রকার ভোজ্য এবং সকল প্রকার পানীয় অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহরণ করিয়া পরিপূর্ণ ডিনারের মাঝখানে বসিয়া কিছুতেই ভাবিয়া পায় না তাঁহাদের বাতায়নের বহিঃস্থিত পথপ্রান্তবর্ত্তী ঐ বিদেশী বাঙালীটির এমন বুভুক্ষু কাঙালের মত ভাবখানা কেন।

কিন্তু স্পেক্টেটর শুনিয়া হয় ত সুখী হইবেন অতি দুষ্প্রাপ্য তাঁহাদের সেই সিম্প্যাথির আঙুর ক্রমে আমাদের নিকটও টক হইয়া আসিয়াছে। আমরা অনেকক্ষণ ঊর্দ্ধে লোলুপ দৃষ্টিপাত করিয়া অবশেষে ধীরে ধীরে ঘরে ফিরিবার উপক্রম করিতেছি। আমাদের এই চির-উপবাসী ক্ষুব্ধিত স্বভাবের মধ্যেও যেটুকু মনুষ্যত্ব অবশিষ্ট ছিল তাহা ক্রমে বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে!

আমরা বলিতে আরম্ভ করিয়াছি—তোমরা কত কি শ্রেষ্ঠ; তোমরা না হয় কল চালাইতে এবং কামান পাতিতে শিখিয়াছ কিন্তু মানবের প্রকৃত সভ্যতা আধ্যাত্মিক সভ্যতা, সেই সভ্যতায় আমরা তোমাদের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ [illegible] বিদ্যার কথ হইতে আমরা তোমাদি[illegible] তোমরা যে আমাদিগকে স্বল্পসভ্য [illegible] তোমাদের অন্ধ মূঢ়তাবশতঃ, [illegible] শক্তিও তোমাদের নাই। [illegible] ধ্যানে বসিব। আজ হইতে [illegible] চপল সভ্যতার বাল্যলীলা হইতে [illegible]

প্রেমের দ্বারা যাহা হইতে পারে তাহার কোন ত্রুটি হয় নাই কিন্তু এখনো এ মন্দিরে সকল দেবতার অধিদেবতা প্রেমের প্রতিষ্ঠা হয় নাই।

প্রেম পদার্থটি ভাবাত্মক, অভাবাত্মক নহে। আকবর সকল ধর্ম্মের বিরোধভঞ্জন করিয়া যে একটি প্রেমের ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা ভাবাত্মক। তিনি নিজের হৃদয় মধ্যে একটি ঐক্যের আদর্শ লাভ করিয়াছিলেন, তিনি উদার হৃদয় লইয়া শ্রদ্ধার সহিত সকল ধর্ম্মের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন; তিনি একাগ্রতার সহিত নিষ্ঠার সহিত হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান পার্সী ধর্ম্মজ্ঞদিগের ধর্ম্মালোচনা শ্রবণ করিতেন ও তিনি হিন্দু রমণীকে অন্তঃপুরে, হিন্দু অমাত্যদিগকে মন্ত্রীসভায়, হিন্দুবীরগণকে সেনানায়কতায় প্রধান আসন দিয়াছিলেন। তিনি কেবল রাজনীতির দ্বারায় নহে প্রেমের দ্বারা সমস্ত ভারতবর্ষকে, রাজা ও প্রজাকে এক করিতে চাহিয়াছিলেন। সূর্য্যাস্তভূমি হইতে বিদেশী আসিয়া আমাদের ধর্ম্মে কোন হস্তক্ষেপ করে না,—কিন্তু সেই নির্লিপ্ততা প্রেম, না রাজনীতি? উভয়ের মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ।

কিন্তু এক জন মহদাশয় ক্ষণজন্মা পুরুষ যে অত্যুচ্চ আদর্শ লাভ করিয়াছিলেন একটি সমগ্র জাতির নিকট তাহা প্রত্যাশা করা যায় না। সেইজন্য কবির স্বপ্ন কবে সত্য হইবে বলা কঠিন। বলা আরো কঠিন এই জন্য, যে, দেখিতে পাইতেছি, রাজা প্রজার মধ্যে যে চলাচলের পথ ছিল উভয় পক্ষে কাঁটাগাছের বেড়া দিয়া প্রতিদিন সে পথ মারিয়া লইতেছেন। নব নব বিদ্বেষ মিলনক্ষেত্রকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে।

রাজ্যের মধ্যে এই প্রেমের কথা আমরা আজকাল এত

অধিক করিয়া অনুভব করি যে, লোকের মনে ভিতরে ভিতরে একটা আশঙ্কা এবং অশান্তি আন্দোলিত হইতেছে। তাহার একটা দৃষ্টান্ত দেখা যায়, যে, আজকাল হিন্দু মুসলমানের বিরোধ উত্তরোত্তর যে নিদারুণতর হইয়া উঠিতেছে আমরা আপনাদের মধ্যে তাহা লইয়া কিরূপ বলা কহা করি? আমরা কি গোপনে বলি না যে, এই উৎপাতের প্রধান কারণ, ইংরাজেরা এই বিরোধ নিবারণের জন্য যথার্থ চেষ্টা করে না বলিয়া। তাহাদের রাজ্য-নীতির মধ্যে প্রেমনীতির স্থান নাই। ভারতবর্ষের দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহারা প্রেমের অপেক্ষা ঈর্ষা বেশি করিয়া বপন করিয়াছে। ইচ্ছা পূর্ব্বক করিয়াছে এমন নাও হইতে পারে—কিন্তু আকবর যে একটি প্রেমের আদর্শে খণ্ড ভারতবর্ষকে এক করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ইংরাজের পলিসির মধ্যে সেই আদর্শটি নাই বলিয়াই এই দুই জাতির স্বাভাবিক বিরোধ হ্রাস না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবার উপক্রম দেখা যাইতেছে। কেবল আইনের দ্বারা শাসনের দ্বারা এক করা যায় না—অন্তরে প্রবেশ করিতে হয়, বেদনা বুঝিতে হয়, যথার্থ ভালবাসিতে হয়—আপনি কাছে আসিয়া হাতে হাতে ধরিয়া মিলন করাইয়া দিতে হয়। কেবল পুলিস্ মোতাইন্ করিয়া এবং হাতকড়ি দিয়া শান্তি স্থাপন করায় দুর্দ্ধর্ষ বলের পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু সেটা ঠিক আকবরের স্বপ্নের মধ্যে ছিল না এবং সূর্য্যাস্ত-ভূমির কবিগণ অলীক অহঙ্কার না করিয়া যদি বিনীত প্রেমের সহিত সুগভীর আক্ষেপের সহিত স্বজাতিকে লাঞ্ছনা করিয়া প্রেমের সেই উচ্চ আদর্শ শিক্ষা দেন তবে তাঁহাদের স্বজাতিরও উন্নতি হয় এবং এই আশ্রিতবর্গেরও উপকার হয়। ইংরাজের আত্মাভিমান সভ্যতাগর্ব্ব জাত্যহঙ্কার কি যথেষ্ট নাই, কবি কি

তবু সে মিষ্ট কথা বলিবে না, তবু মুখ ভার করিয়া থাকিবে, তবু তোমার বাপের বাড়ীর নিন্দা করিবে। ধৈর্য্য ধরিয়া সহ্য কর; ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, তোমার অটল সহিষ্ণুতা তোমার অবিচলিত নম্রভাগুণে তোমার উদ্ধত স্বামী যেন একদিন বশ হয়! আজকাল তুমি লজ্জার মাথা খাইয়া মান অভিমান করিতে আরম্ভ করিয়াছ, ঝঙ্কার সহকারে দু কথা পাঁচ কথা শুনাইয়া দিতেছ সেটা তোমার মত দুর্ভাগিনী নারীকে শোভা পায় না! কাজ নাই বকাবকি করিয়া; যাহাতে তোমার বিদেশী স্বামী সন্তোষে থাকে আরামে থাকে একমনে তাহাই সাধন কর; তোমার হাতের লোহা অক্ষয় হউক্!

আর, হে পরদেশী, তোমাকেও বলি, বাপু, বিধাতা তোমার হাতে যে অধীনাকে সমর্পণ করিয়াছেন যতক্ষণ তাহাকে ভাল না বাসিবে ততক্ষণ তোমার কোন কর্ত্তব্যই সম্পূর্ণ হইবে না। রাস্তাঘাট কলবল এবং সহরের নালা নর্দ্দমার মধ্যে কিছু কিছু অসম্পূর্ণতা থাকিলেও চলে কিন্তু প্রেমটা তোমাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।

এখানে আমি পলিসির কথা বলিব না। ইংরাজদের মধ্যে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, Honesty is the best policy কিন্তু অনেষ্টিকে সে ভাবে দেখিলে তাহাকে ডিজনেষ্টির নিকটে আত্মীয় করিয়া তোলা হয়। সেইরূপ প্রেমকে যদি পলিসির নামিল করা যায়, যদি ষ্ট্যাটিষ্টিক্সের দ্বারা তাহার আপেক্ষিক উপযোগিতা প্রমাণ করিতে হয় তবে প্রেম আর থাকে না।

সেইজন্য ইংলণ্ডের কবি-দরবারে আমাদের প্রার্থনা যে, তাঁহারা যখন মানুষের সহিত মানুষের মিলন-সঙ্গীত গান করিয়া থাকেন, যখন পৃথিবীর সমস্ত দেশকে মুগ্ধ মৃগের ন্যায় একই হৃদয়পাশে বাঁধিবার জন্য মধুময়ী রাগিণীতে বংশী বাজাইতে

থাকেন তখন যেন একবার স্মরণ করিয়া এই সুদূর দরিদ্র কুটুম্ব—ভারতবর্ষের নামটা কোন একটা ছন্দে কোন জায়গায় রক্ষা করা হয়। কবিভ্রাতারা নিশ্চয় জানিবেন এই নিরাশ্রয় অতিথিকে তাঁহাদের সঙ্গীতের অমরাবতীতে স্থান দিলে যে পুণ্য এবং যে সুগভীর কৃতজ্ঞতা লাভ করিবেন এমন আর কিছুতে না। তাঁহাদের সৈনিকেরা যেখানে দেশ বিস্তার করিবে তাঁহাদের বণিকেরা সেখানে বাণিজ্য বিস্তার করিবে এবং তাঁহারা সেখানে হৃদয় বিস্তার করিবেন—এ তাঁহাদের কর্ত্তব্য। পৃথিবীতে স্বার্থ যেখানে কেবল ক্ষুধা প্রসারিত করিতেছে সহৃদয়তাকে সেখানে সুধা প্রবাহিত করিতে হইবে।

ইংরাজ রাজকবি টেনিসন্ মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার সর্ব্বশেষ গ্রন্থে সৌভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষকে কিঞ্চিৎ স্মরণ করিয়াছেন।

কবিবর উক্ত গ্রন্থে আকবরের স্বপ্ন নামক একটি কবিতা প্রকাশ করিয়াছেন। আকবর তাঁহার প্রিয় সুহৃৎ আবুল্‌ফজ্‌লের নিকট রাত্রের স্বপ্নবর্ণন উপলক্ষে তাঁহার ধর্ম্মের আদর্শ ও জীবনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিতেছেন। তিনি ভারতবর্ষের ভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে যে ঐক্য এবং ভিন্ন জাতির মধ্যে যে প্রেম ও শান্তি স্থাপনার চেষ্টা করিয়াছেন, স্বপ্নে দেখিয়াছেন তাঁহার পরবর্ত্তীগণ সে চেষ্টা বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছে এবং অবশেষে সূর্য্যাস্তের দিক হইতে এক দল বিদেশী আসিয়া তাঁহার সেই ভূমিসাৎ মন্দিরকে, একটি একটি প্রস্তর গাঁথিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছে এবং সেই মন্দিরে সত্য এবং শান্তি, প্রেম এবং ন্যায়পরতা পুনরায় আপন সিংহাসন স্থাপন করিয়াছে।

কবির এই স্বপ্ন সফল হউক্ প্রার্থনা করি। আজ পর্য্যন্ত এই মন্দিরের প্রস্তরগুলি গ্রথিত হইয়াছে; বল, পরিহস ও নৈপু-

আজকাল প্রায়ই দেখা যায়। ইংলণ্ডের জনসংখ্যা প্রতিবৎসর বৃদ্ধি হইয়া ক্রমশঃ কি পরিমাণে খাদ্যাভাব হইতেছে এবং ভারতবর্ষ তাহা কি পরিমাণে পূরণ করিতেছে এবং বিলাতি মালের আমদানি করিয়া বিলাতের বহুসংখ্যক শ্রমজীবীর হাতে কাজ দিয়া তাহাদের কিরূপে জীবনোপায় করিয়া দিতেছে তাহার তালিকা বাহির হইতেছে।

ইংলণ্ড উত্তরোত্তর ভারতবর্ষকে তাঁহাদেরই রাজগোষ্ঠের চিরপালিত গরুটির মত দেখিতেছেন। গোয়াল পরিষ্কার রাখিতে এবং খোল বিচালি যোগাইতে কোন আলস্য নাই, এই অস্থাবর সম্পত্তিটি যাহাতে রক্ষা হয় সে পক্ষে তাঁহাদের যত্ন আছে, যদি কখন দৌরাত্ম্য করে সে জন্য শিং দুটা ঘসিয়া দিতে ঔদাসীন্য নাই এবং দুই বেলা দুগ্ধ দোহন করিয়া লইবার সময় কৃশকায় বৎসগুলাকেও একেবারে বঞ্চিত করে না। কিন্তু তবু স্বার্থের সম্পর্কটাকেই উত্তরোত্তর জাজ্বল্যমান করিয়া তোলা হইতেছে। এই সকল প্রবন্ধে প্রায় একই সময় ভারতবর্ষের সহিত ইংরাজী উপনিবেশগুলিরও প্রসঙ্গ অবতারণা করা থাকে। কিন্তু সুরের কত প্রভেদ! তাহাদের প্রতি কত প্রেম, কত সৌহার্দ্য! কত বারম্বার করিয়া বলা হয় যে, যদিও মাতৃভূমি হইতে তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে তথাপি এখনো মাতার প্রতি তাহাদের অচলা ভক্তি আছে, তাহারা নাড়ির টান ভুলিতে পারে নাই—অর্থাৎ সে স্থলে স্বার্থের সঙ্গে প্রেমের কথারও উল্লেখ করা আবশ্যক হয়। আর হতভাগ্য ভারতবর্ষেরও কোথাও একটা হৃদয় আছে এবং সেই হৃদয়ের সঙ্গে কোথাও একটু যোগ থাকা আবশ্যক সে কথার কোন আভাস মাত্র থাকে না। ভারতবর্ষ কেবল হিসাবের খাতায় শ্রেণীবদ্ধ অঙ্কপাতের দ্বারায় নির্দ্দিষ্ট। ইংল

প্র্যাক্‌টিক্যাল লোকের কাছে ভারতবর্ষের কেবল মন-দরে সের-দরে, টাকার দরে শিকার দরে গৌরব। সংবাদপত্র এবং মাসিক-পত্রের লেখকগণ ইংলণ্ডকে কি কেবল এই শুষ্ক পাঠই অভ্যাস করাইবেন? ভারতবর্ষের সহিত যদি কেবল তাহার স্বার্থের সম্পর্কই দৃঢ় হয় তবে যে শ্যামাঙ্গিনী গাভীটি আজ দুধ দিতেছে কালে গোপকুলের অযথা বংশবৃদ্ধি ও ক্ষুধাবৃদ্ধি হইলে তাহার ল্যাজটুকু এবং ক্ষুরটুকু পর্য্যন্ত তিরোহিত হইবার সম্ভাবনা। এই স্বার্থের চক্ষে দেখা হয় বলিয়াই ত ল্যাঙ্কাশিয়র নিরুপায় ভারতবর্ষের ভাঁতের উপর মাশুল বসাইয়াছে আর নিজের মাল বিনা মাশুলে চালান করিতেছে।

আমাদের দেশটাও যে তেমনি! যেমন রৌদ্র তেমনি ধূলা! কেবলি পাখার বাতাস এবং বরফ জল না খাইলে সাহেব বাঁচে না! আবার দুর্ভাগ্যক্রমে পাখার কুলিটিও রুগ্ন প্লীহা লইয়া ঘুমাইয়া পড়ে এবং বরফও সর্ব্বত্র সুলভ নহে। ভারতবর্ষ ইংরাজের পক্ষে রোগশোক স্বজনবিচ্ছেদ এবং নির্ব্বাসনের দেশ, সুতরাং খুব মোটা মাহিনায় সেটা পোষাইয়া লইতে হয়। আবার পোড়া এক্সচেঞ্জ তাহাতেও বাদ সাধিতে চাহে। স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া ভারতবর্ষ ইংরাজকে কি দিতে পারে!

হায় হতভাগিনী ইণ্ডিয়া, তোমাকে তোমার স্বামীর পছন্দ হইল না; তুমি তাহাকে প্রেমের বন্ধনে বাঁধিতে পারিলে না! এখন দেখ, যাহাতে তাহার সেবার ত্রুটি না হয়! তাহাকে অশ্রান্ত যত্নে বাতাস কর ঠাণ্ডা কর; খস্‌খসের পর্দ্দা টাঙ্গাইয়া জল সেচন কর, যাহাতে দুই দণ্ড তোমার ঘরে সে সুস্থির হইয়া বসিতে পারে। খোল, তোমার সিন্দুকটা খোল, তোমার গহনাগুলো বিক্রয় কর, উদর পূর্ণ করিয়া আহার এবং পকেট পূর্ণ করিয়া দক্ষিণা দাও।

চিন্তা ও দুঃখ অনুভব করেন। তবু যাহা অসম্ভব যাহা অসাধ্য তাহা লইয়া বিলাপ করিয়া ফল কি ?

কিন্তু বৃহৎ কার্য্য মহৎ অনুষ্ঠান কবে সহজ সুসাধ্য হইয়াছে ? এই ভারতজয় ভারতশাসনকার্য্যে ইংরাজের যে সকল গুণের আবশ্যক হইয়াছে সে গুলি কি সুলভ গুণ ? সে সাহস, সে অদম্য অধ্যবসায়, সে ত্যাগস্বীকার কি স্বল্প সাধনার ধন ? আর পঞ্চবিংশতি কোটি বিদেশীয় প্রজার হৃদয় জয় করিবার জন্য যে দুর্লভ সহৃদয়তা গুণের আবশ্যক তাহা কি সাধনার যোগ্য নহে ?

অনেকে বলিবেন এ সমস্ত কেবল ভাবের কথা আসিয়া পড়িল—ইংরাজের কাছে কাজের কথা না বলিলে তাহারা কর্ণপাত করে না বরং মনে মনে হাসে। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। দেশের সাধারণ লোক স্বার্থ অন্বেষণ করে কিন্তু ভাবুক লোক ভাবের মর্য্যাদা বুঝেন। ইংলণ্ডে সেই ভাবুক লোকের অভাব নাই। ইংরাজ কবিগণ গ্রীস ইটালী হাঙ্গেরি পোলাণ্ডের দুঃখে অশ্রুমোচন করিয়াছেন, আমরা ততটা অশ্রুপাতের অধিকারী নহি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত মহাত্মা এড্‌বিন আর্ণল্‌ড্‌ ব্যতীত আর কোন ইংরাজ কবি কোন প্রসঙ্গ উপলক্ষে ভারতবর্ষের প্রতি প্রীতি ব্যক্ত করেন নাই। বরঞ্চ শুনিয়াছি নিঃসম্পর্ক ফ্রান্সের কোন কোন বড় কবি ভারতবর্ষীয় প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন। ইহাতে ইংরাজের যতটা অনাত্মীয়তা প্রকাশ পাইয়াছে এমন আর কিছুতেই নহে। যাহারা লাভক্ষতির গণনা লইয়া থাকে তাহারা স্বভাবতই আমাদিগকে স্বার্থের চক্ষে দেখিতে পারে কিন্তু যাঁহারা বিশুদ্ধ ভাবরাজ্যে বাস করেন তাঁহারাও যদি আমাদিগকে একেবারে একঘরে করিয়া রাখিয়া

দেন তবে ইংলণ্ডের এক সূচ্যগ্রভূমিতেও আমাদের স্থান নাই বলিতে হইবে।

ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষীয়দের লইয়া আজকাল ইংরাজি নভেল অনেকগুলি বাহির হইতেছে। শুনিতে পাই আধুনিক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান লেখক সম্প্রদায়ের মধ্যে রাড্‌ইয়ার্ড্ কিপ্লিং প্রতিভায় অগ্রগণ্য। তাঁহার ভারতবর্ষীয় গল্প লইয়া ইংরাজ পাঠকেরা অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার রচনা আমি পড়ি নাই; কিন্তু উক্ত গল্পগুলি পড়িয়া তাঁহার একজন অনুরক্ত ভক্ত ইংরাজ কবির মনে কিরূপ ধারণা হইয়াছে তাহা পড়িয়াছি। সমালোচনা উপলক্ষে এড্‌মণ্ড্ গস্ বলিতেছেন;—"এই সকল গল্প পড়িতে পড়িতে ভারতবর্ষীয় সেনানিবাসগুলিকে জনহীন বালুকাসমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী এক একটি দ্বীপের মত বোধ হয়! চারিদিকেই ভারতবর্ষের অপরিসীম মরুময়তা,—অখ্যাত, একঘেয়ে, প্রকাণ্ড,—সেখানে কেবল কালা আদমি, পারিয়া কুকুর, পাঠান এবং সবুজবর্ণ টিয়া পাখী, চিল এবং ফুটীয়, এবং লম্বা ঘাসের নির্জ্জনক্ষেত্র। এই মরু-সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী দ্বীপে কতকগুলি যুবাপুরুষ বিধুরা মহারাণীর কার্য্য করিতে এবং তাঁহার অধীনস্থ পূর্ব্বদেশীয় ধনসম্পদপূর্ণ বর্ব্বর সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে সুদূর ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত হইয়াছে।" ইংরাজের তুলিতে ভারতবর্ষের এই শুষ্ক শোভাহীন চিত্র অঙ্কিত দেখিয়া মন নৈরাশ্যে বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। আমাদের ভারতবর্ষ ত এমন নয়! আমাদের চোখে ত সে উর্ব্বরা, সুন্দরী সুকোমলা জননী লক্ষ্মীর মত প্রতিভাত হয়! কিন্তু হায়, ইংরাজের ভারতবর্ষ কি এত তফাৎ! যদি এতই তফাৎ হয় তবে নতশিরে আক্ষেপ করা ছাড়া আমাদের আর কি উপায় আছে!

পরন্তু ভারতবর্ষের সহিত স্বার্থসম্পর্কীয় সম্বন্ধ লইয়া প্রবন্ধ

প্রেমের সূত্রে ঈশ্বরের সহিত সে আপনার ঐক্য স্থাপন করে। যেখানে সে আপনার ঐক্যের পথ খুঁজিয়া না পায় সেখানে অন্য যত প্রকার সুবিধা থাক্‌ সে অতিশয় ক্লিষ্ট হইতে থাকে। মুসলমান রাজা অত্যাচারী ছিল কিন্তু তাহাদের সহিত আমাদের অনেক বিষয়ের সমকক্ষতার সাম্য ছিল। আমাদের দর্শন কাব্য আমাদের কলাবিদ্যা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি আমাদের মুসলমান রাজজাতীয়ের নিম্নবর্ত্তী ছিল না। রাজায় প্রজায় আদানপ্রদান ছিল। সুতরাং মুসলমান আমাদিগকে পীড়ন করিতে পারিত কিন্তু অসম্মান করা তাহার সাধ্য ছিল না। মনে মনে আমাদের আত্মসম্মানের কোন লাঘব ছিল না, কারণ বাহুবলের দ্বারা শ্রেষ্ঠতা কিছুতেই অভিভূত হইতে পারে না।

কিন্তু ইংরাজের বলবিদ্যাবুদ্ধিনৈপুণ্য কোন বিষয়েই আমরা তাহাদের সমকক্ষ নহি। আমরা সভ্যতার সমস্ত উপকরণ দেখি এবং বিস্মিত বিহ্বল হই—এ সমস্তই আমাদের ক্ষমতার অতীত বলিয়া মন হাল ছাড়িয়া দেয়—কথঞ্চিৎ সমানভাবে আদানপ্রদানের কথা মনেও হয় না।

এত একান্ত অনৈক্য হইলে মন আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারে না, নিতান্ত নির্ভরপরায়ণ হইয়া উঠে। আমরা ইংরাজের রেলগাড়ি কলকারখানা রাজ্যশৃঙ্খলা দেখি আর হাঁ করিয়া ভাবি ইহারা ময়দানবের বংশ—ইহারা এক জাতই স্বতন্ত্র, ইহাদের অসাধ্য কিছুই নহে—এই বলিয়া নিশ্চিন্ত মনে রেলগাড়িতে চড়ি, কলের নাম সত্যার্ণব দিই এবং মনে করি ইংরাজের মুলুকে আমাদের আর কিছু ভয় করিবার চিন্তা করিবার চেষ্টা করিবার নাই—কেবল, পূর্ব্বে ডাকাতে যাহা লইত এখন তাহা পুলিষ এবং উকীলে মিলিয়া অংশ করিয়া লয়।

এইরূপে মনের একভাগ যেরূপ নিশ্চিন্ত নিশ্চেষ্ট হয়, অপর ভাগে, এমন কি, মনের গভীরতর মূলে ভার বোধ হইতে থাকে। খাদ্যরস এবং পাকরস মিশিয়া তবে আহার পরিপাক হয়, ইংরাজের সভ্যতা আমাদের পক্ষে খাদ্যমাত্র কিন্তু আমাদের মন তদুপযুক্ত পাকরস নিজের মধ্য হইতে যোগাইতে পারিতেছে না। লইতেছি মাত্র কিন্তু পাইতেছি না। ইংরাজের সকল কার্য্যের ফলভোগ করিতেছি কিন্তু আমার করিতে পারিতেছি না, এবং করিবার আশাও নিরস্ত হইতেছে।

যেখানে কোন বিষয়েই সমকক্ষতা লাভ করা যাইতেছে না সেখানে হৃদয়লাভের জন্য লালসা আরো দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠে। সে স্থলে আমরা বলি—আমরা আত্মশক্তিতে যখন কিছুতে তোমাদের সমান হইতে পারি না তখন নিজগুণে আমাদিগকে কাছে টানিয়া লও। নতুবা আত্মপ্রসাদ আর থাকে না, নতুবা মনুষ্যত্বের গৌরবটুকু আর রক্ষা করিতে পারি না। যখন স্বভাবতই দূরে পড়িয়াছি তখন হৃদয়হীন অবজ্ঞাভরে তুমিও যদি দূরে রাখিতে চেষ্টা কর তবে সেই সুদূর উচ্চতা হইতে যত উপকার বর্ষণ করিবে ততই আমাদের গায়ে বাজিতে থাকিবে।

রাজ্য জয় করিয়া গৌরব এবং লাভ আছে, রাজ্য সুশাসন করিয়া ধর্ম্ম এবং অর্থ আছে, আর রাজাপ্রজার হৃদয়ের মিলন স্থাপন করিয়া কি কোন মাহাত্ম্য এবং কোন সুবিধা নাই? বর্ত্তমান কালের ভারত রাজনীতির সেই কি সর্ব্বাপেক্ষা চিন্তা এবং আলোচনার বিষয় নহে?

কেমন করিয়া হইবে তাহাই প্রশ্ন। একে একে ত দেখান গিয়াছে যে, রাজাপ্রজার মধ্যে দুর্ভেদ্য দুরূহ স্বাভাবিক বাধাসকল বর্ত্তমান। কোন কোন সহৃদয় ইংরাজও সে জন্য অনেক সময়

প্রাণ দিতে উদ্যত হইলে অনেকগুলি নিরুপায় নারী অনেকগুলি অসহায় শিশু ব্যাকুল বাহু উত্তোলন করিয়া আমাদের কল্পনা-চক্ষে উদিত হয়! ইহা আমাদের বহুযুগের অভ্যাস!

কিন্তু সে কথা ইংরাজের বুঝিবার নহে। ভাষায় একটিমাত্র কথা আছে, ভীরুতা। নিজের জন্য ভীরুতা ও পরের জন্য ভীরুতার প্রভেদ নির্ণয় করিয়া কোন কথার সৃষ্টি হয় নাই। সুতরাং ভীরু শব্দটা মনে উদয় হইবামাত্র তৎসম্বলিত দৃঢ়বদ্ধ-মূল অবজ্ঞাও মনে উদয় হইবে। আমরা বৃহৎ পরিবার ও বৃহৎ অপমান একত্রে মাথায় বহন করিতেছি।

তাহার পরে ভারতবর্ষের অধিকাংশ ইংরাজি খবরের কাগজ আমাদের প্রতিকূলপক্ষ অবলম্বন করিয়া আছে। চা রুটি এবং আণ্ডার সহিত আমাদের নিন্দাবাদ ভারতবর্ষীয় ইংরাজের ছোটা-হাজরির অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। ইংরাজি সাহিত্যে ও গল্পে, ভ্রমণ-বৃত্তান্তে, ইতিহাসে, ভূগোলে, রাজনৈতিক প্রবন্ধে এবং বিদ্রূপাত্মক কবিতায় ভারতবর্ষীয়ের বিশেষতঃ শিক্ষিত "বাবু"দের প্রতি ইংরাজের অরুচি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত করিয়া তুলিতেছে।

ভারতবর্ষীয়েরা আপন গরীবখানায় পড়িয়া পড়িয়া তাহার প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করে। কিন্তু আমরা কি প্রতিশোধ লইতে পারি! আমরা ইংরাজের কতটুকু ক্ষতি করিতে সক্ষম! আমরা রাগিতে পারি, কাঁদিতে পারি, ঘরে বসিয়া গাল পাড়িতে পারি, কিন্তু ইংরাজ যদি কেবলমাত্র দুইটি অঙ্গুলি দ্বারা আমাদের কোমল কর্ণমূলে কিঞ্চিৎ কঠিন মর্দ্দন প্রয়োগ করে তবে সেটা আমাদিগকে সহ্য করিতে হয়। এইরূপ মর্দ্দন করিবার ছোট বড় কত প্রকার অবসর যে তাহাদের আছে তাহা সদর মফস্বলের লোকের অবিদিত নাই। ইংরাজ আমাদের প্রতি মনে মনে

যতই বিমুখ বীতশ্রদ্ধ হইতে থাকিবে ততই আমাদের প্রকৃত স্বভাব বোঝা, আমাদের সুবিচার করা, আমাদের উপকার করা তাহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইবে। ভারতবর্ষীয়ের অবিশ্রাম নিন্দা ও তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া ইংরাজী কাগজ ভারতশাসন-কার্য্য দুরূহ করিয়া তুলিতেছে। আর আমরা ইংরাজের নিন্দা করিয়া কেবল আমাদের নিরুপায় অসন্তোষ লালন করিতেছি মাত্র।

এ পর্য্যন্ত ভারত-অধিকার কার্য্যে যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে তাহাতে ইহা নিশ্চয় জানা গিয়াছে যে, ভারতবর্ষীয়ের নিকট হইতে ইংরাজের আশঙ্কার কোন কারণ নাই। দেড়শত বৎসর পূর্ব্বেই যখন কারণ ছিল না বলিলেই হয় তখন এখনকার ত আর কথাই নাই। রাজ্যের মধ্যে যাহারা উপদ্রব করিতে পারিত তাহাদের দন্তোৎপাটন গিয়াছে এবং অনভ্যাসে তাহারা এতই নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছে যে, ভারতরক্ষাকার্য্যের জন্যই সৈন্য পাওয়া ক্রমশঃ দুর্ঘট হইতেছে। তথাপি ইংরাজ "সিডিশন" দমনের জন্য নর্ম্মদা উদ্যত। তাহার কারণ, প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞগণ কোন অবস্থাতেই সতর্কতাকে শিথিল হইতে দেন না। সাবধানের বিনাশ নাই।

অত্রাচ উহা অতিসাবধানমাত্র। কিন্তু অপর পক্ষে ইংরাজ যদি ক্রমশঃই ভারতদ্রোহী হইয়া উঠিতে থাকে তাহা হইলেই রাজ-কার্য্যের বাস্তবিক বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভব। বরং উদাসীনভাবেও কর্ত্তব্যপালন করা যায় কিন্তু আন্তরিক বিদ্বেষ লইয়া কর্ত্তব্য-পালন করা মনুষ্য-ক্ষমতার অতীত।

তথাপি, অমানুষিক ক্ষমতা-বলে সমস্ত কর্ত্তব্য যথাযথ পালন করিলেও সেই অন্তরস্থিত বিদ্বেষ প্রজাকে পীড়ন করিতে থাকে। কারণ, যেমন জলের ধর্ম্ম আপনার সমতা রক্ষা করা তেমনি মানবহৃদয়ের ধর্ম্ম আপনার সমঐক্য অন্বেষণ করা। এমন কি,

আমাদের কাছে আসিতে না দিয়া তাঁহাদের দুর্গম সমাজ-দুর্গের মধ্যে কঠিন-পাষাণময় স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখেন।

স্ত্রীলোক সমাজের শক্তিস্বরূপা। রমণী চেষ্টা করিলে বিরোধী-পক্ষের মিলন সাধন করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকমাত্রায় সংস্কারের বশ। তাঁহারা যুক্তি নামক প্রবল দানবটাকে সুমিষ্ট হাস্যে উড়াইয়া দিতে সুশিক্ষিত নহেন কিন্তু রুচি নামক সুকুমারী পরিটিকে কোনমতেই উপেক্ষা করিতে পারেন না। আমরা সেই অ্যাংলো-ইণ্ডিয় রমণীগণের স্নায়ুবিকার ও শিরঃপীড়াজনক। সে জন্য তাঁহাদের কি দোষ দিব, সে আমাদের অদৃষ্ট দোষ। বিধাতা আমাদিগকে সর্ব্বাংশেই তাঁহাদের রুচিকর করিয়া গড়েন নাই। সে অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়—অন্য কোন কারণে নহে—ভগবান যে জাতির হস্তে আমাদিগকে একান্ত সমর্পণ করিয়া দিয়াছেন তাহাদের সহিত মিলনের প্রধানতর অন্তরায় বলিয়া। তাঁহাদের নিকট হইতে রমণীসুলভ স্নেহ প্রত্যাশা করিতে আমাদের সাহস হয় না, রমণীসুলভ ঘৃণা দূরীকৃত করিতে পারিলেই আমরা আশাতিরিক্ত ফললাভ করি।

তাহার পরে, আপনাদের মধ্যে ইংরাজেরা যে ভাবে আমাদের সম্বন্ধে বলাকহা করে, চিন্তামাত্র না করিয়া আমাদের প্রতি যে সমস্ত বিশেষণ প্রয়োগ করে, এবং আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে না জানিয়াও আমাদের যে সমস্ত কুৎসাবাদ করিয়া থাকে, প্রত্যেক সামান্য কথাটিতে আমাদের প্রতি তাহাদের যে বদ্ধমূল অপ্রেম প্রকাশ হইয়া থাকে তাহা নবাগত ইংরাজ অল্পে অল্পে সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়া শোষণ না করিয়া থাকিতে পারে না।

একথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে বিধিবিড়ম্বনা

নায় আমরা ইংরাজের অপেক্ষা অনেক দুর্ব্বল এবং ইংরাজকৃত অসম্মানের কোন প্রতিকার করিতে পারি না। যে নিজের সম্মান উদ্ধার করিতে পারে না এ পৃথিবীতে সে সম্মান পায় না। যখন একজন তাজা বিলাতী ইংরাজ আসিয়া দেখে যে, আমরা অপমান নিশ্চেষ্টভাবে বহন করি তখন আমাদের পরে আর তাহার শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না।

তখন তাহাদিগকে কে বুঝাইবে, যে, অপমান সম্বন্ধে আমরা উদাসীন নহি কিন্তু আমরা দরিদ্র এবং আমরা কেহই স্বপ্রধান নহি, প্রত্যেক ব্যক্তিই এক একটি বৃহৎ পরিবারের প্রতিনিধি। তাহার উপরে কেবল তাহার একলার নহে, তাহার পিতামাতা ভ্রাতা স্ত্রী পুত্র পরিবারের জীবনধারণ নির্ভর করিতেছে। তাহাকে অনেক আত্মসংযম আত্মত্যাগ করিয়া চলিতে হয়। ইহা তাহার চিরদিনের শিক্ষা ও অভ্যাস। সে যে ক্ষুদ্র আত্মরক্ষণেচ্ছার নিকট আত্মসম্মান বলি দেয় তাহা নহে, বৃহৎ পরিবারের নিকট, কর্ত্তব্য-জ্ঞানের নিকট দিয়া থাকে। কে না জানে দরিদ্র বাঙ্গালী কর্ম্ম-চারীগণ কতদিন সুগভীর নির্ব্বেদ এবং সুতীব্র ধিক্কারের সহিত আপিস হইতে চলিয়া আসে, তাহাদের অপমানিত জীবন কি অসহ্য দুর্ভর বলিয়া বোধ হয়—সে তীব্রতা এত আত্যন্তিক, যে, সে অবস্থায় অক্ষমতম ব্যক্তিও সাংঘাতিক হইয়া উঠে কিন্তু তথাপি তাহার পরদিন যথাসময়ে ধুতির উপর চাপকানটি পরিয়া সেই আপিসের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করে এবং সেই মসীলিপ্ত ডেস্কে চামড়ায় বাঁধান বৃহৎ খাতাটি খুলিয়া সেই পিঙ্গলবর্ণ বড়সাহেবের রূঢ় লাঞ্ছনা নীরবে সহ্য করিতে থাকে। হঠাৎ আত্মবিস্মৃত হইয়া সে কি একমুহূর্ত্তে আপনার বৃহৎ সংসারটিকে ডুবাইতে পারে? আমরা কি ইংরাজের মত স্বতন্ত্র, সংসারভারবিহীন! আমরা

প্রমাণ আহরণ করিয়া পাঠকদের প্রতি দৌরাত্ম্য করিতে চাহি না—কথাটা সকলেই বুঝিবেন। শ্বেতকৃষ্ণে যেন দিনরাত্রির ভেদ। শ্বেতজাতি দিনের ন্যায় সদাজাগ্রত, কর্ম্মশীল, অনুসন্ধান-তৎপর, আর কৃষ্ণজাতি রাত্রির ন্যায় নিশ্চেষ্ট, কর্ম্মহীন, স্বপ্নকুহকে আবিষ্ট। এই শ্যামা আর্য্য-প্রকৃতিতে হয় ত রাত্রির মত একটা গভীরতা, মাধুর্য্য, স্নিগ্ধ করুণা এবং সুনিবিড় আত্মীয়তার ভাব আছে, দুর্ভাগ্যক্রমে ব্যস্ত চঞ্চল শ্বেতাঙ্গের তাহা আবিষ্কার করিবার অবসর নাই এবং তাহার কাছে ইহার যথেষ্ট মূল্যও নাই। তাহাদিগকে এ কথা বলিয়াও কোন ফল নাই যে, কালো গরুতেও শাদা দুধ দিয়া থাকে এবং ভিন্ন বর্ণের মধ্যে হৃদয়ের একটা গভীর ঐক্য আছে। কিন্তু কাজ নাই এ সকল ওরিয়েণ্টাল্ উপমা তুলনায়—কথাটা এই যে, কালো রঙ দেখিবামাত্র শ্বেতজাতির মন কিছু বিমুখ না হইয়া থাকিতে পারে না।

তার পরে বসনভূষণ অভ্যাস আচারে প্রত্যেক বিষয়েই এমন সকল বৈসাদৃশ্য আছে যাহা হৃদয়কে কেবলি প্রতিহত করিতে থাকে।

শরীর অর্দ্ধাবৃত রাখিয়াও যে মনের অনেক সদ্‌গুণ পোষণ করা যাইতে পারে, মনের গুণগুলা যে ছায়াপ্রিয় সৌখীন জাতীয় উদ্ভিজ্জের মত নহে, তাহাকে যে জিন বনাতের দ্বারা না মুড়িলেও অন্য উপায়ে রক্ষা করা যায় সে সমস্ত তর্ক করা মিথ্যা। ইহা তর্কের কথা নহে সংস্কারের কথা।

এক, নিকট-সংশ্রবে এই সংস্কারের বল কতকটা অভিভূত হইতে পারে। কিন্তু ঐ সংস্কারই আবার নিকটে আসিতে দেয় না। যখন সীমার ছিল না এবং আফ্রিকা বেষ্টন করিয়া পালের

জাহাজ সুদীর্ঘ কালে ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে গিয়া পৌঁছিত তখন ইংরাজ দেশী লোকের সঙ্গে কিছু যেন বেশি ঘনিষ্ঠতা করিত। কিন্তু আজকাল সাহেব তিনটি মাসের ছুটি পাইলেই তৎক্ষণাৎ ইংলণ্ডে পালাইয়া গিয়া ভারতবর্ষের সমস্ত ধূলা ধৌত করিয়া আসেন এবং ভারতবর্ষেও তাঁহাদের আত্মীয় সমাজ ব্যাপক হইয়া পড়িতেছে, এইজন্য যে দেশ তাঁহারা জয় করিয়াছেন সে দেশে থাকিয়াও যথাসম্ভব না থাকা এবং যে জাতিকে শাসন করিতেছেন সে জাতিকে ভাল না বাসিয়াও কাজ করা সুসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। সহস্র ক্রোশ দূর হইতে সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া আসিয়া একটি সম্পূর্ণ বিদেশী রাজ্য নিতান্ত আপিসের কাজের ন্যায় দিনের বেলায় শাসন করিয়া সন্ধ্যাবেলায় পুনশ্চ সমুদ্রে খেয় দিয়া বাড়ি গিয়া তপ্ত ভাত খাওয়া, ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত আর কোথায় আছে।

এক ত, আমরা সহজেই বিদেশী—এবং আমাদের রূপ রস গন্ধ শব্দ ও স্পর্শ ইংরাজের স্বভাবতই অরুচিকর, তাহার উপরে আরো একটা উপসর্গ আছে। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান্ সমাজ এদেশে যতই প্রাচীন হইতেছে ততই তাহার কতকগুলি লোকব্যবহার ও জনশ্রুতি ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছে। যদিও বা কোন ইংরাজ স্বাভাবিক উদারতা ও সহৃদয়তাগুণে বাহ্য বাধাসকল দূর করিয়া আমাদের অন্তরে প্রবেশ করিবার পথ পাইতেন এবং আমাদিগকে অন্তরে আহ্বান করিবার জন্য দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিতেন, তিনি এখানে আসিবামাত্র ইংরাজ সমাজের জালের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। তখন তাঁহার নিজের স্বাভাবিক সংস্কার এবং স্বজাতি সমাজের পুঞ্জীভূত সংস্কার একত্র হইয়া একটা অলঙ্ঘ্য বাধার স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। পুরাতন বিদেশী নূতন বিদেশীর

রাজকীয় ব্যাপারে সর্ব্বত্রই ডিপ্লম্যাসি আছে এবং ভারতবর্ষে আমাদের পক্ষে তাহার সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক। আমি ইচ্ছা করিতেছি এবং আমার ইচ্ছা অন্যায় নহে বলিয়াই পৃথিবীতে কাজ সহজ হয় না। যখন চুরি করিতে যাইতেছি না শ্বশুরবাড়ি যাইতেছি তখন পথের মধ্যে যদি একটা পুষ্করিণী পড়ে তবে তাহার উপর দিয়াই হাঁটিয়া চলিয়া যাইব এমন পণ করিয়া বসিলে, চাই কি, শ্বশুরবাড়ি না পৌঁছিতেও পারি। সেস্থলে পুকুরটা ঘুরিয়া যাওয়াই ভাল। আমাদের রাজনৈতিক শ্বশুরবাড়ি, যেখানে ক্ষীরটা সরটা মাছের মুড়াটা আমাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে সেখানে যাইতে হইলেও নানা বাধা নানা উপায়ে অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। যেখানে লঙ্ঘন করিলে চলে সেখানে লঙ্ঘন করিতে হইবে, যেখানে সে সুবিধা নাই সেখানে রাগারাগি করিতে না বসিয়া ঘুরিয়া যাওয়া ভাল।

ডিপ্লম্যাসি অর্থে যে কপটাচরণ বুঝিতে হইবে এমন কথা নাই। তাহার প্রকৃত মর্ম্ম এই নিজের ব্যক্তিগত হৃদয়বৃত্তি দ্বারা অকস্মাৎ বিচলিত না হইয়া কাজের নিয়ম ও সময়ের সুযোগ বুঝিয়া কাজ করা।

কিন্তু আমরা সে দিক দিয়া যাই না। আমরা কাজ পাই বা না পাই কথা একটাও বাদ দিতে পারি না। তাহাতে কেবল যে আমাদের অনভিজ্ঞতা ও অবিবেচনা প্রকাশ পায় তাহা নহে; তাহাতে প্রকাশ পায় যে, কাজ আদায়ের ইচ্ছার অপেক্ষা ভুলো দিবার, বাহবা লইবার, এবং মনের ঝাল ঝাড়িবার ইচ্ছা আমাদের বেশি। তাহার একটা সুযোগ পাইলে আমরা এত খুসি হই যে, তাহাতে আসল কাজের কত ক্ষতি হইল তাহা আমরা

ভুলিয়া যাই। এবং কটু ভর্ৎসনার পর সঙ্গত প্রার্থনা পূরণ করিতেও গবর্মেণ্টের মনে দ্বিধা উপস্থিত হয় পাছে প্রজার স্পর্দ্ধা বড়িয়া উঠে।

ইহার প্রধান কারণ, মনের ভিতরে এমন একটা অসদ্ভাব জন্মিয়া গিয়াছে এবং প্রতিদিন তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে, যে, উভয়পক্ষেরই কর্ত্তব্যপালন ক্রমশই কিছু কিছু করিয়া দুরূহ হইতেছে। রাজাপ্রজার এই অহরহ কলহ দেখিতেও কিছুমাত্র ভাল হইতেছে না। গবর্মেণ্টও বাহ্যতঃ যেমনই হৌক্, মনে মনে যে এসম্বন্ধে উদাসীন তাহা বিশ্বাস হয় না। কিন্তু উপায় কি?—বৃটিশ গবর্মেণ্ট অতিশয় উৎকৃষ্ট কিন্তু বৃটিশ চরিত্র, হাজার হৌক, মনুষ্যচরিত্র ত বটে।

ভাবিয়া দেখিলে এ সমস্যার মীমাংসা সহজ নহে।

ভালবাসা বা শ্রদ্ধা অনেক ছোট ছোট বিষয়ের দ্বারা সাধিত হয়। আমরা যে বিজিত জাতি এবং জ্ঞান, শিক্ষা ও সভ্যতায় ইংরাজের অপেক্ষা নিকৃষ্ট সে বড় কথাটা ছাড়িয়া দেওয়া যাক্। কারণ, মানুষের অনুরাগ বিরাগ জ্ঞান অপেক্ষা রুচির উপর বেশি নির্ভর করে। এবং রুচি এতগুলা সূক্ষ্মতম সংস্কার আশ্রয় করিয়া থাকে, যে, কোনপ্রকার স্থূল অস্ত্র লইয়া তাহার সহিত সংগ্রাম করা সম্ভব নহে।

সব প্রথম সঙ্কট বর্ণ লইয়া। শরীরের বর্ণটা যেমন ধুইয়া মুছিয়া কিছুতেই দূর করা যায় না তেমনি বর্ণ সম্বন্ধীয় যে সংস্কার সেটা মন হইতে তাড়ানো বড় কঠিন। শ্বেতকায় আর্য্যগণ কালো রঙটাকে বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া ঘৃণাচক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন। এই অবসরে বেদের ইংরাজি তর্জ্জমা এবং এন্‌সাইক্লোপীডিয়া হইতে এ সম্বন্ধে অধ্যায়, সূত্র এবং পৃষ্ঠাঙ্ক সমেত উৎকট

থাকি ইংরাজ আমাদিগকে অবজ্ঞা করে; অনাহূত আমাদের মনে আঘাত দিতে কুণ্ঠিত হয় না; কার্য্যোপলক্ষ্য ব্যতীত সর্ব্বতোভাবে আমাদের সংশ্রব পরিহার করিতে চেষ্টা করে এবং কার্য্যোপলক্ষ্যেও আমাদের দেশের সুযোগ্য ব্যক্তির কর্তৃত্বপদ মনে মনে তাহাদের অসহ্য বোধ হয়; একশত বৎসর ধরিয়া এক ঘটি জলের উপর একফোঁটা তেলের ন্যায় তাহারা আমাদের সমস্ত উচ্চস্থানটুকু পরিব্যাপ্ত করিয়া নির্লিপ্তভাবে ভাসিয়া বেড়াইয়াছে। এই সমস্ত অমানুষোচিত অনাদর, জ্ঞানে এবং অজ্ঞানে, আমাদের অন্তরে সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল, ক্ষুদ্র ইল্‌বর্ট্ বিলটি তাহারই উপর অধিরোহণ করিয়া এতটা উচ্চ হইয়া উঠিয়াছিল।

আজকালকার অধিকাংশ আন্দোলন এইরূপ গূঢ় মনক্ষোভ হইতে উৎপন্ন। এখন প্রত্যেক কথাটাই দুই পক্ষের হারজিতের কথা হইয়া দাঁড়ায়। হয় ত যেখানে পাঁচটা নরম কথা বলিলে উপকার হয় সেখানে আমরা তীব্রভাষায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়াইতে থাকি, এবং যেখানে একটা অনুরোধ পালন করিলে বিশেষ ক্ষতি নাই সেখানেও অপরপক্ষ বিমুখ হইয়া থাকে।

কিন্তু বৃহৎ অনুষ্ঠানমাত্রেই আপস ব্যতীত কাজ চলে না। পঞ্চবিংশতি কোটি প্রজাকে সুশৃঙ্খলায় শাসন করা সহজ ব্যাপার নহে। এতবড় বৃহৎ রাজশক্তির সহিত যখন কারবার করিতে [illegible] তখন সংযম, অভিজ্ঞতা এবং বিবেচনার আবশ্যক। এইটে [illegible] ইচ্ছা করিলেই একটা কিছু করিতে পারে [illegible] অভিভূত, জটিলতায় আবদ্ধ। তাহাকে [illegible] অনেক দূর হইতে অনেকগুলা ফল [illegible] করিতে হয়।

আমাদের এখানে আবার অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এবং ভারতবর্ষীয় এই দুই অত্যন্ত বিসদৃশ সম্প্রদায় লইয়া কারবার। উভয়ের স্বার্থ অনেক স্থলেই বিরোধী। রাজ্যতন্ত্রের যে চালক সে এই দুই বিপরীত শক্তির কোনটাকেই উপেক্ষা করিতে পারে না—যে করিতে চায় সে নিষ্ফল হয়। আমরা যখন আমাদের মনের মত কোন একটা প্রস্তাব করি তখন মনে করি, গবর্মেণ্টের পক্ষে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের বাধাটা যেন বাধাই নহে। অথচ প্রকৃত পক্ষে শক্তি তাহারই বেশি। প্রবল শক্তিকে অবহেলা করিলে কিরূপ সঙ্কটে পড়িতে হয় ইল্‌বার্ট্‌ বিলের বিপ্লবে তাহার পরিচয় পাওয়া গেছে। সৎপথে এবং ন্যায়পথেও রেলগাড়ি চালাইতে হইলে আগে যথোচিত উপায়ে মাটি সমতল করিয়া লাইন্‌ পাতিতে হইবে। ধৈর্য্য ধরিয়া সেই সময়টুকু যদি অপেক্ষা করা যায় এবং সেই কাজটা যদি সম্পন্ন হইতে দেওয়া যায় তার পরে দ্রুতবেগে চলিবার খুব সুবিধা হয়।

ইংলণ্ডে রাজাপ্রজার মধ্যে বৈষম্য নাই; এবং সেখানে রাজ্য-তন্ত্রের কল বহুকাল হইতে চলিয়া সহজ হইয়া আসিয়াছে। তবু সেখানে একটা হিতজনক পরিবর্ত্তন সাধন করিতেও কত কৌশল কত অধ্যবসায় প্রয়োগ এবং কত সম্প্রদায়কে কত ভাবে চালনা করিতে হয়। অথচ সেখানে বিপরীত স্বার্থের এমন তুমুল সংঘর্ষ নাই; সেখানে একবার যুক্তি দ্বারা প্রস্তাব বিশেষের উপকারিতা সকলের কাছে প্রমাণ করিবামাত্র সাধারণ অথবা অধিকাংশের স্বার্থ এক হইয়া তাহা গ্রহণ করে। আর আমাদের দেশে যখন দুই শক্তি লইয়া কথা এবং আমরাই যখন সর্ব্বাংশে দুর্ব্বল তখন কেবল ভাষার বেগে গবর্মেণ্টকে বিচলিত করিবার আশা করা যায় না। নানা দূরগামী উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক।

তাহার দৃষ্টান্ত দেখ—আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই ইংরাজকৃত উপকার যে উপকার নহে ইহাই প্রাণপণে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। হৃদয়শূন্য উপকার গ্রহণ করিয়া তাহারা মনের মধ্যে কিছুতেই আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে পারিতেছে না। কোন ক্রমে তাহারা কৃতজ্ঞতার দায় হইতে আপনাকে যেন মুক্ত করিতে চাহে। সেইজন্য আজকাল আমাদের কাগজে পত্রে কথায় বার্ত্তায় ইংরাজ সম্বন্ধে নানাপ্রকার কুতর্ক দেখা যায়।

এক কথায়, ইংরাজ নিজেকে আমাদের পক্ষে আবশ্যকীয় করিয়া তুলিয়াছে কিন্তু প্রিয় করিয়া তোলা আবশ্যক বোধ করে নাই; পথ্য দেয়, কিন্তু তাহার মধ্যে স্বাদ সঞ্চার করিয়া দেয় না, অবশেষে যখন বমনোদ্রেক হয় তখন চোখ রাঙাইয়া হুহুঙ্কার দিয়া উঠে।

আমরাও প্রাণের ভয়ে তাড়াতাড়ি আত্মসম্বরণ করিয়া বলিয়া উঠি, বাঃ, অতি সুমিষ্ট! অতি সুগন্ধ! কিন্তু সাহেব, ঐ সঙ্গে যদি একটা লেবু অথবা কিছু মস্‌লা দাও তাহা হইলে কোন কথাই থাকে না! সবই উত্তম, কেবল প্রতিনিধি-নিয়োগ স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি আরো দুটো একটা উপকরণ থাকিলে অতি নিখুঁৎ হয়।

কিন্তু উভয় পক্ষ যদি অভয় দেন তবে আমি বলি কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নহে। ইংরাজ যে তিক্ত অসম্মান আমাদের প্রতি সর্ব্বদা প্রয়োগ করিয়া থাকে আমরা কেবল তাহারই বিস্বাদ মারিবার জন্য এত অধিক ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি।

এমন কি, আপ্‌না-আপ্‌নির মধ্যে আমাদের মাঝে মাঝে এমন সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, আমরা যে সকল অধিকার চাহি-

তেছি তাহা প্রাপ্ত হইলে চালাইতে পারিব কি না। মনে তর্ক উপস্থিত হয় ঘোড়াটা পাইলেই ঘোড়সওয়ার হওয়া যায় কি না। কিন্তু তবু যেমন করিয়া হৌক বাহ্যতঃ ইংরাজের মাথায় মাথায় সমান হওয়া চাই। ব্যবহারে তাহাদের নিকট হইতে যে সম্মানে বঞ্চিত হইয়াছি, আইনে কানুনে দরবারে দালানে সেটা আদায় করিয়া লইবার জন্য অত্যন্ত একটা লালসার উদ্রেক হইয়াছে।

তাহার দৃষ্টান্ত ইল্‌বর্ট্‌ বিল। এই বিলের তর্কে আমাদের দেশের লোক যেমন একটা বিপর্য্যয় জেদ্‌ প্রকাশ করিয়াছিল তৎপূর্ব্বে এমন আর কখনো করে নাই। অথচ দেশের গুরুতর লাভ ক্ষতি সে বিলের উপর নির্ভর করে নাই। ইংরাজ ও দেশীয়ের মধ্যে বিচার উপস্থিত হইলে কোন স্থলে হয় ত ইংরাজ বিচারক স্বজাতিবাৎসল্য ও রাজনৈতিক কারণে স্ববর্ণের প্রতি পক্ষপাত করিতেও পারেন, কিন্তু সে ঘটনা ও সে সম্ভাবনা এতই অধিক নহে যে, সে জন্য এতাদৃশ বিচলিত হওয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে আমাদের দেশের বহুকালের আন্তরিক ক্ষোভাগ্নি সেই সংঘর্ষে জাজ্বল্যমানরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল মাত্র।

আমরা যতই আস্ফালন করি ইংরাজ আমাদের রাজা তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই সভ্যতাভিমানী বিদেশী রাজা নিজের হাতে যদি একটা কোন বিশেষ প্রিয় অধিকার রাখিতে ইচ্ছা করে যাহাতে আমাদের দেশের তেমন কোন ক্ষতিবৃদ্ধি না থাকে, তবে তাহার বিরুদ্ধে অতটা অধিক পণ করিয়া বসা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক এবং সঙ্গত নহে। কিন্তু ইংরাজের সমস্ত আচরণের সহিত জড়িত হইয়া [illegible] গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আমরা [illegible]

তাহাকে বাহির হইতে চিনিয়া লওয়া যাইবে; এমন কি পতিত ভারতবর্ষেরও একটা হৃদয় আছে এবং সে হৃদয়টা সে তাহার জামার আস্তিনে ঝুলাইয়া রাখে নাই।

জড়পদার্থকেও বিজ্ঞানের সাহায্যে নিগূঢ়রূপে চিনিয়া লইতে হয় তবেই জড়প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব বিস্তার করিতে পারা যায়। মনুষ্যলোকে যাহারা স্থায়ী প্রভাব রক্ষা করিতে চাহে তাহাদের অন্যান্য অনেক গুণের মধ্যে অন্তরঙ্গরূপে মানুষ চিনিবার বিশেষ গুণটি থাকা আবশ্যক। মানুষের অত্যন্ত কাছে যাইবার যে ক্ষমতা সে একটা দুর্লভ ক্ষমতা।

ইংরাজের বিস্তর ক্ষমতা আছে কিন্তু সেইটি নাই। সে বরঞ্চ উপকার করিতে অসম্মত নহে কিন্তু কিছুতেই কাছে আসিতে চাহে না। কোন মতে উপকারটা সারিয়া ফেলিয়া অমনি তাড়াতাড়ি সরিতে পারিলে বাঁচে। তাহার পরে সে ক্লবে গিয়া পেগ খাইয়া বিলিয়ার্ড্ খেলিয়া অনুগৃহীতদের প্রতি অবজ্ঞাসূচক বিশেষণ প্রয়োগ-পূর্ব্বক তাহাদের বিজাতীয় অস্তিত্ব শরীর মনের নিকট হইতে যথাসাধ্য দূরীকৃত করিয়া রাখে।

ইংরাজ কেবলমাত্র অফিশ্যালের মত উপকার করে, বন্ধুর সুহৃদের মত নহে।

হায়, একশত বৎসর রাজত্বের পর এই কি রাজাপ্রজার সম্বন্ধ! ইহা অপেক্ষা আমাদের হীনাবস্থা আর কি হইতে পারে! আমাদের মহারাজা আমাদিগকে মনুষ্য জ্ঞান করে না, কেবল রাজকার্য্য করে, এবং আপিস সারিয়া টম্‌টম চড়িয়া দক্ষিণ বায়ে দুই পাতমাত্র না খাইয়া একেবারে বাসার মধ্যে ঢুকিয়া হাঁপ ছাড়ে।

অথচ কাগজে পত্রে এবং কেতাবে যেরূপ পড়া যায় তাহাতে ইংরাজের বিশ্বহিতৈষণার বিস্তর উল্লেখ দেখা যায়। কেবল

"অভাগা যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়, তাহে লক্ষ্মী হৈল লক্ষ্মী-ছাড়া!" এতকাল এত ইংরাজ আমাদের দেশে জীবন কাটাইয়া গেছে কিন্তু আমাদের দুঃখদৈন্য দুরবস্থায় তাহাদের কয়জন আমাদিগকে যথার্থ দয়া করিয়াছে? কে আমাদের কাছে আসিয়া ঘরে বসিয়া আমাদের খবর লইয়াছে, স্নেহের সহিত আমাদের দুঃখমোচনের চেষ্টা করিয়াছে?—কেবল দুই একটি মহাত্মা খৃষ্টমাননের নাম মনে পড়ে—হেয়ার এবং হিউম—যাঁহারা এই হতভাগ্য, আত্মহিতসাধনে অনভিজ্ঞ জাতির জন্য সমস্ত জীবন এবং স্বার্থ বিসর্জ্জন করিয়াছেন।

ইহারা দয়া করে না উপকার করে, স্নেহ করে না রক্ষা করে, শ্রদ্ধা করে না অথচ ন্যায়াচরণের চেষ্টা করে; ভূমিতে জল সেচন করে না, অথচ রাশি রাশি বীজ বপন করিতে কার্পণ্য নাই।

কিন্তু তাহার পর যখন যথেষ্ট কৃতজ্ঞতার শস্য উৎপন্ন হয় না তখন কি কেবলই মাটির দোষ দিবে? এ নিয়ম কি বিশ্বব্যাপী নহে, যে, হৃদয়ের সহিত কাজ না করিলে হৃদয়ে তাহার ফল ফলে না?

চাষা হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য পর্য্যন্ত আমরা সকলেই জানি যে, ইংরাজ চলিয়া গেলে আমাদের দুর্গতির একশেষ হয়, রাজ্যের ধনমানপ্রাণ একেবারে লণ্ডভণ্ড হইয়া যায়; কিন্তু আশ্চর্য্য এই, এত সুবিধার উপরেও আমরা ইংরাজের নিকটে মনুষ্যহৃদয়ের প্রত্যাশা করিয়া থাকি; উপদ্রবকারী রাজার নিকট যতটা করিয়াও তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি করি। কারণ, উদাসীন অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে অন্তর বড় বিমুখ হয়।

বুটের তলায় অনেকটা ছারখার হইয়া যাইতেছে তাহার কোন খেয়াল নাই।

আমাদের কোন শত্রুর উপদ্রব নাই, বিপদের আশঙ্কা নাই, কেবল বুকের উপরে অকস্মাৎ সেই বুটটা আসিয়া পড়ে। তাহাতে আমরা বেদনা পাই এবং সেই বুটওয়ালার যে কোন লোকসান হয় না তাহা নহে। কিন্তু ইংরাজ সর্ব্বত্রই ইংরাজ, কোথাও সে আপনার বুটজোড়াটা খুলিয়া আসিতে রাজি নহে।

আয়র্লণ্ডের সহিত ইংরাজের যে সমস্ত খিটিমিটি বাধিয়াছে সে সকল কথা আমাদের পাড়িবার আবশ্যক নাই; অধীন ভারতবর্ষেও দেখা যাইতেছে ইংরাজের সহিত ইংরাজি শিক্ষিতদের ক্রমশই একটা অ-বনিবনাও হইয়া আসিতেছে। তিলমাত্র অবসর পাইলে কেহ কাহাকেও ছাড়িতে চায় না। ইঁইটির পরিবর্ত্তে পাট্‌কেল্‌টি চলিতেছেই।

আমরা যে, সকল জায়গায় সুবিচারপূর্ব্বক পাট্‌কেল নিক্ষেপ করি তাহা নহে, অধিকাংশ স্থলে অন্ধকারেই ঢেলা মারি। আমাদের কাগজে পত্রে অনেক সময় আমরা অন্যায় খিটিমিটি করিয়া থাকি এবং ভ্রমমূলক কোন্দল উত্থাপন করি সে কথা অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু সেগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করিবার আবশ্যক নাই। তাহার কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা, কোনটা ন্যায় কোনটা অন্যায় হইতে পারে; আসল বিচার্য্য বিষয় এই যে, আজকাল এইরূপ পাটকেল ছুঁড়িবার প্রবৃত্তিটা এত প্রবল হইয়া উঠিতেছে কেন? শাসনকর্ত্তা খবরের কাগজের কোন একটা প্রবন্ধ বিশেষকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়া সম্পাদককে এবং হতভাগ্য মুদ্রাকরকে

পর্য্যন্ত জেলে দিতে পারে কিন্তু প্রতিদিনই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পথে এই যে সমস্ত ছোট ছোট কাঁটাগাছগুলি গজাইয়া উঠিতেছে তাহার বিশেষ কি প্রতিকার করা হইল ?

এই কাঁটাগাছগুলির মূল যখন মনের মধ্যে তখন ইহাকে উৎপাটন করিতে হইলে সেই মনের মধ্যেই প্রবেশ করিতে হইবে। কিন্তু পাকা রাস্তা ও কাঁচা রাস্তা যোগে ইংরাজরাজের আর সর্ব্বত্রই গতিবিধি আছে কেবল দুর্ভাগ্যক্রমে সেই মনের মধ্যেই নাই। হয় ত সে জায়গাটাতে প্রবেশ করিতে হইলে ঈষৎ একটুখানি মাথা হেলাইয়া ঢুকিতে হয়, কিন্তু ইংরাজের মেরুদণ্ড কোনখানেই বাঁকিতে চায় না।

অগত্যা ইংরাজ আপনাকে এইরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করে যে, এই যে খবরের কাগজে কটুকথা বলিতেছে, সভা হইতেছে, রাজ্যতন্ত্রের অপ্রিয় সমালোচনা চলিতেছে ইহার সহিত "পীপ্‌লের" কোন যোগ নাই;—এ কেবল কতকগুলি শিক্ষিত পুতুলনাচ-ওয়ালার বুজরুগিমাত্র। বলে যে, ভিতরে সমস্তই আছে ভাল; বাহিরে যে একটু-আধটু জীর্ণতার মত চিহ্ন দেখা যাইতেছে সে চতুর লোকে রঙ করিয়া দিয়াছে। তবে ত আর ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিবার আবশ্যক নাই; কেবল যে চতুর লোকটাকে সন্দেহ করা যায় তাহাকে শাসন করিয়া দিলেই চুকিয়া যায়।

ঐটেই ইংরাজের দোষ। সে কিছুতেই ঘরে আসিতে চায় না। কিন্তু দূর হইতে, বাহির হইতে, কোনক্রমে স্পর্শসংস্রব বাঁচাইয়া মানুষের সহিত কারবার করা যায় না;—যে পরিমাণে দূরে থাকা যায় সেই পরিমাণেই নিষ্ফলতা প্রাপ্ত হইতে হয়। হিন্দুরা অত্যুগ্রভাবে হিন্দু হইতে গিয়া আজ কত শতাব্দী ধরিয়া তাহার প্রমাণ দিয়া আসিতেছে। মানুষ ত জড়যন্ত্র নহে, যে

ইংরাজ ও ভারতবাসী।*

There is nothing like love and admiration for bringing people to a likeness with what they love and admire; but the Englishman seems never to dream of employing these influences upon a race he wants to fuse with himself. He employs simply material interests for his work of fusion; and, beyond these nothing except scorn and rebuke. Accordingly there is no vital union between him and the races he has annexed; and while France can freely boast of her magnificent unity, a unity of spirit no less than of name, between all the people who compose her, in our country the Englishman proper is in union of spirit with no one except other Englishmen proper like himself.

Matthew Arnold

আমাদের প্রাচীন পুরাণে ইতিহাসে পাঠ করা যায় যে, চরিত্রে বা আচরণে একটা ছিদ্র না পাইলে অলক্ষ্মী প্রবেশ করিতে পথ পায় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রত্যেক জাতিরই প্রায় একটা কোন ছিদ্র থাকে। এবং আরও দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, যেখানে মানুষের দুর্ব্বলতা সেইখানে তাহার স্নেহও বেশী। হিন্দু আপনার দুর্গম স্বাতন্ত্র্য এবং কৃত্রিম জাতিভেদ-প্রথার প্রতি প্রাণপণ

* "চৈতন্য লাইব্রেরী"র অধিবেশনে পঠিত।

আসক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। ইংরাজও আপনার চরিত্রের মধ্যে ঔদ্ধত্যকে যেন কিছু বিশেষ গৌরবের সহিত পালন করে। তাহার দ্বৈপায়ন সঙ্কীর্ণতার মধ্যে সে যে অটল এবং ভ্রমণ অথবা রাজত্ব উপলক্ষে সে যাহাদের সংশ্রবে আসে তাহাদের সহিত মেলামেশা করিবার যে কিছুমাত্র প্রয়াস পায় না, সাধারণ "জন্"-পুঙ্গব এই গুণটিকে মনে মনে কিছু যেন শ্লাঘার বিষয় বলিয়া জ্ঞান করে। তাহার ভাবখানা এই যে, ঢেঁকি যেমন স্বর্গেও ঢেঁকি তেমনি ইংরাজ সর্ব্বত্রই খাড়া ইংরাজ, কিছুতেই তাহার আর অন্যথা হইবার যো নাই।

এই যে মনোহারিত্বের অভাব, এই যে অনুচর আশ্রিতবর্গের অন্তরঙ্গ হইয়া তাহাদের মন বুঝিবার প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা, এই যে সমস্ত পৃথিবীকে নিজের সংস্কার অনুসারেই বিচার করা ইংরাজের এই মহদ্দোষটি কালক্রমে নিশ্চয় মহৎ কুফল প্রসব করিবে। চরিত্রের এই ছিদ্রটী অলক্ষ্মীর একটা প্রবেশপথ।

কোথায় কোন্ শত্রু আসিবার সম্ভাবনা আছে ইংরাজ সে ছিদ্র যত্নপূর্ব্বক রোধ করে, যেখানে যত পথ ঘাট আছে সর্ব্বত্রই পাহারা বসাইয়া রাখে এবং আশঙ্কার অঙ্কুরটি পর্য্যন্ত পদতলে দলন করিয়া ফেলে, কেবল নিজের স্বভাবের মধ্যে যে একটি নৈতিক ছিদ্র আছে সেইটাকে প্রতিদিন প্রশ্রয় দিয়া দুর্দ্দম করিয়া তুলিতেছে—কখন কখন অল্পস্বল্প আক্ষেপ করিয়াও থাকে—কিন্তু মমতাবশতঃ কিছুতেই তাহার গায়ে হাত তুলিতে পারে না।

ঠিক যেন একজন লোক বুট পায়ে দিয়া আপনার শস্যক্ষেত্র-ময় হৈ হৈ করিয়া বেড়াইতেছে পাছে পাখীতে শস্যের একটি কণামাত্র খাইয়া যায়। পাখী পলাইতেছে বটে কিন্তু কঠিন

কাচিদাড়ম্বরং নারী ভুজসংযোগপীড়িতং
কৃত্বা কমলপত্রাক্ষী প্রসুপ্তা মদমোহিতা ॥
কলনোমপরিষ্যাল্যা প্রসুপ্তাভাতি ভামিনী
বসন্ত পুষ্পসবলা মালেব পরিমার্জিতা
পানিভ্যাঞ্চ কুচৌ কাচিৎ সুবর্ণকল সাপমৌ
উপগূহ্যাবলা সুপ্তা নিদ্রাবশমুপাগতা
অন্যাকমল পত্রাক্ষী পূর্ণেন্দু সদৃশাননা
অন্যাসালিঙ্গ্য সুশ্রোণী নিদ্রাবশমুপাগতা
আতোদ্যানি বিচিত্রানি পরিবজ্য বরস্ত্রিয়ঃ
নিপীড্য চ ভুজৈঃ সুপ্তাঃ কামিন্যঃ কামুকানিব ॥

বৌদ্ধগ্রন্থে মহাপ্রস্থানের দ্বিতীয় অঙ্ক সিদ্ধার্থের বিলাসভবনে নিশাযোগে নিদ্রিতা বিলাসিনীগণের বীভৎস অঙ্গভঙ্গী, বিলাসের জঘন্যতা সিদ্ধার্থের হৃদয়ে উদ্দীপিত করিয়াছিল। এই চিত্র ললিতবিস্তর মহাবস্তু ও বুদ্ধচরিত কাব্যে চিত্রিত হইয়াছে। বুদ্ধচরিত প্রাচীনতম, তাহার পরে ললিতবিস্তর তাহার পরে মহাবস্তু রচিত হয়। বুদ্ধচরিত হইতে তাঁহারা এ চিত্র ঋণ করিয়াছিলেন বুঝা যায়। হনুমান রাবণের পুরীতে যে বীভৎস চিত্র দেখিয়াছিলেন তাহার প্রাসঙ্গিকতা জানকী অন্বেষণের সহিত অতি সামান্য। ইহার পরবর্ত্তী অধ্যায়ে দুতিন শ্লোকে বাল্মীকি যাহা লিখিয়াছেন হনুমানের উদ্দেশ্য ও রাক্ষসগণের বিলাসিতা তাহাতেই যথেষ্ট বুঝা যায়। সুন্দরকাণ্ডের দশমসর্গে এ বিশ্লেষণের আবশ্যকতা তত বুঝা যায় না। বুদ্ধচরিতে এই চিত্রটী এইরূপে অঙ্কিত হইয়াছে।

অভবচ্ছয়িতা হি তত্র কাচিদ্বিনিবেশ্য প্রচলে করে কপোলং।
দয়িতামপি রম্যপত্রচিত্রাং কুপিতেবাংকগতাং বিহায় বীণাং ॥

বিবভৌ করলগ্নবেণুরন্ধ্রা স্তনবিস্রস্তসিতাংশুকা শয়ানা।
ঋজুঘটপদপংক্তিজুষ্টপদ্মা জলফেণপ্রহসন্তটা নদীব ॥
নবপুষ্করগর্ভকোমলাভ্যাং তপনীয়োজ্জ্বল সংগতাঙ্গদাভ্যাং।
স্বপিতি স্ম তথা পুরা ভুজাভ্যাং পরিরভ্য প্রিয়বনমৃদংগমেব ॥
নবহাটকভূষণাস্তথান্যা বসনং পীতমনুক্রমং বসানা।
অবশা বত নিদ্রয়া নিপেতুর্গজভগ্না ইব কর্ণিকারশাখা ॥
অবলংব্য গবাক্ষপার্শ্বমন্যা শয়িতা চাগবিভুগ্নগাত্রযষ্টিঃ।
বিররাজ বিলংবিচারুহারা রচিতা তোরণশালভংজিকেব ॥
শশিকুণ্ডলদষ্টপত্রলেখং মুখপদ্মং বিনতং তথাপরস্যা।
শতপত্রমিবার্ধচক্রনালং স্থিতকারংডবষণ্ডিতং চকাশে ॥
অপরা শয়িতা যথোপদিষ্টা স্তনভারেরবনম্যমানগাত্রা।
উপগুহ্য পরস্পরং বিবেজুর্ভুজপাশৈস্তপনীয় পারিহার্যৈঃ ॥
মহতীং পরিবাদিনীং চ কাচিন্নিতালিঙ্গ্য সখীমিব প্রসুপ্তা।
বিজুগুর্ণ চলৎসুবর্ণসূত্রাং বদনেন্মুকুলকর্ণিকোজ্জ্বলেন ॥
পরবং যুবতীর্ভুজাংসদেশাদববিস্রংসিতচারুপাশমন্যা।
সবিলাসরতাং ততাংতমূর্ধোর্বিবরে কান্তনিবাভিনীয় শিষ্যে ॥
অপরা ন বভুর্ণমীলিতাক্ষী বিপুলাক্ষ্যোঽপি শুভভ্রুবোঽপিসত্য ॥
প্রতিসংকুচিতারবিন্দকোশাঃ সর্ব্বিতর্য্যস্তমিতে যথা নলিন্যঃ ॥
শিথিলাকুলমূর্ধজা তথান্যা জঘনস্রস্তবিভূষণাংশুকান্তা।
অশয়িষ্ট বিকীর্ণকণ্ঠসূত্রা গজভগ্না প্রতিপাতিতা ইবেব ॥
অপরাস্ত্ববশা হ্রিয়া বিযুক্তা ধৃতিনাম্নোঽপি বপুগুণৈরুপেতা।
বিনিশশ্বসুরুন্মনং শয়ানা বিকৃতাক্ষিপ্তভুজা জজৃংভিরে চ ॥
ব্যপরিদ্ধবিভূষণস্রজোঽন্যা বিসৃতাগ্রস্তনবাসসো বিসংজ্ঞা।
অনিমীলিতশুক্লনিশ্চলাক্ষী ন বিরেজুঃ শয়িতা গতাসুকল্পা ॥
বিরতাস্যপুটা বিরুদ্ধগাত্রা প্রপতদ্বক্ত্রজলা প্রকাশগুহ্যা।
অপরা মদঘূর্ণিতেব শিষ্যে ন বভাষে বিকৃতং বপুঃ পুপোষ ॥

ঘুরিয়া অন্যদিকে যাইলেন কিন্তু তথাগতের রোগভঙ্গ হইল না। সূর্য্য অন্যদিকে যাইলেন বটে কিন্তু ছায়া তাঁহার সহগামিনী হইলেন না, তিনি কুমারকে আশ্রয় দিয়া স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল রহিলেন। ললিতবিস্তর একাদশ অধ্যায়ে এ আখ্যায়িকাটী উল্লিখিত হইয়াছে। আর্ণল্ড্ সাহেব তাঁহার Light of Asia নামক গ্রন্থে সে কথাটী এইরূপে উল্লেখ করিয়াছেন—

But certain from the king seeking the prince
Found him still musing, though the noon was past,
And the Sun hastened to the western hills:
Yet while all shadows moved, the jambu-tree's
Stayed in one quarter, overspreading him,
Lest the sloped rays should strike the sacred head;
And he who saw this sight, heard a voice say
Amid the blossoms of the rose apple,
"Let be the king's son; till the shadow goes
Forth from his heart, my shadow will not shift."

কালিদাস রঘুবংশে এ আখ্যায়িকাটী উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রান্ত হইয়া বৃক্ষমূলে জানকীর উৎসঙ্গে মস্তক রক্ষা করিয়া শ্রীরামচন্দ্র নিদ্রাগত হইয়াছেন। দিবা অতীতপ্রায় কিন্তু দৈববলে তরুচ্ছায়া নিশ্চল হইয়া সূর্য্যকিরণ রোধ করিতে লাগিলেন, যেন রামের নবীন মুখ রবিতাপে মলিন না হয়—

প্রভাবস্তম্ভিতচ্ছায়মাশ্রিতঃ স বনস্পতিম্।
কদাচিদহ্নে সীতায়াঃ শিশ্যে কিঞ্চিদিব শ্রমাৎ॥

রামায়ণের রচনাকাল সম্বন্ধে বুধমণ্ডলীতে মতভেদ আছে। কিন্তু রাম আখ্যায়িকা অতি প্রাচীন। অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিত কাব্যে

সে আখ্যায়িকার বারম্বার উল্লেখ করিয়াছেন। পীটকাদি প্রাচীনতর গ্রন্থেও রাম আখ্যায়িকার উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু রামায়ণ ও বুদ্ধচরিত কাব্যে একটী সাদৃশ্য এত অধিক যে, নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে এখানে আদান প্রদান হইয়াছে।

হনুমান নিশাযোগে রাবণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া নিদ্রিতা নারীগণের যে অবস্থা দেখিয়াছিলেন তাহা রামায়ণে এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

মদব্যায়ামখিন্নাস্তা রাক্ষসেন্দ্রস্য যোষিতঃ
তেষু তেষ্ববকাশেষু প্রসুপ্তাস্তনুমধ্যমাঃ ॥
অন্যহারৈ স্তথৈবান্যা কোমলৈ র্নৃত্যশালিনী
বিন্যস্ত শুভ সর্ব্বাঙ্গী প্রসুপ্তা বরবর্ণিনী ॥
কাচিদ্বীণাং পরিষজ্য প্রসুপ্তা সংপ্রকাশতে
মহানদী প্রকীর্ণেব নলিনী পোতসাশ্রিতা ॥
অন্যকক্ষগতেনৈব মৃদুকেনাসিতেক্ষণা।
প্রসুপ্তা ভামিনী ভাতি বাল পুত্রেব বৎসলা ॥
পটহং চারুসর্ব্বাঙ্গী ন্যস্য শেতে শুভস্তনী
চিরস্য রমণং লব্ধা পরিষজ্যেব কামিনী ॥
কাচিদ্বীণাং পরিষজ্য সুপ্তা কমললোচনা
বরং প্রিয়তমং গৃহ্য সকামেব হি কামিনী ॥
বিপঞ্চীম্পরিগৃহ্যান্যা নিয়তা নৃত্যশালিনী
নিদ্রাবলমনুপ্রাপ্তা সহকান্তেব ভামিনী ॥
অন্যাকনকসঙ্কাশৈ র্মৃদুপীনৈ র্মনোরমৈঃ
মৃদঙ্গং পরিরভ্যাঙ্গৈঃ প্রসুপ্তা মত্ত লোচনা ॥
ভুজপাশান্তরস্থেন কক্ষস্থেন কৃশোদরী
পনবেন সহানিন্দ্যা সুপ্তা মদকৃতস্তথা ॥
ডিম্ ডিম পরিগৃহ্যান্যা তথৈবাসক্ত ডিমডিমা
প্রসুপ্তা তরুণং বৎস মুপগূহেব ভামিনী ॥

দৃষ্টা চ তং রাজসুতং ত্রিয়ন্তা জাজ্বল্যমানং বপুষা শ্রিয়া চ।
ধন্যাসঃ ভার্য্যেতি শনৈরবোচন্ শুদ্ধৈর্মনোভিঃ খলু নান্যভাবাৎ॥
অয়ং কিল ব্যায়তপীনবাহু রূপেণ সাক্ষাদিব পুষ্পকেতুঃ।
ত্যক্ত্বা শ্রিয়ং ধর্ম্মমুপৈষ্যতীতি তস্মিন্ হি তা গৌরবমেব চক্রুঃ॥

এই সুন্দর ভাবটী একজনের নিকট হইতে অন্য জনে যে গ্রহণ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। বিজ্ঞানে একটী আবিক্রিয়া যুগপৎ দুজনে সাধন করিয়াছেন দেখা যায়। বিবর্ত্তবাদ ডারবিন ও ওয়ালেসের মনে একই সময়ে বিকসিত হইয়াছিল। কাব্যশাস্ত্রের এক প্রকারের ভাব প্রাচ্য ও প্রতীচ্য কবিমণ্ডলীতে প্রস্ফুটিত হইতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত না নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইবে যে, অশ্বঘোষ ও কালিদাসের মনে স্বতই এ সুন্দর ভাব উদিত হইয়াছিল সে পর্য্যন্ত আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, একজনের নিকট হইতে অন্য জনে এ ভাবটী ঋণ করিয়াছেন। পূর্ব্বে কালিদাসকে খৃষ্টপূর্ব্ব শতাব্দীর কবি বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিত। সে বিশ্বাস সত্য হইলে বুঝা যায় যে, কালিদাসের যশঃপ্রভা শতবৎসর মধ্যে নবারুণ তেজে মালব হইতে পশ্চিমে পঞ্জাব ও পূর্ব্বে মগধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। অশ্বঘোষ তাঁহার নিকট ঋণ করিয়া বুদ্ধচরিত মহাকাব্য পূর্ণ করিয়াছেন।

কিন্তু প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ সকলেই এখন কালিদাসকে পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীর কবি বলিয়া উল্লেখ করেন। কথাটী গৌণভাবে রঘুবংশে সন্নিবেশিত হইয়াছে, মুখ্যভাবে বুদ্ধচরিতকার উল্লেখ করিয়াছেন। জরার জওয়াবে বিলাস না হইলে ক্ষণস্থায়ী যৌবনের অকিঞ্চিৎকরতা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় না। পরন্তু বুদ্ধচরিতকার দুতিনটী রেখাপাত করিয়া যে ছবি দেখাইয়াছেন কালিদাস স্বভাবসুলভ লিপিকুশলতায় তাহার পরমোৎকর্ষ সাধন করিয়া-

ছেন। অশ্বঘোষ ধূলাধূসরিত হীরকণিও আবিষ্কার করেন, কালিদাস কুঁদিয়া তাহা হইতে কোহিনূর বাহির করিয়াছেন। এজন্য অতি অনিচ্ছার সহিত আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয় অশ্বঘোষের প্রতিভা এই মহাকবিকল্পনার জননী। আচার্য্য কাউএল সাহেব বলেন—"I can hardly doubt that Kalidas's finished picture was suggested by the rough but inglorious outlines in Ashwaghosh; he was the Buddhist Ennius, who gave the first inspiration to the Hindu Virgil!

ইন্দ্রের অনুরোধে শিবের ধ্যানভঙ্গ করিতে আসিয়া কামদেব কি করিয়াছিলেন কালিদাস কুমারসম্ভবে তাহা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেনঃ—

উমা সমক্ষং হরবদ্ধলক্ষ্যঃ
শরাসনজ্যাং মুহুরামমর্জ্জ

বোধিদ্রুম-মূলে তথাগতের ধ্যানভঙ্গ করিতে আসিয়া মার বা কামদেব কি করিয়াছিলেন বুদ্ধচরিত মহাকাব্যে তাহা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

ততো ধনুঃ পুষ্পময়ংগৃহীত্বা শরাংস্তথা মোহকরাংশ্চ পঞ্চ
সোঽশ্বত্থমূলং সসুতোভ্যগচ্ছদস্থাস্থাকারী মনসঃ প্রজানাং
অথ প্রশান্তং মুনিমানসস্থং পারং তিতীর্ষুর্ভবসাগরস্য
বিষজ্য সব্যং করমাযুধাগ্রে ক্রীড়ন্স্বরেণেদমুবাচ মারঃ।

কালিদাস যে বৌদ্ধগ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন তাহার অন্য প্রমাণ পাওয়া যায়। ললিতবিস্তরে লিখিত হইয়াছে যে দিন কপিলবাস্তুর বৃদ্ধগণ হলচালনা করিতে প্রান্তরে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং যুবকেরা বেশভূষায় ভূষিত হইয়া ক্রীড়াকৌতুকে প্রবৃত্ত ছিলেন, সিদ্ধার্থ সেদিন নিঃসঙ্গ হইয়া এক জম্বুমূলে ধ্যানগত হইলেন। সময় অতীত হইতে লাগিল, সূর্য্য একদিক হইতে

উৎসৃষ্ট লীলাগতিরাগবাক্ষা
দলক্তকাঙ্কাং পদবীং ততান ॥

বিলোচনং দক্ষিণমঞ্জনেন
সম্ভাব্য তদ্বঞ্চিত বামনেত্রা
তথৈব বাতায়ন সন্নিকর্ষং
যযৌ শলাকামপরা বহন্তী ॥

জালান্তরপ্রেষিতদৃষ্টিরন্যা
প্রস্থানভিন্নাং ন ববন্ধ নীবীং
নাভিপ্রবিষ্টাভরণপ্রভেণ
হস্তেন তস্থাববলম্ব্য বাসঃ ॥

অর্দ্ধাঞ্চিতা সম্ভ্রমমুত্থিতায়াঃ
পদে পদে দুর্নিমিতে গলন্তী
কস্যাশ্চিদাসীত্রসনা তদানী
মসূষ্ঠমূলার্পিত সূত্রশেষা ॥

তাসাং মুখৈরাসবগন্ধগর্ভৈ
ব্যাপ্তান্তরা সান্দ্রকুতূহলানাং
বিলোলনেত্র ভ্রমরৈর্গবাক্ষাঃ
সহস্রপত্রাভরণা ইবাসন্ ॥

তা রাঘবং দৃষ্টিভিরাপিবন্ত্যো
নার্য্যো ন জগ্মুর্বিরমান্তরাণি
তথাহি শেষেন্দ্রিয়বৃত্তিরাসাং
সর্ব্বাত্মনা চক্ষুরিব প্রবিষ্টা ॥

এমন জীবন্ত বর্ণনা কদাপি দেখা যায়। নারীগণের রাঘব-দর্শনচেষ্টা যেমন স্বাভাবিক তেমনি সুন্দর। কিন্তু প্রসঙ্গের সহিত

তাহার সম্বন্ধও আছে। কিন্তু সে গৌণ সম্বন্ধ; কালিদাসের এ আটটী শ্লোক তুলিয়া লইয়া প্রসঙ্গের কোন ব্যাঘাত জন্মে না।

সিদ্ধার্থ প্রমোদভবনের বিলাসে নূতনত্বের অভাব দেখিয়া নগর ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। মহাপ্রস্থানের আরম্ভ এইখানে। ধনজনবিলাসপূর্ণ পণ্যবীথিকার সহসা জরতি দর্শনে সিদ্ধার্থের চমক ভাঙ্গিবে। একদিকে বিলাসের রাসবিহার অন্যদিকে তাহার অস্থায়িতা এমনি ক্ষেত্রে অশ্বঘোষ তাঁহার মহাকাব্যে লিখিতেছেন—

ততঃ কুমারঃ খলু গচ্ছতীতি শ্রুত্বা স্ত্রিয়ঃ প্রেষ্যজনাৎ প্রবৃত্তিং।
দিদৃক্ষয়া হর্ম্যতলানি জগ্মুর্জনেন মান্যেন কৃতাভ্যনুজ্ঞাঃ॥
তাঃ স্রস্তকাঞ্চীগুণবিস্মিতাশ্চ সুপ্তপ্রবুদ্ধাকুললোচনাশ্চ।
বৃত্তাংতবিন্যস্তবিভূষণাশ্চ কৌতূহলেনাপি ভৃতাঃ পরীয়ুঃ॥
প্রাসাদ সোপানতলপ্রণাদৈঃ কাংচীরবৈর্ণূপুরনিঃস্বনৈশ্চ।
বিস্রাময়ংতো গৃহপক্ষিসংঘানন্যোন্যবেগাচ্চ সমাক্ষিপংত্যঃ॥
কাসাংচিদাসাং তু বরাংগণানাং জাতত্বরাণামপি সোৎসুকানাং।
গতিং গুরুত্বাজ্জঘনৈর্বিশালাঃ শ্রোণীরথাঃ পীনপয়োধরাশ্চ॥
শীঘ্রং সমর্থাপি তু গংতুমন্যা গতিং নিজগ্রাহ বধূর্ন তূর্ণং॥
হ্রিয়া প্রগল্ভানি নিগূহমানা রহঃ প্রযুক্তানি বিভূষণানি॥
পরস্পরোৎপীড়নপিংডিতানাং সংমর্দসংশোভিতকুংডলানাং।
তাসাং তদা নম্রনভূষণানাং বাতায়নেষ্বপ্রশমো বভূব॥
বাতায়নেভ্যস্তু বিনিঃসৃতানি পরস্পরোপাহিত কুংডলানি।
স্ত্রীণাং বিরেজুর্মুখপংকজানি সক্তানি ঘর্মস্রিবপংকজানি॥
ততো বিনানৈর্ঘৃতকলাপৈঃ কৌতূহলোদ্ঘাটিতবাতজালৈঃ।
শ্রীমৎসমংতন্নগরং বভাসে বিয়দ্বিমানৈরিব সাপ্সরোভিঃ॥
বাতায়নানামবিশালভাবাদন্যোন্যগংডার্পিতকুংডলানি।
মুখানি রেজুঃ প্রমদোত্তমানাং বদ্ধাঃ কলাপা ইব পংকজানাং॥
তস্মিন্ কুমারং পরিবীক্ষমানা স্ত্রিয়ো বভূর্গামিব গংতুকামাঃ।
ঊর্ধ্বোন্মুখাশ্চেনমুপৈক্ষমানা নরা বভূর্দ্যামিব গংতুকামাঃ॥

প্রণালী ঠিক ঐরূপ। মধ্যস্থলে বৃহৎ প্রাঙ্গণ, চারিদিকে দ্বিতল গৃহ, দেখিতে বড় সুন্দর।

মিসেস পটার পামার নামক একটী ধনাঢ্য মহিলার দ্বারা এই বাড়ীর সৌন্দর্য্য ও অন্যান্য কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। এই বাড়ীর ডিজাইন, বোষ্টন নগরের মিস সোফিয়া হেডেন নামক মহিলা দ্বারা প্রথমে করা হয় এবং তাঁহারই তত্ত্বাবধানে এই বাড়ী নির্ম্মিত হয়। এখানকার সমস্ত দ্রব্যাদি কেবল স্ত্রীলোক দ্বারাই প্রস্তুত ও সজ্জিত হইয়াছে। এটী বড় সহজ কার্য্য নহে; ইহার জাঁকজমক্ যে কিরূপ তাহা না দেখিলে হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন। কোন দেশের পুরুষেরাও এরূপ কার্য্যে ক্ষমবান হইলে তাঁহাদিগকে বিশেষ ধন্যবাদ দেওয়া যাইতে পারে।

এই বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া উপরে কতকগুলি চিত্র দেখিতে পাইলাম; প্রাচীন কালে যখন মনুষ্যেরা বস্ত্রাদি পরিধান করিতে শিক্ষা করে নাই তখন হইতে বর্ত্তমান সময়ের নানাবিধ জাঁকাল পরিচ্ছদধারী চিত্র দেখিতে পাওয়া গেল,—একদিকে ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশবাসীর চিত্র অন্যদিকে এসিয়াবাসীর চিত্র।

প্রাঙ্গণের চারিদিক চীন, জাপান, আয়র্লণ্ড, স্কটলণ্ড প্রভৃতি স্থানের নানাবিধ চিত্র স্থাপিত হইয়াছে। এখানে একটী জাপানী যুবতীর চিত্র দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ হইল। ইহারা চিত্র কার্য্যে যে এত নিপুণতা লাভ করিয়াছে ইহাই আশ্চর্য্যের কারণ। আমাদের যে উন্নতি বহুকাল পূর্ব্বে হইয়াছিল তাহা লইয়াই আমরা অহঙ্কারে মত্ত হইয়া নিশ্চেষ্ট আছি, আর যাহাদিগকে আমরা অসভ্য বলিয়া ঘৃণা করিতাম, তাহারা বর্ত্তমান উন্নতির স্রোত ধরিয়া আমাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়াছে।

এই প্রাঙ্গণের [illegible] দিকে নানাদেশীয় মহিলাদিগের হস্ত-নির্ম্মিত কারুকার্য্য সমুদায় সজ্জিত রহিয়াছে। এইস্থানে এক জায়গায় একটী জাপানী স্ত্রীলোক উত্তম পোষাক পরিয়া বস্ত্র বয়ন করিতেছে। এই কলটী ঠিক আমাদের দেশের কলের মত। এই-রূপ কাপড় দ্বারা প্রস্তুত একটী ফুলের ঝাড় দেখিয়া অবাক হইলাম, এমন সুন্দর কাজ আমি আর কোথাও দেখি নাই। প্রথমে ইহাকে যথার্থই স্বাভাবিক ফুলের গাছ বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

একটী কলের সাহায্যে দ্বিতলায় উঠিলাম, এখানে বৃহৎ একটী ঘরে অনেক চেয়ার সাজান, শুনিলাম এখানে মহিলা-দের নানা সভা সমিতির অধিবেশন হইয়া থাকে। তাহার [illegible] যাহারের স্থান, দক্ষিণ দিকে আফিসের মত, সেখানে [illegible] যুবতী ও প্রৌঢ়াকে দেখিলাম, তাঁহারা লেখাপড়া ও [illegible] কার্য্যে ব্যস্ত আছেন; ইঁহারা এখানকার কর্ম্মচারী। [illegible] গৃহগুলির সম্মুখে প্রশস্ত বারাণ্ডা, তাহাতে নানাবিধ [illegible] কার্পেট সাজান আছে; শুনিলাম সেগুলি স্ত্রীলোকের হস্ত-[illegible] কতকগুলি কল আছে, তাহাও স্ত্রীলোকের দ্বারা [illegible] হইয়া চালিত হইতেছে। এই সমস্ত কার্পেট ও গালি-[illegible] [illegible]খানি অতি সুন্দর ও বৃহৎ গালিচা দেখিলাম, [illegible] উজ্জ্বল কারুকরা পশুপক্ষী ইত্যাদির চিত্র রহিয়াছে। [illegible] এইখানির মূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকা। দরিদ্র বাঙ্গালীর [illegible] ইচ্ছা হইল তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। এই সমুদায় দেখিয়াই অবাক [illegible] এমন সময় একটী প্রবীণা যুবতী আমাকে [illegible] বলিলেন, আপনার দেশে [illegible] ঐরূপ [illegible] আমি

বলিলাম, "আমার দেশে ভাল ভাল গালিচা হয় বটে কিন্তু এরূপ একখানিও আমার নয়নগোচর হয় নাই।" ফ্রান্সদেশে প্যারিস সহরে গবর্ণমেণ্টের কার্পেটের কারখানায় গিয়া সুন্দর সুন্দর কার্পেট প্রস্তুত হইতেছে দেখিয়াছি। তাহার মূল্যও অত্যন্ত অধিক বটে, তথাপি ইহার তুলনায় তাহা নিকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইল।

এই বৃহৎ বাটীর পূর্ব্বদিকে কতকগুলি ঘর দেখিতে পাইলাম, তাহা নানাবিধ দ্রব্যে সজ্জিত হইয়াছে। এক একটী এক একপ্রকার নূতন প্রণালীতে সাজান, পড়িয়া দেখিলাম এক একদেশের প্রথামত এই ঘরগুলি সজ্জিত হইয়াছে। একস্থানে জাপানদেশীয় সমস্ত বস্তু দেখিতে পাইলাম; এই ঘরের মেজে মাদুরে মোড়া, অন্যান্য গৃহগুলিতে কার্পেট ও গালিচা পাতা। একটী ঘরের মেজেতে একটী বৃহৎ কৃষ্ণ ভল্লুকের চামড়া পাতা আছে, এত বড় বৃহৎ চর্ম্ম আমি কখন দেখি নাই। ভল্লুকটী যে কত বড় ও ভয়ানক ছিল তাহা অনুমান করিয়া বুঝিলাম। যখন নিম্নদিকে আসিতে আরম্ভ করিলাম তখন সিঁড়ির চারিদিকের শোভা দেখিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত হইল। নীচে নামিয়া স্ত্রীলোক দ্বারায় চালিত নানা প্রকার কল দেখিতে পাইলাম—সেলাইয়ের কল, লেখার কল, ছাপার কল, কাগজপ্রস্তুতের কল ইত্যাদি।

এই বাটীর চারিদিকে কতকটা জমিতে নানা জাতীয় ফুলের গাছ দেওয়া হইয়াছে। একপ্রকার লাল ফুল ফুটিয়া যে শোভা হইয়াছে তাহা বর্ণনা করা আমার সাধ্য নহে।

হস্তসার।*

অধ্যাপক ম্যাক্সমুলর প্রাচ্যদেশীয় ধর্ম্মগ্রন্থগুলি ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছেন, য়ুরোপের জ্ঞানপিপাসা ক্রমশ বিশ্বব্যাপী। আমরা প্রাচ্যগণ আমাদের প্রাচীন সভ্যতার মহত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতার বিস্তার সম্বন্ধে মৌখিক গর্ব্ব করিতে ত্রুটি করি না, কিন্তু তদ্বিষয়ে কিছু জানিতে হইলে য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের শরণাপন্ন হইতে হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের গৌরব জগদ্বিস্তৃত। য়ুরোপে এই বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস এবং তত্ত্বনির্ণয় লইয়া সবিশেষ আলোচনা পড়িয়া গিয়াছে, আমরা বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তিস্থান, বুদ্ধদেবের জন্মভূমি ভারতবর্ষে জন্মলাভ করিয়াও বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছুই জানি না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সম্প্রতি পুরাণাদি হিন্দুশাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া "বঙ্গবাসী" কার্য্যালয় আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এক্ষণে বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইলে আমাদের বঙ্গভাষা ও বঙ্গদেশের একটি প্রধান অভাব মোচন হয়।

কারণ, প্রাচীন সংস্কৃত অথবা পালি গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ পাঠ করিয়া কখনও মনের তৃপ্তি জন্মে না—সর্ব্বদাই একটা সংশয় থাকিয়া যায় যে, দেশীয় ভাবগুলি ইংরাজি অনুবাদে অবিকৃত আছে কি না। বাস্তবিক, প্রাচ্য ভাবগুলি পাশ্চাত্য ভাষায় সম্যক্ অনুবাদ করা বিশেষ দুরূহ। এবং কথার সামান্য [illegible] ওদিকে ভাবের বিশেষ ব্যত্যয় ঘটে।

শ্রীযুক্ত ধর্ম্মরাজ বড়ুয়া মহাশয় সেইজন্য [illegible] সহকারে নানাবিধ বৌদ্ধ গ্রন্থাদি অবলম্বন [illegible]

* হস্তসার। প্রথম খণ্ড। শ্রীধর্ম্মরাজ বড়ুয়া [illegible]

গ্রন্থখানি সংকলন করিয়া সর্ব্বসাধারণের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বিশেষতঃ বাঙ্গলা অনুবাদের সহিত মূল পালি ও সংস্কৃত ব্যাখ্যা থাকাতে বুঝিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এবং সেই সঙ্গে বোধ করি পালিভাষা শিক্ষারও সহায়তা হয়।

বড়ুয়া মহাশয় শ্যামদেশের প্রধান ধর্ম্মযাজকের শিষ্য। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানের পরিচয় বিশেষ করিয়া দিবার আবশ্যক নাই। এবং এই হস্তমার গ্রন্থে বৌদ্ধ ত্রিরত্ন-বন্দনা, পূজাবিধি, উৎসর্গমন্ত্র, দেবাবাহন, পরিত্রাণ, প্রাতঃ-র্থনা, সায়ংপ্রার্থনা কিছুই বাদ যায় নাই। বাঙ্গলা গদ্যা-দটি বাহুল্য হইলেও গদ্যানুবাদ বেশ সরল হইয়াছে।

আশা করি, বড়ুয়া মহাশয় এবং তাঁহার বৌদ্ধ সহযোগীগণ বধর্ম্মের প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলি বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া াদের অজ্ঞতা এবং কলঙ্ক মোচন করিবেন।

সমালোচ্য গ্রন্থ হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্মনীতি ও নিত্যক্রিয়া সম্বন্ধে ক জ্ঞানলাভ করা যায়। আমরা স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়া ছি, তাহা হইতে পাঠকগণ এই গ্রন্থের গৌরব বুঝিতে পারি-।

ভিক্ষুগণ প্রতিদিন প্রাতঃপ্রার্থনার পর যে "মেত্তভাবনা" মৈত্রভাবনা পাঠ করেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিই।— াকল জীব সুখিত হউক্, অবৈর হউক্, অব্যাপজ্জ হউক্, অহিং-হউক্, ও সুখী হইয়া কালহরণ করুক্। সকল জীব দুঃখ ত প্রমুক্ত হউক্, সকল জীব যথালব্ধ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত উক্। সকল জীব কর্ম্মের দায়াদ, কর্ম্ম-া, কর্ম্মবন্ধু ও কর্ম্মাশ্রিত; পাপ বা পুণ্য, যে কর্ম্ম করিবে, রই ফলভাগী হইবে।

একটি নিত্য-
ভাবিবে। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই এই বিষয়টি নিত্য চিন্তা করা কর্ত্তব্য।—

আমি জরা-ধর্ম্মের অধীন, জরাকে অতিক্রম করিতে পারিব না; আমি ব্যাধির অধীন আছি, ব্যাধিকে অতিক্রম করিতে অক্ষম; আমি মরণের অধীন আছি, মরণকে অতিক্রম করিতে অক্ষম; আমার সমুদয় প্রিয়জন ও মনোহর বস্তু হইতে অবশ্যই একদিন-না-একদিন বিচ্ছেদ হইতে হইবেই হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; আমি কর্ম্মের স্বকীয় আছি (অর্থাৎ আমার পাপ পুণ্য কর্ম্মই আমার আপন, আর সকল পর); আমি কর্ম্মের দায়াদ—উত্তরাধিকারী—ফলভাগী, কর্ম্মযোনি (সদসদ্ কর্ম্মেরই বংশধর), কর্ম্মবন্ধু (পাপ-পুণ্য কর্ম্মই আমার বন্ধু, বন্ধু আর কেহ নাই), কর্ম্মাশ্রিত (আমার কর্ম্মই আমার আশ্রয়)। পাপ পুণ্য যে কর্ম্ম করিব, তাহারই ফলভাগী হইব।

বৌদ্ধদের শীলগ্রহণ একটি প্রধান অনুষ্ঠান। কেহ বা পঞ্চশীল গ্রহণ করে, কেহ বা অষ্টশীল, কেহ বা দশশীলও করিয়া থাকে। সকলেই জানেন শীল অর্থে চরিত্র বুঝ পঞ্চশীল, যথা,—

১। প্রাণীহত্যা করিব না, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।
২। চুরি করিব না, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।
৩। ব্যভিচার করিব না, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।
৪। মিথ্যা বলিব না, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।
৫। প্রমাদের কারণ সুরা ও মৈরেয় প্রভৃতি মদ্য করিব না, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।

তৎপরে ভিক্ষু উপদেশস্বরূপ বলিবেন—তিন শরণ সহ

ধর্ম্ম সংঘ ত্রিশরণ) পঞ্চশীল ধর্ম্ম ভালরূপে পালন করিয়া সাধন করিবেন। গৃহী 'যে আজ্ঞা প্রভু' বলিয়া সায় দিবেন।

শীল জিনিসটি বড় সামান্য নহে। বৌদ্ধধর্ম্মে শীলের বিশেষ মাহাত্ম্য।

১। মানবগণ শীল দ্বারা সুগতি, ভোগসম্পদ ও নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। এই হেতু শীল বিশুদ্ধ করিবে।

২। শীলমূলে (ধর্ম্মে) কুলপুত্রগণের যাহা ছাড়া গতি নাই, সেই শীলের ফল কয় সাধ্য যে বর্ণনা করে?

৩।৪। কি গঙ্গা, কি যমুনা, কি সরযূ, কি সরস্বতী, কি অচিরবতী, কি মাথী ও মহানদী ইহলোকে প্রাণীগণের সেই মরণা নোদ করিতে পারে না, যাহা শুদ্ধ শীল-জলই ধৌত করিতে পারে।

৫।৬। কি সজলদ বাতাস, কি হরিচন্দন, কি মণিমুক্তাময় হার অথবা কি চন্দ্রকিরণ ইহলোকে প্রাণীদিগের সেই জ্বালা উপশম করিতে পারে না, যাহা এই অত্যন্ত শীতল সুরক্ষিত আর্য্য-শীল উপশম করিতে পারে।

৭। শীল-সৌরভের সমান এমন সৌরভ আর কোথায়, যাহা অনুকূল ও প্রতিকূল বাতাসেও সমান ভাবে সৌরভ দান করে?

৮। স্বর্গারোহণের সোপান অথবা নির্ব্বাণ-নগরে প্রবেশ করিবার দরজা, শীলের সমান আর কোথায়?

৯। শীলভূষণভূষিত যতিগণ যেমন শোভা পান, মণিমুক্তাবিভূষিত রাজারাও তেমন শোভা পান না।

১০। শীল, শীলবন্তের সর্ব্বদা কীর্ত্তি ও হর্ষ উৎপাদন করে। আত্মনিন্দাদিভয় সর্ব্বশঃ বিধ্বংস করে।

১১। গুণসমূহের মূলস্বরূপ ও দোষসমূহের বলহন্তা শীলের ফলবর্ণনের এই দ্বার বলিয়া জানিবেন।

অষ্টশীলধারী উপাসকগণ যে কর্ম্মস্থানগুলি ভাবনা করিবেন, তাহার মধ্যেও শীলের গুণস্মরণ একটি প্রধান।—

যে শীল অখণ্ড, ভ্রমেও খণ্ড হয় নাই; যে শীল অচ্ছিদ্র, ভ্রমেও লেশমাত্র লঙ্ঘন হয় নাই; যে শীল স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া রক্ষিত, কোন জোরজারপূর্ব্বক রক্ষিত নহে; যে শীল পাপসংসর্গবিরহিত, একান্ত পবিত্র, পরিশুদ্ধ, যে শীল স্বাধীন অর্থাৎ

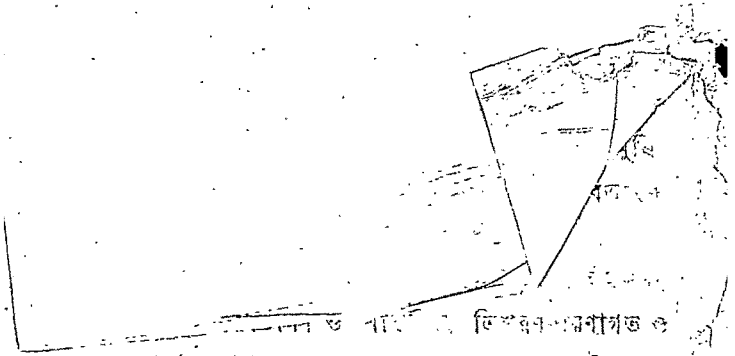

ও পাপ [illegible] লিপ্তকলেবরাগত ও নিয়ত পুণ্যকার্য্যে ব্যাপৃত যে সকল [illegible] সেই সমস্ত দেবতা পরম সন্তোষ হেতু [illegible] তথায় তাহার জন্য আগমন করুন।

অন্যকৃত যে পুণ্য সর্ব্বসাধারণ [illegible] সমুদয় দেবতা, যক্ষ ও ব্রহ্মাগণ অনুমোদন করিয়া সর্ব্বপ্রকারে বিশেষতঃ রক্ষাকার্য্যে সতর্ক হউন্।

ধর্ম্ম ও জগতের সর্ব্বদা শ্রীবৃদ্ধি হউক। [illegible]

আমরা রক্ষা প্রার্থনা করিলে স্ব স্ব পরিবার ও আমাদের সকল আনন্দিত ও নিরাময় সুখী ও দুঃখহীন হইবে।

ভূপতি, তস্কর, নর, অনর; অনল, সলিল, পিশাচ, পাণ্ডুরোগ, কণ্টক, নক্ষত্র, বিসূচিকা রোগ; অসদ্ধর্ম, অসৎ-দৃষ্টি, অসৎ পুরুষ (বেড়ুয়া মহাশয় বাঙ্গালা অনুবাদে 'নাস্তিকের ধর্ম্ম, নাস্তিক্য, নাস্তিক' এইরূপ লিখিয়াছেন) উন্মত্ত বারণ, তুরঙ্গ, হরিণ; বাঁড়, কুকুর, ভুজঙ্গ, বৃশ্চিক, মণিধর, সর্প, শার্দ্দূল, ভল্লুক; তস্কর, সূকর, মহিষ, যক্ষক, রাক্ষস প্রভৃতি নানাবিধ ভয়, নানাবিধ রোগ, নানা উপদ্রব হইতে দেবগণ রক্ষা করুন।

বৌদ্ধ মঙ্গলসূত্র এইরূপ।—

দেবতার সহিত মনুষ্যগণ যেই মঙ্গল দ্বাদশ বৎসর চিন্তা করিয়াছিলেন; চিরকাল চিন্তা করিয়াও যাহা জানিতে পারেন নাই।

যেহেতু (যেই মঙ্গল জানিবার বিষয়ে) অযুত ভূমণ্ডলে যাবৎ ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত তৎকাল করিয়া কোলাহল (মহা আন্দোলন) হইয়াছিল।

লোকনাথ (বুদ্ধ) সর্ব্বপাপবিনাশক যেই মঙ্গল উপদেশ দিয়াছিলেন, যাহা শুনিয়া অসংখ্য অসংখ্য নর (নারী) সত্ত্ব (প্রকার) দুঃখ হইতে মুক্ত হয়, আমরা ঈদৃশ গুণশালী সে মঙ্গল বর্ণনা করিতেছি।
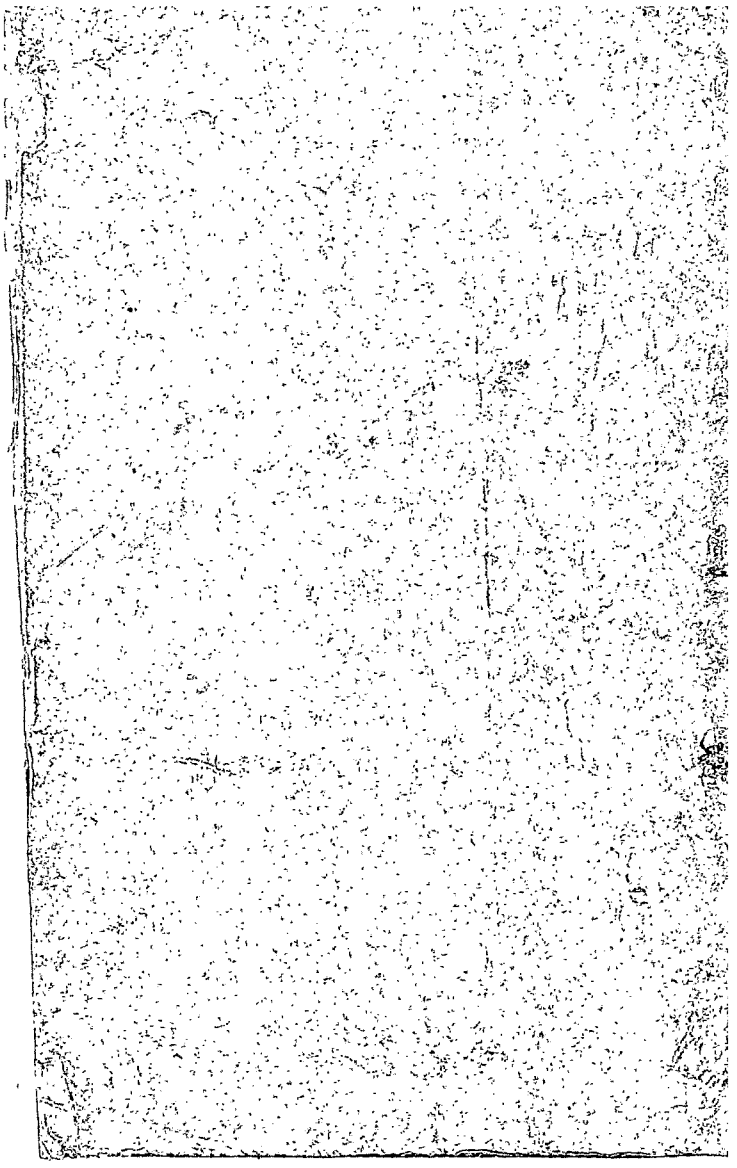
মহাস্থবির আনন্দ বলিতেছেন, যৎকর্ত্তৃক এইরূপ শ্রুত হইয়াছে যে, একসময় ভগবান্ বুদ্ধদেব শ্রাবস্তী নগর সমীপস্থ জেতবনে অনাথপিণ্ডদ নামক শ্রেষ্ঠীর বিহারভবনে বাস করিতেছেন। অনন্তর (নামগোত্রে অপরিচিত) অন্যতর দেবতা রাত্রির যামে স্বকীয় দেহপ্রভায় প্রভাসিত হইয়া, সমুদয় জেতবনকে